বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

৬৬ তম বর্ষ

৬৭ তম বর্ষ

৬৮ তম বর্ষ

৬৯ তম বর্ষ

উক্ত বর্ষের কার্য্যবিবরণীগুলি এই খণ্ডের ১৩০ পৃষ্ঠার পর আছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

সপ্ত ষষ্টিতম বর্ষ প্রথম সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বর্ষ ৬৭ ॥ সংখ্যা ১

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

প্রতি সংখ্যা দুই টাকা। বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা

পরিষদের সদস্য-পক্ষে বিনামূল্যে প্রাপ্তব্য

লালবিহারী দে

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৬৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

দক্ষিণ-পূর্ব্ব বাঙ্গলার চন্দ্র রাজবংশ

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

১

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে জার্ম্মাণ পণ্ডিত হুল্‌ৎশ্‌ 'দক্ষিণ ভারতীয় লেখমালা' সংজ্ঞক গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডে তামিলভাষী অঞ্চলের চোলবংশীয় সম্রাট্‌ প্রথম রাজেন্দ্রের (১০১৬-৪৩ খ্রীষ্টাব্দ) তিরুমলৈ শিলালিপি প্রকাশ করেন। উহা হইতে জানা যায় যে, ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দের অল্পকাল পূর্ব্বে চোল সৈন্য বঙ্গালদেশের অধিপতি গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছিল। বহুকাল পর্য্যন্ত প্রাচীন বাংলার এই রাজবংশ সম্পর্কে আর কোন তথ্য জানা যায় নাই। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীচন্দ্র নামক চন্দ্রবংশীয় নরপতির কতিপয় তাম্রশাসন এবং লডহচন্দ্র নামক অপর একজন চন্দ্র নৃপতির ১৮শ রাজ্যবর্ষে প্রতিষ্ঠিত একটি মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। শ্রীচন্দ্রের শাসনাবলী হইতে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি জানা গিয়াছে।

চন্দ্রবংশের আদিবাস ছিল রোহিতাগিরি অর্থাৎ বিহারের শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত রোহতাসগড়। এই বংশীয় পূর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র হরিকেল-রাজলক্ষ্মীর আধারস্বরূপ ছিলেন এবং চন্দ্রদ্বীপের অর্থাৎ বাকলাচন্দ্রদ্বীপ বা বাখরগঞ্জ অঞ্চলের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। 'হরিকেল-রাজলক্ষ্মীর আধার' কথাটির অর্থ লইয়া পণ্ডিত সমাজে মতদ্বৈধ আছে। আমরা অন্যত্র দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, হরিকেল শ্রীহট্টের প্রাচীন নাম এবং ঐ কথায় ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে হরিকেল রাজ্যের লঘুমিত্র বা সামন্তরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। কেশবকৃত কল্পদ্রুকোশে আছে—"শ্রীহট্টো হরিকেলিঃ স্যাচ্ছ্রীহটো'পি কচিদ্ভবেৎ"। ঐরূপেই পূর্ব্বচালুক্যবংশের সামন্ত পরিচ্ছেদিবংশীয় রাজগণকে অনেকসময় চালুক্যরাজ্যের মূলস্তম্ভরূপে বর্ণিত দেখা যায়। শ্রীচন্দ্রের রাজধানী ছিল বিক্রমপুরে। তাঁহার পিতা ত্রৈলোক্যচন্দ্র ক্ষুদ্র চন্দ্রদ্বীপ জনপদের শাসক ছিলেন; কিন্তু শ্রীচন্দ্র বাহুবলে ঢাকাত্রিপুরা অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। শ্রীচন্দ্রই বাংলার চন্দ্ররাজবংশের প্রথম স্বাধীন পরাক্রান্ত নরপতি।

এই সম্পর্কে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, চন্দ্রবংশীয় পূর্ণচন্দ্র ও ত্রৈলোক্যচন্দ্রের কোন তাম্রশাসন এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। শ্রীচন্দ্রের কোন কোন শাসনে রাজ্যবর্ষের উল্লেখ নাই। সম্প্রতি প্রকাশিত মদনপুর তাম্রশাসন শ্রীচন্দ্রের ৪৬শ রাজ্যবর্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে। তাঁহার অন্যান্য তাম্রশাসনের মধ্যে কেবলমাত্র ধুল্লা শাসনে এইরূপ একটি তারিখ আছে; কিন্তু উহার পাঠ অস্পষ্ট। আমরা পূর্ব্বে আনুমানিকভাবে

ঐ স্থানে "সম্বৎ ৮" পাঠ করিয়াছিলাম। পরে পুনঃপরীক্ষা করিয়া মনে হইয়াছে যে, তারিখটির প্রকৃত পাঠ সম্ভবতঃ "সম্ব ২৮"। অন্ততঃ পক্ষে "সম্বৎ ৮" অপেক্ষা "সম্ব ২৮" যে অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ পাঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং শ্রীচন্দ্রের ধুল্লা তাম্রশাসন তদীয় রাজত্বের ২৮শ বর্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল, স্থির করা যাইতে পারে। আমাদের মনে হয়, রাজত্বের প্রথম দিকে শ্রীচন্দ্র পিতা ত্রৈলোক্যচন্দ্রের ন্যায় ক্ষুদ্রনৃপতিমাত্র ছিলেন; কিন্তু উহার শেষ ভাগে বিস্তৃত রাজ্যের অধিকার লাভ করিবার পর তিনি স্বাধীনভাবে তাম্রশাসন দান করিতে থাকেন।

বাংলার সুপ্রসিদ্ধ পালবংশের আদিবাস ছিল বঙ্গালদেশ অর্থাৎ বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ অঞ্চল। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে পালবংশীয় গোপাল বাংলা ও বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন। তাঁহার মহাপরাক্রান্ত পুত্র ধর্ম্মপাল (আনুমানিক ৭৭০-৮১০ খ্রীষ্টাব্দ) উত্তরপ্রদেশের কিয়দংশে প্রভাব বিস্তার করেন। তৎকালীন লেখমালায় তাঁহাকে বঙ্গাল, বঙ্গ কিংবা গৌড়ের অধীশ্বররূপে উল্লিখিত দেখা যায়। গোপালের সময়ে কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী দেবপর্ব্বতে দেববংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে পালরাজগণ দেববংশ উচ্ছেদ করিয়া ত্রিপুরা অঞ্চলে অধিকার বিস্তার করেন এবং এই সূত্রে দেববংশের সহিত আত্মীয়তা ও মিত্রতাবদ্ধ হরিকেল রাজ্যের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হন বলিয়া মনে হয়। তৎকালীন হরিকেল রাজবংশের একজন মাত্র নরপতির নাম জানা গিয়াছে। তিনি কান্তিদেব। সম্ভবতঃ তিনি নবম শতাব্দীতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব বাংলার অনেকাংশে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কারণে পালরাজগণের সহিত কান্তিদেবকে সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সমগ্র বিহারে পালবংশের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। রোহতাসগড়বাসী চন্দ্র-বংশীয়েরা সম্ভবতঃ পালরাজ্যের সামন্ত বা কর্ম্মচারিরূপে বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা বাংলায় অধিষ্ঠিত হইবার পর, যখন পালসম্রাটের সহিত দেবপর্ব্বত ও হরিকেল রাজ্যের নরপতিগণের বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন সম্ভবতঃ চন্দ্রগণ শত্রুপক্ষে যোগ দিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব বাংলা হইতে পালপ্রভুত্ব বিলোপে সহায়তা করিয়াছিলেন এবং সেই সূত্রেই বোধ হয় ত্রৈলোক্যচন্দ্র হরিকেলরাজ-কর্ত্তৃক চন্দ্রদ্বীপের অধীশ্বররূপে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। পালবংশের সহিত হরিকেল-রাজের সংঘর্ষই শ্রীচন্দ্রকে রাজ্যবিস্তার ও স্বাধীনতা অবলম্বনের সুযোগ দিয়াছিল বলিয়া মনে করি।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গোবিন্দচন্দ্রের দুইখানি মূর্ত্তিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু উহা হইতে শ্রীচন্দ্রের সহিত তাঁহার সম্পর্কের বিষয় কিছু জানা যায় নাই। মূর্ত্তিদ্বয়ের একটি গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বের ২৩শ বর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং তিনি প্রায় ২৫।৩০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। প্রত্নলিপিতাত্ত্বিক প্রমাণ একাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ঐ লিপিটির কালনির্দ্দেশ করে। এদিকে তিরুমলৈ লিপি হইতে জানিতে পারি যে, গোবিন্দচন্দ্র ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই সিংহাসনে আরোহণ

করিয়াছিলেন। আবার শব্দপ্রদীপের গ্রন্থকার সুরেশ্বর বা সুরপাল লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা ভদ্রেশ্বর বঙ্গেশ্বর রামপালের কর্ম্মচারী এবং পিতামহ দেবগণ রাজা গোবিন্দচন্দ্রের রাজবৈদ্য ছিলেন। রামপাল আনুমানিক ১০৮২-১১২৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহা হইতে মনে হয়, গোবিন্দচন্দ্র একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কিছুকাল পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতএব তিনি আনুমানিক ১০২০-৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ গোবিন্দচন্দ্রের পর চন্দ্ররাজ্য পালবংশের করতলগত হইয়াছিল এবং সেইজন্যই শব্দপ্রদীপকার রামপালকে বঙ্গেশ্বর আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন।

সম্প্রতি পূর্ব্ব-পাকিস্থানে চন্দ্রবংশীয় রাজগণের কতিপয় নূতন তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাকিস্থান পুরাতত্ত্ববিভাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ময়নামতীর পুরাতাত্ত্বিক খনন-বিষয়ক পুস্তিকায় শাসনগুলির অতিশয় সংক্ষিপ্ত এক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছিল। ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে আলীগড়ে অনুষ্ঠিত ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আহমদ হাসান দানী সাহেব একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহাতে শাসনগুলির ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

এই নবাবিষ্কৃত লিপিগুলি হইতে জানা গিয়াছে যে, শ্রীচন্দ্রের পর তাঁহার পুত্র কল্যাণচন্দ্র, পৌত্র লডহচন্দ্র এবং প্রপৌত্র গোবিন্দচন্দ্র সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। একখানি তাম্রশাসন কল্যাণচন্দ্রের রাজত্বের ২৪শ বর্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং চন্দ্ররাজগণের রাজত্বের অন্তিম বৎসর নিম্নরূপ জানা যাইতেছে।— শ্রীচন্দ্র ৪৬শ বর্ষ; তৎপুত্র কল্যাণচন্দ্র ২৪শ বর্ষ; তৎপুত্র লডহচন্দ্র ১৮শ বর্ষ; এবং তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্র ২৩শ বর্ষ। অতএব যদি গোবিন্দচন্দ্র আনুমানিক ১০২০-৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার পিতা লডহচন্দ্র আনুমানিক ১০০০-২০ খ্রীষ্টাব্দে, পিতামহ কল্যাণচন্দ্র আনুমানিক ৯৭৫-১০০০ খ্রীষ্টাব্দে এবং প্রপিতামহ শ্রীচন্দ্র আনুমানিক ৯২৫-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

দানীসাহেবের প্রবন্ধে ঐ লিপিগুলি হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখানো হইয়াছে যে, ত্রৈলোক্যচন্দ্র গৌড়রাজের সহিত বিবাদে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যে হরিকেল রাজের লঘুমিত্র বা সামন্তরূপে পাল নরপতির সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা অনুমান করিতে কোনই বাধা নাই।

অপর দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দানীসাহেব দেখাইয়াছেন যে, শ্রীচন্দ্র গৌড় ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের সহিত বিবাদে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং গোপালকে সংরোপিত (অর্থাৎ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত) করিয়াছিলেন। তাম্রশাসনগুলিতে কল্যাণচন্দ্রের সহিতও গৌড় এবং লৌহিত্যতীরবাসী (অর্থাৎ প্রাগ্‌জ্যোতিষনিবাসী) ম্লেচ্ছগণের সংঘর্ষের উল্লেখ আছে বলিয়া দানীসাহেব লিখিয়াছেন। ম্লেচ্ছ বলিতে এখানে কামরূপের শালস্তম্ভ বংশীয় রাজগণকে বুঝিতে হইবে।

উল্লিখিত গোপাল অবশ্যই পালবংশীয় দ্বিতীয় গোপাল (আনুমানিক ৯৪০-৬০

খ্রীষ্টাব্দ)। শ্রীচন্দ্রকর্তৃক গোপালের সংরোপণের অর্থ দুই প্রকার হইতে পারে। উহার প্রথমটি এই যে, তিনি পালবংশের লঘুমিত্র বা সামন্ত ছিলেন এবং পালসিংহাসনসম্পর্কিত বিবাদে গোপালের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। শ্রীচন্দ্রের এই দাবির সহিত কলচুরিরাজ প্রথম কোকল্ল কর্তৃক প্রতীহার ভোজ এবং রাষ্ট্রকূট দ্বিতীয় কৃষ্ণকে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে কীর্তিস্তম্ভরূপে স্থাপনের কাহিনীর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। দ্বিতীয় গোপালের রাজ্যারোহণের সময় পর্যন্তও যে শ্রীচন্দ্র ঢাকা-ত্রিপুরা অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন নাই, তাহার প্রমাণ ত্রিপুরা জেলার মনধুক গ্রামে প্রাপ্ত দ্বিতীয় গোপালের প্রথম রাজ্যবর্ষে প্রতিষ্ঠিত একটি মূর্তি। ত্রৈলোক্যচন্দ্র হরিকেলরাজের লঘুমিত্র বা সামন্ত থাকিলেও তাঁহার পুত্র শ্রীচন্দ্র পুনরায় পালবংশের লঘুমিত্র বা সামন্ত হইয়াছিলেন।

এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে স্বীকার করিতে হয় যে, পালবংশীয় দ্বিতীয় গোপাল শ্রীচন্দ্রের সহায়তায় সিংহাসনের কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া পিতৃরাজ্য লাভ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি এইরূপ। শ্রীচন্দ্র সম্রাট্ দ্বিতীয় গোপালের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হন। কিন্তু তিনি গোপালকে পরাজিত করিয়া পরে তাঁহাকে সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অবশ্য এইরূপ ক্ষেত্রে দাবির মূলে ঐতিহাসিক সত্য কতখানি, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে।

কল্যাণচন্দ্রের সহিত গৌড় ও প্রাগ্‌জ্যোতিষের সংঘর্ষ তাঁহার নিজের রাজত্ব কালীন ঘটনা কিম্বা তাঁহার তরুণ বয়সের কাহিনী, তাহা অনুমান করা কঠিন। তবে এইপ্রসঙ্গে ত্রিপুরা জেলার বাঘাউড়া ও নারায়ণপুরে প্রাপ্ত এবং মহীপালের রাজত্বের ৩য় ও ৪র্থ বর্ষে প্রতিষ্ঠিত দুইটি মূর্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই মহীপাল পালবংশীয় প্রথম মহীপাল (আনুমানিক ৯৮৮-১০৩৬ খ্রীষ্টাব্দ) কিংবা দ্বিতীয় মহীপাল (আনুমানিক ১০৭৫-৮০ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে পারেন। তিনি যদি প্রথম মহীপাল হন, তবে অনুমান করিতে হইবে যে, তিনি কিছুকালের জন্য ঢাকা-ত্রিপুরা অঞ্চল হইতে চন্দ্র অধিকার বিলুপ্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং পরে চন্দ্রবংশীয় কল্যাণচন্দ্র উহা পুনরধিকার করেন। এই অনুমানে যে অসম্ভব কিছু নাই, সপ্তমশতাব্দীর পল্লব-চালুক্য সংঘর্ষের ইতিহাস তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আবার এমনও হইতে পারে যে, পরাজিত হইয়া চন্দ্রগণ কিছুকালের জন্য পালরাজ্যের লঘুমিত্রত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দানীসাহেব লিখিয়াছেন যে, নবাবিষ্কৃত শাসনগুলির একটি শ্লোকে লডহচন্দ্র (আনুমানিক ১০০০-২০ খ্রীষ্টাব্দ) বারাণসীতে তীর্থস্নান করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। লডহচন্দ্র প্রথম মহীপালের লঘুমিত্র না হইলে বারাণসী যাইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ; কারণ পালরাজ্য অতিক্রম না করিয়া বারাণসী পৌঁছা সম্ভব ছিল না। প্রথম মহীপালের সময়ে কিছুকালের জন্য যে বারাণসীতে পালপ্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ পালসম্রাটের সারনাথ লিপি হইতে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

অবশ্য স্বীকার করিতে বাধা নাই যে, বাঘাউড়া ও নারায়ণপুর লিপিদ্বয়ের মহীপাল পালবংশীয় দ্বিতীয় মহীপালও হইতে পারেন। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, গোবিন্দচন্দ্রের পরে সম্ভবতঃ চন্দ্ররাজ্যে কিয়ৎকালের জন্য পালবংশের অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

২

উপরে আমরা অধ্যাপক আহমদ হাসান দানীর যে প্রবন্ধটির উল্লেখ করিয়াছি, উহা ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের আলীগড় অধিবেশনের সম্প্রতিপ্রকাশিত কার্য্যবিবরণীতে (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬-৪৪) মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধটিতে নিম্নখিলিত চারিখানি অপ্রকাশিত তাম্রশাসনের বিষয় আলোচিত হইয়াছে।— (১) কল্যাণচন্দ্রের ঢাকা তাম্রশাসন, (২-৩) ময়নামতীতে প্রাপ্ত লডহচন্দ্রের দুইখানি তাম্রশাসন এবং (৪) গোবিন্দচন্দ্রের ময়নামতী তাম্রশাসন।

তাম্রশাসনগুলি হইতে দানীসাহেব যে শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহাতে কিছু কিছু ভুলভ্রান্তি আছে। দুই এক স্থলে অর্থবোধই হয় না। দানীসাহেবের অনুবাদও সম্পূর্ণ নির্ভুল বলিয়া বোধ হয় না। এতদ্ব্যতীত উদ্ধৃতিগুলিতে মুদ্রাকরপ্রমাদের অভাব নাই। তথাপি বাংলার ইতিহাসানুরাগী ছাত্রগণের পক্ষে ঐ শ্লোকাদি অত্যন্ত মূল্যবান্ বলিয়া আমরা উহা কিঞ্চিৎ সংশোধিত এবং বোধগম্য আকারে নিম্নে পুনরুদ্ধৃত করিলাম।

১। পরমসৌগতো মহারাজাধিরাজশ্রীশ্রীচন্দ্রদেবপাদানুধ্যাত: পরমেশ্বর: পরমভট্টারকো মহারাজাধিরাজ: শ্রীমান্ কল্যাণচন্দ্রদেবঃ।

২। পরমসৌগতো মহারাজাধিরাজশ্রীকল্যাণচন্দ্রদেবপাদানুধ্যাত: পরমেশ্বর: পরমভট্টারকমহারাজাধিরাজ: শ্রীমান্ লডহচন্দ্রদেবঃ।

৩। পরমসৌগতো মহারাজাধিরাজশ্রীলডহচন্দ্রদেবপাদানুধ্যাত: পরমেশ্বর-পরমভট্টারকো মহারাজাধিরাজ: শ্রীমান্ গোবিন্দচন্দ্রদেবঃ।

৪। লডহচন্দ্রের শাসনদ্বয়ে ত্রৈলোক্যচন্দ্রের বর্ণনা—

তস্যাভ্যুন্নতিশালিনঃ প্রচয়িনো বঙ্গস্য মুক্তামণিঃ
খ্যাত: ক্ষ্মাবলয়ৈকনায়কতয়া ত্রৈলোক্যচন্দ্রো নৃপঃ।
অক্ষুদ্রঃ পরিশুদ্ধিমান্নপশতত্রাসঃ সুবৃত্তো গুণ-
গ্রাহ্যঃ পুণ্যতমো বভূব জগতঃ প্রীত্যৈ চ ভূত্যৈ চ যঃ॥

ত্রৈলোক্যচন্দ্র যে একজন স্বাধীন এবং পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন, তাহা এই বর্ণনা হইতে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় না। Indian Historical Quarterly, March, 1948, p. 73 দ্রষ্টব্য। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের সময় চন্দ্রগণ বঙ্গের অন্তর্গত বঙ্গাল দেশের শাসক ছিলেন। তাই তাঁহাকে বঙ্গদেশের মুক্তামণিরূপে প্রশংসা করা হইয়াছে।

৫। কল্যাণচন্দ্রের ঢাকা শাসনে ত্রৈলোক্যচন্দ্রের বর্ণনা—

গৌড়ানামপচুড়মঞ্জলিময়ো হস্তেষু দৃষ্টো ন চেদ্
বদ্ধস্তর্হি কঠোরশৃঙ্খলময়ঃ পাদেষু সংরোপিতঃ।

অঙ্গৈস্‌সার্দ্ধমগাৎ প্রণামরভসাম্মূর্দ্ধ্না ধরিত্রীন্ন চেদ্‌
যেনাভ্যুন্নতকর্কশেন সহসা খড়্গেন নীতস্তদা ॥

এখানে ত্রৈলোক্যচন্দ্রকর্ত্তৃক গৌড়দিগের পরাজয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা হইতেও বলা চলে না যে, তিনি অন্য কোন নৃপতির লঘুমিত্র কিংবা সামন্ত থাকিতে পারেন না। অনেক সময় শত্রুবিজয়ী সামন্ত বা সেনাপতিদের বর্ণনাতেও অনুরূপ উল্লেখ দেখিতে পাই। কৃষ্ণমিশ্রকৃত প্রবোধচন্দ্রোদয়ের প্রারম্ভে চন্দেল্লরাজ কীর্ত্তিবর্ম্মার সেনাপতি সামন্ত গোপালের বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

৬। লডহচন্দ্রের ময়নামতী শাসনদ্বয়ে শ্রীচন্দ্রের বর্ণনা—

প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বরবধূজনলোচনানাং
বাষ্পব্যয়ব্রতমখণ্ডিতমাততান।
গৌড়াবরোধবনিতাধরপল্লবানি
চক্রে চ যো বিগলিতস্মিতকুড্‌মলানি ॥

এস্থলে শ্রীচন্দ্রকর্ত্তৃক প্রাগ্‌জ্যোতিষ এবং গৌড়রাজ্যের নরপতিদ্বয়ের পরাজয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

৭। কল্যাণচন্দ্রের ঢাকা শাসনে শ্রীচন্দ্রের বর্ণনা—

পৃথ্বীপালভয়প্রমার্জনবিধাবার্দ্রঃ কঠোরক্রমো
গোবর্ণোন্মথনে মহোৎসবগুরুর্গোপালসংরোপণে।
লীলানির্জ্জিতরুদ্ধপালমহিষীপ্রত্যর্পণে সত্রপো
যস্যানেকরসাস্পদং সুকৃতিনো বিশ্বাবলম্বো ভুজঃ ॥

এই শ্লোকটিতে শ্রীচন্দ্রকর্ত্তৃক পৃথ্বীপালের অথবা রাজগণের ভয় ভঞ্জন, গোবর্ণের মথন, গোপালকে সিংহাসনে স্থাপন এবং বিজিত ও অবরুদ্ধ পালরাজকে তদীয় মহিষী প্রত্যর্পণ (অথবা, পালরাজকে তদীয় বিজিতা ও অবরুদ্ধা মহিষী প্রত্যর্পণ)—এই বিষয়সমূহ উল্লিখিত হইয়াছে। 'পৃথ্বীপাল'কে নৃপতিবিশেষের নামহিসাবে গ্রহণ করিলে তাঁহাকে দ্বিতীয় গোপালের স্ববংশীয় বলিয়া মনে করা কঠিন। গোবর্ণ কোন দুর্গের বা স্থানের নাম বলিয়া বোধ হয়। শ্রীচন্দ্র কোন্ বন্দিনী পালমহিষীকে তাঁহার স্বামীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক ঠিক অনুমান করা সম্ভব নহে। তবে এই পালরাজ দ্বিতীয় গোপাল হইতে পারেন। দ্বিতীয় গোপালের প্রতিদ্বন্দ্বীর বিষয়ে পূর্ব্বে যাহা অনুমান করা গিয়াছে, উহা সত্য হইলে, তাঁহার কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়।

৮। লডহচন্দ্রের শাসনে কল্যাণচন্দ্রের বর্ণনা—

ম্লেচ্ছীনাং নয়নেষু যেন জনিতঃ স্থূলাশ্রুকোশব্যয়ো
গৌড়ীনাং স্মিতচন্দ্রিকাবিরহিণঃ স্পষ্টাশ্চ বক্ত্রেন্দবঃ।
আতন্বার নির্জ্জৈর্যশোভিরমলৈরষ্টাবনষ্টোদয়ৈ-
র্যশ্চৈতাঃ শশভৃৎকরৈরিব ঘনত্যাগপ্রকাশৈর্দ্দিশঃ ॥

শ্লোকটিতে কল্যাণচন্দ্র কর্তৃক ম্লেচ্ছ এবং গৌড়দিগের পরাজয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

৯। গোবিন্দচন্দ্রের ময়নামতী শাসনে কল্যাণচন্দ্রের বর্ণনা—

যেনাসৌ দ্বিগুণীকৃতঃ পতিবধাদুদ্বেজিতানাং ঘনৈ-
র্ম্লেচ্ছীনাং নয়নাম্বুভির্বিগলিতৈর্লৌহিত্যনামা নদঃ।
যেনাজৌ গজবাজিপত্তিবহুলাং সেনাং গৃহীত্বা বলাদ্
গৌড়ানামধিপঃ কৃতশ্চ সুচিরং লজ্জাবনম্রাননঃ॥

এখানেও কল্যাণচন্দ্রকর্তৃক ম্লেচ্ছগণ ও গৌড়রাজের পরাজয়ের ইঙ্গিত আছে। এই ম্লেচ্ছগণ লৌহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রনদের তীরবর্ত্তী দেশে বাস করিত।

১০। লডহচন্দ্র কল্যাণদেবী নাম্নী এক বণিক্‌পুত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভগবান্ বুদ্ধ এবং বাসুদেবের ভক্ত ছিলেন এবং স্বনামে প্রতিষ্ঠিত লডহমাধবভট্টারকের উদ্দেশ্যে ভূমিদান করিয়াছিলেন। ঐ যুগে বৌদ্ধেরা কিরূপে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মালবম্বীতে পরিণত হইতেছিল, বৌদ্ধ লডহচন্দ্রের বিষ্ণুভক্তি হইতে তাহার ইঙ্গিত পাই। এ সম্পর্কে Bharatiya Vidya, Vol. XIII, pp. 55-61 দ্রষ্টব্য।

লডহচন্দ্রের বর্ণনা—

*যো'স্তর্মগ্নশ্চ পারং পরমুপগমিতশ্চাশু বিদ্যানদীনাং
দোষ্ণা যঃ খ্যাতবীর্য্যো জগদবনমহানাটিকানায়কেন।*
ক্ষোণীভৃন্মৌলিমালাপরিমলসুরভীভূতপাদাব্জরেণু-
র্যশ্চানন্যাতপত্রামকৃত বসুমতীমপ্রয়াসাদহোভিঃ॥

এই শ্লোকে চন্দ্রবংশীয় লডহচন্দ্রের বিদ্যাবত্তার উল্লেখ আছে। দাবিটির মূলে কিছু সত্য আছে বলিয়া মনে হয়। কারণ তাঁহার রচিত শ্লোক সংস্কৃত সূক্তিসংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। Epigraphia Indica, Vol. XXVIII, p. 339, note 7 দ্রষ্টব্য। বসুমতীকে 'অনন্যাতপত্রা' অর্থাৎ একচ্ছত্রা করিবার দাবি হইতে মনে হয়, লডহচন্দ্র সম্ভবতঃ তদানীন্তন পালসম্রাটের লঘুমিত্রই ছিলেন, ঠিক সামন্ত ছিলেন না।

১১। লডহচন্দ্রের বর্ণনা—

বারাণস্যাময়াসীৎ সহ গিরিসুতয়া শম্ভুনাধ্যাসিতায়াম্
অস্নাসীৎ তত্র গাঙ্গে পয়সি সুবিমলে স্নানতার্পীৎ পিতৄংশ্চ।
পাণৌ পাণৌ দ্বিজানামথ কনকমদাত্তস্য কো বেত্তি সংখ্যাং
সংখ্যাবানেক এব ত্রিভুবনতিলকঃ ক্ষ্মাপতির্ধিক্ তদন্যান্॥

এখানে বলা হইয়াছে যে, লডহচন্দ্র বারণসীতে গিয়া গঙ্গানদীতে তীর্থস্নান এবং পিতৃগণের তর্পণ করিয়াছিলেন। ঐ উপলক্ষ্যে তিনি ব্রাহ্মণগণকে অনেক স্বর্ণদান করেন। তীর্থভ্রমণসম্পর্কে লডহচন্দ্রের বারাণসীগমনের বিষয়ে আমাদের বক্তব্য আগেই বলা হইয়াছে।

—০—

বাংলার লৌকিক দেবদেবী

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বর্তমান হিন্দুগণ সাধারণতঃ পঞ্চোপাসক নামে পরিচিত। কারণ তাঁহারা মূলতঃ পাঁচ দেবতার উপাসক। এই পাঁচ দেবতা হইতেছেন— শিব, শক্তি, গণেশ, বিষ্ণু ও সূর্য। ইঁহারা এবং ইঁহাদের পরিজনবর্গ নানা রূপে নানা নামে পূজিত হইয়া থাকেন। শক্তির বিভিন্ন রূপের মধ্যে কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, শিবের স্ত্রী। শিবের পুত্র কার্তিক ও গণেশ। বিষ্ণু, হরি, গোবিন্দ, বাসুদেব, কৃষ্ণ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে বিষ্ণুর পূজা করা হয়। বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মী ও সরস্বতী। সূর্যের স্ত্রী ছায়ার পূজার প্রচলন নাই— তবে সূর্যপুত্র যম ও শনির পূজা অজ্ঞাত নহে।

হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থে— বেদ পুরাণ ও তন্ত্রে— নানা স্থানে এই সমস্ত দেবতার বিবরণ ও পূজাপদ্ধতি উল্লিখিত হইয়াছে। যুগে যুগে পুরাণ ও তন্ত্রসাহিত্য বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে— দেবতাদের সংখ্যা ও কাহিনী স্ফীত হইয়াছে। লোকের মুখে মুখে জনশ্রুতির ধারা বাহিয়াও অনেক দেবতার কথা অতি প্রাচীন কাল হইতে বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন স্থানে জনসমাজে প্রচলিত রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোন কোন দেবতার বিষয় লইয়া মঙ্গল-কাব্য রচিত হইয়াছে। ফলে আমরা ধর্মঠাকুর, দক্ষিণরায়, শিবের স্ত্রী মঙ্গলচণ্ডী, শিবদুহিতা মনসা প্রভৃতি দেবতার সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারি। সূর্যপুত্র বলিয়া বর্ণিত জীমূতবাহন বা জীবিতবাহনের কাহিনীপূর্ণ গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।[১] লোকমুখে গীত পঞ্চাননের কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে— পঞ্চানন-মঙ্গলের পুঁথিও পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন দেবতার কাহিনী ব্রতকথা হিসাবে প্রাচীন মহিলাদের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া, গ্রাম্যাঞ্চলে সাধারণ লোকের মধ্যে এমন অনেক দেবতার পূজা এখনও প্রচলিত আছে যাহাদের কথা কোন্ প্রসিদ্ধ গ্রন্থে নাই— পুরোহিতদিগের নিকট হাতের লেখা পুথিতে বা পৌরোহিত্য বিষয়ক অখ্যাত পুস্তকে তাহাদের বিবরণ পাওয়া যায়। এই জাতীয় কিছু কিছু দেবতার পরিচয় স্থানীয় লোকের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়া নানা সময় নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এইসব দেবতাদের মধ্যে কয়েকটির নাম উল্লেখযোগ্য। যথা, অন্বেশ্বরী, দক্ষিন্দর, সোনারায়, কালুরায়, বনবিবি, ওলা, ঝোলা, জল্লেশ্বর, সোদো, ভাদালি, একাচুরা, বনদুর্গা, বরকুমার, খলকুমারী, ইটা-

১. Adyar Library Bulletin, ২৫।৩০৮-২২। জিতাষ্টমী উপলক্ষ্যে ভাদ্রমাসে এই দেবতার পূজানুষ্ঠান বাঁকুড়া-বীরভূম-মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচলিত আছে।— প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৬১, পৃ. ৫২৯-৩০ ; কার্তিক ১৩৬২, পৃঃ ১২৮।

কুমার, পাগলা, গোরখনাথ, সুঙাই, হুড়কামড়কা, হুড়ুমদেও, আকাশকামিনী, বান্ধক, যখনী, কান্দারী প্রভৃতি। কোন কোন দেবতা ও তাঁহাদের পূজার বিবরণ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকা, ম্যান্ ইন ইণ্ডিয়া প্রভৃতি পণ্ডিত সমাজে প্রসিদ্ধ বাংলা ও ইংরাজি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে— কতকগুলি বিবরণ তত্ত্ববোধিনী, প্রবাসী, ভারতী[1] প্রভৃতি সাধারণ পত্রিকায় স্থান পাইয়াছে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বিবরণগুলি পণ্ডিতমহলে অপরিচিত— এগুলির সংগ্রহ ও আলোচনা অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য। এই সমস্ত বিবরণ একত্র সংকলিত হইলে বা এগুলি অবলম্বন করিয়া কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ[2] রচিত হইলে বাঙালিজীবনের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়লাভের সুযোগ হয়।

সাধারণ পরিচিত শাস্ত্রোক্ত দেবতাদের সঙ্গে তুলনায় লৌকিক দেবতাদের আকৃতি, প্রকৃতি ও পূজার বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। ইঁহাদের নামগুলি বিচিত্র— অনেক ক্ষেত্রে গ্রাম্যশব্দে গঠিত। সাধারণতঃ মূর্তি তৈয়ার করিয়া এই সমস্ত দেবতার পূজা করা হয় না। তবে দেবতাদের আকৃতির যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা অনেক স্থলেই ভয়ঙ্কর। পূজার খুঁটিনাটি আচার অনুষ্ঠানের মধ্যেও অনেক নূতনত্ব, বীভৎসতা ও কুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। পূজায় ব্রাহ্মণ্যরীতি অনুসৃত হইলেও ইহার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নানা দিক্ দিয়া ধরা পড়ে। পূজা অনেক ক্ষেত্রে ঘরের এমন কি বাড়ির বাহিরে অনুষ্ঠিত হয়— দেবতার প্রসাদ সাদরে গৃহীত না হইয়া পরিত্যক্ত হয়। অনেক ক্ষেত্রে পূজায় ব্রাহ্মণ্য আচার একেবারেই অনুষ্ঠিত হয় না— ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরও প্রয়োজন হয় না (*Man in India*,

---

১. ১৮৪৪ শকাব্দের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (পৃ. ১৪-১৮) একাচুরা, বরকুমার, বনদুর্গা, লালসা বিশ্বেশ্বর, খলকুমারী প্রভৃতি দেবদেবীর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রবাসীর ১৩২৭ মাঘ সংখ্যার ৩৪৬-৪৮ পৃষ্ঠায়, ১৩২৯ আষাঢ় সংখ্যার ৩৫৬-৫৭ পৃষ্ঠায়, ১৩২৯ ভাদ্র সংখ্যার ৭০৭-৮ পৃষ্ঠায়, ১৩২৯ কার্ত্তিক সংখ্যার ৬৫-৬৮ পৃষ্ঠায়, ১৩৩০ বৈশাখ সংখ্যার ১৪৩ পৃষ্ঠায়, ১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ২৫৬-৫৭ পৃষ্ঠায় এবং ১৩৩০, শ্রাবণ সংখ্যার ৫৪৫ পৃষ্ঠায় গোরক্ষনাথ, সোনারায়, ইটাকুমার, সাঁজুই, তোষালি প্রভৃতি দেবতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবাসীতে প্রকাশিত গোরক্ষনাথ ও সোনারায়ের বিবরণ অবলম্বন করিয়া শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র মহাশয় জার্ণাল অব দি ডিপার্টমেণ্ট অব লেটারস্ পত্রিকার অষ্টম ও চতুর্দশ খণ্ডে ইংরাজিতে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ১৩০২ সালের পৌষ সংখ্যার ভারতীতে (পৃ. ৫০২-৭) নিরাকুল বাসুদেবের ব্রতকথা আলোচিত হইয়াছে। ১৩১৫, ১৩১৬ ও ১৩১৯ সালের ভারতীতেও কয়েকটি গ্রাম্য ব্রতকথা বিবৃত হইয়াছে। 'দেশ' পত্রিকায় (২৯শে চৈত্র ১৩৪২) চড়কপূজা উপলক্ষ্যে পূজিত লৌকিক দেবতাদের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

২. কোন কোন অঞ্চল সম্পর্কে ইংরাজিতে এইরূপ গ্রন্থ অনেক দিন আগেই প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন, Crooke—*Introduction to Popular Religion and Folklore in Northern India*; Whitehead—*The Village Gods of South India.*

১৯৫৫, পৃ. ২৭)। বর্তমানে গ্রাম্য সমাজজীবনের পূর্বরূপ পরিবর্তিত হওয়ার ফলে এই সমস্ত দেবতাদের পূজা ও আনুষঙ্গিক উৎসব অনুষ্ঠান ক্রমশ অপরিচিত হইয়া পড়িতেছে— ইহারা দ্রুত বিলুপ্তির দিকে অগ্রসর হইতেছে। অথচ ইহাদের মধ্য দিয়া আদিম ধর্মানুষ্ঠানের যে ক্ষীণধারা প্রবাহিত হইতেছিল— প্রাচীন মানব-সমাজের যে পরিচয় ইহারা বহন করিত তাহা তো উপেক্ষা করিবার যোগ্য নহে। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে উল্লিখিত না হইলেও এই সমস্ত দেবতাদের সকলেই অর্বাচীন নহেন। ইতিহাসপূর্ব যুগের অনেক দেবতা পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ্য সমাজে স্থান করিয়া লইয়াছেন, সকলে শাস্ত্রমধ্যে প্রবেশ করিবার সুযোগ পান নাই। শাস্ত্রগ্রন্থেও লৌকিক দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে।[১] স্বভাবত ভীরু, আত্মপ্রত্যয়হীন, প্রকৃতির রহস্য উদ্ভেদে অসমর্থ, প্রকৃতির বৈচিত্র্যে বিমূঢ়, মানুষ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অলৌকিক শক্তির কাছে মাথা নত করিয়াছে—জীবনের বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন অবস্থায় সম্ভাব্যমান নানা বিপদ্ আপদের রক্ষাকর্তা হিসাবে যুগে যুগে বিভিন্ন দেবদেবীর কল্পনা করিয়াছে।

ইঁহাদের বিবরণ মানবদরদী ব্যক্তিমাত্রেরই কৌতূহল জাগরিত করিবে। তাই আমি এখানে কিছু কিছু অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত এইরূপ দেবতার পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতেছি। এককালে ইঁহারা পূর্ববঙ্গে— বিশেষ করিয়া ফরিদপুর বরিশাল অঞ্চলে সুপরিচিত ছিলেন। ইহাদের ধ্যান বা রূপের বর্ণনা ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি, হিন্দুসর্বস্ব, দেবার্চনবারিধি, পুরোহিত-দর্পণ প্রভৃতি প্রচলিত ধর্মকৃত্য বিষয়ক গ্রন্থ, হস্তলিখিত পদ্ধতি-গ্রন্থ বা পুরোহিতের মুখ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থানে একই দেবতার বিভিন্ন ধ্যান পাওয়া যায়। একই ধ্যানে কোন কোন ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী উক্তি দেখা যায়। ধ্যানের অর্থ সর্বত্র সুস্পষ্ট নয়—মাঝে মাঝে ভাষা ও ছন্দের দোষ পরিলক্ষিত হয়।

মানুষের গৃহ বা বাস্তুর অধিষ্ঠাতা বাস্তুদেব, বাস্তুপুরুষ, বাস্তুপাল বা বাস্তুরাজ। নানা সময়ে নানা উপলক্ষ্যে তাঁহার পূজার ব্যবস্থা। গৃহনির্মাণের সময় তাঁহার সন্তোষবিধানের ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল বাস্তুযাগে। পৌষসংক্রান্তি উপলক্ষ্যে ঘরে ঘরে বাস্তুপূজার লৌকিক অনুষ্ঠান হইত[২]। এই পূজায় মাটির তৈয়ারী কুমীরের মূর্তি বলি দেওয়া হইত। বাস্তুর ধ্যান বা পূজিত রূপের বর্ণনা এইরূপ:—ইনি সিংহিকার পুত্র, কৃষ্ণবর্ণ, অসুরাকৃতি, মহাকায় উগ্র— দেবতাদের দ্বারা ভূপাতিত ইনি উত্তান অবস্থায় পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান। ইনি সর্বভূতবিনাশক।

১. 'যেষু দেশেষু যে দেবাঃ'—দেবলবচন (হেমাদ্রির চতুর্বর্গচিন্তামণির পরিশেষ খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে উদ্ধৃত)। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে গ্রামদেবতার উল্লেখ আছে। শব্দকল্পদ্রুমে বেদশব্দ দ্রষ্টব্য।

২. বাখরগঞ্জ জেলায় বাস্তুপূজা প্রসঙ্গে কুলাইপূজার উল্লেখ পাওয়া যায়। কুলাইদেবী ব্যাঘ্রবাহনা— ইঁহার প্রতিমা অনেকাংশে জগদ্ধাত্রী প্রতিমার অনুরূপ। প্রতিমার দুই প্রান্তে

ইঁহার সঙ্গে কোকিলাক্ষ শঙ্খপাল, বঙ্কপাল, নাগপাল, গ্রাম্যদেবতা ও ক্ষেত্রপালের পূজা করা হয়। কোকিলাক্ষ ব্র্যাঘ্রোপরি উপবিষ্ট; ইনি পশুভীতিহর। ইনি দক্ষিণ দিকের অধিপতি, বীর এবং শরীরের হিতকারক। ইঁহার উদ্দেশে কচ্ছপবলিদানের বিধানের উল্লেখ পাওয়া যায় (কোকিলাক্ষায় কচ্ছপম্)। শঙ্খপালও ব্যাঘ্রবাহন— ইঁহার চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ এবং হস্তে শূল। বঙ্কপাল লোকবিঘ্ননাশক, মহাভুজশালী ও ভীষণনয়নবিশিষ্ট। শিবপুত্র ক্ষেত্রপাল পিঙ্গলকেশধারী, উগ্রদন্ত, ভুজঙ্গভূষণ, দিগম্বর।

ক্ষেত্রপালের শাস্ত্রীয় রূপ ও পূজার উল্লেখ বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইঁহার স্বতন্ত্র লৌকিক রূপ ও অনুষ্ঠান নানা স্থানে অধিকতর পরিচিত ছিল। বাংলা দেশে নানা অঞ্চলে নানা রকমে ক্ষেত্রপালের ব্রত অনুষ্ঠানের নিদর্শন পাওয়া যায়। ফরিদপুর বরিশালে অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের শনি মঙ্গল বারে রোগনাশ ও ব্যাঘ্রভয় নিবারণের উদ্দেশ্যে এই ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। খই ও তিলের ছাতু এই দেবতার প্রিয়। তাই উহা দেবতাকে নিবেদন করিয়া ব্রতিনীদের আহার করিবার নিয়ম।১ কিছু ছাতু কাপড়ের টুকরায় বাঁধিয়া দেবতার উদ্দেশে কুল গাছে ঝুলাইয়া রাখা হয়। ঐ গাছেই ক্ষেত্রপাল ঠাকুর অবস্থান করেন। ব্রতের কথায় বলা হয়, একদিন এক কৃষকরমণী কিছু ছাতু ও কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত স্বামীকে নিয়া মাঠে যায়—কাপড়ে বাঁধা ছাতু কুলগাছে ঝুলাইয়া রাখে এবং স্বামীকে গাছের তলায় শোয়াইয়া রাখে। ক্ষেত্রপাল ঠাকুর ঐ ছাতু খাইয়া ফেলেন— কিছু তাঁহার দাড়িতে লাগিয়া যায়। উহা পরিষ্কার করার সময় কিছু গুঁড়া গাছের তলায় কুষ্ঠীর গায়ে পড়ে, কুষ্ঠী ক্ষণেকের জন্য দেবতার দর্শন লাভ করে এবং সে রোগমুক্ত হইয়া যায়। ফলে দেবতার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচারিত হয়। বরিশালে ব্রতমাহাত্ম্য বর্ণনার প্রসঙ্গে বলা হয়— এই ব্রত করিলে বাঘের ক্ষুধা শান্ত হয়। চট্টগ্রামে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান সকলেই এই দেবতার পূজা করে। মৈমনসিংহে ক্ষেত্রের সিন্নীর ব্যবস্থা আছে। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষেত্রদেবী বৈষ্ণব দেবতা— লক্ষ্মীরূপে তাঁহার পূজা করা হয়। ক্ষেত্রপাল যেমন ক্ষেত্রের অধিপতি, ক্ষেত্রদেবীও সেইরূপ ক্ষেত্রের অধীশ্বরী। ব্রতকথায় বলা হয়, ক্ষেত্রদেবীর পূজা করার ফলে দেবীর অনুগ্রহে একজনের ক্ষেত্রে ধানের বীজে সোনার ধান ফলিয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে ক্ষেত্রের অধীশ্বর আর এক দেবতারও নাম করিতে হয়। ইঁহার নাম সারস। ইনি বিড়ালবাহনা—ইঁহার শরীরের অর্ধাংশ কৃষ্ণবর্ণ এবং অর্ধাংশ হরিদ্রাবর্ণ।

একশ্রেণীর দেবদেবীর কোপদৃষ্টি শিশুদের পক্ষে বিশেষ করিয়া অমঙ্গলজনক।

দুইটি কুমীর ও দুইটি বাঘের মূর্তি থাকে। বালকগণ সারা পৌষ মাস কুলাইর ছড়া গাহিয়া পূজার চাউল ও পয়সা সংগ্রহ করে। ইহাকে 'কুলাইর ভিক্ মাগা' বলে।— (প্রবাসী, ১৩৩৫, ফাল্গুন, পৃ. ৭০৪-৫)। এইরূপ ছড়া অন্যত্রও প্রচলিত ছিল (দ্রষ্টব্য—বাঘাইর বয়াত, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৯ সাল)

১. ইঁহাকে পায়স দিবারও ব্যবস্থা আছে (পায়সং ক্ষেত্রপালায়)।

ইঁহাদের মধ্যে পঞ্চানন্দ, পঞ্চানন বা পাঁচুঠাকুর বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইঁহার মূর্তি ও পূজা এক-সময় পশ্চিমবঙ্গে বহুলপ্রচলিত ছিল। গ্রামে গ্রামে পঞ্চাননতলা নামক স্থান এই দেবতার পূজাস্থানের নিদর্শন হিসাবে বর্তমান রহিয়াছে। অনেক মন্দিরে পঞ্চাননের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। শিশুদের অমঙ্গল নিবারণের উদ্দেশ্যে বা রোগাক্রান্ত শিশুর আরোগ্যলাভ কামনায় এই দেবতার বিশেষ পূজার ব্যবহার।

আর-একটি শিশুদের ভীতিজনক অপরিচিত দেবতা বর্ষ্যাল। সকল রোগের উপশম কামনায় ইঁহার পূজা করিয়া ছাগ বলি দেওয়া হয়। পুরোহিতের মুখে ইঁহার যে বর্ণনা শুনিয়াছি[১] তাহা হইতে জানা যায়— ইনি ঘোররূপ, বিবিধ ভয়ের হেতু, বিদ্যুৎকোটিতুল্য অথচ কৃষ্ণপর্বতসদৃশ, কালরূপী, প্রচণ্ড জটাধারী, শিশুগণের ভয়দাতা, মৎস্যমাংসাশী, দীর্ঘাঙ্গ, লম্বকর্ণ, অতিশয় কুটিল—ইঁহার দন্ত ও শব্দ ভীষণ।

এইরূপ আর-এক দেবতা জাতাপহারিণী। ইঁহার পূজার প্রসাদ গ্রহণ করা হয় না— নিবেদিত সমস্ত জিনিস পূজার স্থানেই রাখিয়া দেওয়া হয়। বলির কাটা পাঁঠা ভাসাইয়া দেওয়া হয়। পূজা বাড়ীর বাহিরে অনুষ্ঠিত হয়। ইঁহার আট হাত, আট মুখ —হাতে বর, অভয়, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, পাশ এবং অসি—ইনি বিবসনা, ঊর্ধ্বকেশা, উগ্রদংষ্ট্রা, ত্রিনেত্রা, উগ্রনয়না, ভীষণা, বিরূপাকৃতি, শিশুহারিণী। ইঁহার সঙ্গে অন্য যে সমস্ত দেবতার পূজা করা হয় তাঁহাদের বেশির ভাগই ভীষণাকৃতি। আশ্চর্যের বিষয়, এই উপলক্ষ্যে পূজিত সুপরিচিত ষষ্ঠীদেবীর রূপও ভীষণ। ইনি করুণার্দ্র কিন্তু শ্যামা, অত্যন্ত ভীষণা এবং মানবের ভয়দাত্রী। রক্তমাত্রী নামে দেবতা অত্যন্ত রক্তনেত্রা, রক্তবসনা, কৃশাঙ্গী, রত্নালঙ্কৃতা ও ভয়দা। ইনি ডাক্ষুরের স্ত্রী। ডাক্ষুর উন্মত্তবেশধারী, উগ্রবিশাল-নেত্রযুক্ত, চর্মাম্বরপরিহিত, ঘোরঘনশব্দপূর্ণ। জলকুমার সুশীতল জলের মধ্যে অবস্থান করেন; তাঁহার বস্ত্র চন্দ্রের মত শুভ্র; তাঁহার চক্ষু অনবরত ঘুরিতেছে; তাঁহার দুই হাত— হাতে শক্তি ও শরাসন। শোঘট্ট নীলবর্ণাভ, রক্তনেত্র, মহাবলশালী, সদাপ্রমত্ত, রক্তাশ্ববাহন, রক্তকেশ, পিঙ্গললোচন, শূলচর্মধারী, ক্রূরহৃদয়, ভীষণ ও মহাকায়। ইনি চতুঃষষ্টিযোগিনী ও দানবগণের দ্বারা পরিবৃত; ইঁহার ধ্বনি সিংহের মত; মুখে সর্বদা কটমট শব্দ; নিজমদে নয়ন সদা ঘূর্ণিত।

এই প্রসঙ্গে জ্বরাসুরের পূজার উল্লেখ করা যাইতে পারে। জ্বরের প্রকোপ দেখা দিলে এই দেবতার মূর্তি তৈয়ার করিয়া সাড়ম্বরে পূজার অনুষ্ঠান করা হইত। এই দেবতার তিন মাথা, তিন পা, ছয় হাত ও নয়টি চক্ষু। ইঁহার বর্ণ কৃষ্ণ কজ্জলের মত— ইনি

বর্ষ্যালং ঘোররূপং বিবিধভয়করং ঘোরদংষ্ট্রাকরালং
বিদ্যুৎকোটিপ্রতিমমসিতগিরিনিভং কালরূপং প্রচণ্ডম্।
ধ্যায়েন্নিত্যং জটালং শিশুগণভয়দং মৎস্যমাংসাশিনং তং
দীর্ঘাঙ্গং লম্বকর্ণমতিশয়কুটিলং ঘোরনাদং ভজামি॥

কৃশকায়, ইঁহার লোম ও চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, প্রলয়ের মেঘের মত ইঁহার ধ্বনি, ইনি সর্বভূতের ভয় নিবারণ করেন। ভস্ম ইঁহার অস্ত্র। বজ্রাধিক ইঁহার নখস্পর্শ। ইনি মানুষের মৃত্যুর হেতু; সুরাসুরপিশাচের ভয়ের কারণ। ইনি কালান্তক যমের তুল্য। ইঁহার কেশাগ্র স্বর্ণাভ; শ্মশ্রু রক্তবর্ণ। ইনি রুদ্রনিঃশ্বাসসম্ভূত। জরাসুরের পরিচয় কোন কোন পুরাণেও পাওয়া যায় (ভাগবত ১০।৬৩।২২, ২৯)।

যে কোন বিপদ্ আপদের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য মাতা ও ভগিনী সহিত বারো ভাইয়ার শরণ লইবার বিধান ছিল। দ্বাদশ দানব ভ্রাতা, তাঁহাদের মাতা বনদুর্গা ও ভগিনী রণযক্ষিণী সকলেই ভয়ঙ্কর দেবতা। স্বতন্ত্রভাবে এবং জাতাপহারিণী, জয়দুর্গা প্রভৃতি দেবতার পূজার সঙ্গে ইঁহাদের পূজার ব্যবস্থা আছে। অন্নপ্রাশন উপনয়ন বিবাহাদি শুভকার্যের পরে সাধারণ মঙ্গলকামনায় সুবচনী নিস্তারিণী আকুলাই[১] প্রভৃতি

১. আশ্চর্যের বিষয়, এই সব দেবতার প্রকৃত রূপের কথা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। দুর্গার রূপভেদ রূপে কল্পিত সুবচনীর স্বতন্ত্র ধ্যানের প্রচলন আছে। ইনি রক্তাঙ্গী, চতুর্মুখী, ত্রিনয়না, রক্তবস্ত্রশোভিতা, হংসারূঢ়া, ব্রহ্মানন্দময়ী। ইঁহার হস্তে কমণ্ডলু; ইনি অভয় প্রদানে উৎসুক। ইনি সকল আপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়া মানুষের মঙ্গল বিধান করেন। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চি মহাশয়ের মতে ইনি মূলতঃ চণ্ডী—শুভচণ্ডী হইতে সুবচনী শব্দ আসিয়াছে (*Man in India* ১৯২২, পৃ. ৬২)। আকুলাই, খাড়াকুলাই, অসমঘনারায়ণী, নিরাকুল বাসুদেব, নিস্তারিণী সুবচনী—এই পাঁচ দেবতার মাহাত্ম্যসূচক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কাহিনী এখনও মেয়েমহলে প্রচলিত আছে। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'ভারতী' পত্রিকায় (১৩০২ পৌষ, পৃঃ ৫০২-৫০৭) নীলকুন্ বাসুদেবের ব্রতকথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অন্য দেবতাদের কথা প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানি না। ব্রতকথার মধ্যে ইঁহাদের কাহারও কাহারও স্বর্ণপ্রতিমার উল্লেখ আছে—কিন্তু আকৃতির কোনও উল্লেখ নাই। ইঁহাদের পূজার উপকরণ সামান্য—সরিষার তেল, সিন্দুর ও পান সুপারি অপরিহার্য। বিবাহাদির জন্য আনীত দ্রব্যের মধ্য হইতে এই সমস্ত দেবতার পূজার জন্য কিছু কিছু পূর্বেই পৃথক্ করিয়া রাখা হয়। আশ্বিনের সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত গার্সী বা গারুব্রতের অন্তরালে এইরূপ আর একজন বিস্মৃত দেবতা লুক্কায়িত রহিয়াছেন মনে হয়। তাঁহাকে ভুলিয়া তাঁহার স্থলে এখন আমরা পরিচিত লক্ষ্মীর পূজা করিয়া কার্য সমাধা করিতেছি। গন্ধবণিকদের দেবতা গন্ধেশ্বরী দুর্গারই নামান্তর বলিয়া মনে করা হইতেছে। ঘণ্টাকর্ণ শাস্ত্রে স্বীকৃত হইলেও ইঁহার আকৃতির কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার গজারূঢ় চতুর্ভুজ মূর্তির পূজা বর্তমানে বহুল প্রচলিত হইলেও ইহার কোনও সন্ধান ধ্যানের মধ্যে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ প্রাচীন গ্রন্থে ইঁহার পূজার কথাও নাই। আরও নানা অপরিচিত দেবতার ক্ষীণ আভাস নানা প্রসঙ্গে পাওয়া যায়—সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ্যসমাজ ইঁহাদের মানিয়া লইলেও সর্বত্র তাঁহাদের সমস্ত বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয় নাই।

নানা নামে যে পূজানুষ্ঠানের প্রথা দেখা যায় তাহাতেও এই সব দেবতাদেরই পূজা করা হয়।

দানবভ্রাতাদের নাম কৃষ্ণকুমার, পুষ্পকুমার, রূপকুমার, হরিপাগল, মধুভাঙ্গর, রূপমালী, গাভুরডলন, মোচরাসিংহ, নিশানাথ, সূচিমুখ, মহামল্লিক ও বালিভদ্র। কৃষ্ণকুমার কৃষ্ণবর্ণ, মহাকায়, খড়্গাখট্বাঙ্গধারী, শ্বেতাশ্ববাহন, রক্তমাল্য ও রক্তচন্দনশোভিত, স্মেরানন, সুন্দর, শুভ্র, পিঙ্গলনেত্র, পিঙ্গলকেশ, পীতবসন, ভয়ঙ্কর দৈত্য[১]। পুষ্পকুমার পুষ্পহস্ত, মহাকায়, পুষ্পবাণধারী, পুষ্পমাল্যশোভিত, সুন্দর, দিব্যগন্ধানুলিপ্ত, তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ, রক্তাশ্ববাহন, রক্তানন, রক্তবসন, ক্রূর। রূপকুমার কাঞ্চনবর্ণাভ, দ্বিভুজ, শূলহস্ত, অতি সুন্দর, শান্ত, পুষ্পবনবিহারী, রক্তনেত্র, রক্তবস্ত্র, রক্তমাল্যধারী, রক্তচন্দনলিপ্ত। হরিপাগল উন্মত্তবেশী, দুই করকমলে লগুড় ও পাশযুক্ত পরশু। ইনি মত্ততাবশতঃ ঘূর্ণিত ও স্খলিত হইয়া থাকেন। মধুভাঙ্গর রক্তনেত্র, রক্তবদন, খলস্বভাব, সুদৈত্য নিজমদে বিঘূর্ণিত ও স্খলিতপদ। রূপমালী অতি মনোহর, শুভ্রবর্ণ, অল্পবয়স্ক, স্বর্ণমাল্য ও স্বর্ণবসনধারী, দীর্ঘহস্ত, দীর্ঘকায়, কৃষ্ণাশ্ববাহন, চতুর্ভুজ। ইনি শূল, বজ্র, শর, চাপ, পাশ ও খট্বাঙ্গ ধারণ করিয়া আছেন। গাভুরডলন সর্বলোকভয়ঙ্কর, ক্রূর, দীর্ঘহস্ত, দীর্ঘকায়, খট্বাঙ্গধারী, কৃষ্ণবর্ণ, রক্তনেত্র, লম্বকর্ণ, কৃশোদর, রক্তবস্ত্রপরিহিত, রক্তচন্দনানুলিপ্ত। নাম দেখিয়া মনে হয় ইনি গাভুর বা তরুণদের দমন করেন। মোচরাসিংহ রক্তবর্ণ, রক্তনেত্র, রক্তবদন, রক্তহস্ত, কুটিলস্বভাব, ভীষণানন, ভয়জনক, জড়-প্রকৃতি। ইঁহার করপদ্মে শূল ও কপাল বিরাজিত। নিশানাথ, নিশাচৌর বা নিশাচার (?) রক্তবর্ণ, রক্তনেত্র, ভয়ানক, শক্তিহস্ত, দীর্ঘজঙ্ঘ, বিকটানন, দিগম্বর, করালবদন, শুষ্কদেহ, কৃশোদর, সদাক্রোধী, নিশাচারী, দ্বিশতমস্তকবিশিষ্ট, অসিচর্মধারী, ঘণ্টার ঘর্ঘর নিনাদকারী। সূচিমুখ দীর্ঘনেত্র, দীর্ঘবদন, কুটিলস্বভাব, কৃশদেহ, ভয়ঙ্কর, বিরস, বিমুখ, প্রমাদী। ইঁহার হস্তে খট্বাঙ্গ, মুখ সূচির অগ্রভাগের ন্যায়। মহামল্লিক পদ্মাসনোপবিষ্ট, খট্বাঙ্গ কদম্বমাল্য ও নরকপালমাল্যধারী, কুটিল, কৃশাঙ্গ, বিশালনেত্র, পরিপূর্ণবদন, করালদন্ত, দ্বিভুজ। ইঁহার সর্বাঙ্গ ব্যাঘ্রচর্মে আবৃত। ইনি শৃগালের ন্যায় শব্দ করেন। রক্তমাংসের দ্বারা ইনি মানুষের ভীতি উৎপাদন করেন। ইঁহার মস্তকে জটাজূট। বালিভদ্র কৃশদেহ, কৃশানন, ক্রুদ্ধনয়ন, পশুর ন্যায় হিংস্রকায়বিশিষ্ট। ইঁহার দেহযষ্টি স্ফটিকের তুল্য; ইঁহার কেশ ও নয়ন কপিলবর্ণ; ইঁহার হস্তে খট্বাঙ্গ। ইনি কাক ও গৃধ্র ধারণ করিয়া আছেন। দানব ভ্রাতাদের ভগিনীরূপে প্রসিদ্ধ রণযক্ষিণী দ্বীপিচর্মপরিহিতা, দীর্ঘাঙ্গী, দীর্ঘনেত্রা, দীর্ঘবদনা, ঘোরদংষ্ট্রা, করালী, রক্তবর্ণা, রক্তনেত্রা। ইনি গুরু কুচযুগল ধারণ করেন। ইঁহার হস্তে রুধিরপাত্র, ঘণ্টা, খট্বাঙ্গ ও পাশ। ইঁহার দেহ মুণ্ডমালায় আবৃত। ইনি রণক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত— মাংস ও অস্থিভক্ষণে নিরত। দানবমাতা

১. কোথাও কোথাও চৈত্রসংক্রান্তির দিন স্বতন্ত্রভাবে কৃষ্ণকুমার ও কালকুমারের পূজা করা হয়। তবে কালকুমারের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

বনদুর্গা ধনুর্বাণধারিণী, মেঘবর্ণা, লোকভয়ঙ্করী। ইঁহার বিশাল লোচন নিজমদে বিঘূর্ণিত। দন্তের জন্য ইঁহার আনন ভীষণ। ইঁহার মস্তক জটাভারে শোভিত। ইনি নরকপালের মাল্য ধারণ করেন। ভুজঙ্গহারে ইঁহার দেহ উজ্জ্বল। ইঁহার বিপুল নিতম্ববিম্ব সর্পের দ্বারা আবদ্ধ।

বনদুর্গার কথা শাস্ত্রেও পাওয়া যায়— তবে ঠিক এইরূপে নহে। ঈশানশিবগুরুদেব-পদ্ধতি গ্রন্থে শত্রুমারণের উদ্দেশে যে বনদুর্গার পূজার কথা বলা হইয়াছে তিনি অনেকাংশে আমাদের আলোচ্য বনদুর্গার অনুরূপ। ঐ গ্রন্থেই বনদুর্গার অন্য কয়েকপ্রকার রূপের উল্লেখও পাওয়া যায়। গোপীনাথ রাও তাঁহার মূর্তিতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থে অষ্টভুজা এক বনদুর্গার বিবরণ দিয়াছেন। পুরশ্চর্যার্ণব গ্রন্থেও (পৃ. ৯৫৫) বনদুর্গার প্রসঙ্গ আছে। শরৎচন্দ্র মিত্র মহাশয় পূর্ববঙ্গের কোন কোন জেলায় প্রচলিত শেওড়া গাছের অধিষ্ঠাত্রী বনদুর্গাদেবীর পূজার পরিচয় দিয়াছেন। (*Man in India* ১৯২২, পৃ .২২৮ প্রঃ)।

জয়দুর্গা ভীষণ দেবতা। ইঁহার বিশেষ পূজার রীতিনীতি বীভৎস বলিয়া মনে হয়। এই বিশেষ পূজার নাম পত্রাবলী জয়দুর্গাপূজা। সাধারণতঃ ইহার অনুষ্ঠান হয় না— ক্বচিৎ হইয়া থাকে। বিপত্তারিণী ব্রতে[১] বা কোথাও কোথাও সুবচনী ব্রতে এই দেবতার যে পূজা করা হইয়া থাকে সে পূজায় কোন বৈচিত্র্য নাই— উহা প্রচলিত অন্যান্য পূজার মতই সহজভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসার গ্রন্থে উল্লিখিত জয়দুর্গার পূজাও বৈচিত্র্যহীন। নানা বৈচিত্র্যে পূর্ণ পত্রাবলী পূজার কথা এখানে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

পূজার পূর্বে পত্রাবলীর সং বা ঢুঙ্গিরা উলঙ্গ নৃত্যের দ্বারা দেবীকে আবাহন করে— না আসিলে নানারূপ লাঞ্ছনা করিবে ভয় দেখায়। পূজার সংকল্পে চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তির কামনা করা হয় এবং দগ্ধ মৎস্যরূপ উপচার প্রদান ও গায়ন বাদ্য নৃত্যনাটকরূপ পত্রাবল্যাখ্য মহোৎসব কর্ম করা হইবে উল্লেখ করা হয়। দেবীর পূজার সঙ্গে ক্ষেত্রপালাদি দানবপূজা করিতে হয়—সংকল্পে তাহারও উল্লেখ থাকে। প্রথমেই ধূম্রবর্ণা, পট্টবস্ত্রপরিহিতা, ত্রিনেত্রা, চতুর্ভুজা, নৈঋতদিগবস্থিতা, প্রৌঢ়বয়স্কা সন্ধ্যার পূজা করিয়া ক্ষেত্রপালের পূজা করিতে হয়। ক্ষেত্রপাল দীপ্ত চন্দ্র ও জটাধারী, ত্রিনেত্র, নীলাঞ্জনাদ্রিপ্রভ অথচ অরুণবর্ণ, দোর্দণ্ড-প্রতাপ, উজ্জ্বল। তিনি গদা, কপাল, মাল্য ও বস্ত্রযুগ্ম ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার কর্ণে সর্পযুক্ত স্বর্ণকুণ্ডল। তাঁহার ঘণ্টার মেখলা ঘর্ঘরধ্বনি করিতেছে। ঝঙ্কার শব্দে তিনি ভীষণ। দধি, মাষ ও অন্ন নিবেদন করার সময় যে মন্ত্র উচ্চারিত হয় তাহাতে ক্ষেত্রপালের

১. এই ব্রত আষাঢ় মাসে রথদ্বিতীয়ার অব্যবহিত পরে শনি বা মঙ্গলবারে অনুষ্ঠিত হয়। শাস্ত্রোক্ত না হইলেও ইহার কথা সংস্কৃতে লিখিত। মনে হয়, ইহা অর্বাচীনকালে কোন পণ্ডিতকর্তৃক রচিত হইয়াছে। কাহিনীটী বিচিত্র। রাজরানী গোপনে গোমাংস ঘরে আনিয়া রাজার সন্দেহভাজন হন এবং দেবীর প্রসাদে গোমাংস ফলপুষ্পে পরিণত হইলে সহজেই রাজার সন্দেহ নিরসন হয়।

প্রকৃতির আভাস পাওয়া যায়। মন্ত্রটি এইরূপ—এহেহি বিদ্বিষ বিদ্বিষ তরুং ভঞ্জয় ভঞ্জয় তর্জয় তর্জয় বিঘ্নভৈরব ক্ষেত্রপাল বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা। ক্ষেত্রপাল ও তাঁহার ব্রতানুষ্ঠানের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

কোকিলাক্ষের পূজার পর জয়দুর্গার পূজা। ইঁহার বর্ণ প্রলয়কালীন মেঘের মত। ইনি ত্রিনেত্রা; কটাক্ষের দ্বারা ইনি অরিকুলের ভয় উৎপাদন করেন। ইঁহার মস্তকে চন্দ্রকলা আবদ্ধ। ইনি চতুর্ভুজা— হস্তে শঙ্খ, চক্র, কৃপাণ এবং ত্রিশূল ধারণ করেন। ইনি সিংহস্কন্ধে আরূঢ়া, দেবতাদের দ্বারা পরিবৃত এবং সিদ্ধসঙ্ঘের দ্বারা পূজিত। সমস্ত ত্রিভুবন ইঁহার তেজের দ্বারা পূর্ণ। পরিবার-দেবতাদের মধ্যে দক্ষিণেশ্বরী, মগধেশ্বরী ও দানবমাতার নাম উল্লেখযোগ্য। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আরাধ্য ও রানী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত কালীর নাম দক্ষিণেশ্বরী। তাঁহার সঙ্গে আলোচ্য দক্ষিণেশ্বরীর কোন যোগ আছে কিনা বলা যায় না। চট্টগ্রামে মগধেশ্বরী নামে এক দেবীর পূজা খুব প্রচলিত। এই পূজার নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে ছাগী-বলি ও গৃধ্র-কর্তৃক পূজার দ্রব্য গ্রহণে পূজার সার্থকতাবোধ উল্লেখযোগ্য[১]। দানবমাতা এখানে কেবল দ্বাদশ দানবের জননী নহেন। দ্বাদশ ভ্রাতা ছাড়া আরও অনেক দানবের এই উপলক্ষ্যে পূজা করা হয়। পূজিত দানবদের মধ্যে দ্বাদশ ভ্রাতার কয়েক জনের নামও স্বতন্ত্রভাবে পরিদৃষ্ট হয়। দানবদের নাম—ছোটেশ্বর, কৃষ্ণকুমার, অগ্নিমুখ, পুষ্পকুমার, জলকুমার, লৌহজঙ্ঘ, ধবলাক্ষ, কোকিলাক্ষ, শূকরশিরাঃ, বিড়ালাক্ষ, একজঙ্ঘ, একপাদ, তালকেতু, হস্তিমুখ, রক্তনয়ন, শালকুমার, আকুলকুমার, বকুলকুমার, দীর্ঘকুমার, দীর্ঘকর্ণ, উর্ধ্বপাদ, দীর্ঘজঙ্ঘ, ভ্রামর, ময়ূরমোদ, কালকেতু, আকুল, মুকুল, বিমুখ, বেতাল, তালকবন্ধ, সবিতাক্ষ, সনৎকুমার, বলিকুমার, অঙ্কুর, যক্ষাধিরূঢ়, মার্জনীসাংখ্য, কালাখ্য, বংশকুমার, মুকুট, উষ্ণকুমার, দুর্মুখ, গোশৃঙ্গাধিরূঢ়, শুকাক্ষ, ভূত, প্রেত, খেচর, ভূচর, ধনেশ, চাটকুমার, চাটেশ্বর, শাখোটারূঢ়, রণকুমার, ছলকুমার, অক্ষশূর, ঘটকুমার, যূপকুমার, রণপণ্ডিত, রক্তমুখ, ক্রোধমুখ, শুক্রা, শৃঙ্গ, অজা, দন্ত, মাণিক্য, সপ্ত, বিদ্যুৎসঞ্চার, চৌরাখ্য, হট্টাধিপ, রস্তাধিপ, বহ্ন্যধিপ, হরিপাগল, কর্ণচাপ, সূচিমুখ, মোচরাসিংহ, গাভুরডলন, সৌভট্ট, নিশাচৌর, আকাশকুমার, স্থলকুমার, সুরমর্দন, জলমর্দন, কালাসুর, কালমেঘ, ছলেশ্বর, হেমন্তকুমার, লুণ্ঠ, অগ্নি, নারায়ণ, অঘোর, আয়ুধ, ভৈরব, একদন্ত ও অষ্টগণ[২]। অগ্নি, নারায়ণ, ভৈরব, একদন্ত প্রভৃতি নামও দানবদের অন্তর্ভুক্ত হইবার কারণ বুঝা যায় না। রণপণ্ডিতের বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ, নীলবস্ত্রপরিহিত, দ্বিভুজ, খড়্গহস্ত, বরদাতা, ত্রিভুবনেশ্বর। তাঁহার

১. *Journal Anthropological Soc. Bombay,* ১৩।৮২৭-৩১ ; *Man in India,* ১৯২৩, পৃঃ ২২৪-৩১ ; সংস্কৃত সাহিত্যপরিষৎ ১১।৮৮-৯৩।

২। বীরভূম অঞ্চলে আরও কিছু দানব দেবতা বা দানার সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, দোঁসেরা দানা, ক্ষেত্রার দানা প্রভৃতি।— Man in India, ৩৫ খণ্ড, পৃ. ২৪ প্রঃ

উদর বিশাল; সর্প তাঁহার যজ্ঞোপবীত। তিনি শত্রুরূপ হস্তীর সিংহ-স্বরূপ। তিনি ব্যাঘ্রাদি পশুভয় হইতে রক্ষা করেন।

রাত্রিশেষে নির্জন স্থানে চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কন করিয়া গোপাল হাজরার পূজা করিতে হয়। গোপাল হাজরা ধূম্রবর্ণ, মহাকায়, কৃষ্ণবস্ত্রপরিহিত, সর্বদা প্রাণিহিংসক, ক্রুর, ভীষণ দ্বিভুজ, দ্বিমুখ, পাশমুদ্গরধারী, সর্বভীতিহর। ব্যাঘ্র ইঁহার উত্তরীয়। গোপাল হাজরার প্রীতির জন্য ভুবনেশ্বরী বিদ্যার পূজা ও হংসবলির ব্যবস্থা আছে। জয়দুর্গার প্রীতির জন্য দগ্ধমৎস্যাদি সহিত সিদ্ধান্ন ক্ষেত্রপালকে দিতে হয়। পরদিন পূজান্তে চাউলের গুঁড়া দিয়া উনত্রিশটি মণ্ডল আঁকিয়া তাহার উপর কলাপাতা রাখিতে হয় এবং দুধ দিয়া ঐ কলা পাতা ধুইয়া তাহার উপর উনত্রিশভাগ পোড়া মাছ ও সিদ্ধ চাউলের ভাতের ভোগ জয়দুর্গাকে দিতে হয়। প্রচুর চাউল ও মৎস্য সহযোগে এই ভোগ দেওয়া হয়। তবে দেবীর প্রসাদ কেহ গ্রহণ করে না।

মানুষ বিপন্ন হইলে সকল সময় ধর্মের গোঁড়ামি রক্ষা করিতে পারে না। আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। হিন্দুদের পক্ষে মুসলমানের দরগায় পূজা দেওয়া, মুসলমান পীরদের শ্রদ্ধা নিবেদন করা, মুসলমান ফকীরদের শরণাপন্ন হওয়ার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। মুসলমানেরাও অনেক সময় হিন্দু দেবতাদের উদ্দেশে পূজা দিতেন এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। হিন্দুদের পূজিত মুসলমান পীরের মধ্যে সত্যপীর প্রসিদ্ধ— সোনাপীরও একেবারে অপরিচিত নন। মনাইপীর কিন্তু একেবারে অজ্ঞাত। শুনিয়াছি— ইঁহার ব্রত পূর্বপাকিস্তানের ফরিদপুর জিলার মাদারিপুর অঞ্চলে হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অনুষ্ঠানের দিন ব্রতীর উপবাসী থাকিবার কথা। ঐদিনই খাদ্য প্রস্তুত করিয়া পরদিন উহা পীরকে উৎসর্গ করিয়া কিছু অংশ কোন মুসলমানকে দিতে হয়। তৎপরে ব্রতী প্রসাদ গ্রহণ করেন। সংস্কৃত ও দেশী মিশ্রিত ভাষায় রচিত ইঁহার বর্ণনা[১] হইতে জানা যায়— ইঁহার মুখে পাকা দাড়ি, বাম ভাগে বৃদ্ধা বিবি এবং গুড়ের পোটলা দ্বারা ইনি বেষ্টিত। পূজায় এই ধ্যানের ব্যবহার ছিল কি না বলা যায় না।

মনাইপীরের কথা আমি এক পুরোহিতের নিকট শুনিয়াছি। তিনিই সারস ও বর্ষ্যালের কথা বলিয়াছেন। ক্ষেত্রপালের ব্রতের অনুষ্ঠান আমি বাল্যকালে গ্রামে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহার কাহিনী পরবর্তী কালে প্রাচীন মহিলাদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। অন্যান্য দেবতাদের বিবরণ হস্তলিখিত পুথি বা মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রামে গ্রামে প্রাচীন মহিলা বা পুরোহিতদিগের নিকট হইতে এখনও এইরূপ আরও অনেক দেবতার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। এখনই ইঁহারা অজ্ঞাত অপরিচিত

১ মনাইপীরমহং বন্দে পাক্কাদাড়িযুতাননম্।
বৃদ্ধাবিবি বামভাগে বেষ্টিতং গুড়পোণ্টয়া॥

হইয়া পড়িয়াছেন। আর-কিছুদিন বাদে ইঁহাদের সমস্ত পরিচয় লুপ্ত হইয়া যাইবে। বস্তুতঃ এখনই সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। নদিয়ায় প্রচলিত হরিষষ্ঠী বা কাঁচাঘট পূজার উল্লেখ পঞ্জিকার মধ্যেও আছে। কিন্তু ইহার কোন বিবরণ সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। গ্রামের ও গ্রাম্য সমাজের সঙ্গে যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে তাঁহারা এ বিষয়ে আগ্রহান্বিত হইলে দেশের সংস্কৃতির ইতিহাসের এই সকল অমূল্য উপাদান এখনও বিস্মৃতির কবল হইতে উদ্ধার করা যাইতে পারে।

প রি শি ষ্ট

প্রবন্ধমধ্যে উল্লিখিত দেবদেবীর আকৃতির বিবরণ বা ধ্যান যাহা পাওয়া যায় নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ধ্যানের ভাবার্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রবন্ধমধ্যে যথাস্থানে প্রদত্ত হইয়াছে।

কৃষ্ণকুমার :

কৃষ্ণবর্ণং মহাকায়ং খড়্গখট্বাঙ্গধারিণম্।
শ্বেতাশ্ববাহনং দৈত্যং রক্তমাল্যাহ্নলেপনম্॥
স্মেরাস্যং সুন্দরং স্কন্দং পিঙ্গাখ্যং পিঙ্গকেশকম্।
বন্দে কৃষ্ণকুমারঞ্চ ভয়দং পীতবাসসম্॥

কোকিলাক্ষ :

কোকিলাক্ষং মহাভাগং ব্যাঘ্রস্যোপরি সংস্থিতম্।
পশুভীতিহরং দেবং কোকিলাক্ষমহং ভজে॥

ক্ষেত্রপাল :

ভ্রাজচ্চন্দ্রজটাধরং ত্রিনয়নং নীলাঞ্জনাদ্রিপ্রভং
দোর্দণ্ডাত্তগদাকপালমরুণস্রগ্ গন্ধবস্ত্রোজ্জ্বলম্।
ঘণ্টামেখলঘর্ঘরধ্বনিমিলজ্ঝঙ্কারভীমং বিভুং
বন্দেঽহং সিতসর্পকুণ্ডলধরং শ্রীক্ষেত্রপালং সদা॥

অথবা

মূর্দ্ধ্নি পিঙ্গলকেশং উর্ধ্বত্রিলোচনং সম্পাত্তজটাকলাপম্।
দিগ্বাসসং ভুজঙ্গভুষণমুগ্রদংষ্ট্রকং ক্ষেত্রেশং শম্ভুতনয়ং ভজে॥

এই দেবতার আরও ধ্যানের সন্ধান পাওয়া যায়।

গাভুরডলন :

দীর্ঘহস্তং দীর্ঘকায়ং পাশখট্টাঙ্গধারিণম্।
কৃষ্ণবর্ণং রক্তনেত্রং লম্বকর্ণং কৃশোদরম্॥
রক্তবস্ত্রধরং ক্রূরং রক্তগন্ধানুলেপনম্।
গাভুরডলনং বন্দে সর্বলোকভয়ঙ্করম্॥

গোপালহাজরা :

ধূম্রবর্ণং মহাকায়ং সর্বদা প্রাণিহিংসকম্।
কৃষ্ণাম্বরধরং ক্রূরং ব্যাঘ্রচর্মোত্তরীয়কম্॥
দ্বিভুজং দ্বিমুখং ঘোরং পাশমুদ্গরধারিণম্।
গোপালহাজরাং বন্দে সর্বভীতিহরং পরম্॥

চড়কপূজায় শ্বেতবর্ণ চতুর্ভুজ দিগম্বর জটিল ভূতনাথ এক হাজরার পূজার ব্যবস্থা আছে।

গ্রাম্যদেবতা :

গ্রাম্যদেবং গ্রাম্যপালং গ্রামোপদ্রবনাশকম্!
গ্রামরক্ষাকরং দেবং গ্রাম্যদেবং নমাম্যহম্।

জলকুমার :

শীতং সুতেজঃ-সুমনঃ-প্রকাশং
সদাশুচিং সন্ততমেব জাড্যম্।
আঘূর্ণনেত্রং শশিশুভ্রবস্ত্রং
দ্বিবাহুকং শক্তিশরাসনঞ্চ॥
সুশীতলান্তঃস্থিতমার্দ্রদেহং
ভজেন্মহান্তং জলকুমাররূপম্॥

জয়দুর্গা :

কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্।
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং পূজিতাং সিদ্ধসঙ্ঘৈঃ॥

জাতাপহারিণী :

যা দেব্যষ্টভুজাষ্টবক্ত্র বরদা ভীত্যব্জপাশাসিভি
র্যুক্তা শঙ্খগদারথাঙ্গসকলৈঃ সংক্ষোভয়ন্তী দিশঃ।

দিগ্‌বস্ত্রোর্দ্ধকচোগ্রদংষ্ট্রনয়না ভীমা বিরূপাকৃতি
বন্দে তাং শিশুহারিণীং ত্রিনয়নাম্ একামজামগ্রজাম্ ॥

জরাসুর :

কৃশপিঙ্গললোমাক্ষং কৃষ্ণাঞ্জনচয়োপমম্ ।
প্রলয়াম্বুদনির্ঘোষং সর্বভূতভয়াপহম্ ॥
ত্রিপাদং ষড়্‌ভুজঞ্চৈব নবলোচনসংযুতম্ ।
ধ্যায়েত্রিশিরসং দেবং ভস্মপ্রহরণায়ুধম্ ॥

অথবা

রুদ্রনিশ্বাসসম্ভূতং জরং মৃত্যুপ্রদং নৃণাম্ ।
ত্রিপদং ত্রিশিরঞ্চৈব নবভির্লোচনৈর্যুতম্ ॥
কেশাগ্রং স্বর্ণসদৃশং কালান্তকযমোপমম্ ।
সদৈব ভস্মনিক্ষেপং রৌদ্রং সংহাররূপিণম্ ॥
বজ্রাধিকনখস্পর্শং স্তূয়মানং সুরর্ষভিঃ ।
সুরাসুরপিশাচানাং ভয়দং ক্রূররূপিণম্ ॥
এবং ধ্যায়েন্মহাকালস্বরূপং রক্তশ্মশ্রুলম্ ॥

ডাক্কুর :

উন্মত্তবেশোগ্রবিশালনেত্রং
ধৃতং সশূলং পরশুঞ্চ চক্রম্ ।
খড়্গং সুতীক্ষ্ণং বহুপুষ্পমাল্যং
চর্মাম্বরং ঘোরঘনশব্দপূর্ণম্ ॥
উচ্ছ্বাসভাবং নরলোককান্তং
ভজেন্মহান্তং শ্রী [ল] ডাক্কুরাখ্যম্ ॥

নাগপাল :

নাগপালং নাগরাজং বিষবীর্যমদান্বিতম্ ।
বিষোপদ্রবনাশায় নাগপালং সদা ভজে ॥

নিশাচৌর :

কৃষ্ণবর্ণং রক্তনেত্রং নিশাচৌরং ভয়ানকম্ ।
শক্তিহস্তং দীর্ঘজঙ্ঘং বিকটাস্যং দিগম্বরম্ ॥
করালবদনং ভীমং শুষ্কদেহং কৃশোদরম্ ।
ধ্যায়েৎ সদাক্রোধযুতং ঘণ্টাঘর্ঘরবাদিনম্ ॥
রাত্রৌচারমসিচর্মধরং দ্বিশতমস্তকম্ ॥

পঞ্চানন :

দ্বিভুজং জটিলং শান্তং করুণাসাগরং বিভুম্‌।
ব্যাঘ্রচর্মপরীধানং যজ্ঞসূত্রসমন্বিতম্‌॥
লোচনত্রয়সংযুক্তং ভক্তাভীষ্টফলপ্রদম্‌।
ব্যাধানামীশ্বরং দেবং পঞ্চাননমহং ভজে॥

ধ্যানটি পূজারিদের মুখে মুখে প্রচলিত (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—৬৪।১)। প্রচলিত পৌরোহিত্য বিষয়ক গ্রন্থে পঞ্চাননপূজার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

পুষ্পকুমার :

পুষ্পহস্তং মহাকায়ং পুষ্পচাপকরং পরম্‌।
পুষ্পমালাধরং কান্তং দিব্যগন্ধানুলেপনম্‌॥
রক্তাশ্ববাহনং ক্রূরং রক্তাস্যং রক্তবাসসম্‌।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং বন্দে পুষ্পকুমারকম্‌॥

বঙ্কপাল :

বঙ্কপালং মহাভাগং ভীষণাক্ষং মহাভুজম্‌।
লোকবিঘ্নহরং দেবং তং বন্দে বঙ্কপালকম্‌॥

বনদুর্গা :

দেবীং দানবমাতরং নিজমদাঘূর্ণন্মহালোচনাং
দংষ্ট্রাভীমমুখীং জটালিবিলসন্মৌলিং কপালস্রজম্‌।
বন্দে লোকভয়ঙ্করীং ঘনরুচিং নাগেন্দ্রহারোজ্জ্বলাং
সর্পাবদ্ধনিতম্ববিম্ববিপুলাং বাণান্‌ ধনুর্বিভ্রতীম্‌॥

বালিভদ্র :

কৃষ্ণাঙ্গবক্ত্রঃ স্ফটিকাঙ্গযষ্টিঃ
সক্রোধনেত্রঃ কপিলাক্ষকেশঃ।
খট্বাঙ্গহস্তঃ খরগৃধ্ররাবী
স বালিভদ্রঃ পশুসিংহকায়ঃ॥

বাস্তু :

সিংহিকাতনয়ং বাস্তুং দেবৈর্ভূমিনিপাতিতম্‌।
ধরাং ব্যাপ্য স্থিতমুগ্রং সর্বভূতবিনাশকম্‌॥

প্রোত্তানং কৃষ্ণবর্ণঞ্চ পুরুষমসুরাকৃতিম্।
অধোমুখং মহাকায়ং শালাদিকসমন্বিতম্॥

অথবা

শশধরসমবর্ণং রত্নহারোজ্জ্বলাঙ্গং
কনকমুকুটচূড়ং স্বর্ণযজ্ঞোপবীতম্।
অভয়বরদহস্তং সর্বলোকৈকনাথং
তমিহ ভুবনরূপং বাস্তুরাজং ভজামি॥

বিশ্বকর্মা

দংশপাল মহাবীর সুচিত্রকর্মকারক।
বিশ্বকৃৎ বিশ্বধৃক্ চ ত্বং রসনামানদণ্ডধৃক্॥

মধুভাঙ্গর :

রক্তাস্যনেত্রং পিশুনস্বভাবং
সদা জয়ন্তীপরিপূর্ণবক্ত্রম্।
আঘূর্ণিতং নিজমদস্খলিতং প্রপাদং
ধ্যায়েৎ সুদৈত্যং মধুভাঙ্গরাখ্যম্॥

মহামল্লিক :

বিশালনেত্রঃ পরিপূর্ণবক্ত্রো
রক্তৈঃ সমাংসৈর্ভয়দো জনানাম্।
করালদংষ্ট্রঃ কমলাসনস্থঃ
কদম্বমালাকুটিলঃ কৃশাঙ্গঃ॥
শ্রীমন্মহামল্লিক এষ ভাতি
গোমায়ুরাবী দ্বিভুজো জটৌঘঃ।
খট্টাঙ্গধারী নৃকপালমালী
শার্দূলচর্মাবৃতসর্বগাত্রঃ॥

মোচরাসিংহ :

রক্তাঙ্গনেত্রো ভয়দো জনানাং
শূলং সপাশং করপঙ্কজেন।
রক্তাস্যহস্তঃ পিশুনস্বভাবঃ
সদাজয়ো ভীমমুখো বিভাতি॥

রক্তমাত্রী :

স্থরক্তনেত্রাং নবচন্দ্রচূড়াং
সদা কৃশাঙ্গীং ভয়দাং নরাণাম্।
সশূলখট্টাঙ্গকচাপসায়কাং
রক্তাম্বরাং রক্তবিভূষিতাঙ্গীম্॥
স্মরাতুরাং ডাক্কুরচিত্তহারিণীং
স্মরামি দেবীং শ্রীরক্তমাত্রিকাম্॥

রণপণ্ডিত :

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং নীলবস্ত্রপৃথুদরম্।
দ্বিভুজং খড়্গহস্তঞ্চ ব্যালযজ্ঞোপবীতিনম্॥
বরদং শুভ্রবংশাস্তং ভজেৎ ত্রিভুবনেশ্বরম্॥

প্রণাম মন্ত্র :

রণপণ্ডিত মহাসত্ত্ব বৈরিবারণকেশরী।
ব্যাঘ্রাদিপশুভীতিভ্যো রক্ষাং মাং কুরু সর্বতঃ॥

রণযক্ষিণী :

দীর্ঘাঙ্গী দীর্ঘনেত্রা গুরুকুচযুগলা ঘোরদংষ্ট্রা করালা।
রক্তাক্ষী কৃষ্ণবর্ণা রুধিরচষকহস্তা মুণ্ডমালাবৃতাঙ্গী॥
খট্বাঙ্গপাশং করযুগবিধৃতা দ্বীপিচর্মাপিনদ্ধা।
নিত্যং মাংসাস্থিভক্ষা চলতুরগগতা যক্ষিণী দীর্ঘবক্ত্রা॥

রূপকুমার :

বন্দে কাঞ্চনবর্ণাভং দ্বিভুজং শূলহস্তকম্।
সুন্দরাৎ সুন্দরং কান্তং নানাপুষ্পবিহারিণম্॥
রক্তনেত্রং রক্তবর্ণং রক্তমাল্যানুলেপনম্।
ধ্যাত্বৈবং পূজয়েদ্ধীমান্ দৈত্যং রূপকুমারকম্॥

রূপমালী :

রূপ্যমাল্যধরং শ্বেতং রুক্মবস্ত্রং চতুর্ভুজম্।
শূলবজ্রশরাংশ্চাপং ধারিণং সুমনোহরম্॥
কৃষ্ণাশ্ববাহনং কান্তং কুমারং রূপধারিণম্।
দীর্ঘহস্তং দীর্ঘকায়ং পাশখট্টাঙ্গধারিণম্॥

শঙ্খপাল :

শঙ্খপালং মহাদেবং দ্বিভুজং ব্যাঘ্রবাহনম্।
শূলহস্তং পিঙ্গলাক্ষং পরমং পুরুষং ভজে ॥

শোঘট্ট :

উদ্যৎপিঙ্গলসোত্তরং নিজমদাঘূর্ণন্মাহালোচনং
দংষ্ট্রাকোটিবরস্ফুটকটমটৈঃ শব্দৈঃ সশব্দং মুখম্।
পূর্বান্তাচলয়োশ্চ শৃঙ্গকরণং বন্দে মহান্তং ভজন্
চুড়ং পাশকপালকং ধ্বতগদং তুঙ্গোত্তমং ভীষণম্ ॥
শোঘট্টং নীলবর্ণাভং রক্তনেত্রং মহাবলম্।
সদাপ্রমত্তং স্মেরাস্যং খড়্গখট্বাঙ্গধারিণম্ ॥
চতুঃষষ্টিযোগিনীভিরাবৃতং দানবৈর্যুতম্।
অশীত্যধিককোটীনাং সহস্রৈশ্চ সমন্বিতম্ ॥
রক্তাশ্ববাহনং রক্তকেশং পিঙ্গললোচনম্ ॥
ঘণ্টাঘর্ঘররাবৈশ্চ চরণেষু বিরাজিতম্ ॥
শূলচর্মধরং ক্রূরহৃদয়ং ক্রূরসন্নিভম্।
সিংহরাবং মহাকায়ং বাদ্যভাণ্ডশতৈর্যুতম্ ॥

ষষ্ঠী :

ষড়্বর্ষযুক্তাং করুণার্দ্ররূপাং
শ্যামাং সুভীমাং ভয়দাং নরাণাম্।
করালামুগ্রপ্রসন্নদংষ্ট্রাং স্মেরাস্যমত্তাং
ত্রিনয়নীং সুভীমাম্ ॥
খড়্গং সুচক্রঞ্চ তথা চ শূল—
বরায়ুধাং খেটসমন্বিতাং চ।
সমাস্থিতাং পঙ্কজকর্ণিকায়াং
ভজামি শক্তিং জগতঃ প্রধানাম্ ॥

সুবচনী :

রক্তাঙ্গী চ চতুর্মুখী ত্রিনয়না রক্তাম্বরালঙ্কৃতা।
পীনোত্তুঙ্গকুচা দুকূলবসনা হংসাধিরূঢ়া পরা ॥
ব্রহ্মানন্দময়ী কমণ্ডলুকরা ভীতিপ্রদানোৎসুকা।
ধ্যেয়া সা শুভকারিণী সুবচনী সর্বাপদুদ্ধারিণী ॥

সূচিমুখ :

দীর্ঘাস্যানেত্রঃ পিশুনস্বভাবঃ
সদাকৃশাঙ্গো ভয়দো জনানাম্।
সুরক্তবক্ত্রো বিরসঃ প্রমাদী
খট্বাঙ্গহস্তো বিমুখো বভাসে॥

হরিপাগল :

উন্মত্তবেশং করপঙ্কজাভ্যাং ধৃতং লগুড়ং
পরশুং সপাশম্।
আঘূর্ণিতং নিজমদস্খলিতং সুকান্তং
ভজেন্মহান্তং হরিপাগলাখ্যম্॥

শ্রুতকীর্তি রেভারেণ্ড লালবিহারী দে

১৮২৪-৯৪

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

আমাদের ছাত্রজীবনে স্কুলের উঁচু শ্রেণীতে উঠে আমরা পড়তাম রেভারেণ্ড লালবিহারী দে-র *Folk-Tales of Bengal* এবং *Bengal Peasant Life* বা *Govinda Samanta*। পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেও এই বইগুলি ছাত্রদের অবশ্যপাঠ্য বলে গণ্য হত। দেশকে জানা ও ইংরেজি শেখা উভয় উদ্দেশ্যই ঐ গ্রন্থদ্বয় পাঠে পূর্ণ হত। কিন্তু এখন দিনকাল বদলে গেছে, ফিরিঙ্গিয়ানা বেড়েছে, দেশ প্রায়-বিদেশে পরিণত হয়েছে। তাই সেদিন দুঃখ ও ক্ষোভের সঙ্গে এম. এ. ক্লাসের ছাত্রদের কাছ থেকে শুনলাম তারা কেউ লালবিহারী দে-র নামও শোনে নি, তাঁর লেখা বই পড়ে নি। অথচ দেশের প্রতি, জাতির প্রতি ভালোবাসায় তিনি কারো চেয়ে খাটো ছিলেন না।

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে হিন্দুধর্ম ছেড়ে যাঁরা খৃস্টধর্ম অবলম্বন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত এবং রেভারেণ্ড লালবিহারী দে-র নাম উল্লেখযোগ্য। মধুসূদন দত্ত অপর দুজনের মত খৃস্টধর্মকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেন নি, ধর্মযাজকও হন নি। তাঁর নিজের দেশ জাতি ভাষা ও সাহিত্যের তথা সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের কথা আমরা দেশবাসী সেদিনই জেনেছিলাম। মধুসূদনের তিরোধানের পর তাই বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন '…জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও— আর তাহাতে নাম লেখ শ্রীমধুসূদন!'

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫) নিষ্ঠাবান খৃস্টান ছিলেন। তাঁর ক্রাইস্ট চার্চ নামে নিজের পৃথক চার্চ ছিল। আকৈশোর কোনোদিনই তিনি নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেন নি। তাঁর ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা শুনে একদা অধ্যাপক রচফোর্ট উমেশচন্দ্র দত্তকে বলেছিলেন, 'যাহা শুনিলাম, তাহা ইংরাজের সর্বোচ্চ শ্রেণীর Sermon অপেক্ষা কম উপাদেয় বলিয়া বোধ হইল না।'[১] কৃষ্ণমোহন এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যের সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন, বিদ্বজ্জনসভায় রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' নাটকের প্রথম অভিনয় দেখেন, ইণ্ডিয়া লীগের সভাপতি হন। যখনই দেশসেবার ডাক আসে তিনি উৎসাহভরে সাড়া দেন। উমেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন, 'তিনি খুব

১. পুরাতন প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় পর্যায়। স্মরণীয় যে কৃষ্ণমোহন সর্বদা 'গৌড়ীয় ভাষা'য় তাঁর ধর্মোপদেশ দিতেন। দ্র উপদেশ কথা।

পণ্ডিত ছিলেন ত বটেই, খুব স্বদেশহিতৈষীও ছিলেন। Black Actএর গোলযোগের সময় তিনি নির্ভীকভাবে রামগোপাল ঘোষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন।'[২] ১৮৭৮ সালে ভার্নাকুলার প্রেস আইনের বিরুদ্ধে আয়োজিত প্রতিবাদসভায় তিনি সরকারের কার্যের তীব্র সমালোচনা করেন। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর সুরধুনীকাব্যে (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ) যথার্থই লিখেছেন—

খৃষ্টধর্মে মতি কৃষ্ণমোহন পবিত্র
বিদ্যাবিশারদ অতি বিশুদ্ধ চরিত্র,
স্বদেশের হিতে চিত্ত প্রফুল্লিত হয়
লিখিয়াছে নীতিগর্ভ প্রবন্ধ নিচয়।

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর 'হুতোম পেঁচার গানে' কৃষ্ণমোহনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন—

এসো এসো তাহার পরে রেভারেণ্ড সাজ
বন্দ্যকুল চুড়ামণি 'মানোয়ারী' জাহাজ।
শুভ্র ভুরু, শুভ্র কেশ, শুভ্র দাড়ি চেরা
গিরীক-ল্যাটিন-হিব্রু ইংরেজি ফোয়ারা।
মাকাল বনের মাঝে পাকা আম্রফল
স্বধর্মত্যেয়াগী তবু স্বজাতির দল ॥···

'স্বধর্মত্যেয়াগী তবু স্বজাতির দল'— পরিচয়টি কৃষ্ণমোহন সম্পর্কে শুধু নয় লালবিহারী দে-র সম্পর্কেও প্রযোজ্য। মধুসূদন, কৃষ্ণমোহন ও লালবিহারী তিনজনই স্বদেশ ও স্বজাতিগর্বী ছিলেন। তাঁরা ধর্মগত সংস্কার ছেড়েছিলেন কিন্তু দেশকে বুকে করে রেখেছিলেন।

লালবিহারীর জন্ম ও মৃত্যুর বৎসরদুটি বাংলার ইতিহাসের দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১৮২৪ তাঁর ও মধুসূদন দত্তের জন্মবর্ষ এবং ১৮৯৪ তাঁর ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুবর্ষ। তিনি মধুসূদন বা বঙ্কিমচন্দ্রের মত অভিজাত ধনী ও উচ্চবর্ণ-সম্ভূত ছিলেন না। মধুসূদনের পিতা মুনশী রাজনারায়ণ দত্ত সেকালের কলিকাতার সমাজে ধনে-মানে অগ্রগণ্য ছিলেন। মধুসূদন ছাত্রহিসাবে প্রথম প্রবেশ করেন বিখ্যাত হিন্দু কলেজে। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর। তিনিও পদ-মর্যাদায়, বংশকৌলীন্যে তাঁর সময়ে বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে হুগলী সরকারী কলেজের ছাত্র, পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের আইন-শ্রেণীর ছাত্র হন।

লালবিহারী কোনো দিক থেকেই এঁদের কাছাকাছি ছিলেন না। বর্ধমানের দূর এক অখ্যাত গ্রাম তালপুরে তাঁর জন্ম, এক দরিদ্র সুবর্ণবণিক পরিবারে। সুবর্ণবণিক

---

২. তদেব

সমাজ বল্লাল সেনের সময় থেকে হিন্দু সমাজে জল অচল বা 'পতিত' বলে ঘোষিত হন। চৈতন্যদেব সনাতনী রক্ষণশীলতায় আঘাত করে সুবর্ণবণিক সমাজকে নিজের প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব সমাজে গ্রহণ করেন। বঙ্গের সুবর্ণবণিক সমাজে এজন্যই বৈষ্ণবধর্ম তথা চৈতন্য-ধর্মের প্রভাব বেশি। লালবিহারীর পিতা ছিলেন বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী সেজন্য লালবিহারীর বাল্যকালে নাম রাখা হয়েছিল 'কালা গোপাল'। সুদূর গ্রামাঞ্চলে বাস, নিষ্ঠুর দারিদ্র্য প্রভৃতির সঙ্গে সম্প্রদায়গত ত্রুটির চাপও তাঁর উপর কম পড়ে নি। লালবিহারী হিন্দু সমাজের এই ব্যবহারকে সম্পূর্ণ অন্যায় বলে মনে করেছেন। তাঁর খৃস্টধর্ম গ্রহণের অন্যতম কারণ কি বল্লালী প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন? কিন্তু খৃস্টান হলেও তিনি সুবর্ণ-বণিক সমাজে জাত হবার জন্য হীনতা নয়, বরং একপ্রকার গর্বই বোধ করতেন। উমেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন—

'রেভারেণ্ড লালবিহারী দে খৃষ্টান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জাত্যভিমান ছিল। তিনি জাতিতে সুবর্ণবণিক; কিন্তু তিনি বলিতেন সুবর্ণবণিক মাত্রই বৈশ্যজাতি। তিনি নিজেকে বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করিতেন। আমার কাছে গল্প করিতেন, যে বল্লাল সেন তাঁহাদের অধঃপাতের কারণ।' ৩

কিন্তু এই উক্তিকে সর্বাংশে মেনে নেবার পথে বাধা আছে। লালবিহারী দে তাঁর সম্পাদিত বেঙ্গল ম্যাগাজিনে (প্রচলন বৎসর ১৮৭২; একই বৎসরে বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়) 'The Banker Caste of Bengal' নামে প্রবন্ধ লেখেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি 'বল্লাল চরিতে'র উল্লেখ করেছেন, সুবর্ণবণিক সমাজের উপর বল্লালী অত্যাচারের নিন্দা করেছেন। অন্য দিকে রীতিমত গবেষণামূলক রীতিতে মনুসংহিতা, রামায়ণ, রাজনির্ঘণ্ট প্রভৃতির বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে সুবর্ণবণিক শ্রেণী বৈদ্যসম্প্রদায়ের মত 'সংকর' নয়। বরং তিনি দাবি করেছেন যে তাঁরাও বৈশ্যসমাজভুক্ত দ্বিজ ('Twice born Vaisyas') এবং সেজন্য বেদ পাঠের ও উপবীত ধারণের অধিকারী। তিনি নিজেদের শুধু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের নিচে বসাতে সম্মত হয়েছেন— তবে বৈদ্যদের নীচে নয়। কাজেই উমেশচন্দ্র দত্তের বিবৃত তথ্য যে লালবিহারী দে 'নিজেকে বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব বোধ করিতেন'— স্বীকার্য নয়। তবে দেখা যাচ্ছে লালবিহারী হিন্দুধর্ম ছেড়েছিলেন কিন্তু জাতিগর্ব ছাড়েন নি। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ছেলে জ্ঞানেন্দ্রমোহন খৃস্টান হবার পরে গর্ব করেই বলতেন 'I am a Brahmin Christian'।

মধুসূদন দত্ত কেন হঠাৎ খৃস্টান হয়েছিলেন ঠিক করে বলা শক্ত, তবে ইংলণ্ডে যেতে পারবেন এবং পাশ্চাত্য দেশ ও তার সাহিত্যের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা হবে এ ধরণের দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর ছিল। দারিদ্র্যের জন্য, পদোন্নতির জন্য বা ধর্মবিশ্বাসের গভীরতায় তিনি খৃস্টান

৩. পুরাতন প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় পর্যায়

হন নি। (কৃষ্ণমোহনের কন্যাকে বিবাহের প্রসঙ্গ অনৈতিহাসিক।) মধুসূদনের ধর্মান্তর নিয়ে কলিকাতার হিন্দুসমাজে সেদিন (১৮৪৩, ৯ ফেব্রুয়ারি) বিরাট আলোড়ন হয়েছিল। তার প্রধান কারণ মধুসূদন ছিলেন বর্ণ-অর্থ-মর্যাদায় সমাজের উচ্চস্তরভুক্ত। আর একটি দরিদ্র পিতৃহীন সুবর্ণবণিক বালক লালবিহারী দে-র যেদিন পাদ্রী ডাফ সাহেবের হাতে ধর্মান্তর ঘটল, সেদিন সমাজে কোনো চাঞ্চল্যই দেখা দেয় নি। লালবিহারী কোনোদিনই ভুলতে পারেন নি যে তিনি ধনে ও বর্ণগত মর্যাদায় হিন্দুসমাজের চোখে অবহেলিত। তার থেকে উদ্ধার পাবার জন্যই তিনি হয়তো বা খৃস্টধর্ম বরণ করেন।

২

লালবিহারী নিজের বাল্যকথা ইংরেজিতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তার থেকে আমরা জানতে পারি যে তাঁর পিতা আদিতে ঢাকার লোক ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও দুই পুত্র মারা গেলে তিনি দেশত্যাগ করে বর্ধমানের তালপুর গ্রামে এসে বসবাস ও দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। এই গ্রামের মাতুলালয়ে ১৮২৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখে লালবিহারীর জন্ম হয়। নবজাত শিশুর মুখে ছিল মায়ের মুখের ছাপ, সকলেই তাকে সৌভাগ্যের লক্ষণ বলে ধরেছিলেন। তাঁর বাবা কলিকাতায় সামান্য বিল-সরকারি ও দালালির কাজ করতেন।[৪] তিনি ইংরেজি লেখাপড়া কিছুই জানতেন না তবে শেয়ার, গভর্ণমেণ্ট, প্রমিসরি নোট, কোম্পানির কাগজ, প্রিমিয়াম, ডিস্‌কাউণ্ট ইত্যাদি শব্দ ও তাদের প্রয়োগ সম্পর্কে ওয়াকেফহাল ছিলেন। তখনকার দিনে এ-সব কাজ করে লোকে সাধারণত কৌশলে বা অসদুপায়ে বেশ দু পয়সা উপার্জন করত। কিন্তু লালবিহারীর বাবা সৎ লোক হওয়ায় দারিদ্র্যকে এড়াতে পারলেন না। নিরামিষাশী, নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব এই মানুষটি পূজা, মালাজপ না সেরে জল গ্রহণ করতেন না, মুখে তাঁর হরিনাম লেগেই থাকত। বাবার কথা লালবিহারী গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেছেন। লালবিহারীর জন্মকালে তাঁর মায়ের বয়স ছিল ষোলো বছর। উত্তরকালে স্নেহময়ী মায়ের কথা বলতে গিয়ে লালবিহারী গভীর বেদনা বোধ করেছেন।

গ্রামের গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় আর-পাঁচটি ছেলের মতই লালবিহারীর পড়াশুনা শুরু হল। শুভদিনে গুরুমশায় গোপীকান্তের কাছে তিনি পড়েছিলেন রামমোহন রায়ের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' এবং 'শিশু সেবধি', আর শিখেছিলেন গণিত।

৪. 'Father was a bill and stock broker in Calcutta. He could not read and write English"— "Recollection of My School Days". By an old Bengali boy, *Bengal Magazine* February 1873। ১৮৭২ অগস্টে এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়।

নয় বছর বয়সে লালবিহারী গ্রামের পাঠশালার পড়া শেষ করে বাবার বিশেষ আগ্রহে কলকাতায় এলেন স্কুলে ইংরেজি শিক্ষার জন্য। তখন কলিকাতায় আসার পথ সহজ ছিল না। গ্রাম থেকে রওনা হয়ে চতুর্থ দিন হেঁটে এসে পৌঁছালেন ত্রিবেণীতে, সেখান থেকে নৌকায় এলেন মহানগরীর জগন্নাথ ঘাটে।

তখন অর্থাৎ ১৮৩৩-৩৪ সালে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ, ডাফ সাহেবের স্কুল বা জেনারেল অ্যাসেমব্লি ইনস্টিট্যুশন, হেয়ার সাহেবের স্কুল,[৫] গৌরমোহন আঢ্যের স্কুল বা ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি মুখ্যত এই চারটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষাদানকার্যে ব্রতী ছিল। হিন্দু স্কুলের মাসিক বেতন ৫৲ টাকা, গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে ৩৲ টাকা। লালবিহারী দে-র বাবা দরিদ্র ছিলেন, কাজেই ঐ-দুটি স্কুলে পড়ানো তাঁর সাধ্যাতীত। হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্তি হওয়াও খুব কঠিন ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "তখন স্বীয় স্বীয় বালকদিগকে ইংরাজী শিখাইবার জন্য লোকের এমন ব্যগ্রতা জন্মিয়াছিল যে হেয়ারের পক্ষে বাটীর বাহির হওয়া কঠিন হইয়াছিল। বাহির হইলেই দলে দলে বালক—'me poor boy, have pity on me, me take in your school' বলিয়া তাঁহার পাল্কীর দুই ধারে ছুটিত। তদ্‌ভিন্ন পথে ঘাটে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ তাহাকে অনুরোধ উপরোধ করিতেন।" রামতনু লাহিড়ী কয়েকদিন হেয়ারের পাল্কীর পিছনে ছুটে শেষে হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্তি হতে পেরেছিলেন 'ফ্রী বালক'রূপে।[৬] কিন্তু তাঁর সময়েই হেয়ার স্কুলে 'ফ্রী বালক লওয়া একরূপ বন্ধ করিয়াছিলেন'। কাজেই লালবিহারীর সময়ে 'ফ্রী বালক' হতে পারা যে দুর্লভ সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিল তাতে সন্দেহ নেই। উপযুক্ত বেতন দিতে পারার অক্ষমতাই লালবিহারীর ডাফ সাহেবের বিনা-মাইনের স্কুলে ভর্তি হবার মূল কারণ। রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদের সুপারিশপত্রের জোরে লালবিহারী সহজেই ভর্তি হতে পেরেছিলেন।[৭] স্কটল্যাণ্ড থেকে এসে পাদ্রী ডাফ সাহেব রামমোহন রায়ের সহায়তায় 'ফিরিঙ্গী' কমল বসুর বাড়িতে তাঁর স্কুল খোলেন। ১৮৩০ সালের ১৩ জুলাই জেনারেল অ্যাসেমব্লি ইনস্টিট্যুশনের যাত্রা শুরু হয়। ডাফ তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এদেশে এসেছিলেন, নিছক পাশ্চাত্যশিক্ষাদান নয়। হিন্দু ছাত্রদের খৃস্টধর্মের প্রতি

৫. কলিকাতা স্কুল সোসাইটি পরিচালিত স্কুল। হেয়ার ও রাধাকান্ত দেব প্রথমে স্কুল সোসাইটির যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্কুল সোসাইটির খরচে পড়েছিলেন।

৬. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ

৭. "স্কটলণ্ডে যে গিরিজা সংক্রান্ত ধন আছে সেই ধন হইতে বিদ্যালয়ের ব্যয় হইবেক এবং বিদ্যালয়ের সাহায্যকারী শ্রীযুক্ত দেওয়ান রামমোহন রায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু রাধাপ্রসাদ রায় হইয়াছেন ও তিনি ঐ বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থি বালকদিগকে রীতিমত শিক্ষা করাইবেন।" —সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৭

অনুরক্ত করে তোলা এবং তাদের খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করাকে তিনি জীবনের প্রধান ব্রত রূপে গ্রহণ করেন। ১৮৩২ সালে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনিই খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করেন। কাজেই লালবিহারীর বাবাকে তাঁর আত্মীয়স্বজন ডাফ সাহেবের স্কুলে ছেলেকে ভর্তি করতে নিষেধ করেছিলেন কিন্তু তিনি ভাগ্যের দোহাই দিয়ে ছেলের শিক্ষা চালিয়ে গেলেন। লালবিহারী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে তাঁর বাবার ইচ্ছা ছিল অল্প লেখাপড়া শিখিয়ে ছেলেকে সরিয়ে আনা। কিন্তু লালবিহারীর শিক্ষালাভে ছিল অদম্য আগ্রহ, তারই জোরে তিনি পরীক্ষায় ক্রমাগত সাফল্যের পর সাফল্য অর্জন করতে থাকেন, স্বর্ণপদক পারিতোষিক পান।

তখনকার দিনে পরীক্ষা নেওয়া হত টাউন হলে। লাট ভগিনী মিস্ ইডেন পরীক্ষার সময় পরিদর্শনে আসতেন। লালবিহারীও টাউন হলে পরীক্ষা দিয়েছিলেন। টাউন হলে সেকালের পরীক্ষার বর্ণনা আছে রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' গ্রন্থের 'শৈশব ও তাৎকালিক শিক্ষা' অধ্যায়ে।

এর কিছু আগে ১৮৩৪-এ ডাফ গেলেন স্বদেশে। তার কিছু পরে অর্থাৎ ১৮৩৮ সালে লালবিহারীর বাবার দেহান্ত হয়। একজন জ্ঞাতিভাইয়ের বাসায় থেকে লালবিহারী অতিকষ্টে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর হিন্দু কলেজে পড়বার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত ছিল। তিনি জানতেন যে স্কুল সোসাইটির অর্থে হেয়ার সাহেবের স্কুলের কয়েকটি নির্বাচিত ছাত্র হিন্দু কলেজে পড়বার সুযোগ পায়। সেই কথা ভেবে তিনি হেয়ার সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন। কিন্তু হেয়ার যেই শুনলেন লালবিহারী ডাফ সাহেবের স্কুলের ছাত্র তখনই তিনি তাকে কোনো সুযোগ দিতে অসম্মত হলেন, বললেন, "you read the New Testament ; you are half a Christian. You will spoil my boys."—তুমি নিউ টেস্টামেণ্ট পড়ো ; তা হলে তুমি তো আধা-খৃস্টান। তুমি আমার ছেলেদের নষ্ট করবে।[৮] হেয়ার সাহেব পাদ্রীদের কার্যকলাপের, তাদের ধর্মান্তর-করণ-প্রচেষ্টার তীব্র বিরোধী ছিলেন। ছাত্রেরা পাদ্রীদের বক্তৃতা শুনতে গেলে কঠোর শাস্তি দিতেন। হেয়ার নাস্তিক ছিলেন, কিন্তু বিশ্বাস করতেন মানবিকধর্মে ও লোককল্যাণে। হেয়ারের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ক্ষুব্ধ লালবিহারী ফিরে এলেন নিজের শিক্ষায়তনে। অর্থাভাবে তাঁর পাঠ্যপুস্তক বা সহায়ক গ্রন্থ কিনবার ক্ষমতা ছিল না। শিক্ষক ও সহপাঠীদের কাছ থেকে বই ধার করে এনে পড়ে ফেলতেন বা নকল করে নিতেন। একখানি ইংরেজি অভিধানের খুব প্রয়োজন ছিল তাঁর কিন্তু সংগ্রহের সাধ্য ছিল না। শেষে একটি সহৃদয় মুসলমান বই-হকারের (তাকে সকলে 'চাচা' বলতেন) নিকট থেকে কয়েক আনায় A বর্জিত একখানি

৮. হেয়ার সাহেবের সঙ্গে লালবিহারীর কথোপকথন বৃত্তান্তের জন্য দ্রষ্টব্য—"Recollection of My School Days", *Bengal Magazine*, October, 1873। ম্যাকফার্সন-লিখিত *Life of Lalbehari Day* গ্রন্থে উৎকলিত।

অভিধান সংগ্রহ করেন। তিনি একখানা বই ফেরত দিয়ে ঐ হকারটির কৃপায় আরেকখানা বই নিতেন, পর্যায়ক্রমে তাঁর অনেক বই পড়া হয়ে যেত। তিনি হিউম্, জনসন্, গিবন্, অ্যাডিসন্ প্রভৃতি প্রখ্যাত লেখকদের বই এইভাবে অধ্যয়ন করেন। যে আত্মীয়ের বাড়িতে লালবিহারী থাকতেন তার পরিবেশ লেখাপড়ার পক্ষে অনুকূল ছিল না। কিন্তু তিনি ঐ বাড়ির কুঞ্জর মা নামে পরিচিতা এক খোঁড়া রাঁধুনির স্নেহ আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। তার সহায়তায় লালবিহারীর অনেক সুবিধা হয়েছিল। এই কুঞ্জর মায়ের কথা তিনি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। এই সময় তিনি মায়ের গহনা বিক্রয় করতে বাধ্য হন খরচ চালাতে।

৩

ডাফ ১৮৩৯ অবধি স্কটল্যাণ্ডে কাটিয়ে ১৮৪০ সালে সুয়েজ খাল দিয়ে ভারতবর্ষে ফিরলেন। এ সময়ে লালবিহারী নিষ্ঠা নিয়ে বাইবেল পড়েন, পাদ্রীদের ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা মন দিয়ে শোনেন, বাঙালী খৃস্টান বন্ধুদের সংসর্গ করেন কিন্তু তখনো লালবিহারী খৃস্টান হবার দৃঢ় সংকল্প করেন নি। তিনি ব্রাহ্মধর্মের আদর্শের প্রতিও সাময়িকভাবে যে আকৃষ্ট হয়েছিলেন সে কথা তাঁর 'জার্নাল' থেকে জানা যায়। তিনি লিখেছেন যে শেষ পর্যন্ত তিনি ব্রাহ্মধর্মে তাঁর জীবনের কাম্য পাপমুক্তি ও আনন্দময় করুণা লাভ করতে পারেন নি, যাকে তিনি পেয়েছিলেন খৃস্টধর্মে[১]। পরবর্তীকালে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সমাজ-সংস্কারমূলক বিভিন্ন প্রচেষ্টার প্রশংসা করলেও তাদের ধর্মতত্ত্বকে তীব্র সমালোচনা

১. "I myself was a Brahma, though not in name, yet in reality. I disbelieve in book-revelation and like you believed that repentance was a sufficient expiation for sin. I concentiously believed in those Brahmaistic doctrines and endeavoured to act in the light I then enjoyed. I became sorry for my sins and prayed to God to forgive them. But I enjoyed no peace of mind. I could not be sure that he would pardon my sins. I had not His word of promise. This led me to think what consolation I should have if I could have God's word of promise. This led me again to enquire more fully than I had done before into the proofs of a positive revelation. I also endeavoured to reform my conduct, to amend my life. I tried to banish from my mind all evil thoughts, all simple desires. The more I tried, the more signally I failed. I began to see my moral deformity more than before. I abhorred myself ; I was in despair. Then it was that the Lord took mercy on me. He opened my eyes and showed one Christ in all the lustre of his mediatorial glory."— ম্যাক্‌ফারসনের পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্‌ধৃত।

করেছেন। [১০] যাই হোক, ডাফের প্রত্যাবর্তনের পর বহু হিন্দুযুবক খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হতে থাকে। লালবিহারী ১৮৪৩ সালের ২ জুলাই খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর দীক্ষার পর স্কটল্যাণ্ডের জাতীয় চার্চের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব-প্রশ্ন নিয়ে দারুণ সংঘর্ষ দেখা দেয়। ডাফ তাঁদের চার্চের উপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ আদৌ সমর্থন করেন নি। [১১] তার ফলে স্কটিশ মিশনারীদের মধ্যে দুই দল দেখা দেয়। একদল পুরোনো চার্চে (Established Church) রয়ে গেলেন অপর দল বিদ্রোহ করে বেরিয়ে গেলেন। এই বিদ্রোহী দলের নেতৃত্ব করেন ডাফ। তাঁরা 'Free Protesting Church of Scotland' নামে নতুন 'সমাজ' গড়লেন কসাইটোলায় (বর্তমান বেন্‌টিঙ্ক স্ট্রীট)। স্কুলও গড়লেন নূতন করে রাধানাথ সেনের বাড়িতে। নাম হল 'দি ফ্রী চার্চ ইনস্টিট্যুশন'। এ প্রসঙ্গে 'সম্বাদ ভাস্কর' লিখেছিলেন—

"অনন্তর ডফ সাহেবের স্বদেশীয় সভ্য প্রতিযোগিরা দেখিলেন ডফ সাহেব ভারতবর্ষে দানে মানে উন্নত হইলেন অতএব তাঁহারা শ্রীমতী মহারাজ্ঞী বিকটোরীয়ার আজ্ঞার হস্তে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম সমর্পণ করিলেন, তাহাতেই ডফ সাহেব ও তাঁহার স্বাধীন বান্ধবেরা হেদোর বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন।" [১২] লালাবিহারীকে ডেকে ডাফ কোনো একটি পথ বেছে নিতে বলেছিলেন। লালবিহারী চিরদিনই স্বাধীনচেতা, তিনি তাই 'Protesting Church'এর সঙ্গেই নিজের মর্মগত যোগ অনুভব করলেন এবং তাঁদের সঙ্গেই রইলেন।

কিন্তু লালবিহারী ১৮৪৬ সালেই ভাবছিলেন খুব তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিষয়— কী করে এদেশের নিজস্ব জাতীয় চার্চ গড়ে তোলা যায়। খৃস্টধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও আস্থা জীবনের গভীরে সুপ্রোথিত ছিল, সেখানে তিনি সম্পূর্ণ সংশয়হীন। কিন্তু ১৮৪৬ সালের জুন মাসে তিনি জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরকে একখানি চিঠিতে লেখেন (জ্ঞানেন্দ্রমোহন তখনও পুরোপুরি খৃস্টান হন নি)[১২] একটি সম্মিলিত উদার জাতীয় চার্চ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার বিষয়। তাঁর সংকল্প ছিল—"I would construct the United National Church of Bengal

১০. "Religion of the Brahmasamaj", by a Hindusthani, *Bengal Magazine.*

১১. "Why Separate" ভাষণে ডাফ বলেন—

"Because the British state now denies all spiritual independence to the Church as established by law in Scotland and his, by its various civil courts, subordinate and supreme, avowedly sanctioned and encouraged judicial interference with almost every of the church's function".

১২. সম্বাদ ভাস্কর, ১৮৪৯, ৯ জানুয়ারি।

১২. ১৮৫১ সালে ১০ জুলাই জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র, প্রথম ভারতীয় ব্যারিস্টার।

on the broadest possible basis, so as to include in its communion a great variety of opinions"[১৩] এ চিন্তা লালবিহারীর চিত্তে চিরদিনই জাগ্রত ছিল। পরবর্তীকালের রচনায় তার বিস্তৃত পরিচয় আছে।[১৪]

১৮৪৬ সালে তিনি ডাফ সাহেবের চার্চে 'ক্যাটেকিস্‌ট' রূপে কাজ করেন। ১৮৫১ সালে তিনি ধর্ম-উপদেশকরূপে বর্ধমান জেলার অম্বিকা-কালনায় তাঁর কর্মক্ষেত্রে যাত্রা করেন। এর পূর্বে ১৮৪০ সালে লালবিহারী ডাফ সাহেবকে তাঁকে সঙ্গীরূপে একবার স্কটল্যাণ্ডে নিয়ে যাবার কথা বলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল খৃস্টধর্ম ও দর্শনবিষয়ে উন্নততর শিক্ষালাভ কিন্তু ডাফ সাহেব এ-সম্পর্কে নিরুত্তর রহিলেন। লালবিহারী ডাফের এই নীরবতায় বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন।

১৮৫৫ সালে তিনি কর্নওয়ালিস স্কোয়ারে ফ্রী চার্চে ধর্মযাজক নিযুক্ত হন ('ordained to the office of the holy ministry by the Free Church Presbytery of Calcutta')। এর পরই ডাফ সাহেবের সঙ্গে তাঁর সংঘাত বাধল। লালবিহারী ডাফ সাহেবের শিষ্য, ভক্ত, অনুরাগী এবং ধর্মে খৃস্টান হলেও তিনি ভারতীয় হিসাবে সাদা ও কালো চামড়ার বৈষম্যকে কিছুমাত্র সহ্য করতে পারেন নি। খৃস্টান ধর্মযাজকদের মধ্যে ইউরোপীয় ও দেশীয় বিভাগ ব্যবস্থাকে এবং ইউরোপীয় যাজকেরা সর্বক্ষেত্রে উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত থাকবেন এবং দেশীয় যাজকেরা তাঁদের নিচে থাকবেন এই অবিচারকে মেনে নিতে তিনি অস্বীকৃত হলেন। সেজন্যই তিনি যখন দেখলেন, যে চার্চগুলির উচ্চতম পরিচালক কমিটিতে যার নাম 'মিশন কাউন্‌সিল' ইউরোপীয় ছাড়া কোনো ভারতীয়কে গ্রহণ করা হয় না বা হবে না— তিনি ডাফ সাহেবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সাদা-কালোর এই ভেদনীতি প্রত্যাহারের জন্য কঠিন অনুরোধ জানালেন। কিন্তু ডাফ সাহেব 'মিশন কাউন্‌সিল'-এ দেশীয় সদস্যদের সভ্যপদ দিতে অসম্মত হওয়ায় লালবিহারী স্কটল্যাণ্ডে সর্বোচ্চ কমিটির কাছে এর প্রতিকার দাবি করলেন। ডাফ এজন্য অপ্রসন্ন ও ক্রুদ্ধ হলেও লালবিহারী নিরস্ত হন নি। এই ঘটনার মধ্যে যুবক লালবিহারীর স্বাধীনচেতনার ভারতীয় হিসাবে গর্ববোধের ও ইউরোপীয়দের সঙ্গে পূর্ণ সমকক্ষতা দাবির প্রকাশ দেখি। ধর্মে খৃস্টান কিন্তু চেতনায় ভারতীয়, এই গর্ববোধ তাঁর ছিল। সাদাচামড়ার কাছে অন্যায় হার স্বীকার করা তাঁর অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল। ঊনবিংশ শতকের নবজাগ্রত বাংলার জাতিগর্ব ও দেশগর্ব তাঁর চরিত্রে পরিব্যাপ্ত ছিল। পরবর্তীকালে লেখা প্রবন্ধে দেখি যাজকবর্গের সাদা-কালোর মধ্যেকার অর্থনৈতিক

১৩. ম্যাক্‌ফারসনের লিখিত *Life of Lalbehari Day* গ্রন্থে উদ্‌ধৃত।

১৪. L. B. Day, *The Desirableness and Practicability of Organising a National Church in Bengal*, 1870, Calcutta.

১৫. Catechism— প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে ধর্মোপদেশ ও শিক্ষাদান।

বৈষম্য রাখাকে তিনি তীব্র নিন্দা করেছেন।[১৬] 'ইণ্ডিয়ান এভাঞ্জেলিকাল রেভিউ' (Indian Evangelical Review) পত্রিকায় রেভারেণ্ড আই. অ্যালেন 'A Paid Native Ministry' নামে একটি প্রবন্ধে লেখেন যে দেশীয় খৃস্টান ধর্মযাজকদের দেশীয় জনসাধারণের স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের উপর নির্ভর করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা উচিত। তার উত্তরে লালবিহারী বলেছেন যে অনুরূপ উপায়ে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান খৃস্টানদের স্বেচ্ছাদত্ত দানের উপর ইউরোপীয় মিশনারীরা যেন এখন থেকে নির্ভর করেন :

If Native Ministers can support themselves by the voluntary offerings of Native Christians, why cannot European Missionaries in India support themselves by the voluntary offerings of Anglo-Indian Christians?... we should ask to reduce Mr. Allen's salary and to bring it down at per with Native Ministers.[১৭]

এই মনোভাব তাঁর চিরদিন ছিল। স্বনামখ্যাত কিশোরীচাঁদ মিত্র কলিকাতার পুলিশকোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট পদ থেকে সামান্য কারণে পুলিশ কমিশনার ওয়াকোপের চক্রান্তে ও লাট হ্যালিডের দুর্বলতায় পদচ্যুত হন।[১৮]

এই ঘটনাটি ঘটবার সময় লালবিহারী বর্ধমান জেলার অম্বিকা-কালনায় অবস্থান করে তাঁর সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক-সাময়িক পত্র 'অরুণোদয়' পরিচালনা করছিলেন। ১৮৫৮ সালের ২৮ অক্টোবর কিশোরীচাঁদ কর্মচ্যুত হন। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে দেশগর্বী লালবিহারী লেখেন :

"আমরা দুঃখ সাগরে মগ্ন হইয়া লিখিতেছি যে কলিকাতা পোলিশের ছোট ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র কোন দুষ্কর্ম নিমিত্ত পদচ্যুত হইয়াছেন। অনেকেই বলিতেছেন, লঘু পাপে গুরুদণ্ড হইয়াছে। কিন্তু আমরা সেরূপ বোধ করি না। যেমন পাপ তাহার সমুচিত দণ্ড হইয়াছে সন্দেহ নাই। ফলতঃ ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে কিশোরীবাবুর পরিবর্তে যদি কোন শ্বেতবর্ণ মহাত্মা ঐ দোষ করিতেন তাহা হইলে তাঁহার এতাদৃশ দণ্ড হইত না। বহুদিবস হইল ঐ পোলিশেই জনৈক শ্বেতবর্ণ কর্মচারী বহুবিধ কুকর্ম করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি পদচ্যুত হয়েন নাই— কেবল স্থানান্তরিত

১৬. এই প্রসঙ্গে বলা উচিত যে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ও খৃস্টান-ভক্তদের মধ্যে সাদা-কালোর ভেদরেখার বিরোধিতা করেছিলেন। এবং তার প্রতিবাদে "resigned his Canonry"—Ramchandra Ghosha, *Biographical Sketch of Rev. K. M. Banerji.* 1893.

১৭. "A Paid Native Ministry", by An Unpaid Native Minister, *Bengal Magazine,* June 1874.

১৮. 'কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র', মন্মথনাথ ঘোষ, ১৩৩৩

হইয়া উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনেকেই বোধ করেন কিশোরীবাবুর শাস্তি কেবল কৃষ্ণবর্ণ দরুণ। মহারাণীর জয় হউক!"[১৯]

শ্বেতকায়দের এই ধরণের অন্যায় ব্যবহার, 'হামবড়া' ভাব, বা ভারতীয়দের প্রতি কৃপামিশ্রিত ব্যঙ্গ লালবিহারীর মনে আগুন ধরিয়ে দিত। একদা রো এবং ওয়েব সাহেব তাঁদের রচিত *Hints on the study of English* (1874) বইয়ের ভূমিকায় শিক্ষিত বাঙালীদের ভুল-ইংরেজি ব্যবহারকে ব্যঙ্গ কটাক্ষ করে 'বাবু ইংলিশ' (Babu English) নামে অভিহিত করেন। লালবিহারী কিন্তু সাহেবদের সহজে ছেড়ে দিলেন না। তাঁর দেশগর্বে ও জাতিগর্বে আঘাত লেগেছিল, 'বাঙালী' লালবিহারী ঐ বইয়ের Preface থেকে প্রতি পৃষ্ঠায় ইংরেজির ভুল দেখাতে শুরু করলেন। দেখালেন যে-সব প্রয়োগকে সাহেবরা শুদ্ধ বলে চালাবার চেষ্টা করছেন আসলে সেগুলিই ভুল। তিনি লিখলেন—

What shall we say then of two gentlemen who laugh at 'Baboo English' and at the same time commit egregious grammatical blunders and murder The Queen's English? লালবিহারী ব্যঙ্গচ্ছলে পাল্টা প্রশ্ন করেছেন এসব ভুল কি 'Cambridge-English' এর নমুনা? এবং বিদ্রূপভরে আরও লিখেছেন:

"Shall we regard it as one of the newly discovered idiotism of the English language into the mysteries of which, we are told, it is impossible for the Natives of Bengal to be initiated?"[২০]

এবং সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন যে এখন বহু শিক্ষিত বাঙালী ভদ্রসন্তান আছেন যাঁদের পায়ের কাছে বসে রো এবং ওয়েব ইংরেজি ভাষা শিখতে পারেন 'and men, at whose feat Messers Rowe and Webb might well sit as learners of English Composition"—[২১]। রো অ্যাণ্ড ওয়েবকে তিরস্কারের পিছনে লালবিহারীর ভারতীয় মনের সেই জ্বলন্ত দেশ ও জাতি-গর্ব বিদ্যমান।[২২]

১৯. অরুণোদয়, ১৫ নভেম্বর ১৮৫৮।

অরুণোদয় পত্রিকাখানি লালবিহারীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এদেশের জনসাধারণের মনের অন্ধকার খৃস্টধর্মের অরুণচ্ছটায় দূর হবে এই মূল বাসনা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে অন্যান্য বহু শিক্ষনীয় বস্তু থাকত এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি (শুধু দেশ ও জনগণের প্রতি নয়) লালবিহারীর অকৃত্রিম অনুরাগ এই পত্রিকা পরিচালনার মধ্যে ধরা পড়ে।

২০. "Hints on the Study of English", *Bengal Magazine*, Sep. 1874

২১. তদেব

২২. তাঁর জীবনীকার ম্যাকফারসন মন্তব্য করেছেন—"He thought for himself and adhered to his convictions. This was specially seen in his

৪

লালবিহারীর সঙ্গে সর্বোচ্চ সংস্থা 'মিশন কাউন্‌সিল্'-এর সদস্য পদের অধিকার ও যোগ্যতা নিয়ে ডাফসাহেবের সঙ্গে যে সংঘাত বাধে তার জন্য লালবিহারীর ডাফসাহেবের 'মিশন' ছেড়ে চলে যাবার সংকল্প করেন। কিন্তু ডাফসাহেবের বিশেষ অনুরোধে এক বৎসর মিশনত্যাগ প্রস্তাব স্থগিত রাখেন। এই সময় তিনি অম্বিকা-কালনায় খৃস্টধর্ম প্রচারে ও স্কুল পরিচালনায় পরম নিষ্ঠায় ব্রতী হন। পল্লীঅঞ্চলের জনসাধারণের জীবনযাত্রা, অভাব-অভিযোগ, উৎসব-অনুষ্ঠান প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর নতুন করে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল। এই সময়েই তাঁর অমর গ্রন্থ *Folk Tales of Bengal*-এর সূত্রপাত হয়েছে বলে মনে করি। কেননা তাঁর সম্পাদিত অরুণোদয় পত্রিকায় লিখেছেন—

"**বঙ্গীয় উপকথা।** প্রায় প্রত্যেক রজনীযোগে বঙ্গরাজ্যে উত্তমাধম পরিবার মাত্রেই প্রায় উপকথা ব্যবহার করিয়া থাকেন। আর বালক বালিকাকুল উপকথা শ্রবণ মানসে আপনাদিগকে অতি উৎসুক দেখায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অনেক উপকথা নীতিগর্ভ নহে। যাহা হউক বঙ্গে যে সকল নীতিজনক উপকথা ব্যবহার হইয়া থাকে তাহার মধ্যে কতকগুলিন উপকথা সর্বসাধারণগোচর জন্য এই পত্রে ক্রমশঃ প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম।"[২৩]

এই পর্যায়ে প্রথম বেরিয়েছিল ক্রমপ্রকাশ্য 'ভীরু ভূপতির কথা'। এবং *Bengal Peasant Life* বইয়ে আমাদের পল্লীঅঞ্চলের বিশেষত কৃষক সমাজের যে বিশ্বস্ত-আখ্যান তিনি বর্ণনা করেছেন তার একটি প্রধান উৎস যাজক ও প্রচারকরূপে এই অম্বিকা-কালনার জীবনের অভিজ্ঞতা।

এইখানে থাকবার সময় ১৮৫৭র সেপ্টেম্বর মাসে খৃস্টীয় মিশনগুলি সম্পর্কে শ্রীমতী কলিন ম্যাকেন্‌জির লেখা *The Mission camp* নামে একখানি বই তাঁর হাতে আসে। ঐ বইয়ে তিনি জানতে পারেন গুজরাটের পার্শি খৃস্টান রেভারেণ্ড হরমদজি পেস্‌টনজির একটি বিদুষী কন্যার নাম।[২৪]

intercourse with Europeans towards whom he acted and spoke with a manly freedom. He refused to believe that he belonged to a race inferior to Europeans, who were at times inclined to assume a superiority on very insufficient grounds."

২৩. অরুণোদয়, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা, ৩১ ভাদ্র ১২৬৪, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭। এই রচনাগুলিতে লেখকের নাম নেই, কিন্তু এগুলি লালবিহারী দে-র লেখা বলে মনে করার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে।

২৪. হরমদজি পেস্‌টনজি বোম্বাইয়ের বিশপ উইলসন কর্তৃক খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হন। বিশপ উইলসন সম্পর্কে বেথুন সোসাইটির এক সভায় (২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬) লালবিহারী একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি বেঙ্গল ম্যাগাজিনে মুদ্রিত হয় (মার্চ ১৮৭৬)।

তিনি বোম্বাইয়ে রেভারেণ্ড ডি. নৌরজিকে একখানি চিঠি লিখে ঐ মহিলার সম্পর্কে বিশেষত 'তাঁর ধর্ম-জীবন এবং মানস উৎকর্ষ' বিষয়ে জানতে চান। এই বিষয়ে পরিশেষে প্রস্তাব হল যে লালবিহারীর নিজেরই একবার সুরাটে গিয়ে এ-সম্পর্কে দেখাশোনা ও কথাবার্তা বলা দরকার। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭) প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। আর দাঁড়াল তাঁর অর্থকৃচ্ছ্রতা— তেরো শ টাকার তাঁর প্রয়োজন অথচ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হলেন। ডাফসাহেব বিবাহে সানন্দে অনুমতি দিলেন। কিন্তু তখন বাধা পড়ে গেছে। দু বছর পর (১৮৫৯) লালবিহারী "Searchings of Heart" নামে একটি প্রবন্ধ পড়েন ও তার প্রতিলিপি পূর্বোক্ত হরমদজিকে পাঠিয়ে দেন। তার ফলে নূতন করে উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ শুরু হল, অর্থেরও সংস্থান ঘটল এবং লালবিহারী বিবাহ করে কলিকাতায় সস্ত্রীক ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে লালবিহারীর শিক্ষক ও বিশিষ্ট ধর্মযাজক ইউয়ার্ট পরলোকগত হয়েছেন। লালবিহারী কর্নওয়ালিস স্কোয়ারের চার্চে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, যে-লালবিহারী 'মিশন্‌' ত্যাগ করে যেতে চেয়েছিলেন, তিনি কেন কর্নওয়ালিশ স্কোয়ারের চার্চের ভার নিলেন। তার জবাবে বলতে হয় এই বিশিষ্ট চার্চের কার্যাবলী 'মিশন কাউন্‌সিলের' অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত হত না।[২৫] সেজন্যই তিনি এই কর্মভার গ্রহণ করেছিলেন। কর্নওয়ালিস স্কোয়ারের চার্চে অস্বাস্থ্যকর ঘরে লালবিহারীর সাত বছর (১৮৬০-৬৭) কাটালেন, তাঁদের তিনটি সন্তান পর-পর মারা গেল। তখন তাঁর সর্বসাকুল্যে আয় মাসিক দেড়শো টাকা। তিনি এই সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বাংলা ও সংস্কৃতের উত্তরপত্র পরীক্ষা করতেন।

৫

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার লালবিহারী পরবর্তীকালে আমাদের দেশে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে, ইংরেজি ভাষায় গ্রন্থরচয়িতা ও পত্রিকা-সম্পাদকরূপে পরিচিত। কিন্তু বঙ্গদেশ ও বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর প্রাণে ছিল অকৃত্রিম অনুরাগ। অম্বিকা-কালনায় থেকে বাংলা ভাষায় তিনি অরুণোদয় পাক্ষিক পত্রিকা পরিচালনা করেছিলেন[২৬] এবং ঐ পত্রিকায় প্রকাশ করেন বাংলা ভাষা শিক্ষার উপকারিতা, প্রয়োজনীয়তা ও শিক্ষা-

২৫. তাঁর জীবনীকার ম্যাকফারসন লিখেছেন যে তাঁর এই কার্যভার ছিল "entirely independent of Mission Council".

২৬. এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় "সংবাদ সুধাংশু" নামক বাংলা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেছিলেন। "সংবাদ সুধাংশু" ১৮৫০ সালের ৬ সেপ্টেম্বর থেকে চলে ১৮৫১ সালের ২ অগস্ট বন্ধ হয়ে যায়। কৃষ্ণমোহনও এই আশা পোষণ করতেন যে একদিন বঙ্গভাষা শিক্ষার বাহন হবে।

দানের পদ্ধতি -বিষয়ক নানা প্রসঙ্গ। তাঁর মতে অবশ্য মুসলমান ('যবন') শাসনে বঙ্গ-ভাষার প্রকৃত উন্নতি হয় নি, হয়েছে বৃটিশ রাজত্বে—

"গণিতবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা; ভূগোলবিদ্যা, ধর্মবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, শারীরিক অর্থাৎ শরীর রক্ষা বিষয়কী চিকিৎসাবিদ্যা কাব্য নাটকাদি বিদ্যা, কবিত্ব বিদ্যা, গদ্য পদ্য লিখন, প্রকারকী বিদ্যা প্রায় তাবৎ বঙ্গভাষায় বিরচিত হয়েছে।"[২৭] এবং মাতৃভাষা শিক্ষা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—

"এতাদৃশ স্বার্থসম্পাদনী, মূর্খতাদোষ-কলঙ্ক-উন্মোচিনী বঙ্গভাষা, বঙ্গদেশীয় লোকদিগের সর্বাগ্রে শিক্ষা করা কর্তব্য। পশ্চাৎ রাজকীয় ভাষা, তদনন্তর ভাষান্তর। স্বদেশীয় ভাষাজ্ঞান ব্যতিরেকে ভাষান্তরজ্ঞান কখনই সুলভ কি সহজ হয় না—প্রথম শিক্ষাকল্পে সাতিশয় কঠিনতর বোধ হয়। দেশভাষা বিশিষ্টরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া যে-কোনো ভাষা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তাহাতে অবশ্যই কৃতকার্য হওনের সম্ভাবনা। অতএব স্ব স্ব দেশীয় ভাষা সর্বাগ্রে শিক্ষা করিয়া পশ্চাৎ দেশান্তরীয় ভাষাজ্ঞান সর্বসাধারণের কর্তব্য।"[২৮]

তাঁর এই বক্তব্য যখন প্রকাশিত হয়েছে মনে রাখতে হবে তখন বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্র-সুন্দর, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষীদের শিক্ষাচিন্তা প্রকাশিত হয় নি। তবে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন করেন তার ঐতিহ্য রয়েছে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায়। শিক্ষার প্রথম স্তরে মাতৃভাষার গুরুত্বপূর্ণ স্থান লালবিহারী সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ করেছেন—বিশেষ করে আজকের দিনে, আমাদের এ কথা স্মরণ করতে হবে।[২৯] তার পর বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্পর্কেও তাঁর মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ এবং আজো তার পূর্ণ মূল্য রয়েছে—

"যে সকল পুস্তক পাঠ্যরূপে পরিগণিত হয় অগ্রে তাহার আবৃত্তি, পরে আবর্তিত পাঠের তাৎপর্যার্থ তদনন্তর প্রশ্ন ও মাতৃভাষার ব্যাখ্যা। পরে বানান, যে শব্দের বানান জিজ্ঞাসিত হয় তাহার মূল ধাতু। পরে মূল ধাতুর যথার্থ অর্থ, ঐ মূল ধাতু যদি প্রাদি উপসর্গ পূর্বক হয়, তাহা হইলে যে উপসর্গটি পূর্বে থাকে তাহার অর্থ। এবং যে উপসর্গ যুক্ত আছে তদ্‌ভিন্ন অন্যান্য উপসর্গযোগে কি প্রকার অর্থ হয়, ঐ শব্দের অনুরূপ অভিধানে কটি শব্দ আছে। আর ঐ শব্দের ব্যুৎপত্তি ধরিলে কত প্রকার অর্থ হইতে পারে। পরে

২৭. "বঙ্গভাষা শিক্ষার উপকার কি?"—অরুণোদয়, ১৫ জুন ১৮৫৮

২৮. "বঙ্গভাষা শিক্ষার উপকার কি?"—অরুণোদয়, ১ অগস্ট ১৮৫৮

২৯. লালবিহারী আরও লিখেছেন— "বঙ্গভাষাকে বঙ্গদেশের মাতৃভাষা বলিতে হইবে যে ব্যক্তি মাতৃভাষাতে বঞ্চিত সে বঙ্গদেশের তাবৎ সুখেই বঞ্চিত।" —অরুণোদয়, ১ অগস্ট ১৮৫৮

ঐ মূল ধাতুর উত্তর কৃদন্ত প্রত্যয় কতগুলিন শব্দ বাহির হয় তন্মধ্যে কতগুলিন বিশেষ্য, কতগুলিন বিশেষণ। মনে কর 'আকৃতি' একটি শব্দ আছে, উহার মূল ধাতু 'কৃ' অর্থ করণ, আ — উপসর্গ। আকৃতি অর্থ অবয়ব, বিশেষ্য। বি পূর্বক হইলে বিকৃতির অর্থ, যথার্থের অন্যথাভাব, কৃ ধাতুর উত্তর কৃদন্ত প্রত্যয় করিলে কর্তব্য, করনীয় কার্য, কৃত্য কর্তৃকারক কারী কর্ম কৃত কৃতবান কৃতি করণ কর ইত্যাদি। ঐ সমুদায় শব্দ কোথায় বিশেষ্য, কোথায় বা বিশেষণ ; ঐ ধাতুর অনুরূপ যথা স্মৃ—স্মরণীয় স্মর্তব্য, স্মার্য্য ইত্যাদি। যদি ঐ প্রকার শব্দ কোন শব্দের সহিত একপদ হইয়া থাকে তবে কি করিয়া এক পদ হইল। সমাস জ্ঞান ব্যতীত পদসকলকে একপদ করা যায় না। এই দুই পদে কি সমান হইল। তাহার লক্ষণের সহিত সপ্রমাণ পূর্বক সমাসজ্ঞান। যদি ঐ দুইপদে সন্ধি হইয়া থাকে তাহাও সন্দর্ভশুদ্ধ শিক্ষা দেওয়া উচিত।…যেমন 'তদাকৃতি' এখানে তাহার আকৃতি, এই প্রকার বাঙ্গালায় সমাসযোগ্য বাক্য বলিয়া তাহার সঙ্গে আকৃতির সম্বন্ধ থাকায় ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হইয়াছে ; পরে আকৃতির আকার পরে রতে পূর্বের ৎ স্থানে দ হইয়া হস্ অচকে আশ্রয় করিয়াছে। পরে পাচ্চিং অর্থাৎ পদান্বয় করিবার সময়ে যে কারক বিশিষ্ট বিশেষণ সর্বনাম দিকবাচকাদির উল্লেখ হয়, তাহার লক্ষণ উদ্ভাবনের সহিত পদান্বয়কে সপ্রমাণকরণ, তদনন্তর এতাবৎ প্রস্তাব শ্রেণীস্থ তাবতের বোধগম্য হইয়াছে কিনা সন্দেহ হইলে কৌশলক্রমে পাত্র বিশেষ পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা।…এবম্প্রকার অধ্যাপনা মধ্যে ২ গদ্য পদ্য লিখনের নিয়ম। এবং শিক্ষাকল্পে উৎসাহসূচক উপদেশ। পরে কতকগুলিন পদ বাক্যের সহিত সঙ্গত। কোন বৃহৎ গল্প অল্পের মধ্যে রচনা, কোন ক্ষুদ্র গল্প বৃহদাকারে রচনা, সময়ে ২ রচনা শিখিবার উপায় উপদেশ। এবং অনুপ্রাস শব্দের শিক্ষাদান। পরে ওজঃ প্রসাদ মাধুর্যাদি গুণকথন। কাব্যাদি রচনা করিবার উপায় শিক্ষা, আর কিরকম বাক্যকেই কাব্য বলা যায়। এই প্রকারে বঙ্গভাষা শিক্ষার উপায় ব্যবহার হইলে বোধকরি শিক্ষাকল্পে দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে।"[৩০]

দেখা যাচ্ছে পদ-পরিচয় থেকে কাব্য-পরিচয় পর্যন্ত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার স্তরগুলির বিষয় লালবিহারী কী বিচক্ষণতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। 'অরুণোদয়' নামটি 'সম্বাদ প্রভাকর', 'সম্বাদ ভাস্কর', 'সম্বাদ তিমিরনাশক' প্রভৃতি পত্রিকার নামের অনুকরণে প্রদত্ত। 'সম্বাদ প্রভাকর' পত্রের কণ্ঠদেশে দুটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত শ্লোক মুদ্রিত থাকত। সংস্কৃত কলেজের অলংকার শাস্ত্রের অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ঐ শ্লোক দুটি রচনা করে দেন। সম্বাদ ভাস্করের সংখ্যাগুলিতেও প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ-রচিত দুটি শ্লোক শিরোভাগে মুদ্রিত থাকতে দেখা যায়। লালবিহারী পূর্বসূরীদের এই ঐতিহ্য অনুসরণ করেন। অরুণোদয় পত্রিকার শীর্ষে দেখা যায় সংস্কৃত ভাষায় নিম্নলিখিত অনূদিত পংক্তিগুলি :

৩০. "বঙ্গভাষা শিক্ষার উপায় কি ?"—অরুণোদয়, ১ অক্টোবর ১৮৫৮

অপরং অস্মৎ সমীপে দৃঢ়তরং ভবিষ্যদ্বাক্যং বিদ্যতেযুয়ঞ্চ যদি দিনারম্ভং যুষ্মন্মনঃসু প্রভাতীয় নক্ষত্রস্যোদয় যাবৎ তিমিরময়ে স্থানে জ্বলন্তং। প্রদীপমিব তদ্বাক্যং সমন্বধেব তর্হি ভদ্রং করিষ্যথ। পিতরস্য দ্বিতীয়ং সর্বসাধারণ পত্রং॥ ১॥১৯।[৩১]

পাক্ষিক সংবাদ, বিভিন্ন সচিত্র শিক্ষাপ্রদ বিষয়ে (মনসাপূজার 'ঝাঁপান', কাষ্ঠ মার্জার, বৃক্ষ, পেচক, বৃষ্টি, প্রজাপতি, কাকাতুয়া, তণ্ডুল, সর্প, জ্যোতির্বিদ্যা পাঠের ফল, খরগোস, বিলুপ্ত উরগকুল ইত্যাদি), মহম্মদের জীবনচরিত, ব্রিটিশ রাজ্য প্রণালী প্রভৃতি নানা ধরণের রচনা এই প্রকাশিত হত। খৃস্টধর্মের কথা ও প্রচার স্বভাবতই থাকত। সম্পাদকীয় মন্তব্যে বিধবা বিবাহের ও স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন লালবিহারী। সংবাদে সিপাহী বিদ্রোহের বহু ঘটনা জানা যায়।

অরুণোদয় পত্রিকায় কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত হতে দেখি 'হিন্দিভাষা ও হিন্দি সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'।[৩২] বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' (মার্চ ১৮৫৩) গ্রন্থের অনুকরণে তিনি ঐ নাম দেন। এই রচনাগুলি তাঁর নিজের কি না এ বিষয়ে নিঃসন্দেহে কিছু বলা যায় না। 'অরুণোদয়' পত্রিকায় ভারতচন্দ্র-ঈশ্বরগুপ্তের অনুসরণে রচিত কিছু প্রকৃতিবিষয়ক কবিতাও মুদ্রিত হয়েছিল। 'বসন্ত বর্ণন' 'নিদাঘ বর্ণন' 'প্রাবৃট বর্ণন' প্রভৃতির তার দৃষ্টান্ত। 'প্রাবৃট বর্ণন' কবিতাটির রচয়িতা নন্দকুমার মুখোপাধ্যায়, সাং গুপ্তপুর। কবিতাটি 'মালতিছন্দে' রচিত।[৩৩] বাংলা কবিতায় সেকালে ভারতচন্দ্র থেকে মদনমোহন তর্কালংকার, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি কবির কাব্যে সংস্কৃত-প্রাকৃত ছন্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

চন্দ্রমুখী নামে একটি খৃস্টমতপ্রচারধর্মী সামাজিক আখ্যায়িকা এই পত্রে ক্রম প্রকাশিত হতে দেখা যায়[৩৪] এর রচয়িতা লালবিহারী দে কিনা তাও জানা যায় না। তবে আখ্যায়িকাটি শ্রীমতী মুলেন্‌সের খৃস্টধর্মের প্রচারমুখ্য 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' পর্যায়ের সামাজিক রচনা। তবে বোধকরি রচয়িতার মনে 'আলালের ঘরের দুলালে'র 'সংস্কার' ছিল কেননা এর মধ্যে বহুস্থলে কথ্য উপভাষা বসানো হয়েছে। লালবিহারী

---

৩১. অংশটি বাইবেল থেকে গৃহীত—"We have also a more sure word of prophecy ; where unto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place until the day dawn and the daystar arise in your hearts", Second Epistle General of Peter, Chapter I : 19.

৩২. অরুণোদয়, ১৫ এপ্রিল, ১৮৫৮ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। বাংলা ভাষায় এই ধরণের আলোচনা এই প্রথম।

৩৩. অরুণোদয়, ১ অক্টোবর ১৮৫৮

৩৪. অরুণোদয়, ১ নভেম্বর ১৮৫৭ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে।

নিজে 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থের প্রশংসা করেছেন।[৩৫] 'চন্দ্রমুখী' নাতিদীর্ঘ রচনা, এর মধ্যে বিধবা বিবাহ সমর্থন, নানা কুসংস্কার বর্ণনের সঙ্গে খৃস্টধর্ম গ্রহণের কথা আছে। 'চন্দ্রমুখী' থেকে 'আলাল'ধর্মী ভাষার একটু নিদর্শন দেওয়া যাক—

"ধীবর॥ গোটা দুই চারি মাচ পেয়েছি, তা আমি বেচিবনা, আমার ছেলেপিলে আজ তরকারি বিনে ভাৎ খেতে পারে নাই।

নিধিরাম॥ এ গ্রামের নাম কি? আর এখানকার কোন গৃহস্থ অতিথিসেবা করে?

ধীবর॥ প্রাতঃ পনম, আপনি কে, পথিক দেখিতেছি, এজায়গাটুকুর নাম জেলে পাড়া।

নিধিরাম॥ এখানে কোন ব্রাহ্মণের বাড়ী আছে যেখানে আমি অতিথি হইতে পারি? এখানে তো কেবল জেলে, মালো আর তোমার গে তেওরের বসতি, এর মাজে বামুন কায়েৎ কই।...

ধীবর॥ একটুকু রসো, একছিলুম নৈতন তামাক সাজ়ি, আপনি কোন ঠাঁই হতে আসচন্, লও ধর তামাকু খাও।

নিধিরাম॥ আহো-হো,ক্ষক্-ক্ষক্— এ়কি শক্ত তামাক্ রে— গাজাতো সাজিসনি।"

—দ্বাদশ অধ্যায়

অরুণোদয় পত্রিকায় (১৮৫৭-৫৮) পার্নেলের *Hermit*-এর অনুবাদ বার হয়েছিল 'তপস্বী' নামে। অনুবাদকের নাম নেই কিন্তু এই অনুবাদ লালবিহারীর নয় হরিমোহন গুপ্তের। তবে এই ১৮৫৮ সালে লালবিহারী পার্নেলের 'হার্মিট' কাব্যের টীকাটিপ্পনীসহ একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন।[৩৬] 'অরুণোদয়' পত্রিকা প্রকাশ ও পরিচালনা লালবিহারীর অন্যতম বরণীয় প্রচেষ্টা।

৬

লালবিহারীর বঙ্গপ্রীতির যে নিদর্শন অরুণোদয় পত্রিকায়, *Folk Tales of Bengal* এবং *Govinda Samanta* গ্রন্থে, তার পূর্বপরিচয় রয়েছে ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে। তিনি বাঙালী জনসমাজের ক্রীড়াকৌতুক সম্পর্কে যে-প্রবন্ধটি

৩৫. অরুণোদয়, ১ মে ১৮৫৮

৩৬. Lalbehari Day, *Johnson's Vanity of Human Wishes and Parnell's Hermit with Notes* (1858), ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে রক্ষিত। হরিমোহন গুপ্তের রচনা গ্রন্থাকারে বার হবার সময় নাম হয়েছিল 'সন্ন্যাসীর উপাখ্যান' (১৮৫৯)। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় লিখেছেন, হরিমোহন গুপ্ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন এবং 'অদ্ভুত রামায়ণ' ও 'শকুন্তলা' অনুবাদ করেছিলেন। আমরা হরিমোহন গুপ্তের অনুদিত শকুন্তলা 'সম্বাদ প্রভাকর' (১২৬৪-৬৫) পত্রিকায় পেয়েছি

লেখেন তার প্রথম দিকে তিনি জানিয়েছেন যে বাঙালীর ক্রীড়াকৌতুক সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে কোনো পাশ্চাত্য জাতির কাছে হার মানবে না। ইউরোপীয়ানরা এ দেশের মানুষকে কর্মক্লান্ত প্রহরে দেখেছেন কিন্তু তাদের প্রকৃতরূপ দেখেন নি।[৩৭] পাশ্চাত্য দেশের মানুষের সঙ্গে প্রকৃতিগত দুর্বল বাঙালীর খেলাধুলার পার্থক্য তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। পুরুষদের দাবা, পাশা, তাস (প্রমরা), গ্রাবু, কড়ি খেলা, হুঁকা টানার বিবরণ দিয়ে তিনি মেয়েদের বালিকা বয়সে বৌ-বৌ খেলা, লুকোচুরি, কানামাছি, ফুল কুটি, আগডুম-বাগডুম প্রভৃতি খেলার উল্লেখ করেছেন। তার পর বিবাহ হলে তারা খেলবে দশ-পঁচিশ, মোগল-পাঠান, বাঘবন্দী, তাস প্রভৃতি খেলা। যাঁরা মনে করেন বাঙালী মেয়েরা ক্রীতদাসীর মত, তাঁদের মুখের মত জবাব দিয়েছেন লালবিহারী—that they are viewed here in the light of slaves, cattle and household property is not true. That much of their time is devoted to all sorts of in-door work is true ; but is not that the case even in England ? তিনি আমাদের মেয়েদের বধূজীবনকে প্রশংসা করে বলছেন "স্বার্থত্যাগের জীবন" ('self.-denying')।

কৃষকসমাজের ক্রীড়াকৌতুকের কথা বলতে গিয়ে লালবিহারী তাদের দুঃখকষ্ট, জমিদারের অত্যাচার, শোষণের কথা না বলে পারেন নি। ১৮৫১ সালের পূর্বে প্রজাদের দুঃখের কথা এমন ভাবে কেউ বলেছেন বলে আমার জানা নেই।[৩৮]

তিনি লিখেছেন—"They have been greatly abused. Systematic oppression from time immemorial has paralyzed their energies deprived them of their native manliness and reduced them to the ignoble condition of slaves. Their own countrymen have proved to be their cruelest oppressors and most inveterate foes. The Zemindar's Katchery is the scene of the ryot's degradation where he is derided, spat upon and treated as if he were the veriest vermin of creation".[৩৯]

৩৭. *Calcutta Review*, June 1851.

৩৮. প্যারীচাঁদ মিত্রের 'The Zeminder and the Ryot' (*Calcutta Review* 1846) প্রবন্ধ পূর্বে প্রকাশিত হইলেও লালবিহারী যে আবেগময় ভাষায় প্রজাদের দুঃখ-কষ্টের কথা লিখেছেন ঐ প্রবন্ধটি ঠিক সে-ধরণের নয়। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে কিশোরীচাঁদ মিত্র (প্যারীচাঁদের ভ্রাতা) ইণ্ডিয়ান ফিল্ড পত্রিকায় (১৮৫৯) লিখেছিলেন—"The Ryot and the Zeminder" প্রবন্ধ। দ্র মন্মথনাথ ঘোষ, 'কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র'।

৩৯. তদেব

বাংলার কৃষকদের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন পৌরুষ, সততা ও সারল্য। তাদের ক্রীড়াকৌতুক সম্বন্ধে তিনি গুলতি ছোঁড়া, ঘুড়ি ওড়ানো, হাডুডু, ডাণ্ডাগুলি, কুস্তি, ভেড়ার লড়াই, বুলবুলির লড়াই প্রভৃতির কথা বলেছেন। ঐ প্রবন্ধে পৃথকভাবে তিনি তখনকার দিনের বাংলা যাত্রা, কবিওয়ালাদের হাফ্-আখড়াই, পাঁচালী গান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু কোনোটিই তাঁর কাছে আদৌ উচ্চাঙ্গরুচির পরিপোষক বলে মনে হয় নি, বরং তাঁর মতে 'Young Bengal will be ashamed'।

আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল বাঙালীর পর্বদিন ও উৎসব সম্পর্কে। এই প্রবন্ধে তিনি 'বারো মাসে তের পার্বণের' দীর্ঘ তথ্যপূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন। তার মধ্যে জামাইষষ্ঠী, মনসাপূজা, রথযাত্রা, ঝুলন, দুর্গাপূজা, রাস, দোল বা হোলি, ধর্মঠাকুরের পূজা শীতলা পূজা কিছুই বাদ যায় নি। সরস্বতী, লক্ষ্মী, কালী, জগদ্ধাত্রী, গঙ্গাপূজা সবই বর্ণিত হয়েছে।

নানা ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও বাঙালীর জীবন ও সমাজ তাঁর কাছে চিরদিনই প্রিয় ছিল যদিও হিন্দুধর্মকে তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন ও খৃস্টধর্মের প্রসার তাঁর পরম কাম্য ছিল।

এই বঙ্গপ্রীতি বা দেশের জনসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির নিদর্শন *Folk Tales of Bengal*। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে 'অরুণোদয়' পত্রিকায় লালবিহারী 'বঙ্গীয় উপকথা' প্রকাশের প্রয়াস পেয়েছিলেন। তিনি *Folk Tales of Bengal* গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন যে তাঁর *Bengal Peasant Life* রচনায় তিনি গোবিন্দকে শম্ভুর মায়ের কথিত উপকথার শ্রোতারূপে বর্ণনা করেছিলেন[৪১]। ঐ অংশ পড়ে স্যর রিচার্ড টেম্পলের পুত্র ক্যাপটেন টেম্পল তাকে বঙ্গের উপকথা সংগ্রহ করে প্রকাশ করতে বলেন।

১৮৭১ সালে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ইংরেজি ভাষায় রচিত "Social and Domestic Life of the Rural Population and Working Classes in Bengal" নামক প্রবন্ধের লেখককে পাঁচশো টাকা পুরস্কার দেবেন বলে ঘোষণা করেন। লালবিহারীর *Bengal Peasant Life* রচনা তারই ফল (১৮৭২)। লালবিহারীর রচনার ফলাফল প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ সালে।[৪২] ক্যাপ্টেন টেম্পল লালবিহারীকে উৎসাহ দিয়েছিলেন এ কথা সত্য। তিনি নিজে পাঞ্জাবের লোকগাথা সংকলন করেন, তাঁর পিতা স্যার রিচার্ড টেম্পল "Some Hindu Songs and Etches from village in Northern

৪০. "Bengali Festivals and Holidays", *Calcutta Review*, July 1852.

৪১. Chapter XIX, "Evenings at Home."

৪২. *Govinda Samanta*, পরিবর্ধিত গ্রন্থ। Macmillan, London 1874.

India"[৪৩] এবং "Folk Songs in Northern India"[৪৪] নামক প্রবন্ধদ্বয় ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

// লালবিহারী তাঁর সম্পাদিত বেঙ্গল ম্যাগাজিন পত্রিকায় ১৮৭৫ সালের আগস্ট মাস থেকে 'বাংলার উপকথা' প্রকাশ করতে থাকেন। কথকের অর্থাৎ রচয়িতার স্থানে লেখা থাকত 'Mother Goose'। লালবিহারী এই মহৎ কার্য সাধন করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয় যখন প্রথম 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৩১৪) প্রকাশ করেন তিনি সর্বাগ্রে স্মরণ করেছিলেন লালবিহারী দের নাম। তিনি লিখেছেন—

"*Arabian Nights* জগতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে আদর পাইয়াছে— আপনার সফলতায় তৃপ্ত হইয়াছে। আমাদের দেশের কেবলমাত্র কাশ্মীর কথাই (*Folk Tales of Kashmir*) কথঞ্চিৎ যত্ন পাইতে বসিয়াছে— বিদেশীয় গুণগ্রাহীর কটাক্ষে পড়িয়াছিল বলিয়া। কিন্তু ধন্য আমাদের লালবিহারী— আমাদের বরেণ্য পথপ্রদর্শক! যিনি প্রাণের আহ্লাদে, অন্তরের আকুলতায় এই ধূলির ঝুলি ঘৃণায় নিক্ষেপ না করিয়া ঝাড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহারই মজবুত বিলাতী ট্রাঙ্কে করিয়া বাঙ্গলার কথাকাহিনী পৃথিবীর দেশে দেশে আপনার সত্তা জানাইতে পারিয়াছে।"

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় 'ঠাকুরমার ঝুলি' প্রসঙ্গে লিখেছেন— "৺লালবিহারী দে মহাশয় ইংরাজিতে উপকথা লিখিয়া গিয়াছেন এ পর্যন্ত বাঙ্গলায় কেহ লেখেন নাই। এই হেতু আশা করি এই বইখানি দ্বারা দেশের একটা অভাব পূরণ হইবে।" //

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিদেশী রূপকথার অনুবাদ বা ছায়ানুসারী বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সংস্কৃত থেকে গৃহীত উপাখ্যানও কম প্রকাশিত হয় নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ নীলমণি বসাকের 'আরবীয় উপন্যাস' (১৮৫০), আলোকনাথ ন্যায়ভূষণ ও রাধামাধব মিত্রের 'আরব্যোপন্যাস', আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের 'বৃহৎ কথা' (১৮৫৭), হরিশ্চন্দ্র নন্দীর 'চাহার দরবেশ' (১৮৫৪), মহেন্দ্রচন্দ্র সিংহের 'হাতেম তাই' (১৮৭৩), শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত 'মনোহর উপন্যাস' (১৮৫৭), হরিনাথ মজুমদারের 'বিজয় বসন্ত' (১৮৬৯) প্রভৃতি বইয়ের কথা বলা যায়। কিন্তু এই পর্বে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন মধুসূদন

৪৩. *Calcutta Review*, LXXV No. 149.

৪৪. *Calcutta Review*, LXXVIII No. 156.

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর আলালের ঘরের দুলাল উপন্যাসের শেষে 'আমার কথাটি ফুরোল নটে গাছটি মুড়োল'—ছড়ার দুটি পঙ্‌ক্তি বসিয়েছেন।

মুখোপাধ্যায় যিনি হান্‌স ক্রিশ্চিয়ান অ্যানডারসনের বহু গল্প বঙ্গভাষায় অনুবাদ করে বার করেন। রুশ কথক ক্রিলভের গল্পও তিনি অনুবাদ করেন। এঁর যোগ্য মর্যাদা আজো এঁকে দেওয়া হয় নি। তাঁর 'চকমকি বাক্‌স' (১৮৬৭), ছোট কৈলাশ ও বড় কৈলাশ (১৮৬৩), চীনদেশের বুলবুল পক্ষির বিবরণ (১৮৬৭), হংসরূপী রাজপুত্রদিগের বিবরণ বিষয় (১৮৭ম), ক্রিলভের গল্প (১৮৭০), পুত্রশোকাতুরা দুঃখিনী মাতা (১৮৫৮) প্রভৃতি বহু গ্রন্থ Bengali Family Libraryর উদ্যোগে প্রকাশিত হয়।

কিন্তু কেউই বাংলার নিজস্ব উপকথাকে সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন নি। লালবিহারী ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন যে তিনি গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয়ের উপকথা সংকলন[৪৫] বা ডাসেন্ট্‌-এর *Norse Tales* অথবা আইসল্যাণ্ডের উপকথার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন পূর্বেই—এবং তাঁর এই কথা-সংকলনের মধ্য দিয়ে তুলনামূলক লোকগাথা ও লোকপুরাণ সাহিত্যালোচনায় সুবিধা হবে। এবং দেখা যাবে যে এই উপকথার ক্ষেত্রে গঙ্গাতীরের চাষীর সঙ্গে টেমস-তীরের সুসজ্জিত ইংরেজ মানসের অদ্ভুত সাদৃশ্য।[৪৬] লালবিহারী নিজের শৈশবে শশুর মায়ের কাছ থেকে বহু উপকথা শুনেছিলেন কিন্তু সেই শশুর মা তখন পরলোকে। কাজেই তিনি একজন বাঙালী খৃস্টান মহিলার কাছ থেকে কয়েকটি গল্প সংগ্রহ করলেন। আরও গল্প জোগাড় করলেন দুজন[৪৭] ব্রাহ্মণ, একজন বুড়ো নাপিত ও তাঁর নিজের ভৃত্য প্রভৃতির কাছ থেকে। তার সব তিনি অনুবাদ করে উঠতে পারেন নি।

গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয়ের কীর্তি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে। তাঁরা সাধারণ মানুষের মুখ থেকে উপকথাগুলিকে তুলে নিয়েছিলেন এবং সেই ভাবেই রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিলেন। লালবিহারী একই পন্থা গ্রহণ করেন, তিনি যাদের কাছ থেকে উপকথাগুলি শুনেছিলেন তারা কেউই ইংরেজি জানে না, কাজেই সেগুলি অবিকৃত রূপেই বিদ্যমান ছিল। তিনি যে-সব উপকথা এই সময় সংগ্রহ করেন তাদের মধ্যে কয়েকটি

৪৫. গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয় জেকব (১৭৭৮-১৮৬৫) ও উইলিয়ম (১৭৮৭-১৮৫৯)। তাঁদের সম্পাদিত গ্রন্থ '*Kinder-und-Hansmarchen* (Household Tales), 1812.

৪৬. "That the swarthy and half-naked peasant on the banks of the Ganges is a cousin, albeit of the hundredth remove, to the fair-skinned and well dressed English man on the banks of the Thames", Preface to *Folk Tales of Bengal*,

৪৭. "The Story of Brahmadaitya", *Bengal Magazine*, January 1878.

নরসুন্দর সম্প্রদায় সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধ 'Bengali Barbers' দ্রষ্টব্য—*Calcutta Review*, XXXII No. 64.

'ভেজাল' বলে তাঁর মনে হয়। শৈশবশ্রুত উপকথাগুলির মানদণ্ডে তিনি খাঁটি ও ভেজাল নির্ণয় করে কয়েকটিকে বর্জন করেন।

জর্মান সাহিত্যে উনবিংশ শতকের শুরুতে যে রোমান্টিসিজ্‌মের বন্যা বহে যায় তার অন্যতম ফলশ্রুতি লোক-কথা, লোক-গাথা, লোক-বচন প্রভৃতির সংগ্রহ ও সংকলন। এগুলির মধ্যে মনীষী হার্ডার কথিত সেই খাঁটি অকৃত্রিম জন-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে আবিষ্কার করা গেল। সংস্কৃতির এই উৎস-সন্ধানপ্রবণতা অবশ্যই রোমান্টিক কিন্তু সেই রোমান্টিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিল সমকালীন (১৮০৬-১৩) দেশপ্রেম। নেপোলিয়নী শাসনের বিরোধিতা থেকে জাত এই দেশপ্রেম সার্থকতা খুঁজেছিল নিজস্ব ভাষা, ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতির রচনায় ও চর্চায়।[৪৮] দেশপ্রেম ও রোমান্টিসিজ্‌ম গঙ্গাযমুনার মত মিলিত হয়ে এই ধরাজয়ী উপকথা সংকলন সম্ভব করেছিল গ্রীম ভ্রাতৃযুগলের মধ্য দিয়ে। আয়ারল্যাণ্ডের ইতিহাসে অনুরূপ ঘটনার সাক্ষ্য মিলবে। কবি য়েটস্ আইরিশ স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন এবং নবজাগ্রত আইরিশ দেশপ্রেমের ফল কেল্‌টিক সভ্যতার পুনরাবিষ্কার। নতুন করে দেখা হল অতীত-প্রচ্ছন্ন নিজস্ব কথাকাহিনীকে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"সকলেই জানেন, কিছুকাল হইতে আয়র্লণ্ডে একটা স্বাদেশিকতার বেদনা জাগিয়া উঠিয়াছে। অনেকদিন হইতে এই বেদনা প্রধানত পোলিটিকাল বিদ্রোহ-রূপেই আপনাকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। অবশেষে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা চেষ্টা দেখা দিল। আয়র্লণ্ড আপনার চিত্তের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করিয়া তাহাই প্রকাশ করিতে উদ্যত হইল।[৪৯]

৭

লালবিহারী বৃটিশ রাজত্বের বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু তাঁর গভীর দেশপ্রীতি, বঙ্গপ্রীতি ছিল। পূর্বে দেখেছি তিনি সাদা ও কালো চামড়ার মধ্যে বৈষম্যরক্ষা নীতির তীব্র সমালোচক ছিলেন। অপরদিকে দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি, তাদের অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করে তুলবার জন্য প্রবল আগ্রহ, তাদের জীবনরূপকে সাহিত্যে প্রতিফলনের জন্য গ্রন্থ রচনা তাদের মুখে-মুখে বেঁচে থাকা উপকথাকে সংরক্ষণ প্রচেষ্টা—

---

৪৮. Rose, *A History of German Literature,* trs. Peter Owen.

৪৯. "কবি য়েটস", পথের সঞ্চয়

স্যর ওয়াল্টার স্কটের সাহিত্য রচনা অনুসরণ করলে দেখা যাবে তাঁর তীব্র স্কটল্যাণ্ড-প্রীতি। দেশপ্রেম থেকেই জন্ম নিয়েছে স্কটের অতীত-ঐতিহ্য প্রীতি ও রোমান্স রচনার প্রেরণা।

সবই লালবিহারীর দেশপ্রেমের সাক্ষ্যবহ। বাংলার মাটি ও মানুষের প্রতি এই প্রাণের টান লালবিহারীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য। একথা সত্য লালবিহারী তাঁর *Bcngal Peasant Life* বা তারই পরিবর্ধিত রূপ *Govinda Samanta* গ্রন্থে আমাদের হিন্দু সমাজের প্রচলিত প্রথা, সংস্কার, ধর্মাচারকে আক্রমণ করেছেন। কিন্তু কুৎসা রটনার উদ্দেশ্য নিয়ে বা হিন্দু সমাজের সব কিছুকে হেয় করবার সংকল্প নিয়ে তিনি এই বই লেখেন নি। তিনি এর মধ্যে তাঁর নিজ বাল্যজীবনের স্মৃতিকে বহুলাংশে ভরে দিয়েছেন। "বেঙ্গল ম্যাগাজিন" পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর ছাত্রজীবনের স্মৃতির সঙ্গে *Gavinda Samanta* বইয়ের প্রথমখণ্ডের অনেক মিল দেখা যাবে। গ্রামজীবনের সাধারণ মানুষের এমন বিশ্বস্ত পরিপূর্ণ কথাচিত্র এর পূর্বে দেখা যায় নি। গ্রামের পাঠশালা, গণকঠাকুর, বিয়ের ঘটকালি, বাসরঘর, ভূত নামানো, সতীদাহ, হিন্দু বিধবাদের কথা, মেয়েলি বৈঠক, প্রভৃতি বাস্তবধর্মীদৃষ্টিতে বর্ণিত হয়েছে। সমাজের যা নিন্দনীয় বলে তাঁর মনে হয়েছে তিনি তার বিরুদ্ধে বলেছেন কিন্তু এই নিয়ে সাদা চামড়ার লোকদের নিক্ষিপ্ত ব্যঙ্গ-কটাক্ষ তাঁর অসহ্য ছিল। তাই আদুরীর বৈধব্যের পর হিন্দু বিধবাদের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, হিন্দু বিধবাদের অবস্থাকে দুঃসহ বলে মনে করবার মত কোনো কারণ নেই। "It is not she is persecuted and tormented by her relations and friends—that is a fiction of foreign writers, of people unacquainted with Hindu life in its actual manifestations..." অথবা "English people have somehow or other got the idea that a Hindu widow receives harsh and cruel treatment from the relations of her husband. This is not true."[৫০]

'গোবিন্দ সামন্ত' বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে সাধারণ দরিদ্র প্রজার উপর একদিকে গ্রাম্য জমিদার, তার নায়েব গোমস্তা লাঠিয়ালদের নিষ্ঠুর অত্যাচার অপরদিকে নির্মম সুদ-খোর মহাজনের অপকৌশল লালবিহারী অতি নিপুণ ভাবে বর্ণনা করেছেন। ঘুষখোর দারোগা, অসাধু সরকারী কর্মচারীদের প্রকৃত রূপ তিনি উদ্‌ঘাটিত করেছেন। এই বইয়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নীলকর-প্রসঙ্গ। নীলকর-প্রসঙ্গ বাংলা সাহিত্যে নতুন নয়। 'সম্বাদ প্রভাকর' পত্রিকায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯) তাঁর সম্পাদকীয় রচনায় এবং কবিতায় নীলকরদের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেছেন। 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকায় গৌরীশঙ্করও নীলকরদের বিরুদ্ধে লেখেন। প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪—৮৩) তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে (১৮৫৮) পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে নীলকরদের অত্যাচারের কথা লিখেছেন এবং ঐ সূত্রে জমিদার মতিলালের সঙ্গে নীলকরের

৫০. *Govinda Samanta* Part I, Chapter XX, The Hindu Widow.

দাঙ্গার বিবরণ দিয়েছেন।[৫১] দীনবন্ধু মিত্রের নাটক নীলদর্পণ (১৮৬০) ও তার অনুবাদ *Nil Durpan or the Indigo Planting Mirror.* (১৮৬১) চিরস্মরণীয় গ্রন্থ। কোলস্ওয়ার্দি গ্রান্টের *Rural Life in Bengal* এই সম্পর্কে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা এই ক্ষেত্রে অমর কীর্তি রেখে গেছে। এই হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায়, অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শিশিরকুমার ঘোষ যশোহরের সংবাদদাতারূপে নীলকরদের অত্যাচারের বিবরণ পাঠাতেন এম. এল. এল. ছদ্মনামে।

লালবিহারীর নীলকর-অত্যাচারের বা নীল আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় বিশেষ ছিল বলে মনে না, কেননা যশোহর-নদীয়া অঞ্চলই মুখ্যত নীলকরদের এলাকা ছিল এবং লালবিহারী ঐ অঞ্চলে কখনও যাননি। তবে তখনকার দিনের দেশপ্রেমী শিক্ষিত বাঙালী হিসাবে তাঁর সহানুভূতি ছিল চাষী প্রজাদের প্রতি। নীলকরদের জোর করে জমিতে নীল বোনা, দাদন চাপিয়ে দেওয়া এবং অমানুষিক নিগ্রহ সবই তিনি বিশ্বস্তরূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি এ বিষয়ে কোলস্ওয়ার্দি গ্রান্টের *Rural Life in Bengal* থেকে যে বহু সাহায্য পেয়েছেন সে কথা স্বীকার করেছেন।[৫২]

প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং লালবিহারী দে রচিত *Govinda Samanta* বই দুখানির মধ্যে একদিক থেকে মিল আছে। কেননা কোনোখানি রোমান্স-ধর্মী নয়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস'-এর স্বাভাবিক পরিণতি 'আলালের ঘরের দুলাল'। কিন্তু লালবিহারীর *Bengal Peasant Life* শহর-অঞ্চলের বৃত্তান্ত নয়, গ্রামাঞ্চলের মানুষের জীবন কথা। তিনি তাঁর বইয়ের অধ্যায়গুলির প্রারম্ভে গ্রে, চসার, গোল্ডস্মিথ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং ক্র্যাবের কবিতা থেকে বার বার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তার কারণ লালবিহারীর সঙ্গে তাঁদের বক্তব্যের অন্তর্নিহিত মিল আছে। শাহরিক পরিবেশ এবং জীবন যাত্রা থেকে বহু দূরে রাঢ়ের গ্রামীণ সাধারণ নরনারীর খাঁটি বাস্তব পরিপূর্ণ জীবনালেখ্য গভীর সহানুভূতির সঙ্গে তিনি এঁকেছেন। তিনি স্পষ্টই জানিয়েছেন *Govinda Samanta* গ্রন্থের ভূমিকায় যে এই বইয়ে অলৌকিক, বিস্ময়কর, রোমহর্ষক উপাদান কিছু পাওয়া যাবে না। কিংবা রোমান্টিক অভিযান, কাহিনীর জটিলতা, উত্তেজক ঘটনার

৫১. 'মাসিক পত্রিকা'র তৃতীয় বর্ষের ১১শ সংখ্যা পর্যন্ত ২৬ অধ্যায় প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ ১৮৫৭ সালের প্রথমে এই নীলকর-প্রসঙ্গ প্রকাশিত হয়। এই একটি অধ্যায়ে সংক্ষেপে অথচ পূর্ণাঙ্গরূপে নীলকরের অত্যাচার ও সরকারী ঔদাসীন্য বর্ণিত হয়েছে।

৫২. নীল বিদ্রোহের জ্ঞাতব্য তথ্যের জন্য বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য, সি. ই. বাকল্যাণ্ড রচিত *Bengal Under the Lieutenant Governor* Vol. I (1901), Chapter XLIX, All About Indigo.

প্রাচুর্য অথবা ভয়ংকর দৃশ্য খুঁজলে মিলবে না। পাশ্চাত্য উপন্যাসসুলভ নরনারীর প্রণয়দৃশ্য সন্ধানও এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হবে। তা ছাড়া এ রচনা দীর্ঘসমাসবদ্ধ জন্‌সনী রীতির বাগ্‌ভঙ্গীবর্জিত। পক্ষান্তরে তিনি জানিয়েছেন যে তিনি এই উপন্যাসে বাংলার একটি সাধারণ গ্রামীন চাষীর জীবন বর্ণনা করতে চান। তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে। ইংরেজি ভাষায় লেখা হলেও *Govinda Samanta* বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে প্রথম গণ-আখ্যান।[৫৩]

ডাফ সাহেব *Govinda Samanta* পড়ে আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি একখানি চিঠিতে লালবিহারীকে লেখেন : Your Govinda Samanta is by far the best the truest, the most complete account of the social and domestic life of the rural population of Bengal to be found in the English language.[৫৪]

কিন্তু সবচেয়ে গৌরবের কথা পৃথিবীখ্যাত জীববিজ্ঞানী চার্লস্ ডারউইন বইখানি পড়ে প্রকাশককে লিখেছিলেন যে গোবিন্দ সামন্ত পড়ে তিনি যুগপৎ শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করেছেন : "I see that the Rev. Lal Behari Day is Editor of the 'Bengal Magazine' and I shall be glad if you would tell him with my compliments how much pleasure and instruction I derived from reading a few years ago, his novel, Govinda Samanta."[৫৫]

৮

লালবিহারীর কর্মজীবন সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। লাল-বিহারী ১৮৬৭ থেকে ১৮৮৮ পর্যন্ত সরকারী শিক্ষাবিভাগে কার্যরত ছিলেন। তার মধ্যে

---

৫৩. *Govinda Samanta* গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন ভূকৈলাসের সত্যবাদী ঘোষাল। অনুবাদের নাম 'গোবিন্দ সামন্ত'। তবে তিনি সম্ভবত প্রথম খণ্ডের অনুবাদ করেছিলেন। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে প্রথম খণ্ডের অনুবাদগ্রন্থ আছে, দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ পাই নি।

৫৪. ৮ই জুন, ১৮৭৫ সালে লিখিত পত্র, ম্যাকফারসনের গ্রন্থে উদ্‌ধৃত।

৫৫. ডারউইনের চিঠির তারিখ ১৮ এপ্রিল ১৮৮১

লালবিহারী রচিত এই উপন্যাসের সমকালীন সৃষ্টি 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৪) তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনা। এই উপন্যাস প্রকাশের কিছুকাল পরে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় (No. CX LIX, 1882) সমালোচনায় বলা হয় : "This is the only true novel we have read in Bengali, Babu Bankim Chandra's works being poems, not novels ; we are therefore glad that it has passed through its third edition". এই সমালোচক সম্ভবত লালবিহারী।

১৮৬৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৭২ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে কাজ করেন। ১৮৭২ জানুয়ারি থেকে ১৮৮৮ ডিসেম্বর অবধি তিনি হুগলী মহসীন কলেজে অধ্যাপনা করেন।[৫৬] তাঁর সরকারী চাকরি পাবার ইতিহাস এই। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়—বহু প্রাণহানি ঘটে। ছোটলাট স্যর সেসিল বীডনের ঔদাসীন্য ও দীর্ঘ সূত্রতার ফলে অবস্থা শোচনীয় হয়। কৃষ্ণদাস পাল ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁদের সম্পাদিত হিন্দু পেট্রিয়ট এবং বেঙ্গলী পত্রিকায় সরকারের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় লালবিহারী তাঁর সম্পাদিত *Friday Review* পত্রিকায় বীডনের পক্ষ সমর্থন করেন। তারই ফলে তিনি সরকারের শিক্ষা-বিভাগে প্রবেশের সুযোগ লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে *Govinda Samanta* বইয়ের শেষ অধ্যায়ে দুর্ভিক্ষ বর্ণনার কথা বলা অবান্তর হবে না। লালবিহারী বর্ধমানে দুর্ভিক্ষ বর্ণনা কালে সরকারের কার্যের প্রশংসা করেছেন। শুধু চাকরি পাবার জন্যই তিনি ঐ কাজ করেছিলেন বলে মনে হয় না। পূর্বেই বলেছি লালবিহারী ব্রিটিশ রাজত্বের বিরোধী ছিলেন না, সমর্থক ছিলেন। বর্ধমানে দুর্ভিক্ষ ও গোবিন্দ সামন্তের দুর্দশা বর্ণনা করেও তিনি স্যর রিচার্ড টেম্পল ও লর্ড নর্থব্রুকের প্রশস্তি করেছেন: "Never did any Government in the world act, in the face of great calamity, with such promptitude, such presence of mind, such energy, such considerate benevolence, as the Government of Lord Northbrook."[৫৭]

১৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি হুগলী মহসীন কলেজে ইংরেজি সাহিত্য ও দর্শনের অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। স্যর রিচার্ড টেম্পল এ বিষয়ে তাঁকে সহায়তা করেন।[৫৮]

---

৫৬. *Hooghly Mohsin College Register.*

৫৭. *Govinda Samanta*, Part II, Chapter LXI, p. 286.

৫৮. স্যর রিচার্ড টেম্পলের কার্যকাল ১৮৭৪-৭৭। তিনি লালবিহারী সম্পর্কে লিখেছেন—"The Reverend Lal Behari Day, one of the earliest converts made by the Scottish Missionaries was Professor in a Government College. His character was marked by firmness, independence and ambition for doing good in his generation. He possessed an exact knowledge of the best points in the European character and his writings displayed much insight into the thoughts and ways of the poorer classes among his countrymen. He possessed much literary skill wrote English prose with purity and prosperity"—*Men and Events of My Time in India*, p. 429

১৮৭২ সালে ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়[৫৯] সরকারী কার্যভার থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সেই পদে লালবিহারী নিযুক্ত হন। সরকারী প্রস্তাবে দেখা যায় লালবিহারী দে সম্পর্কে বলা হয়েছে "well known for a proficiency in English not surpassed by any native of Bengal"[৬০] এই সূত্রে উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্মৃতিকথা উৎকলনযোগ্য—

"আমি কৃষ্ণনগরে ফিরিয়া আসিলাম। লেথব্রিজ—Roper Lethbridge সাহেব তখন প্রিন্সিপ্যাল। কলিকাতা হইতে অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার (১৮২৩-৭৫) Lethbridge সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর উড্রো (Woodrow) সাহেব তাঁহার পদে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। লালবিহারী দেকে দিলেন না। সেপ্টেম্বর মাসে প্যারীচরণের মৃত্যু হয়; নবেম্বর মাসে আমি তাঁহার পদে উন্নীত হই। লেথব্রিজ সাহেব ছয়মাসের ছুটি লইলেন; আমি তাঁহার স্থানে officiate করিতে আরম্ভ করিলাম; তিনি নিজে জোর করিয়া আমাকে ধরিয়া বসিলেন যে, তাঁহার অনুপস্থিতিতে আমি যেন প্রিন্সিপ্যালের কাজ করি। বাহির হইতে আর কেহ আসিয়া officiate করেন, ইহা তাঁহার আদৌ ইচ্ছা নহে; সুতরাং ডাইরেকটরকেও তাঁহার অনুমোদন করিতে হইল। এমন সময় প্যারীচরণ সরকারের পদ খালি হইল। সট্‌ক্লিফ (Sutcliffe) সাহেব একজন ইংরেজের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন; লেথব্রিজ আমার জন্য জিদ করিয়া বসিলেন; উড্রো সাহেবেরও ঝোঁক আমার দিকে। তিনি আমাকে বলিলেন—What is Lal Behari De's qualifications? He has written one book; you could write twenty books. লর্ড ইউলিক ব্রাউন (Lord Ulick Brown) তখন মুসুরি পাহাড়ে ছিলেন; পূর্বে মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে অনেকবার তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করিয়াছি। তিনি আমাকে লিখিলেন 'শুনিলাম তুমি কলেজে প্রিন্সিপ্যালের কাজ করিতেছ। তোমার বেতন বৃদ্ধি হইল কি? উত্তরে আমি লিখিলাম, 'উক্ত পদে আমি ছয়মাসের জন্য অস্থায়ী ভাবে কাজ করিতেছি, বেতন বৃদ্ধি হয় নাই; কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজে একটা পদ খালি হইয়াছে, সেটার জন্য আপনি বোধ হয় কিছু চেষ্টা করিতে

৫৯. "যোগেশ কাব্য" গ্রন্থের কবি নন, পৃথক ব্যক্তি। দ্র পুরাতন প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় পর্যায়, পৃ ২৬

৬০. অধ্যক্ষ জ্যাকরায়া (Zachariah) কর্তৃক লিখিত *History of the Hooghly College* গ্রন্থে উদ্‌ধৃত। দুঃখের বিষয় লালবিহারী হুগলী মহসীন কলেজে দীর্ঘদিন কাজ করলেও তাঁর সম্পর্কিত কোনো কাগজপত্র সেখানে পাওয়া যায় নি। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার মজুমদার মহাশয় আমার পত্র পেয়ে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে সফলকাম হন নি বলে জানিয়েছেন।

পারেন।' তিনি একেবারে স্যর রিচার্ড টেম্পলকে আমার জন্য লিখিলেন। আমার বেতন বৃদ্ধি হইল; কিন্তু আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে গেলাম না। লালবিহারী ও মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন হটিয়া গেলেন। ন্যায়রত্নের জন্য কয়েকটি সাহেব চেষ্টা করিয়াছিলেন।'[৬১] প্যারীচরণ সরকার মহাশয় ১৮৭৫ সালে দেহত্যাগ করেন। কাজেই লালবিহারী সাময়িক ভাবে পরাস্ত হলেও অনতিবিলম্বে তাঁরও পদোন্নতি হল।

লালবিহারী হুগলী কলেজে মোট ষোল বছর অধ্যাপনা করে অবসর গ্রহণ করেন। ইংরাজি সাহিত্য ও পাশ্চাত্যদর্শনের অধ্যাপনায় তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি চাকরি জীবনে পর পর দুইবার তাঁর কার্যকালবৃদ্ধির (Extension) আদেশ পান। তিনি ১৮৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসের পর অবসর গ্রহণ করেন।

৯

বেঙ্গল ম্যাগাজিন পত্রিকা সম্পাদনা লালবিহারীর বিশিষ্ট কীর্তি। এ অনুমান অসঙ্গত নয় যে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন পত্রিকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন। বঙ্গদর্শন ১৮৭২ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত হয় আর *Bengal Magazine* প্রথম বার হয় ঐ বছরের অগস্টে। বঙ্কিমচন্দ্র ও লালবিহারী উভয়েই ১৮৭০-৭১এ বহরমপুরে ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও লালবিহারীতে রেষারেষি ছিল বলে মনে হয়। গৌরহরি সেন লিখেছেন, "লালবিহারী দে এই সময় বহরমপুর কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। Grant Hall Club নামক নব প্রতিষ্ঠিত সভার তিনি সম্পাদক ও প্রধান কর্মী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র উহার সহকারী সভাপতি এবং তৎকালীন সবজজ দিগম্বর বিশ্বাস উহার সভাপতি ছিলেন। ...দিগম্বর বিশ্বাস বদলি হইয়া গেলে স্যর গুরুদাস প্রস্তাব করেন যে সহকারী সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্থলে সভাপতি হউন। ইহাতে লালবিহারী অত্যন্ত বিরক্ত হন। তাঁহার ধারণা ছিল যে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষা ঢের ভাল ইংরাজী জানেন এবং প্রেসিডেণ্ট পদে তাঁহার পূর্ণ মাত্রায় অধিকার। ...ইহার পরে লালবিহারী ক্লাবে আসা বন্ধ করিলে উহা উঠিয়া যায়।"[৬২]

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন প্রকাশের পর *Bengal Magazine* প্রকাশ হয়ত তারই অন্যতম কারণ। বেঙ্গল ম্যাগাজিনের ঘোষণাপত্রে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছিল যে এই

৬১. পুরাতন প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় পর্যায় পৃ. ৩০-৩১। ১৮৭৬ সালের ১লা জানুয়ারি মহেশচন্দ্রের পদোন্নতি হয়। দ্র, শ্রীযুক্ত গোপিকামোহন ভট্টাচার্য কর্তৃক সংকলিত 'সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৬২) পৃ. ৪১।

৬২. গৌরহরি সেন, 'স্যর গুরুদাসের 'জীবনস্মৃতি', মানসী ১৯২০। মন্মথনাথ ঘোষ রচিত 'সেকালের লোক' গ্রন্থে 'আচার্য লালবিহারী দে' প্রবন্ধ উদ্‌ধৃত।

মাসিক পত্রিকায় হাল্‌কা ধরণের কিছু লেখা থাকলেও মূলতঃ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে প্রবন্ধাদি মুদ্রিত হবে এবং দেশের শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ গোষ্ঠীর উপযুক্ত হবে।[৬৩] যাঁরা প্রবন্ধাদি রচনা করে পত্রিকাখানিকে সাহায্য করবেন বলে জানিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রকুমার দে, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, ব্রজেন্দ্রকুমার শীল, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দীননাথ আঢ্য, উমেশচন্দ্র দত্ত, গৌরদাস বসাক, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কিশোরী চাঁদ মিত্র, রামবাগানের দত্ত পরিবারের এইচ, সি. দত্ত এবং ও, পি. দত্ত প্রভৃতি ছিলেন। পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ছিল ছয় টাকা। ১৮৭২ সালের জানুয়ারিতে লালবিহারী হুগলী কলেজে আসেন এবং পরে সেখান থেকে পত্রিকা চালাতে থাকেন।

রাজনৈতিক দিক থেকে দেখা যায় লালবিহারী ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সমর্থন করেন নি,[৬৪] সিপাহী বিদ্রোহের নিন্দা করেছেন। কিন্তু তাই বলে দেশীয় সংবাদ পত্রগুলির বিরুদ্ধে সরকারী নিষেধাজ্ঞাকে মেনে নেন নি, প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আই. সি. এস. দের অতিরিক্ত উচ্চ বেতন দান তিনি অন্যায় বলেছেন, পি. ডব্লিউ. ডি. বিভাগকে আখ্যা দিয়েছেন Public Waste Department অর্থাৎ 'সাধারণের অর্থ অপচয় বিভাগ'। দেশের ব্যাবহারিক উন্নতি বা 'Material Progress'এর প্রশস্তি তিনি মানেন নি বরং লিখেছেন—What do you find on the other side? A Nation sinking in debt: the peasantry population groaning under the load of taxation।"[৬৫] বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশীয় কৃষক' প্রবন্ধে একই সুর শোনা যায়।

এই বেঙ্গল ম্যাগাজিনে রমেশচন্দ্র দত্তের বহু স্মরণীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। রমেশচন্দ্র কৃষকসমাজের কথা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন "The Past and Future of Bengal" (Jan. 1873), "Indian Finance" (Feb. 1873) "Administration of Justice in Bengal" (June 1873), "The Bengal Zamindar and Ryot" (Aug. 1873) প্রবন্ধগুলিতে।

৬৩. No pains will be spared to make the Magazine worthy of the best educated and most advanced section of the Bengali community'—Prospectus, Aug, 1872.

৬৪. তিনি দাদাভাই নৌরজীর রাজনৈতিক মতের বিরুদ্ধে লিখেছেন—December 1881.

৬৫. "State of the Empire", Aug. 1872.

রমেশচন্দ্র দত্ত সম্পর্কে একটি মূল্যবান প্রবন্ধে ডক্টর ভবতোষ দত্ত মহাশয় লিখেছেন—

"পাবনা জেলার ১৮৭৩ এর দাঙ্গাহাঙ্গামার মূলে ছিল নাটোর জমিদারিতে খাজনা বৃদ্ধি; এই হাঙ্গামার ফল এতদূর গিয়েছিল যে নূতন আইন প্রণয়ন করতে হয়েছিল। রমেশচন্দ্রের ইতিহাসে এ সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায় না, যদিও এই গোলমালের মাত্র চোদ্দ বছর পরে ১৮৮৭ তে তিনি পাবনার কালেক্টর হয়েছিলেন।"[৬৬]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, রমেশচন্দ্র পাবনার প্রজা-বিদ্রোহের অল্পকাল পরে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন "An Apology for the Pubna Rioteers"[৬৭] 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' কৃষকদের পক্ষে চিরদিনই দাঁড়িয়েছে। এই পত্রিকায় প্রকাশিত 'The Bengal Peasant' (প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৮৮০) খুব উল্লেখযোগ্য রচনা। রচয়িতার নামের স্থলে পাওয়া যায়—'A distinguished member of the Subordinate Judicial Service'। এই সূত্রে কেশবচন্দ্র সেনের সম্পাদিত সুলভ সমাচার পত্রিকায় কৃষকদের দুরবস্থা নিয়ে যে মন্তব্য করা হয়েছিল তার উল্লেখ অসংগত হবে না। কেশবচন্দ্র লিখেছেন—

"চাষারা দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়া যে সকল ফলশস্য প্রস্তুত করে তাহা লইয়া বড় মানুষ ভদ্রলোকে কত সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু কি দুঃখের বিষয় যাহারা এত খেটে মরে, তাহাদের দুঃখ ঘোচে না। তাহাদেরই হাতের জিনিস লইয়া অন্য লোকে সুখী হয়, কিন্তু তাহাদের নিজের পরিবার, পুত্রকন্যাগণ খাইতে পরিতে পায় না।

"কৃষিকর্মে যাহা কিছু জন্মে তাহা জমিদার এবং মফঃস্বলের কর্ম্মচারীগণ নানাপ্রকার দাওয়া করিয়া হাত করিয়া লয়। নির্দ্দোষী পল্লীগ্রামবাসী চাষা কিছুই জানে না, কেবল ভূতের মত সারাদিন পরিশ্রম করিয়াই মরে। জলে, বানে, বিশেষতঃ রৌদ্রে কত কষ্ট পেয়ে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেছে, তাহা পাঁচ জনে লুটিয়া খাইতেছে। বড় লোকদিগের দৌরাত্ম ও অত্যাচার ভয়ে সর্বদা কম্পমান। পুলিশ থানার আমলারাও অনিষ্ট করিতে পারিলে ছাড়েন না। দরিদ্রদের প্রতি গবর্ণমেণ্টের তত অনুরাগ নাই।"[৬৮]

---

৬৬. "রমেশচন্দ্র দত্ত ও ভারতবর্ষের আর্থিক ইতিহাস", বিশ্বভারতী পত্রিকা, একাদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, পৃ. ২০৩। দ্র, রমেশচন্দ্রের *The Peasantry of Bengal* being a view of their condition under the Hindu, the Mohamedan and the English Rule and a consideration of the means calculated to improve their future prospect. 1874.

৬৭. *Bengal Magazine*, Jan. 1874.

৬৮. "প্রজাদিগের দুরবস্থা", সুলভ সমাচার ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা ১২৭৭, ৮ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার।

পুনরায় লিখেছেন—

"হে রাজা, হে জমিদার! মনে করিয়া দেখ অসহায় প্রজাকে মেরে কেটে টাকা আদায় করিয়া লইলে ইহার হিসাব একদিন দিতে হবে না?···কেবল কত টাকা মুনাফা হইল তারই দিকে চাহিয়া থাকিও না। প্রজার দুঃখের দুঃখী, সুখের সুখী হও। তাহাদের ভালবাসিতে শিক্ষা কর।"[৬৯]

প্যারীচাঁদ, কিশোরীচাঁদ, কেশবচন্দ্র, লালবিহারী, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র সকলেই কৃষকদের কথা ভেবেছেন, তাদের উন্নতি কিসে হয় সে-সম্পর্কে নানা পন্থা নির্দেশ করেছেন। লালবিহারী মনে করতেন ব্যাপক জনশিক্ষা দ্বারা কৃষকদের দুর্দশার প্রতিকার সম্ভব। সেজন্য তিনি 'শিক্ষা সেসের' (Education cess) বিরোধিতা করেন নি। সরকারের প্রবর্তিত শিক্ষা সেসের বিরোধিতা করেছিলেন বঙ্গীয় জমিদারসভার সদস্যেরা, রমানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ। লালবিহারী তাঁর "Primary Education in Bengal" প্রবন্ধে[৭০] ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (বঙ্গীয় জমিদার শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান) লরেন্স প্রস্তাবিত জনশিক্ষার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে দেয় 'সেস' বা 'কর' ধার্যের বিরোধী ছিলেন। জমিদারগোষ্ঠীর যুক্তিগুলিকে লালবিহারী নিপুণভাবে খণ্ডন করেছেন। একজন সদস্য মন্তব্য করেন যে উচ্চবর্ণের অনেকেই যখন ইংরেজি শিক্ষা প্রাপ্ত নন, তখন জনসাধারণকে (প্রধানত নিম্নবর্ণের) শিক্ষিত করে তুলবার প্রয়োজন কি? লালবিহারী জবাবে বলেছেন তিনি সমগ্র জনসাধারণকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা হোক এ কথা বলেন না, তাদের মাতৃভাষায় সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হোক এইটুকু তাঁর প্রার্থনা। তিনি তাই বলেন—"it must be the wish of every patriotic native of Bengal and it is the resolution of a paternal government that the mass of the people shall be educated". অপর একজন সদস্য বলেন, গ্রামের চাষী ও জনসাধারণ লেখাপড়া শিখতে চায় না। লালবিহারী এই মত মেনে নিতে অস্বীকৃত হয়েছেন। তিনি বলেন বরঞ্চ তাদের লেখাপড়া শেখানো হয় নি, তার ফলে তারা 'বোবা পশুর মত' জীবন যাপন করেছে।[৭১] লালবিহারী 'অশিক্ষা'কে সবচেয়ে মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি রূপে নির্দেশ করে লিখেছেন: 'I demand in the name of the peasantry that

৬৯. 'প্রজা পীড়ন', সুলভ সমাচার, ১২৭৭, ১৫ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার।

৭০. বেথুন সোসাইটিতে প্রদত্ত বক্তৃতা, ১০ ডিসেম্বর ১৮৬৮। পরে বক্তৃতাটি পুস্তিকা রূপে প্রকাশিত হয়। বেথুনের মৃত্যুর (১৮৫১) পর এই সভা স্থাপিত হয়। ডাঃ, মৌআট এই সভা স্থাপনের প্রস্তাব করেন।

৭১. এই সূত্রে অ্যাডামস্ কৃত 'দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদান' (Vernacular Education) সম্পর্কে রিপোর্টে (১৮৩৫, '৩৬ ও '৩৮) রেভারেণ্ড লঙ্ রচিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

a dispensary of useful instruction be forth with established within the easy reach of every village and hamlet in Bengal? লালবিহারী জনশিক্ষার জন্য ধার্য শিক্ষা-সেস সম্পূর্ণ সমর্থন করেছেন এবং স্পষ্ট ভাবে এ কথা জানিয়েছেন যে এই শিক্ষার উদ্দেশ্য এই নয় যে প্রজা সাধারণকে দ্রুত "শিক্ষিত ভদ্রলোক" করে তোলা হবে। তাঁর মতে এদের শেখানো হবে মোটামুটি ভাবে গণিত, কৃষিশিক্ষা, সাধারণ অর্থনীতি ও নীতিশিক্ষা। সেই সঙ্গে হিসাবের খাতাপত্র লেখা শিক্ষা, সামান্য ভূগোলের জ্ঞান এবং ব্যায়াম শিখতে হবে। তিনি অবশ্য এই আশা করেছিলেন যে একদিন এই 'বাংলা বিদ্যালয়গুলি'থেকে কৃতী ছাত্রের আবির্ভাব হবে। কিশোরীচাঁদ মিত্র যুক্তি দেন, উচ্চবর্গের লোকদের শিক্ষিত করা দরকার, তাহলে ধীরে ধীরে নিম্নবর্গের জনগণ উপকৃত হবে। এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গীকে বলা হয় 'filtration theory' অর্থাৎ উপর থেকে নিচে শিক্ষা চুঁইয়ে পড়বে। লালবিহারী এই যুক্তির প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও ঐ নীতির বিরোধী ছিলেন। ঠিক এই যুক্তি দেখিয়ে Council of Education (১৮৪২-৫৫) অ্যাডামের মাতৃভাষায় জনশিক্ষাদানের পরিকল্পনাকে বানচাল করেন। একদা লর্ড ক্যানিংও তাঁর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে 'downward filtration of education' অর্থাৎ শিক্ষার ক্ষেত্রে উপর থেকে নীচে চুঁইয়ে পড়া নীতির সমর্থন করেছিলেন। লালবিহারী শেষে দেখিয়েছেন যে, দেশে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা শোচনীয়, স্ত্রীশিক্ষা অবহেলিত, এবং শিক্ষা-খাতে ব্যয় অত্যন্ত কম। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন যে, একমাত্র বাংলার পুলিশ-বাহিনী পুষতেই ৬০ লক্ষ টাকা খরচ হয় অথচ শিক্ষা প্রসারের জন্য টাকার দাবি করলেই যত প্রতিবাদ ওঠে। তিনি এমন কি লবণের দাম বাড়িয়ে শিক্ষা-খাতে টাকা তুলতে পরামর্শ দিয়েছেন। দেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণকামী ছিলেন তিনি, এই শিক্ষাদর্শ তাঁর দেশপ্রেমিক মনেরই পরিচয়বাহী।[১২]

বেথুন সোসাইটির কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় লালবিহারী 'Vernacular Education in Bengal' এবং 'English Education in Bengal' নামে দুটি প্রবন্ধ সমিতির সভায় পাঠ করেছিলেন ১৮৫৯-এর পূর্বে।[১৩]

লালবিহারীর নিশ্চিত ধারণা ছিল একমাত্র জনশিক্ষার মধ্য দিয়ে জনগণের দুর্দশার প্রতিকার হবে—"The true way to improve the condition of the

১২. "Doubtless from there national primary vernacular school, a peasant's, boy will sometime through the force of intellect, rise to the English Schools and Colleges and with honours in the University."

১৩. বেথুন সোসাইটি গ্রন্থ : শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল।

people is to educate them, but for the education of the mass of the people and especially the peasantry there is no provition ।" [৭৪]

তিনি শিক্ষাকে আবশ্যিক করবার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন তাঁর "Compulsory Education in Bengal" (1869) প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভার (Bengal Social Science Association, ১৮৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত) এক অধিবেশনে পঠিত হয়।

'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' পত্রিকায় খ্যাতনামা লেখকদের বহু উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ, কবিতা, সমালোচন প্রকাশিত হয়েছে। এখানে সে-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে। লালবিহারী তাঁর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাবিষয়ক ও সাহিত্যবিষয়ক মতামত নানা প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের সমালোচনায় লালবিহারী বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক আখ্যাত করেন এবং তাঁকে স্কটের অনুরাগী ভক্ত বলে অভিহিত করেন। বিষবৃক্ষ উপন্যাসের গুণ স্বীকার করেও তিনি চারিটি ত্রুটির উল্লেখ করেন, (ক) কুন্দের পিতার নিঃসঙ্গ মৃত্যু এবং সূর্যমুখীর আকস্মিক প্রত্যাবর্তন—অবিশ্বাস্য ও অসংগতিপূর্ণ ('improbable and inconsistent'); (খ) নগেন্দ্রনাথের চরিত্রে ও কার্যক্রমে অসামঞ্জস্য; (গ) দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ব্রাহ্মসমাজকে অন্যায় কটাক্ষ; (ঘ) কুন্দের প্রতি poetical justice বা শিল্পীর ন্যায়-বিচার করা হয় নি। তাঁর মতে নগেন্দ্রনাথের আত্মহত্যা অনেক স্বাভাবিক হত। হীরা ও কমলমণি চরিত্র-চিত্রণ লালবিহারী কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে।[৭৫]

বঙ্কিমচন্দ্র এই সমালোচনা পড়ে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

১০

বাল্যকাল থেকে খৃস্টান মিশনারীদের কাছে মানুষ হয়েছিলেন বলে লালবিহারীর মন স্বভাবতঃই খৃস্টধর্মের দিকে ঝুঁকেছিল। ১৮৪৩ সালের জুলাই মাসে তিনি খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হন। তার একবছর আগে ১৮৪২ সালে তিনি "Falsity of The Hindu Religion" বা "হিন্দুধর্মের অসত্যতা" সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখে পুরস্কার পান। তখন তাঁর বয়স আঠারো। হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর বিরাগ তিনি নানা ক্ষেত্রে প্রকাশ করেছেন। ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে তিনি তাঁর 'জার্নালে' লিখেছেন যে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি সাময়িক ভাবে আকৃষ্ট

৭৪. *Bengal Magazine*, Aug. 1872.

৭৫. 'The novels which he has written more nearly resemble English novels than anything we have seen in the Bengali language. He is doubtless a devout worshipper of Scott.' January 1874,

হয়েছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ধর্মাদর্শ ও সাধনায় তিনি তৃপ্ত হন নি। তিনি লিখেছেন— পৌত্তলিকতার বিরোধিতা, স্ত্রীস্বাধীনতা ও সামাজিক সংস্কার এবং শিক্ষিত সমাজে ধর্ম সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি— এই তিনটি ব্রাহ্মসমাজের যথার্থ মূল্যবান কাজ। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে তিনি প্রতিকূল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মতে ব্রাহ্মধর্ম মানুষের চিত্তে চিরশান্তি, চির-আনন্দ দানে অক্ষম। সেই শান্তি ও আনন্দ একমাত্র খৃস্টধর্মই দিতে পারে।[৭৬]

লালবিহারীর সঙ্গে সংঘাত বেধেছিল কেশবচন্দ্রের। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা (১৮৬১) ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র। সেজন্য খৃস্টান সমাজ ১৮৬১ সালে 'ইণ্ডিয়ান রিফর্মার' নামে প্রতিবাদী কাগজ বার করেন। লালবিহারী এই কাগজের সম্পাদনা করেন। ১৮৬১ সালের মে মাসে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণনগরে রেভারেণ্ড ডাইসনের বিতর্ক হয়। কেশবচন্দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে এ-সম্পর্কে লেখেন যে, 'প্রায়শ্চিত্ত ও যুক্তি' বিষয়ে বক্তৃতার পর ডাইসন সাহেব তাঁর মত খণ্ডন করবার চেষ্টা করে বিফল হন। তিনি লিখেছেন— "ডাইসন সাহেব ব্রাহ্মধর্মের আপ্তবাক্য ও প্রয়শ্চিত্ত বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন, তাহার বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। শুনিলাম সংগ্রামের জন্য হামিল্টনের লেকচর এবং অন্যান্য লক্ষ্যতর্ক বিবাদ নহে; [৭৭] ডাইসন্-উত্থাপিত সহজজ্ঞানের (Intuition) বিরোধী প্রশ্ন সম্পর্কে কেশবচন্দ্র সুন্দর উত্তর দিয়েছিলেন। কিন্তু গোলমাল মিটবার কথা নয়। লালবিহারী জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইন্স্টিট্যুশনে Brahmic Intuition অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্মের 'সহজজ্ঞান' সম্পর্কে লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন যে সহজ প্রত্যক্ষজ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরের প্রকৃত জ্ঞান হয় না এবং ব্রাহ্মধর্মের প্রায়শ্চিত্ত মত অসংলগ্ন ও অনিষ্টকর। কেননা পাপ ও পাপী সম্পর্কে খৃস্টানধর্ম যে মত পোষণ করেন ব্রাহ্মধর্ম ও প্রার্থনায় সেই পরিচয় নেই।[৭৮] কেশবচন্দ্র এই বক্তৃতার প্রতিবাদে 'The Brahmo Samaj Vindicated' বক্তৃতা দেন (২৮শে এপ্রিল ১৮৬৩)। ব্রাহ্মমত ও খৃস্টমত রামমোহন রায়ের সময় থেকেই পরস্পর প্রতিযোগী রূপে দাঁড়িয়ে যায়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর খৃস্টধর্মের বিরোধী ছিলেন এবং কেশবচন্দ্র সেনের খৃস্টপ্রীতি, বাইবেল পাঠ, পাপবোধ ও অনুতাপনীতি, প্রত্যাদেশ প্রভৃতি তাঁর মত ও পথের বিরোধী ছিল। প্রকৃতপক্ষে সেজন্যই তাঁর ও কেশবচন্দ্র সেনের মধ্যে

৭৬. 'That it is incapable of giving everlasting happiness to its votaries and that therefore as a system of religion it is of no use'—'জার্নাল' থেকে উৎকলিত, ম্যাকফারসনের গ্রন্থে (পৃ. ৮৮) উদ্ধৃত।

৭৭. কেশবচন্দ্র সেনের পত্র, ১২ই মে ১৮৬১।

৭৮. 'Brahmaism represent God as a being incapable of being displeased with a sinner'— L. B. Dey, "Brahmo Theory of Atonement."

বিরোধের মূলসূত্র এখানেই নিহিত। অন্যদিকে কেশবচন্দ্র সেদিন খৃস্টকে তাঁর ধর্মমতে গ্রহণ করেই খৃস্টান সমাজের ক্রমপ্রসারকে রোধ করেছিলেন। বাঙালী তরুণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ সেদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজের পরিবর্তে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বের অধিক অনুরাগী হয়েছিলেন। ১৮৬৬ সাল থেকে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের প্রকৃত বিচ্ছেদ ঘটে।

লালবিহারী খৃস্টধর্মের ব্যাখ্যাত পাপবোধ, অনুতাপ ও ঈশ্বরকরুণালাভ ব্রাহ্মধর্মে দেখতে পান নি বলে অভিযোগ করেছেন। কিন্তু তাঁর এই অভিযোগ ঠিক নয় কেননা কেশবচন্দ্র সেনই ব্রাহ্মসমাজে এই পাপতত্ত্ব ও ঈশ্বরকরুণা আনয়ন করেন। ১৮৬৭ সালে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ 'Regenerating Faith' সম্বন্ধে তিনি লেখেন—"বিশ্বাস পবিত্র হৃদয়ের পুরস্কার নহে, ইটি প্রথম সোপান, যাহার মধ্য দিয়া ঘোর পতিত পাপিগণ পরিত্রাতা ঈশ্বরের নিকটবর্তী হইতে পারে এবং আর সকল উপায় যখন অকর্মণ্য হইয়া যায় তখন উহা শেষ অবলম্বন। দ্বিতীয়তঃ পাপী সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিবে এবং তাঁহার পরিত্রাণ প্রদ কৃপার জন্য প্রার্থনা করিবে; কেননা কৃপার সহায়তা বিনা মনুষ্যের যত্নে কোন ফলোদয় নাই।"[৭৯] কাজেই লালবিহারীর যুক্তি দৃঢ়মূল নয়।

লালবিহারী কেশবচন্দ্র-চালিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের তথা নববিধান সমাজের বিরুদ্ধে লেখনীচালনা করেছিলেন। তিনি বলেন, কেশবচন্দ্রের ধর্মসাধনা প্রকৃতপক্ষে খৃস্টধর্ম ও চৈতন্যধর্মের মিশ্রণ মাত্র।

"They have borrowed the types of doctrine elaborated by their European masters wholesale, that is phraseology and all; and they have borrowed some forms of derotion form the Vaisnava wholesale, that is nomenclature and all. Their 'Samkirtan' is a feeble imitation of the Vaisnava 'Samkirtan' and their 'mahotsabas' are but miserable apologies for those of their Vaisnsva teachers.'[৮০]

লালবিহারীর এই মন্তব্য অযৌক্তিক নয়। তবে লালবিহারী ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র ও সাধনার মর্মজ্ঞ ছিলেন না। তিনি খৃস্টধর্মতত্ত্ব ও পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কিন্তু উপনিষদ ভগবদ্গীতা ভাগবত প্রভৃতির নিহিতার্থ তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি, সে শক্তি তাঁর ছিল না মনও ছিল না। তা ছাড়া যুক্তিবাদ দিয়ে ব্রহ্মতত্ত্ব জীবতত্ত্ব প্রভৃতি বিচার করতে গেছেন এবং খানিকটা রঙ্গরস করেছেন বলা যায়।[৮১] কিন্তু অন্যদিকে

৭৯. উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, 'আচার্য কেশবচন্দ্র, শতবার্ষিকী সং, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৭৯। অনূদিত।

৮০. "Religion of Brahmo Samaj", *Bengal Magazine*, Aug. 1878.

৮১. কেশবচন্দ্র অন্নব্রহ্ম বলায় লালবিহারী তাঁই নিয়ে ঠাট্টা করে লেখেন "Rice

যাঁরা পাশ্চাত্যে যুক্তিবাদের সাহায্যে খৃস্টতত্ত্বকে দেখেছেন, তাদের তিনি নিন্দা করেছেন। সেজন্য তিনি কোম্‌তের বিরোধী। তিনি শিক্ষিত হিন্দুদের খৃষ্টধর্মের প্রতি অনুরক্ত করে তুলবার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করেছেন। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে সম্প্রতি একখানি পুস্তিকা হস্তগত হয়েছে তার নাম *On Vedantism*। প্রকাশিত হয়েছিল মাদ্রাজের The Christian Literature Society দ্বারা লালবিহারীর মৃত্যুর পরবৎসর ১৮৯৫ সালে। ঐ 'society' এই ধরণের বহু পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই পর্যায়ের নাম 'Papers for Thoughtful Hindus'। লালবিহারীর পুস্তকটির নবম সংখ্যক। এই পর্যায়ে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের *The relation of Christianity with Hindus* নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। লালবিহারীর পুস্তিকাটিতে on Brahma, on Creation, on Man, on Liberation, on the True Religion— এই পাঁচটি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। প্রস্তাবনায় লালবিহারী লিখেছেন যে বেদান্তমত যুক্তি দিয়ে সিদ্ধ কি না সেটি বিবেচনা করবার জন্যেই তিনি এই পুস্তিকাটি রচনা করেছেন।[৮২]

লালবিহারী 'নিরুপাধি', 'অবাঙ্‌মনসগোচর' 'অখণ্ড সচ্চিদানন্দ' ব্রহ্মস্বরূপকে, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' সূত্রকে, তার উপযুক্ত দার্শনিক গুরুত্ব দিয়ে বিচার করেন নি। তিনি ব্রহ্মতত্ত্বের মধ্যে শুধু অসংগতি ও অসামঞ্জস্য দেখেছেন। তাঁর বিচাররীতি বহুলাংশে দুর্বল, কোথাও বা হাস্যকর। যেমন তিনি 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' সূত্রের বিরোধিতা করে লিখেছেন "If you hold that 'all this universe is Brahma' then you must also hold that Brahma commits sin, that Brahma steals, speaks lies, for many men are guilty of those faults"। তিনি ব্রহ্মস্বরূপের মধ্যে প্রধান ত্রুটি দেখেছেন যে কোথাও বলা হয় নি যে ব্রহ্ম প্রেমস্বরূপ। তাঁর মতে—"If God be not merciful, if He be not Love where is the hope of the sinner? God's love for men is the root of our salvation. How infinitely superior in this respect are the Christian Scriptures. Listen to the following passage of the Bible: The Lord, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin."—Exodus, xxxiv 6-7। এইভাবে সৃষ্টিতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব,

is Holy, Rice is Divine, we shall next hear of the divinity of Dal" ইত্যাদি।
—*Bengal Magazine*, 1879.

৮২. "With a view to ascertain what vedantism is and whether it is consonant to reason, we purpose in the following pages to extract passages from the vaidantika writings and give expositions of them."

মোক্ষতত্ত্ব সবই তিনি বিচার করেছেন। তিনি উপনিষৎ, গীতা, আত্মবোধ প্রভৃতির সহিত পরিচয় সাধন করেছিলেন, তাদের তুলনায় খৃস্টধর্মশাস্ত্র উন্নত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ এইটি দেখাবার জন্য।[৮৩] এগুলির মধ্যে পাণ্ডিত্যের কোন পরিচয় নেই।

১১

শেষ জীবন লালবিহারীর সুখে অতিবাহিত হয় নি। ১৮৮৯ থেকে ১৮৯৪ এই পাঁচ বছর তাঁর জীবনের শোচনীয় পর্ব। মৃত্যুর পূর্বে ভুগেছিলেন পক্ষাঘাতে, চোখ দুটিও অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের দেশে মধুসূদন শেষজীবনে ব্যাধিতে, অর্থকষ্টে দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিলেন। হেমচন্দ্র অন্ধ হয়ে পরের অনুগ্রহে প্রাণধারণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে ত্রিপুরার মহারাজা তাঁকে মাসিক ৩০ টাকা অর্থসাহায্য করেন। লালবিহারী ও মধুসূদনের জন্ম ১৮২৪ সালে। দুজনের স্বদেশানুরাগ ও বিদ্যাচর্চা স্মরণীয়। হেমচন্দ্রের ন্যায় তিনিও অন্ধ হয়ে গেলেন। আর্থিক দুর্দশায় পড়লেন। তাঁর স্ত্রী বিলেতে ড. হিস্‌টিকে যে চিঠি[৮৪] লিখেছিলেন তার থেকে জানা যায় লালবিহারী দের বড় ছেলে বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়ে দেনায় ডুবে শেষে রোমান ক্যাথলিকদের সঙ্গে রয়ে যান আর দেশে ফেরেন নি বা তাঁর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। এই ছেলের পড়ার জন্য বারো হাজার টাকা খরচ করা হয়েছিল এই আশায়, যে, ছেলে ফিরে এসে তাঁদের দেখাশোনা করবে। কিন্তু ছেলের কোন খোঁজ না পেয়ে লালবিহারী একেবারে ভেঙে পড়েন। তবে এই রোগাক্রান্ত শরীর ও বেদনার্ত মন দিয়ে তিনি তাঁর ঈশ্বরের সমীপবর্তী হবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন। অন্ধ মিল্‌টনের মত খৃস্টপন্থী ধর্মশাস্ত্র শ্রবণ ও চিন্তার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের শেষ দুটি বছর কাটে। একদিন মেয়েদের কাছে ডেকে স্বর্গের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন : 'ওখানে আমরা সকলেই একসঙ্গে মিলতে পারব।' তার পর ১৮৯৪ সালে (বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানবর্ষে) ২৮শে অক্টোবর তিনি পৃথিবীর সকল বন্ধন ছিন্ন করে চলে গেলেন তাঁর প্রার্থিত আনন্দলোকে। দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩) তাঁর উদ্দেশ্যে যে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন সে অর্ঘ্য সকল দেশবাসীর হৃদয়সঞ্জাত—

বিনোদ বাসনা লালবিহারী ধীমান্
সরল-স্বভাব ধীর গভীর বিজ্ঞান,

৮৩. যেমন সৃষ্টিতত্ত্বের বেলায় মুণ্ডকোপনিষৎ, শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ প্রভৃতি আলোচনার শেষে তিনি লিখলেন—"The real account of the creation, as given in the only true Sastra, the Bible as follows" ইত্যাদি।

৮৪. Letter of Mrs. B. Day to Dr. Hastie (Jan 12, 1895). ম্যাকফারসনের গ্রন্থে উদ্‌ধৃত।

অবাধে লেখনী চলে, ভাষা মনোহর
মধুর বচনে তুষ্ট মানবনিকর
খৃষ্টধর্ম অবলম্বী ধর্ম সুধাপান
অভিলাষী দিবানিশি দেশের কল্যাণ।'[৮৫]

সং যো জ ন

১

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে সম্পর্কে স্বর্গত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর মহাশয় তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—

"হুগলী কলেজের সুবিখ্যাত ও সুপণ্ডিত অধ্যাপক লালবিহারী দে মহাশয় ১৮৭৩ [বস্তুতঃ ১৮৭২] খৃষ্টাব্দে একখানি ইংরাজি মাসিক পত্র বাহির করিয়াছিলেন। ইহার নাম Bengal magazine। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে আমি যখন উত্তরপাড়া গভর্নমেণ্ট স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি তখন আমি এই কাগজখানির গ্রাহক হইয়াছিলাম। তখন Folk Tales of Bengal নামক একটি প্রবন্ধ দে-সাহেব মহাশয় ধারাবাহিক রূপে এই কাগজে লিখিতেন। তাঁহার এই গল্পগুলি অতি মধুর লাগিত। মধুর লাগিত বলিয়া আমি উক্ত মাসিক কাগজখানির গ্রাহক হইয়াছিলাম। হুগলী স্টেশনের নিকটে জীবন পালের বাগানে তিনি একখানি সুন্দর বাড়ি করিয়া থাকিতেন। হুগলীর একটি আত্মীয় লোকের বাটিতে মধ্যে মধ্যে আমাকে যাইতে হইত। সেই সূত্রে আমি দে সাহেবের সহিত দেখা করিতে যাইতাম। তিনি ক্রিশ্চান হইলেও হিন্দু ছাত্রদিগকে অত্যন্ত ভালোবাসিতেন। আমি বিশেষ ভাগ্যবান যে তাঁহার মত বিজ্ঞ, বিদ্বান লোকের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইতে পারিয়াছিলাম। একদিন তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। কিয়ৎকাল কথা বলিবার পর তিনি আমাকে বলিলেন, "Master De, do you wish to see my staircase"—তুমি কি আমার সিঁড়ি দেখিতে চাও? তাঁহার কথার মর্ম বুঝিতে না পারিয়া আমি একটু অবাক হইয়া রহিলাম। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে ডাকিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'Make a staircase'। মেমসাহেব তাঁহার অনেকগুলি পুত্র ও কন্যাকে মাথার উচ্চতা অনুসারে একটির পর একটিকে দাঁড় করাইয়া দিলেন। দেখিতে ঠিক সিঁড়ির মত হইল। তখন দে-সাহেব আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন 'See my staircase'—আমার সিঁড়ি দেখ। আমি ঐ দৃশ্য দেখিয়া আনন্দিত হইয়া হাসিতে লাগিলাম। কয়েকবৎসর চলিয়া গেল। দশ বৎসর বাহির

৮৫. সুরধুনী কাব্য, (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ সংস্করণ) দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ১৫৩।

হইবার পর বোধকরি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কাগজখানি বন্ধ হইয়া যায়। আমি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম শ্রেণীতে পড়ি তখন একদিন হরীতকী বাগান নিবাসী ৺কানাইলাল মুখোপাধ্যায় এম. এ. বি. এল. মহাশয়ের সহিত কোনও কার্যোপলক্ষে দেখা করিতে যাই।

"ইনি তৎকালে লালবাজার পুলিশের সর্বশ্রেষ্ঠ উকিল ছিলেন। ইতি সুপণ্ডিত ও সুলেখক ছিলেন। তিনি বহুদিন ধরিয়া দে সাহেবের 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' "Hindu family" নামক ইংরাজী প্রবন্ধ ধারাবাহিক রূপে লিখিতেন। এতদ্‌ভিন্ন ডারউইন সাহেবের মতের বিরুদ্ধে তিনি একটি প্রবন্ধ লিখিয়া 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' বাহির করিয়া ঐ কাগজখানি তিনি বিখ্যাত ডারউইন সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তৎকালে মহাত্মা ডারউইন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সহিত Isle of Wight নামক স্থানে বাস করিতেন। কবিবর টেনিসন ও ডারউইন সাহেবও তাঁহার সহিত বেড়াইতে গিয়াছিলেন। কথায় কথায় কানাইবাবু লালবিহারী দের কথা তুলিয়া বলিলেন—'তাঁহার মত ইংরাজি লেখক আর নাই'—আমি বলিলাম—'আপনিও সুন্দর ইংরাজি লেখেন।' তখন তিনি বলিলেন—"লালবিহারী দে কে, আর আমি কে!" ঢালা বিছানায় বসিয়া ও সম্মুখে একটি বাক্‌স রাখিয়া তিনি ইহার উপর লেখাপড়া করিতেন। বাক্‌সটি খুলিয়া হাসিতে হাসিতে একখানি পত্র বাহির করিয়া আমাকে ইহা পড়িতে দিলেন। দেখিলাম ডারউইন এই পত্রখানি Isle of Wight থেকে লিখিয়াছেন। পত্রখানির ভাবার্থ এইরূপ—'মিস্টার মুখার্জি আপনার পত্রখানি পাইলাম। ইহার আদ্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া দেখিলাম আপনার প্রবন্ধে আপনি অনেক সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। প্রবন্ধটি আপনার বুদ্ধিমত্তার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। তবে প্রাণ খুলিয়া বলিতেছি ইহা পাঠ করিয়াও আমার মত ও বিশ্বাস সম্পূর্ণ অটল রহিল। ইহার কিছুমাত্র পরিবর্তন হইল না। যে একখণ্ড বেঙ্গল ম্যাগাজিন পাঠাইয়াছেন তাহা আদ্যন্ত পড়িলাম। ইহার সম্পাদক মিস্টার লালবিহারী দে অতি সুন্দর ইংরাজি লিখিতে পারেন। ম্যাগাজিনখানি বন্ধুবর টেনিসনকে দেখিতে দিলাম। তিনিও ইহা পড়িয়া মিস্টার দে-র ইংরাজি ভাষার অত্যন্ত প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

"এই ঘটনার ২।৩ বৎসর পরে একবার হুগলীতে দে-সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়া ডারউইন সাহেবের পত্রের কথা বলিলাম। তিনি শুনিয়া হাসিতে হাসিতে একখানি পত্র বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন। পত্রখানি টেনিসন সাহেব ম্যাকমিলান কোম্পানীকে মন্তব্যসহ পাঠাইয়াছিলেন। ম্যাকমিলান লালবিহারীকে পাঠান। ভাবার্থ এইরূপ মোটামুটি মনে আছে—"ম্যাকমিলান কোম্পানী আপনার *Govinda Samanta* ও *Folk Tales of Bengal* সম্পর্কে আমাকে opinion দিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। পুস্তক পড়িয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। ইহা পড়িয়া বাঙালী কৃষকগণের সামাজিক জীবন ও আচার-ব্যবহারের কথা জানিতে পারিলাম। আমাদের দেশে আজকাল যত

বড় বড় উপন্যাস লেখক আছেন, আপনি তাঁহাদের অনেকের অপেক্ষা সুন্দর প্রাঞ্জল ইংরাজী লিখিতে পারেন।"

— মাসিক বসুমতী, চৈত্র ১৩৬৬

২

পুণ্যশ্লোক প্যারীচাঁদ সরকার মহাশয়ের (১৮২৩-৭৫) তিরোধানের পর তাঁর একখানি জীবনচরিত রচনার কথা আলোচিত হয়। এ সম্পর্কে প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের জীবনচরিত রচয়িতা নবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় লিখেছেন—

"এক সময়ে সুপ্রথিতনামা সাহিত্যরথী ও অধ্যাপক লালবিহারী দে আগ্রহের সহিত স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকারের জীবনী লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ কোনও অপরিজ্ঞাত কারণে লালবিহারীবাবুর সঙ্কল্প কার্যে পরিণত হয় নাই। সে আজ সপ্তবিংশবর্ষের কথা—" (১৩০৯)।

এই প্রসঙ্গে ঐ জীবনচরিত গ্রন্থের পরিশিষ্টে লালবিহারী দে মহাশয়ের লিখিত দুখানি পত্র সংকলিত হয়েছে। এই পত্রদুখানি প্যারীচাঁদ সরকার মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ভুবনমোহন সরকার এল. এম এস. কে লিখিত।—

Chinsurah Nov, 17th
1875

My dear Sir,

I write simply to ask whether any one is writing or is intending to write a biography of your late lamented uncle Babu Peary Churun Sircar. I think as a typical educated Bengali and as one who has done so much good to his countrymen he deserves a biography; and I shall feel satisfied if a competent person intends undertaking the task. But if no one to your knowledge has any such intention I should like to undertake the task myself provided you kindly supply me with materials especially of a domestic nature. I do not think it would be difficult to get up a book of about 200 or more octavo pages; and I am sure, if well written it will be appreciated by all educated Bengali gentlemen. I knew you uncle when we were both boys and when I lived at Chorebagan, though I had little or no communication with him in after years. I think I could make his biography interesting to the public. If I write his life I shall with your assistance to get hold of the letter he wrote to his friends. A man's correspondence always makes a valuable part of a biography. I shall thank you for sending me an answer at your earliest convinience.

Yours faithfully,
Lal Behari Day.

Chinsurash Nov. 22
1875

My dear Sir,

Many thanks for your letter just received and for the help you promise to give me in the supply of materials. I should like to be in immediate communication with Babu Kalikrishna Mitter of Barasat to whom I shall thank you for communicating my wish to write a Life of your uncle. I hope he will agree to give me either the originals or copies of the letters in his possession for publication. He is also, I suppose the best person for giving me a full account of your uncle's career at Barasat. Does Kali Babu usally reside at Barasat? Kindiy send me his address.

I have seen the notice in the Banga Mahila. I have also looked up into the Education Reports containing your uncle's answers to questions in the Senior Scholarship Examination as well as his Essays. Those must be incorporated in to the Memoir.

I must go down to Calcutta early next month and see you and have a long chat with you and glean information. I must also see Kali Babu and if possible, visit Barasat the Scene of your uncle's labours for so many years that I may have a proper idea of the place. In the meantime, as I must immediately began to write the Life, I shall thank you for sending me replies to the questions I have put in the accompanying paper. I have many questions to ask ; please do not be displeased at these questions Kindly also get from your uncle's mother some anecdotes of his boyhood. I hope also you will kindly give me afterwards a copy of every book he wrote and an entire series of the periodicals he edited. These must be reviewed or at least noticed in "Life". Kindly tell me also to what other persons I should refer for information besides Kali Babu. Who were his most intimate friends when he was student in the Hindu College.

Yours faithfully,
Lal Behari Day.

পত্র দুখানি পড়লে বোঝা যাবে যে ইংরেজি সাহিত্যে আইজাক ওয়ালটন, ম্যাসন জনসন ও বসওয়েল জীবনী-রচনার ক্ষেত্রে যে রীতি গ্রহণ করেছেন লালবিহারী দে সেই ধারার পক্ষপাতী ছিলেন। পরিতাপের বিষয় যে লালবিহারী তাঁর সংকল্পকে কার্যে পরিণত করেন নি। কালীপ্রসন্ন দত্ত তাঁর 'বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনী' (১২৯৯) গ্রন্থের ভূমিকায় জানিয়েছেন যে, গর্ডেন, লালবিহারী দে এবং দীনবন্ধু সান্ন্যাল

দ্বারকানাথের জীবনী ইংরেজিতে লেখেন, কিন্তু লালবিহারী দে রচিত ঐ জীবনীগ্রন্থ আমার নজরে পড়ে নি।

৩

নবীনচন্দ্র সেন তাঁর আত্মজীবনীগ্রন্থ 'আমার জীবন'-এর প্রথম খণ্ডে লিখেছেন—

"কলিকাতায় আসিলাম। তখন মনস্বী রামমোহন রায়ের সদ্যপ্রসূত ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলনে কলিকাতা সহর বিধ্বস্ত। এই আন্দোলনের নেতা একদিকে কিশোর কেশবচন্দ্র, অন্যদিকে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী লালবেহারী। দুইজনের মধ্যে বক্তৃতায় কবির লড়াই আরম্ভ হইয়াছে।[৮৬] বাগ্মিতায় কেশবচন্দ্র এবং বিদ্রূপে লালবিহারী অদ্বিতীয়। পরম জ্ঞানী রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্মকে বেদউপনিষদমূলক প্রকৃত হিন্দুধর্ম বলিয়া সংস্থাপিত করেন, এবং তদ্দ্বারা খ্রীষ্টধর্মের তরঙ্গ অবরোধ করিয়া দেশরক্ষা করেন। 'পৌত্তলিকতা' পর্যন্ত তিনি নিম্ন অধিকারীর জন্যে প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করেন। ইতিমধ্যেই দেশের উজ্জ্বলরত্ন কয়েকটি খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছিলেন এবং স্বয়ং কেশবচন্দ্রও সেই আকর্ষণে পড়িয়াছিলেন। ক্ষণজন্মা রামমোহন রায়ের অভ্যুত্থান না হইলে আজ দেশ অর্ধেক খ্রীষ্টান হইয়া যাইত। কিন্তু জ্ঞানে, মানসিক প্রতিভায় এবং চিন্তাশীলতায় কেশবচন্দ্র রামমোহন রায়ের সমকক্ষ ছিলেন না। বিশেষতঃ তখনও তিনি ইংরাজের শিষ্যও তাঁহার অপরিণত বয়স। তিনি revelation অর্থাৎ ঈশ্বর প্রচারিত শাস্ত্র বিশ্বাস করেন না। বেদ-উপনিষদও revelation মনে করিয়া ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি হইতে তাহা ক্রমে ক্রমে সরাইয়া তাহার স্থানে intuition বা স্বতঃসিদ্ধ সংস্কার স্থাপন করিলেন। এই কেশবচন্দ্রই শেষে কুচবিহারী বিবাহের[৮৭] গরজে ঈশ্বর তাঁহাকে আদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া সেই revelation "আদেশবাদ" দ্বারা অত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।...

"যাহা হউক, কেবল মনুষ্যের বিবেকশক্তির উপর ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি স্থাপিত হইল তখন লালবেহারীর পোয়াবার। লালবেহারী শ্রোতৃবৃন্দকে হাসাইয়া বলিলেন—"যদি ব্রাহ্মধর্মটা কি, আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে আমি বলিব—যাহা কেশবচন্দ্র সেন বিবেচনা করেন। বিবেচনা ক্রিয়াপদ বর্তমান কালে সাধন করিলেই ব্রাহ্মধর্মটা কি, তাহা বুঝা যাইবে,—যাহা আমি বিবেচনা করি, যাহা তুমি বিবেচনা কর, যাহা তিনি বিবেচনা করেন তাহাই ব্রাহ্মধর্ম।" কথাটা ঠিক। কেশবচন্দ্রের বিবেচনাশক্তির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম গড়াইতে গড়াইতে আজ ৩।০ সমাজে বিভক্ত হইয়া ব্রাহ্মধর্মের ৩।০ মূর্তি হইয়াছে।..."

৮৬. লালবিহারী তখন *Indian Reformer* পত্রিকার সম্পাদক। ১৮৬৩ খৃস্টাব্দে কেশবচন্দ্র ও লালবিহারী দের মধ্যে বক্তৃতার লড়াই চলে।

৮৭. কুচবিহার বিবাহ—৬ই মার্চ, ১৮৭৮।

ক্রমে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের মতভেদ বর্ধিত হল। নবীনচন্দ্র লিখেছেন—"কেশবচন্দ্র গোপাললাল মল্লিকের অপদেবাশ্রিত ছাড়াবাড়ী কণ্ঠস্বরে কম্পিত করিয়া এবং দেবেন্দ্রনাথের অব্রাহ্মত্ব প্রতিপাদন করিয়া, সরিয়া পড়িলেন। দেবেন্দ্রনাথের পুত্র একজন ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন—'আমিও বক্তৃতা করিব।' অধ্যক্ষ বলিলেন, সেখানে বক্তৃতা করিবার তাঁহার অধিকার নাই। তখন তিনি চীৎকার করিয়া শ্রোতাদিগকে বলিলেন— "অন্য স্থানে আপনারা ঢালের অন্য দিক্ দেখিবেন।" তাহা আর বড় দেখিলাম না। বিশেষতঃ আমরা অজাতশ্মশ্রু বাগ্মিতা-বিমুগ্ধ বালকেরা বুঝিতাম, কেশবচন্দ্রই ব্রাহ্মসমাজ। আমরাও তাঁহার দলভুক্ত হইয়া জীবস্থান মেছুয়াবাজারস্থ সমাজ ছাড়িয়া, তাঁহার কলুটোলার বাড়ীর সমাজে যোগ দিয়া কলুর বলদের মত ঘুরিতে লাগিলাম। ঈশ্বর গুপ্ত জীবিত ছিলেন না। না হইলে তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া আবার লিখিতেন—

"বাধিয়াছে দলাদলি, লাগিয়াছে গোল।
ব্রাহ্মদের দুই জাতি, বেজে গেল ঢোল॥"

"লালবেহারী বগল বাজাইতে লাগিলেন। তাহার পর 'বেথুন সোসাইটি'তে কেশবের "Jesus Christ, Europe and Asia" বক্তৃতা।[৮৮] মিশনরিদের মধ্যে টি টি পড়িয়া গেল— কেশব খ্রীষ্টান হইয়াছেন। কেশব যে একজন প্রকৃত ঐশ্বরিক বিভুতিসম্পন্ন মহাপুরুষ, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই।"

—'ব্রাহ্মধর্ম ত্যাগ' অধ্যায়, পৃ ১১০-১১২। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ

৪

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে-র পত্নীর নাম বাচুভাই দে (Bachubhai Day)। তিনি তাঁর স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করে একখানি পুস্তিকা রচনা করেন। তিনি তাঁদের বিবাহপ্রসঙ্গে লিখেছেন—

"I was married ot Gogo, in Guzrat, at the Irish Presbyterian Mission House, on Monday the 2nd January, 1860 in presence of Rev. Robert Montgomery, Registrar and Mr. J. S. S. Wylic I. E. S, the Commissioner of the district. Rev. Dr. James Glasgow performed the ceremony at 9 A. M." —*Reminiscences*, p. 57.

শ্রীমতী দে আরো লিখেছেন—

তাঁদের 'engagement' হয়েছিল ১৮৫৯ সালের ২৬শে নভেম্বর। লালবিহারী তাঁদের 'এন্‌গেজমেন্‌টে'র পরে ও বিবাহের ঠিক পূর্বে গোগা শহরে এক রবিবারের

---

৮৮. বক্তৃতাটি প্রদত্ত হয় মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটারে ১৮৬৬ সালের ৫ই মে তারিখে।

ধর্মানুষ্ঠানে বাংলা ভাষায় ভাষণ দেন। তার প্রত্যেকটি শব্দ তাঁর বাবা গুজরাটি ভাষায় অনুবাদ করেন। আবার তাঁর বাবার গুজরাটিতে প্রদত্ত ভাষণ লালবিহারী ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেন।

তাঁর স্মৃতিকথা (পৃ ১৮) থেকে আরো জানতে পারি যে তাঁর জন্মস্থান পলাশী গ্রামে এক অগ্নিদাহে যখন লালবিহারীর মাতৃদেবী গৃহহীন হন, লালবিহারী তাঁর পুরস্কার-পাওয়া সোনার মেডেল বিক্রী করে নতুন করে মায়ের জন্য গৃহনির্মাণ করে দিয়েছিলেন।[৮৯]

৫

শ্রীনিকেতনের কর্মী শ্রীতারাকৃষ্ণ বসু ১৯৩৩-৩৪ সালে ডক্টর হাসিম আমির আলির নির্দেশে *Bengal Peasent life* বা *Govinda Samanta* গ্রন্থে বর্ণিত 'কাঞ্চনপুর' গ্রামের তথা গোবিন্দ সামন্তের পরিবারে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিবৃত্ত জানবার প্রয়াসী হয়ে লালবিহারীর জন্মস্থান 'সোনা-পলাশী' গ্রামে যান। তিনি *Bengal Peasant Life* গ্রন্থের বহু তথ্যের 'বাস্তব' মূল নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে তিনি জেনেছিলেন যে লালবিহারী খৃস্টান হলেও তাঁর মন এই গ্রামের দিকে চিরদিন আকৃষ্ট ছিল। তিনি নাকি একবার গ্রামে এসে ব্রাহ্মণ পাচকদের নিয়ে রন্ধন করিয়ে গাঁয়ের লোকদের খাইয়েছিলেন। তিনি গাঁয়ের বন্ধুদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন এবং গাঁয়ের কোন মানুষ দেখলে তাঁর চোখ জলে ভরে উঠত।[৯০]

৬

রেভারেণ্ড লালবিহারী দের চাকরিতে পদোন্নতির ব্যাপারে সাদা-কালোর মধ্যে বৈষম্য নীতি সরকারী শিক্ষাবিভাগ অনুসরণ করেছিলেন বলে জানা যায়। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকা (১৬ই জুলাই ১৮৮৩) এ-সম্পর্কে লেখেন যে হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ গ্রিফিথস্ কার্যকাল শেষ হওয়ায় ঐ কলেজের সিনিয়র ও কৃতী অধ্যাপক হিসেবে উক্ত পদ তাঁরই প্রাপ্য কিন্তু কালো চামড়ার জন্যই তাঁকে সে-পদ দেওয়া হচ্ছে না ("but as of black colour being denied the post")। ঐ পত্রিকা আরও লেখেন যে লালবিহারী দের ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনার খ্যাতি দূর পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে পৌঁছেচে। কাজেই

৮৯. Mrs. B, Day, *Reminiscences of My Early Life and Experiences and Incidents in Maturer years.* For Private Circulation. Calcutta 1925.

৯০. Tarakrishna Basu, *Kanchanpur Revisited,* Orient Longmans, 1934.

এ-পদ তাঁকেই দেওয়া উচিত। অবশ্য লালবিহারী ঐ পদ পান নি। প্রেসিডেন্সি কলেজের মিঃ বুথ্‌কে ঐ পদ দেওয়া হয়। তিনি চাকরি থেকে লালবিহারীর চেয়ে ২৩ দিনের জুনিয়র ছিলেন। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' (৩০শে জুলাই ১৮৮৩)-এর জন্য সরকারের কার্যের সমালোচনা করেছিলেন।

৭

রেভারেণ্ড লালবিহারী দের 'গোবিন্দ সামন্ত' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ করেন ভূকৈলাসের সত্যবাদী ঘোষাল, সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। শিবচন্দ্র মুখার্জি নামে এক ব্যক্তি ১৮৮৩ সালে *Govinda Samanta* গ্রন্থের অনুবাদে অগ্রসর হন কিন্তু লালবিহারী দের আপত্তির ফলে ঐ অনুবাদ হয় নি। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় প্রকাশিত (৬ নভেম্বর ১৮৮৩) চিঠিতে দেখতে পাই লালবিহারী দে হুগলী কলেজ থেকে লিখেছেন—

"I find from a Bengali Circular which has come into my hands that one Shib Chunder Mookerjea is engaged in translating *'Govinda Samanta'* into Bengali. He says in the Circular that I have given him permission to translate the book. I hereby declare that I have not given him permission to translate the book.··· I warn all concerned that legal proceedings will be taken against any person who publishes the translation of Govinda Samanta into Bengali or any other language."

স্বী কৃ তি

১. সোনা-পলাশী গ্রামের জনাব জাহেদ আলি সাহেব অনুগ্রহপূর্বক আমাকে রেভারেণ্ড লালবিহারী দের পত্নীরচিত স্মৃতিকথা ও শ্রীতারাকৃষ্ণ বসু রচিত *Kanchanpur Revisited* বই দুখানি দেখতে দিয়েছেন।

২. লালবিহারী দে-র বিস্তৃত বংশপরিচয় মুদ্রিত হয় 'নূতন পত্রিকা'র শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৬০) শ্রীযুক্ত রাধারমণ মিত্র মহাশয়ের "রেভারেণ্ড লালবিহারী দে" প্রবন্ধে। তাঁর অনুমত্যনুসারে সেটি পুনর্মুদ্রিত হল।

৩. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কর্মী শ্রীযুক্ত সনৎকুমার গুপ্ত মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগরের স্মৃতিকথার প্রতি প্রবন্ধলেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

—

লালবিহারী দের বংশপরিচয়

১. বর্গীর হাঙ্গামার সময়, আনুমানিক ১৭৪৫ সালে, ঢাকায় পলায়ন করেন।

২. বিপত্নীক অবস্থায় ঢাকা থেকে ১৮০৫ সালে পলাশী আগমন করেন।

কালিকামঙ্গলের একটি নূতন কাহিনী

শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল

কালিকামঙ্গল বলিতে আমরা সাধারণতঃ বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীই বুঝিয়া থাকি। ইহা ছাড়া ইহাতে আরও দু-একটি লৌকিক কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়— যেমন ভানুমতীর উপাখ্যান। ঐ উপাখ্যানের অন্তর্ভুক্ত (অথবা স্বতন্ত্রভাবে) কুঁজাকুঁজির বিবরণ কালিকামঙ্গলের এক কৌতুকোজ্জ্বল কাহিনী।[১] কালিদাস কিভাবে কুঁজাকুঁজির নিকট অপ্রতিভ হন, কিভাবে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের স্থলে একাদশ রত্নের সমাবেশ ঘটে, বঙ্গীয় কবিকুলের লেখনীতে তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বিক্রমাদিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা ইহার বিস্তৃত বিবরণ দিব। এখানে আমরা কালিকামঙ্গলের একটি অপরিচিত-প্রায় কাহিনীর পরিচয় দিতেছি— কংসমল্ল-যমঘণ্ট-যুদ্ধপালা। এই কাহিনীটির প্রতি সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অধ্যাপক শ্রীযুত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়।[২]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রাঘব কবীন্দ্রের কালিকামঙ্গলের (?) পুথি আছে—৯২৭ ও ২২৬৪ সংখ্যক। প্রথম পুথিতে ৪-১০ ও ১৩ সংখ্যক পত্র এবং দ্বিতীয় পুথিতে ২-৩, ১১-১২, ১৪-১৬, ২১-২২, ২৪ ও ২৮ সংখ্যক পত্র রক্ষিত। আসলে একখানা পুথিরই দুইটি বিভক্ত অংশ।[৩] প্রথম পুথির ১৩ সংখ্যক পত্রখানি কবীন্দ্রের রচনা নয়, প্রাণবল্লভ-রচিত; ইহার সহিত কবীন্দ্রের কাহিনীর কোন সম্পর্ক নাই।[৪] দুইখানি পুথি একত্র

১. গোবিন্দদাস—কালিকামঙ্গল (এসিয়াটিক সোসাইটির পুথি নং ২১); রত্নাকর কবিশেখর (মৎসংগৃহীত) কালিকামঙ্গলঃ কুঁজাকুঁজির পালা—।

২. বাংলা পুঁথির বিবরণ, প্রথম ভাগ (১৩৫১) ভূমিকা পৃ. ।০

৩. ২২৬৪ সংখ্যক পুথির তথ্য পৃষ্ঠার অসমাপ্ত চরণ—'কংসমল্ল সাবধানে এড়িয়া দিলেক কানে বেগে যায় ভয়ঙ্কর ডাকে' ইহার পূরণ ৯২৭ সংখ্যক পুথির ৪ক পৃষ্ঠার প্রারম্ভেই—'সমুখে যেজন ঠেকে তারে গেলে আড়পাকে নাগগণ পড়িল বিপাকে'; ঐরূপ ৯২৭ সংখ্যক পুঁথির ১০খ পৃষ্ঠার অসমাপ্ত চরণ—'সলিলে বসিয়া রাজা থাকে শীতকালে', ইহার পূরণ ২২৬৪ সংখ্যক পুথির ১১ক পৃষ্ঠার প্রারম্ভেই—'আষাঢ় শ্রাবণ মাসে তিতে ঘন জলে'।

৪. ১৩ সংখ্যক পত্রে এক সদাগরের তরণী উজানী দামোদর এড়াইয়া ত্রিবেণী পৌঁছিলে গঙ্গার উৎপত্তি কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ভণিতা— প্রাণবল্লভ ওপদ দুর্লভ ভকতি মুকতি আশ। অন্তকালস্থল চরণ যুগল ঐ সে মাগয়ে দাস॥

করিলেও পুথিখানি খণ্ডিত। এই খণ্ডিত পুথি হইতে কাহিনীর একটা মোটামুটি পরিচয় জানিতে পারা যায়।

প্রথম পত্রে সম্ভবতঃ কাব্যোৎপত্তির বিবরণ ছিল। দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভেই দেখিতেছি—

ঢুলিয়া পড়িল তনু জিনিলেখ বিষে ॥
অনন্ত মহিমা দেবী হরের গৃহিনী। জগায় কহিয়া দিল অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
নাহি বেদ পুরাণে নাহিক রামা অনে। হেনকথা কহিয়া দিল ডঙ্ক বদনে ॥
পাঁচালি প্রবন্ধ গীত রচন তাহার। অনুভবা প্রচারিল সকল সংসার ॥
দৈববিপাকে সেই হারাইল পোতা। গায়ন বাসরে নাই সবে রইল কথা ॥
কণ্ঠ ভরণ ভাই তাহার অনুজ। রাঘব কবীন্দ্র নাম তাহার তনুজ ॥
অনেক জনম তপফল পরগণ। স্বপনে পর্ব্বতবালা দিল দরশন ॥...
শিয়রে স্বপনে দেবী করিলা আদেশ। রচহ পাঁচালি গীত ডঙ্ক উপদেশ ॥
শুনিয়া দেবীর কথা বড় কুতুহল। রচিল কবীন্দ্র কবি কালীর মঙ্গল ॥
(তাগায়=তাহাদিগকে)

কাব্যটির দোষক্রুটির জন্য কবি পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন তার পরই কাহিনীর স্ত্রপাত—

প্রথমেই মঙ্গলকোটের অধিপতি কংসমল্লের বিরুদ্ধে নাগরাজ যমঘণ্টের সমরাভিযান। উভয় পক্ষেই প্রচণ্ড সংগ্রাম। বিপদ বুঝিয়া শিবভক্ত কংসমল্ল ইষ্টদেবতার শরণ লইলেন। ভক্তের বিপদ দেখিয়া মহাদেব আকাশপথে ত্রিশূলহস্তে শিঙ্গানাদ করিতে লাগিলেন।

শিবের ত্রিশূল তেজে শুব্ধ হৈল নাগরাজে সিংহমুখ ধরণী লোটায় ॥

শিব অন্তর্হিত হইলে 'নাগরাজ পাইল চেতন'। নাগসেনাপতি চিত্রকেতু বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া বীরগতি লাভ করিলেন। যমঘণ্ট ও কংসমল্লের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল।

কংসমল্লে কাতর দেখিয়া ব্যোমকেশ। রণমাঝে দাঁড়াইলা সমর আবেশ ॥

নাগরাজের সমস্ত বল টুটিয়া গেল, নাগসৈন্যগণ বিবশ হইয়া পড়িল। তখন

কংসমল্ল বলে শুন নাগ অধিপতি। মিলানি দিলাম জায় আপন বসতি ॥
কটক সহিত দিলাম ধরম দুয়ার। কালদিন পাইলে আসিহ আরবার ॥
(জায়=যাহ)

পরাজিত নাগরাজ স্বীয় সৈন্যগণকে বলিলেন— তোমরা সব গৃহে ফিরিয়া যাও, আমি প্রাণত্যাগ করিব। মানুষের সঙ্গে যুদ্ধে আমার পরাজয়— এ কলঙ্ক মুছিবার নয়। তবে যখনই আমি কংসমল্লকে জয় করিতে যাই, তখনই দেখি এক বৃষভারূঢ় পঞ্চমুখ যোগী

ত্রিশূল লইয়া আমার দিকে আগাইয়া আসে, আর 'হাত পা না চলে মোর তনু কাঁপে ডরে'। আমার পরাজয়ের হেতু ইহাই এবং মৃত্যুই আমার লজ্জা নিবারণের একমাত্র উপায়। নাগগণ বলিল, হে ভুজঙ্গেশ, কংসমল্ল তোমাকে জয় করিতে পারে নাই—জয় করিয়াছেন মহেশ্বর। তুমি শঙ্করের আরাধনা কর, তাঁহার ভক্ত ত্রিভুবনবিজয়ী। যমঘণ্ট বলিলেন—আমার ভাগ্যদোষে আমার স্বজনদেরও বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে। কংসমল্ল বহু জন্ম তপস্যা করিয়া শিবের বর লাভ করিয়াছে, কাজেই শিবের আরাধনা নিষ্ফল। পাত্র সুগ্রীব বলিলেন—

মন দিয়া শুন কহি ভুজঙ্গমমণি। কায়মনবচনে তুমি সেবহ ভবানী॥
ভবানীর সনে বাদ না করে মহেশ। কংসমল্ল তোমা এই অনেক বিশেষ॥

এই প্রস্তাব যমঘণ্টের মনঃপূত হইল। তার পর পাত্রের সহিত পরামর্শ করিয়া দণ্ডকারণ্যে 'সিদ্ধিপীঠকুণ্ডে' মহিষ-মাংসের হোম করিয়া যমঘণ্ট কঠোর তপস্যায় নিরত হইলেন।

প্রথম মাসের হোম হবিষ্য আহার। দ্বিতীয়ে করিল মূলে প্রাণ প্রতিকার॥
তৃতীয় মাসেতে কাল শাক ভক্ষণ। চতুর্থে করিল ফলে দেহের রক্ষণ॥
পঞ্চম মাসেতে যজ্ঞধূম আহার। ষষ্ঠ মাসেতে পবন ভোজন প্রকার॥
সপ্তম মাসেতে সির্ণদল (?) আনি খায় অষ্টম মাসেতে চাঁদ রশ্মিতে কুলায়॥
গোমূত্র আহার গেল মাস নবমে। তিন মাস অনাহারে গেল এক ক্রমে॥
উৰ্দ্ধপদে তপ করে সময় নিদাঘে। করপুটে স্তুতি করে ভবানীর আগে॥…

তবুও ভবানীর দর্শন মিলিল না। নাগরাজ অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া জীবনাহুতি দিতে হইলেন। কৈলাসে কালিকার সখী কপালিনী কালিকাকে বলিল—তোমার উপর ভক্তবধের অপরাধ লাগিতেছে। সখীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া দেবী বিচলিত হইয়া পড়িলেন।

কালি কালি বলি নাগ পড়িতে অনলে। পুত্র পুত্র বলি দেবী তুলি নিল কোলে॥

যমঘণ্ট বলিলেন—কংসমল্লের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তোমার শরণ লইয়াছি। 'তাহারে মারিব রণে এই মোর পণ' সেই বরই তুমি আমাকে দাও। দেবী বলিলেন—'তাহার কপালে আছে বিশ্বজয়মণি।' যক্ষরক্ষগন্ধর্বকিন্নর, এমনকি দেবরাজ ইন্দ্রও তাহাকে জয় করিতে পারে না। তথাপি

তাহারে মারিব আমি শুন তত্ত্বকথা। সমরের মাঝে যাব নাগের দুহিতা॥
তাহার সহায় যদি সদাশিব হয়। নিশ্চয় মারিব তারে না করিহ ভয়॥

বলিয়াই দেবী অট্টহাস্যে ত্রিভুবন কাঁপাইয়া তুলিলেন। মহাদেব নন্দীভৃঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—অকালে প্রলয়ের লক্ষণ দেখিতেছি কেন? নন্দী বলিলেন—নাগরাজ যমঘণ্ট কালিকার নিকট কংসমল্লবধের বরলাভ করিয়াছে। মহাদেব দেবীর নিকট গিয়া

অনুরোধ করিলেন 'মারিয়া জিয়াবে তারে আমার কারণ'। দেবী বলিলেন—যমঘণ্ট বলিলে তবেই তাহাকে জিয়াইতে পারি। নাগরাজ বলিলেন—শত্রুকে নিধন করিয়া আমি যখন গৃহে প্রত্যাগমণ করিব 'তবে জিয়াইয়া দিবে কংস নৃপবরে'! মহাদেব বিদায় লইলেন, দেবীও সুন্দরী নাগকন্যার বেশ ধারণ করিয়া যমঘণ্টকে কংসমল্লের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে নির্দেশ দিলেন।

সংগ্রাম কৌতুকরঙ্গ খেলাবে আপনি। কপাল হইতে লবে শঙ্করের মণি ॥

নাগরাজ কংসমল্লের 'গড় দুয়ারে' আসিয়া কাড়ায় কাঠি দিলেন। কংসমল্ল তখন রানী কমলাকে লইয়া পাশা খেলিতেছিলেন। তাঁহার রণদামামাও বাজিয়া উঠিল।

কংসমল্ল যমঘণ্টকে পরিহাস করিয়া বলিলেন—

সহায় করিয়া নারী সমরে জিনিবে অইরি ধিক ধিক তোমার সাহসে ॥

যমঘণ্ট বলিলেন—

শিবের সহিত বাদ ঘুচিব মনের সাধ আজি হইতে জীবন অবধি!

শিব ও কালী স্ব স্ব ভক্তপক্ষে সহায় হইলেন। শিব প্রথম সেনা পাঠাইয়া দিলেন। চণ্ডিকা, চামুণ্ডা, উগ্রতারা, মহিষমর্দিনী, ত্রিপুরাসুন্দরী প্রভৃতি সমস্ত দেবীশক্তি লইয়া মহাকালী রণে আবির্ভূতা হইলেন। উভয়পক্ষই রণতাণ্ডবে মাতিয়া উঠিল। এখানে পুথির কিয়দংশ খণ্ডিত থাকিলেও বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, দেবীশক্তির নিকট শিবশক্তির পরাজয় ঘটিল। কংসমল্ল পরাজিত ও নিহত হইলেন। পতিশোকাতুরা রানী সহচরীদের ডাকিয়া বলিলেন—

জিয়াইতে অধিকারী সেবিব হরের নারী অবসর আজিকার রাতি।

নতুবা সকলে মিলিয়া অগ্নিতে আত্মাহুতি দিব। এই যুক্তি করিয়া সবাই মিলিয়া রাজার শব 'শ্মশানমণ্ডবঘরে' তুলিয়া আনিল। সেই শব 'অধোমুখ পূর্বশিরে' শোয়াইয়া তাহার উপর আসন করিয়া রানী 'আগম-নিগম অনুসারে' মন্ত্রজপ করিতে লাগিলেন।

কুণ্ডলিনী জাগাইয়া সদাশিবে মানাইয়া চক্রভেদে পরম গেয়ানি ॥

প্রথম প্রহর রাত্রি রানীর একাকিনী কাটিল। 'দোয়জ' প্রহর রাত্রিতে ব্যাঘ্র ভল্লুক গর্জন করিয়া 'ঘুরিয়া বেড়ায় ঘনপাকে'। ইহার পর ভূতপ্রেতদানবপিশাচাদির উৎকট নৃত্য। উলঙ্গ উন্মত্ত নিশাচর-নিশাচরীদের বীভৎস উল্লাস।

নিশাচরী বলে রামা আহ তোর ঠাই। মড়াটা পেলাইয়া দেহ চিবাইয়া খাই ॥

যদি পতি শবতনু দিতে প্রাণ পোড়ে। তবে রামা খাব তোরে কামড়াইয়া ঘাড়ে ॥

এক ভৈরবী আসিয়া বলিল—

অভিমত কাজে যদি থাকে তোর মন। আপনি কাটিয়া দেহ ডাহিনের স্তন ॥

খাইয়া স্তনের মাংস তুষ্ট হবে দেবী। অভিমত বর মাগিয়া তবে লবি ॥

রানী ক্ষুর লইয়া স্তন কাটিতে উদ্যত হইলে 'ভক্তবৎসলা দেবী হইলা পরতেক'।

দেবী রানীকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে রানী বলিলেন, 'জিয়াইয়া পতি মোর উদ্ধার করিবে'।

অমৃতনয়ানে দেবী নিরখিলে তায়। আচম্বিতে উঠিয়া বসিল কংসরায়॥

রাজা রানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি এখানে কেন? রানীর নিকট সব কথা রাজা ও রানী উভয়েই দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। দেবী তুষ্ট হইয়া রাজার সমস্ত সৈন্যসামন্ত ও হস্তীঅশ্বাদি বাঁচাইয়া দিলেন।

এইখানেই খণ্ডিত পুথির শেষ। প্রাপ্তাংশে পুষ্পিকা বা লিপিকাল নাই। পুথির বয়স আনুমানিক একশত বৎসর। ১১খ পৃষ্ঠায় 'শ্রীরামনাথ বসু, ও ২২খ পৃষ্ঠায় 'শ্রীজগন্নাথ দেবশর্ম্মন' লিখিত আছে। ইহাঁরা লিপিকর হইতে পারেন। প্রাপ্ত পুথিতে কেবল কালিকামঙ্গল নামই দেখিতে পাওয়া যায়, 'কংসমল্ল-যমবন্ট-যুদ্ধপালা' নাম আমাদের প্রদত্ত।

ভণিতা—

সুকবি কবীন্দ্র ভণে কটকে না ধরে টানে বিস্ময় লাগিল কংসরাজে॥

ভণতি কবিন্দ্র গুণী কংসমল্ল নাগমণি দুইজনে বচন লড়াই॥

কবীন্দ্র কবির গীত ডংখবআন। দেবীরে দড়াইয়া শিব গেল নিজস্থান॥

কালিকামঙ্গলের অপর কবি, ঘটক চক্রবর্তী-সুত কবীন্দ্র ও আমাদের আলোচ্য কবীন্দ্র পৃথক ব্যক্তি। প্রথমোক্ত কবির নাম নিধিরাম বা মধুসূদন,[৫] আর শেষোক্ত কবির নাম রাঘব। প্রথমোক্ত কবির কালিকামঙ্গলের অষ্টমঙ্গলায় কংসমল্লযমবন্টপালার উল্লেখ নাই। রাঘব কবীন্দ্রের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। উভয় কবিই অষ্টাদশ শতকের লোক হইতে পারেন।

শিবশক্তি ও দেবীশক্তির দ্বন্দ্বে দেবীশক্তির বিজয়েই কালিকামঙ্গল নামের স্বার্থকতা সম্পাদিত হইয়াছে। তন্ত্রপুরাণের উপর কবির বেশ অধিকার ছিল বলিয়া মনে হয় রানী কমলার শবসাধনা, কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গল-বর্ণিত তারাবতীর শবসাধনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।[৬] যুদ্ধবর্ণনায় কবির কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। লঘু হাস্যরসপরিবেশনেও তিনি বেশ পটু, যেমন— আকাশে বলদ বুড়া হামা হামা ডাকে। কাব্যাংশে কবীন্দ্রের রচনা খুব উচ্চাঙ্গের না হইলেও একেবারে নিকৃষ্ট নহে। কালিকা-মঙ্গল কাহিনীর মধ্যে তাঁহার কাহিনী সম্ভবতঃ একক, এই কারণেই ইহা একটি বিশিষ্টতার দাবী করিতে পারে।

৫. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুথিসংখ্যা ৬২৬১, পৃ. ৪০ক; শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল, বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী, পৃ. ৮ ও ৩৪

৬. ডক্টর সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী (১৯৫৮), পৃ. ১৩৯-৪০

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বর্ষ ৬৭ ॥ সংখ্যা ২

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

প্রতি সংখ্যা দুই টাকা। বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা

পরিষদের সদস্য পক্ষে বিনামূল্যে প্রাপ্তব্য

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৬৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা
১৩৬৭

পেয়ার শাহ্

(চব্বিশ পরগণার লোক-ইতিহাস)

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

চব্বিশ পরগনার বারাসাত-বসীরহাট বড় রাস্তার উপর দেউলিয়া (বর্তমান দেবালয় গ্রাম)। সেখান হইতে যে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা সোজা দক্ষিণে হাড়োয়ায় গিয়াছে, সে রাস্তার পাঁচ মাইল পার হইলেই বাঁ দিকে রাস্তা হইতে দুই-চার রশি দূরে উঁচু পাড় দেখা যায়। সেখানে একটা ছেলেকেও জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়া দিবে— সেটা পেয়ার শাহের দীঘির পাড়। দীঘির পাড় তাল, বেল ও বাঁশ গাছে বোঝাই। দুই চারিটি বট, তেঁতুল ও অন্যান্য বড় গাছও আছে। পাড়ে কিছু অংশে চাষ আবাদ হইয়াছে। কৌতূহলী পথিক দীঘি দেখিতে গেলে দেখিবেন, তিন দিকে প্রায় দু-তিন-তলার সমান উঁচু পাড়ে ঘেরা প্রকাণ্ড দীঘি, অধিকাংশ দাম দলে ঢাকা, মধ্যে দুই-এক জায়গায় যেখানে পরিষ্কার আছে, কত স্ত্রী পুরুষে পানীয় জল লইতেছে। এই দাম দল সত্ত্বেও পানি অতি সুপেয়। দীঘির জলকর প্রায় ৫০।৬০ বিঘা।

এই দীঘির দক্ষিণ গায় বাঁশ গাছে ঘেরা ছোট একটী গ্রাম। দূর হইতে বোধ হয় যেন একটা বাঁশবন। তার মাঝে মাঝে নারিকেল গাছগুলি সাধু সন্ন্যাসীর মত দুনিয়ার সমস্ত মলিনতার উর্ধ্বে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গ্রামের ভিতর পশ্চিম পাড়ের উপর একটী ছোটখাট পাকা মসজিদও দেখিবেন। দীঘিতে, নারিকেল গাছে ও বাঁশগাছে আর মসজিদে গ্রামটি যে পুরান মুসলমান ভদ্রলোকের গ্রাম, তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। গ্রামটির নাম পেয়ারা। গ্রামটি স্বভাবের শোভায় প্রিয় বটে। দীঘির পেয়ার শাহ্ হইতে গ্রামটিরও নাম পেয়ারা। সরকারী কাগজপত্রে, শাহ্‌পুর ওরফে পেয়ারা।

এই পেয়ার শাহ্ কে? আমাদের ঘরে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ শেখ লাল কর্ত্তৃক প্রায় দুই শত বৎসর আগেকার রচিত যে পুঁথির নকল আছে, তাহাতে পেয়ার শাহের যেমন জীবনচরিত পাইয়াছি তাহা আপনাদিগকে উপহার দিতেছি। কিংবদন্তীর সহিত ইহার খুব মিল আছে। মধ্যে মধ্যে ইহা হইতে উদ্ধৃতি দিব।

আজ অনেক দিনের কথা। তখন পীর হজরত শাহ্ সৈয়দ আব্বাস ওরফে পীর গোরাচাঁদ বারগোপপুরে সমাধিশয়ন লাভ করিয়াছেন। এখন বারগোপপুর হাড়োয়া। তখন গৌড়ের তখ্‌তে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ (১৪৯৬ খ্রীঃ - ১৫২০ খ্রীঃ) বিরাজমান। পেয়ার শাহ্ ছিলেন তাঁহার প্রিয় অনুচর।

বাদশাহ্ রাত্রিকালে শুইয়া আছেন, পীর গোরাচাঁদ তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিতে লাগিলেন :

"ছের কন্দো [১] দুই স্থান,
বঞ্চিত হইল পান,
ছাড়িয়া গেল সঙ্গের ইয়ার।
গহনিয়া জঙ্গলে,
কাম আমার নাই চলে,
জাইগীর দিয়া পাঠাও পেয়ার॥
শুন বাদশা এছা কাম,
গোরাচাঁদ আমার নাম,
বালাণ্ডায় আমার ছিলে-খানা।"

পরদিন সকালে পেয়ারের সহিত দেখা হইতেই বাদশাহের স্বপনের কথা মনে পড়িয়া গেল। বাদশাহ্ পেয়ারকে বলিলেন—

"আজ হইতে খেদমত মানা,
লও পেয়ার পরওয়ানা।
জায়গীর লয়ে যাও ভাটীর দেশে [২]।"

বারো বৎসরের জন্য জায়গীর দিয়া বাদশাহ্ পেয়ারকে দস্তখতযুক্ত পরওয়ানা প্রদান করিলেন। তখন পেয়ার—

"সাজ সাজ বলিয়া সাজনে দিল সাড়া,
ষোলো হল্‌কা হাতী সাজে, পাঁচহাজার ঘোড়া।
পেয়ার লইয়া ছেরে বাদশাহি পরওয়ানা।
বাইশ হাজার ছওয়ার সঙ্গে বাঙ্গালায় রওয়ানা॥"

পেয়ার শাহ্ সুহাই নগরে আসিয়া তাঁবু ফেলিলেন। এই সুহাই মার্টিনের বেলেঘাটা জংশনের নিকটে একটি ছোট গ্রাম। তখন সেখানে ডিম শাহ্ নামে এক জমিদার ছিলেন। তিনি পেয়ার শাহের প্রতাপ দেখিয়া ভয়ে তাঁহার অনুগত হইলেন।

এখন চন্দ্রকেতুর পালা :

"চন্দ্রকেতু নামে রাজা দেউলায় যাহার স্থান,
মরা মানুষ জিলায় [৩] রাজা বড় পুণ্যবান্॥"

১. শির ও স্কন্ধ।

২. জোয়ার ভাঁটার দেশ, দক্ষিণবঙ্গ

৩ জীবিত করে।

চন্দ্রকেতুকে গোরাচাঁদ ইসলাম ধর্মে আহ্বান করিয়াছিলেন। চন্দ্রকেতু গোরাচাঁদের নিকট অলৌকিক কার্য দেখিতে চাহিয়াছিলেন। গোরাচাঁদ রাজার কথামত লোহার কলা পাকাইয়াছিলেন এবং লোহার বেড়ায় চাঁপা ফুল ফুটাইয়াছিলেন। যেখানে এই ব্যাপার হয়, এখনও সেখানকে বেড়াচাঁপা বলে।

"তবু রাজা চন্দ্রকেতু আড়ি করে রয়।
না মানে গোরাই পীর দেমাগ করিয়া॥
বদ্‌দোয়া করেন জেন্দা [৪] দস্ত [৫] ওঠাইয়া॥

গোরাচাঁদ হাত উঠাইয়া চন্দ্রকেতুকে শাপ দিলেন। এখন দেখা যাউক পীরের শাপ কিরূপে রাজাকে লাগে।

পেয়ার শাহ্ চন্দ্রকেতুর নিকট দূত পাঠাইলেন। দূতের নাম ছিল সাতন।

"পরওয়ানা লইয়া হাতে,
সাতন আইসেন পথে,
রাজার বাটী হৈলা উপনীত।
সাতন কহে শীঘ্র করি,
শোন রাজা অধিকারী,
বাদশাহী পরওয়ানা উপস্থিত॥
লও লও পরওয়ানা,
কর রাজা সামিয়ানা, [৬]
পেয়ার গিয়ে ভেট শীঘ্র গতি।
বাইশ হাজার ছওয়ার সাতি,
ষোল হল্‌কা আছে হাতি॥
শোন রাজা মহারাজ,
করহ আপন কাজ,
মনে'ত ভাবিয়া দেখ নিত।
নিকটে বাদশাহ দল,
নাহি চলে কারো বল,
পরিণামে তোমায় বলি হিত॥"

---

৪. জীবিত, জাগ্রত পীর।

৫. হস্ত।

৬. সামান, সাজসজ্জা।

রাজা সাতনের কথা শুনিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। সাতন চলিয়া গেলেন। রাজার বড় রাণীর নাম ছিল কমলারাণী। তিনি রাজাকে বলিলেন:

"বিবাদে নাহিক তোমার কাজ,
হিন্দু গেলো রসাতল,
মমিনের [৭] বাড়িল বল,
হারিলে পাইবে বড় লাজ॥"

রাজা তখন পেয়ার শাহের সহিত সন্ধি করিতে মনস্থ করিলেন। রাজা পাত্রমিত্র লইয়া পেয়ার শাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। রাজার হাতে ঘিরিনি পায়রা ছিল। যাত্রাকালে রাজা রাণীদিগকে বলিলেন, যদি বন্দী হই, তবে পায়রা ছাড়িয়া দিব। রাজা আগে ভেট পাঠাইয়া দিলেন:

"চিনি কেলা [৮] ঘৃতদুগ্ধ দাড়িম্ব রসাল।
আম্র কাঠাল গুবাক তাল নারিকেল॥
খাসি বকরি লইল মোরগ ঝুড়ি ঝুড়ি।
হস্তী ঘোড়া রথ রথী কত ঘোড়া ঘুড়ী॥"

পিছে রাজা ঘোড়ায় চলিয়া লোকজন সঙ্গে শাহের দরবারে উপস্থিত হইলেন।

পেয়ার শাহ্ রাজাকে আদর করিয়া সভায় বসাইলেন। রাজার হাতে ঘিরিনি পায়রা দেখিয়া পেয়ার শাহ্ কৌতূহলী হইয়া পায়রা দেখিতে চাহিলেন। রাজা শাহের হাতে পায়রা দিতে গেলেন। বিধির ফেরে পায়রা হাত হইতে উড়িয়া ঘরের দিকে চলিল। রাজার মন ভাবী আশঙ্কায় দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল। রাজা তখনই বায়ুভরে ঘোড়া ছুটাইলেন।

এদিকে পায়রা আসিয়া গাছের ডালে বসিল। কমলা রাণী পায়রা দেখিয়া বুঝিলেন কপাল ভাঙিয়াছে। রাজবাটীতে ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল। বসিয়া কাঁদিলে কি হইবে? এই বুঝি বাদশার সৈন্য আসে। তবে'ত রক্ষা নাই। রাণী বাড়ীর অন্যান্য স্ত্রীলোকসহ দহে ডুবিয়া মরিলেন।

রাজা বাড়ি আসিয়া দেখিলেন সর্বনাশ! রাজা মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নগরের যত লোক জমা হইয়া গেল। সকলে রাজাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল, কিন্তু রাজা শোক-সান্ত্বনার বাহিরে। রাজাও দহে ডুবিয়া মরিলেন। মরিবার আগে,

"রাজা বলে মোর পুরী মজিল সরোবরে।
এমনি পেয়ারের পুরী দহায় ডুবে মরে॥"

প্রজারাও রাজার সহগামী হইতে চায়। পেয়ার শাহ্ দেউলিয়ায় আসিয়া প্রজাগণকে নানা ভরসা দিয়া ঠাণ্ডা করিলেন।

৭. মুসলমানের।

৮. কলা।

পেয়ার শাহ্ সুহাই হইতে যাত্রা করিয়া বিদ্যাধরী নদীর কূলে আড্ডা করিলেন। হাতীর আড্ডার জন্য সেইস্থানকে এখনও পিলখানা বা হাতীর পিলখানা বলে। পিলখানার অর্থ হাতীশালা। এই পিলখানা পেয়ারা গ্রামের সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ডিস্ট্রিক্ট্ বোর্ডের রাস্তার পশ্চিম পাশে। পেয়ার শাহ্ যেমন প্রতাপশালী, তেমনি ধার্মিক ছিলেন।

"তদারক করেন ঘড়ি ঘড়ি।
চুরি ছেনালি আদি গোনাগার [৯] পান যদি,
আজ্ঞা তবে গেল সেই ঘড়ি॥
বিহানে আপন ঘরে কোরান খতম করে,
রাতি উড়ে ঝাণ্ডা ও নিশান।"

একদিন পেয়ার শাহ্ রাত্রিতে শুইয়া ছিলেন, গোঁরাচাঁদ পেয়ার শাহ্কে স্বপ্নে আদেশ করিলেন, শাহ্পুরে তুমি কিছু স্থায়ী চিহ্ন রাখিবে। সকালে পেয়ার শাহ্ দরবারে বসিয়া স্বপ্নের কথা বলিলেন। অনেক পরামর্শের পর ঠিক হইল দীঘি দেওয়াই সঙ্গত। লোনা দেশে চারিদিকে জলকষ্ট, তথাকার লোকের অনেক উপকার হইবে। পেয়ার শাহ্ দীঘি দেওয়াই স্থির করিলেন।

হাজার হাজার লোক দীঘি কাটিতে লাগিয়া গেল। এক-এক ঝুড়ি মাটীতে এক-এক কড়ি মজুরি।

সেই সময় রাম হাজরা বালাণ্ডায় একজন মাতব্বর লোক ছিলেন। তিনি কাহারও ভাল দেখিতে পারিতেন না। এই ছিল তাঁহার দোষ। পেয়ার শাহের পসার প্রতিপত্তি দেখিয়া তাহার ঈর্ষ্যা হইল। তিনি একদিন, পেয়ার শাহ্ বাদশাহের পয়সা অনর্থক নষ্ট করিতেছেন বলিয়া পেয়ার শাহের সহিত বিষম তর্কবিতর্ক করেন। পেয়ার শাহ রাম হাজরাকে কয়েদ করিলেন। দীঘি কাটা চলিতে লাগিল।

রাম হাজরা কোনরূপে কয়েদ হইতে ছাড়া পাইয়া একেবারে গৌড়ে বাদশাহের নিকট হাজির। সেখানে তিনি পেয়ার শাহের নামে অনেক মিথ্যা অভিযোগ করিলেন। বাদশাহ্ পেয়ার শাহকে তলব করিয়া দূত পাঠাইলেন। পেয়ার শাহ্ তখন দীঘি কাটিতে ব্যস্ত। দীঘির কাজ ফেলিয়া তিনি রাজদরবারে যাইতে পারিলেন না। এমন কি বাদশাহের কাজ যে, তিনি এত বড় জরুরি কাজ ফেলিয়া যাইবেন? দূত ফিরিয়া আসিল। বাদশাহ্ ক্রুদ্ধ হইয়া আবার দূত পাঠাইলেন। দূত আসিয়া বলিল:

"সাতন কহেন পেয়ার তুমি দিনদার [১০]।
ঠেকিলে বিপাকে বাবা হইলে গোনাগার॥

৯. অপরাধী।
১০. ধার্মিক।

তকছির[11] হইয়াছে তোমার গোনার নাহি সংখ্যা।
এক কাম কর যদি প্রাণে পাইবে রক্ষা॥
হাতে জিঞ্জির গলে তোক, বেড়ি দিয়া পায়।
বাদশাহ হুজুরে পেয়ার চলহ ত্বরায়॥"

তখন ধর্মবলে নির্ভীক, তেজস্বী—

"পেয়ার শাহ বলে কি দোষ করিছি পানা-তলে,
কি দোষেতে হাতে জিঞ্জির, তোক দিব গলে॥
বঞ্চনা করিয়া আদেলে[12] করিয়াছি কাকে।
প্রজালোক ডাকিয়া তুমি পোছ একে একে॥
যবে কেহ কুলক্ষণ কহে মন্দ বাণি।
আপনার হাতে জিঞ্জির দেব যে আপনি॥
নাহক চোগলের বাতে করিয়াছে তাও[13]।
না যাইব বাদশার কাছে তুমি গিয়া কও॥"

দূত ফিরিয়া আসিয়া বলিল :

"সাতন বলে, পরওয়ানা ঠেলিল পেয়ার।
রহিল ভাটির দেশে ধরিয়া তলওয়ার॥"

তখন বিদ্রোহ অধীন শাসনকর্তাদের একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। বাদশাহ বুঝিলেন পেয়ার শাহ্ বিদ্রোহী হইয়াছেন।

তখন গৌড়ের বাদশাহ্ পেয়ার সাহকে সাজা দিবার জন্য সাজিলেন :

"এতেক শুনিয়া বাদশা ক্রোধিত হইল।
সাজ সাজ বলিয়া বাদশা হাঁকিতে লাগিল॥
ইরাকী তুরকী সাজে রুমী আছওয়ার[14]।
পায়দল সাজিল কত কে করে শুমার[15]॥
চড়িয়া তুরকী ঘোড়া তাজি তুরকী সাজে।
চিত্র বিচিত্র শোভা, পায়ে ঘুঙুর বাজে॥

---

১১. অপরাধ।
১২. বিচারে।
১৩. ক্রোধ।
১৪. ঘোড়সওয়ার।
১৫. গণনা।

মুখোস লাগাম তাহে মুণিমুক্তা দোলে।
হীরা জওহেরাত গজের বান্ধা গলে ॥

এইরূপে সাজসজ্জা করিয়া লোকলস্কর লইয়া বাদশাহ্ সুহাই নগরে আসিয়া আড্ডা করিলেন। বাদশাহ্ যতদূর আসেন আপনার দোহাই শুনিতে লাগিলেন। পেয়ার শুনিলেন বাদশাহ্ তাঁহাকে ধরিতে আসিতেছেন।

"হেট মাথে ভাবেন পেয়ার হাজরা হইল কাল।
দীঘির তটে নৌকা করিলা মোম ঢাল ॥
পেয়ার বলে, তলোয়ার বান্ধি বাদশার সনে।
নেমকহারাম তবে বলিবে সর্ব্বজনে ॥
তড়িঘড়ি চলিয়া আইসে নাহি জানে রীত।
ডুবিয়া মরিব আমি পরিবার সহিত ॥

বাদশাহ্ সুহাইয়ে রহিয়াছেন। এমন সময় কাটারমাল সেখানে উপস্থিত হইল। বাদশাহ কাটারমালকে পেয়ার শাহের খবর জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন—

"কাটারমাল বলে শাহা শুন দিয়া মন।
দীঘির মাঝে নৌকায় তুলিছে পরিজন ॥
এতক্ষণে আছে কি নাই, কি জানি পেয়ার।
পরিবার সমতে মরে দীঘির মাঝার ॥
রাম হাজরা মিথ্যা কহিছে সকল।
সর্ব্বনাশ হইল ছাহেব মজিল সকল ॥"

বাদশাহ্ রাম হাজরার শঠতা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে হাতীর পায়ের তলে ফেলিয়া মারিতে বলিলেন। এইরূপে দুষ্টের জীবনের অবসান হইল।

এখনও বালাণ্ডা পরগণায় কেহ কাহাকেও ঠকাইলে লোকে বলে, "হবেই'ত! এ যে রাম হাজরার দেশ!" তখন বাদশাহ্ পেয়ার শাহকে ভরাডুবি হইতে রক্ষা করিবার জন্য একেবারে ঘোড়া ছুটাইয়া দীঘির পাড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, পেয়ার নৌকায় মগ্নপ্রায়। পেয়ার শাহ্ এখন জীবনমরণের মধ্যে। পেয়ারের এখন ভয় ডর কি? পেয়ার শেষে অভিমানে মজিয়া কাঁদিয়া বাদশাহকে মিষ্ট ভর্ৎসনায় বলিলেন:

"পেয়ার বলেন কাঁদিয়া,
বার বৎসর করার করিয়া,
আইলাম জায়গীর পাইয়া ॥
আমার মকদুর জেএছা,
খেদমত করিনু তেএছা,
ছয়মাস তোমার কৌউসে ॥

তোমার বড়াই বড়,
বাদশাহ হইয়া করার তোড়,
বলবুদ্ধি সকলি নৈরাশ ॥
আমি বান্দা গোনাগার,
তুমি বাদশাহ নামদার,
মাফ করো মেরা যত দোষ ॥
মাল মাণ্ডা লস্করে সাথি,
লও তোমার ঘোড়া হাতি,
দীঘিতে খরচ তোমার ধন ॥
তুমি বাদশা দিনদার,
আমি পেয়ার গোনাগার,
তক্ত পাইলাম তোমা হতে ॥

পেয়ারের কথা শুনিয়া বাদশাহ্ কাঁদিতে লাগিলেন। পেয়ারও কাঁদিতে লাগিলেন। তারপর তিনবার হক্ নাম ডাকিয়া পেয়ার শাহ্ দীঘির মধ্যে ডুবিয়া গেলেন। বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে পাওয়া গেল না। বাদশাহ্ তখন হায়! হায়! করিতে লাগিলেন। দীঘির পানি অপবিত্র হইল দেখিয়া বাদশাহ্ বালাণ্ডায় সাজো পুকুর কাটাইয়া লোকলস্করের পানির বন্দোবস্ত করিলেন। তারপর বাদশাহ্ গৌড়ে আপন কোটে ফিরিয়া গেলেন!

পেয়ারা গ্রামে আমাদের জ্ঞাতি গোরাচাঁদ সাহেবের খাদিমেরা (সেবাইতগণ) বসবাস করেন। সমস্ত গ্রামটি বাদ্‌শাহী আমল হইতে বরাবর পীরোত্তর নিষ্কর ছিল। এখন অবশ্য খাজনা বসিয়াছে। চব্বিশ পরগণার বারাসাত-বসীরহাট অঞ্চলে প্রসিদ্ধ প্রাচীন দীঘির নাম একটি ছড়ায় আছে—'হামাদামা, পেয়ারশাহ। মধু মুড়লি, ডিমশাহি'।*

*এই বিষয়ে লেখকের একটি প্রবন্ধ বহুদিন পূর্বে বসীরহাট "পল্লীবাণী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।
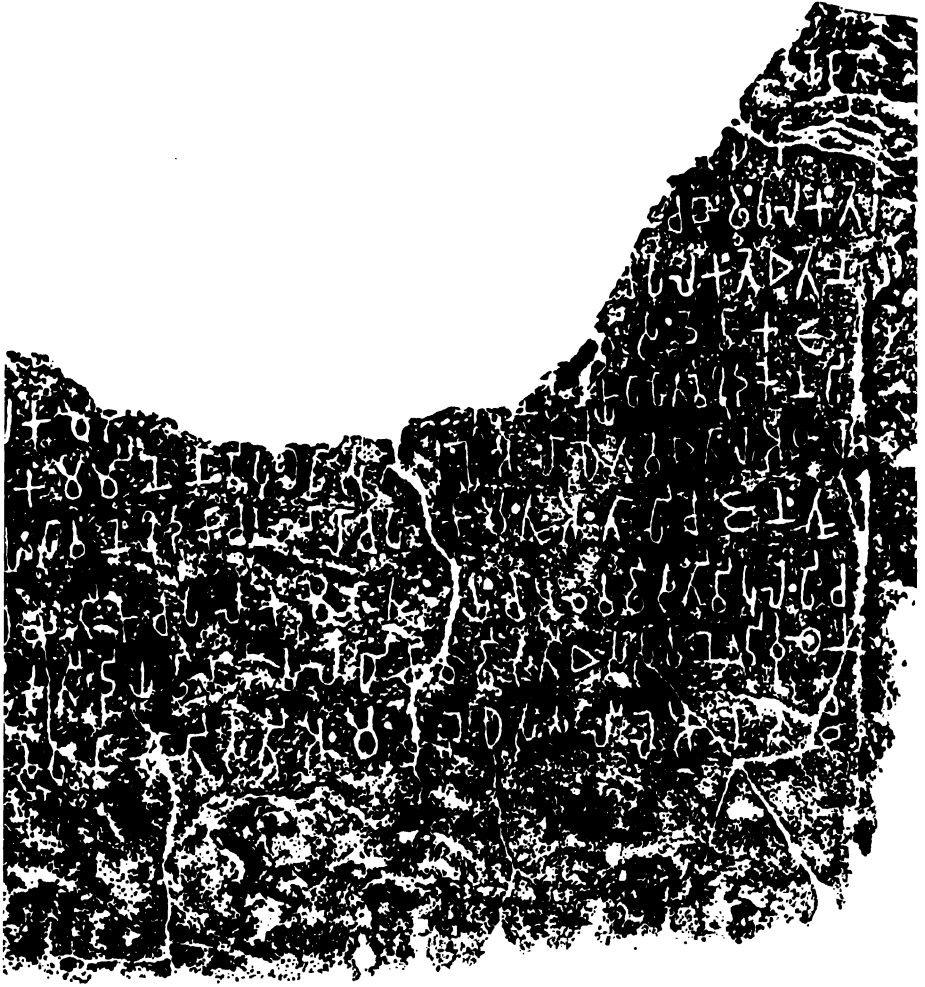
অশোকের আহ্‌রৌরা অনুশাসনের প্রতিলিপি

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সৌজন্যে

অশোকের আহ্‌রৌরা অনুশাসন

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে মৌর্য সম্রাট্ অশোকের কতকগুলি শৈলানুশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে সর্বশেষটির আবিষ্কারবার্তা ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে প্রচারিত হয়। এটি উত্তর প্রদেশের মীর্জাপুর জেলার অন্তর্গত আহ্‌রৌরা গ্রামে পাওয়া গিয়াছে।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোবর্ধন রায় শর্মা সর্বপ্রথম আহ্‌রৌরা অনুশাসনটি পরীক্ষা করেন। তাঁহার মতামত এলাহাবাদ হইতে প্রচারিত দৈনিক লীডার পত্রিকার ১১ নবেম্বর ১৯৬১ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। অতঃপর বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ভারতবিদ্যাবিষয়ক মহাবিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর অবধকিশোর নারায়ণ উক্ত মহাবিদ্যালয়ের মুখপত্র 'ভারতী'তে আহ্‌রৌরা অনুশাসন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন—১৯৬১-৬২ সালের ১ম ভাগ, ৫ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৯৭-১০৫। 'ভারতী'র উল্লিখিত সংখ্যায় নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় বাসুদেব বিষ্ণু মিরাশীর লিখিত একটি প্রবন্ধেও অনুশাসনটির পাঠ ও ব্যাখ্যা আলোচিত হইয়াছিল—পৃষ্ঠা ১৩৫-৪৭। আহ্‌রৌরা অনুশাসন সম্পর্কে আরও একজন পণ্ডিতের মতামত জানা গিয়াছে। তিনি ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগীয় লেখবিদ্যাশাখার কর্মচারী এস. শঙ্করনারায়ণন্। দুঃখের বিষয়, এই চারি ব্যক্তির মধ্যে কেহই অনুশাসনটির নির্ভুল পাঠোদ্ধারে কৃতকার্য হন নাই।

আহ্‌রৌরাতে যে লেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে উহাকে পণ্ডিতেরা অশোকের ১নং ক্ষুদ্র শৈলানুশাসন বলিয়া থাকেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে লেখটির অনেকগুলি প্রতি পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু শব্দবিন্যাস সর্বত্র একরূপ নহে। কোন কোন প্রতিতে এমন দুই-একটি কথা আছে, যাহা অন্য কোথাও দেখা যায় না। আহ্‌রৌরা প্রতির শেষভাগে এইরূপ একটি নূতন বাক্যাংশ সংযোজিত দেখা যায়; উহা অন্যত্র পাওয়া যায় নাই। এই অংশই লেখটিকে বিশেষভাবে মূল্যবান্ করিয়া তুলিয়াছে। আর ইহার পাঠ এবং ব্যাখ্যাব্যাপারেই পণ্ডিতেরা ভ্রান্তমত প্রচার করিয়াছেন।

অশোকের ১নং ক্ষুদ্র শৈলানুশাসনের কতকগুলি প্রতির শেষে নিয়োদ্ধৃত বাক্যটি দেখা যায়—'ইয়ং চ সাবনে সাবাপিতে ব্যুথেন ২৫৬'। ইহার সংস্কৃতরূপ-'ইদং চ শ্রাবণং শ্রাবিতং ব্যুষ্টেন ২৫৬'।

কথাটি অনুশাসনের রূপনাথে প্রাপ্ত প্রতিতে কিছু স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে—

'ব্যুঠেনা সাবনে কটে। ২৫৬ বিবাসা ত।' অর্থাৎ সংস্কৃতে—'ব্যুষ্টেন শ্রাবণং কৃতম্। ২৫৬ বিবাসঃ ইতি।'

আবার সহস্রাম প্রতির পাঠে কথাটি অধিকতর স্পষ্ট দেখা যায়—'ইয়ং চ সাবনে বিবুথেন। দুবে-সপংনা-লাতি- সতা বিবুথা তি—২৫৬।' ইহা সংস্কৃতে দাঁড়াইবে—'ইদং চ শ্রাবণং ব্যুষ্টেন [কৃতম্]। দ্বি ষট্‌পঞ্চাশদ্রাত্রি-শতে ব্যুষ্টঃ ইতি—২৫৬।'

সংস্কৃতে 'ব্যুষ্ট' শব্দের সাধারণ অর্থ 'বিগত' বা 'অতিবাহিত'; যেমন, 'ব্যুষ্টা যামিনী'। কিন্তু 'ইদং চ শ্রাবণং শ্রাবিতং ব্যুষ্টেন' অর্থাৎ 'ব্যুষ্টের দ্বারা এই ঘোষণা বিঘোষিত হইল' বলিতে 'ব্যুষ্ট' শব্দে অবশ্যই 'ব্যুষিত' (প্রবাসী) বুঝানো হইয়াছে। কারণ রূপনাথ প্রতিতে আছে—'ব্যুষ্টেন শ্রাবণং কৃতম্। ২৫৬ বিবাসঃ ইতি।' অর্থাৎ-'ব্যুষিতের দ্বারা (আমার ব্যুষিত বা প্রবাসী অবস্থায়) ঘোষণাটি প্রচারিত হইল। প্রবাস—২৫৬ [রাত্রি]।' আবার সহস্রাম প্রতিতে পাইতেছি— 'ইদং শ্রাবণং ব্যুষ্টেন [কৃতম]। দ্বিপঞ্চশদ্রাত্রি-শতে ব্যুষ্টঃ ইতি—২৫৬।' অর্থাৎ 'এই ঘোষণা ব্যুষিতের দ্বারা (আমার প্রবাসকালে) [ঘোষিত হইল]। দুইশত ছাপান্ন রাত্রি পর্যন্ত ব্যুষিত [আছি]—২৫৬।' ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সম্রাট্ অশোক ২৫৬ রাত্রি প্রবাসে কাটাইবার পরদিন ১নং ক্ষুদ্র শৈলানুশাসনটি প্রচার করিয়াছিলেন।

কথাটির অর্থ স্পষ্ট। কিন্তু বহুদিন পূর্বে যখন অশোকের অনুশাসনাবলী একে একে আবিষ্কৃত এবং পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইতেছিল, তখন ইহার কতকগুলি ভ্রান্ত ব্যাখ্যা প্রচারিত হইয়াছিল এবং আজিও পণ্ডিতসমাজ সেই ভ্রান্তির প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই। তাই এখনও অনেকে 'ব্যুথেন ২৫৬' কথাটির বিভিন্ন আজগুবি ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন; যেমন ১. ২৫৬ সংবৎসর কালে, ২. ২৫৬ জন ধর্মপ্রচারক দ্বারা, ৩. ২৫৬ জন রাজকর্মচারী পাঠাইয়া, ৪. ঘোষণার ২৫৬ প্রতি পাঠাইয়া, ইত্যাদি, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এই সকল ব্যাখ্যার মূল্য কিছু নাই।

যাঁহারা '২৫৬ বৎসর' অর্থ করিয়াছেন, তাঁহাদের ধারণা এই যে, অনুশাসনটি বুদ্ধ-পরিনির্বাণাব্দের ২৫৬ সংবৎসরে ঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে সহস্রাম প্রতিতে ঐ সংখ্যার সহিত স্পষ্টই 'রাত্রি' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। রূপনাথ প্রতির 'বিবাস' (প্রবাস) শব্দটিও এই সম্পর্কে লক্ষণীয়। আবার শিলালেখ ও তাম্রপত্রাদি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, সুপ্রাচীন যুগে ভারতের জৈন, বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী রাজগণ কোন সালের ব্যবহার জানিতেন না; তাই তাঁহারা দলিলপত্রে স্বকীয় রাজ্য-সংবৎসরের তারিখ দিতেন। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের শক প্রমুখ বৈদেশিক জাতীয় রাজগণ সালের ব্যবহার সূচিত করেন। বহুকাল পরে তাঁহাদের ব্যবহৃত সালটি বিক্রমসংবৎ নামে পরিচিত হয়। আবার খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুষাণ-বংশীয় সম্রাট্ প্রথম কনিষ্কের অভিষেকবর্ষ হইতে যে সালের গণনা প্রচলিত হয়, কালক্রমে উহা শকাব্দ নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে প্রাচীন

বলিয়া মনে হয় এরূপ কয়েকটি সাল পরবর্তী কালে পরিকল্পিত হইয়াছিল, যেমন কলিযুগাব্দ।

উপরে অশোকের ১নং ক্ষুদ্র শৈলানুশাসনের বিভিন্ন প্রতি হইতে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, উহার স্থলে আহ্‌রৌরা প্রতিতে আছে— 'এস সাবনে বিবুথেন দুবে-সপংনা-লাতি-সতি অং মংচে বুধস সলীলে আলোঢে তি।' ইহার সংস্কৃত রূপ—'ইদং শ্রাবণং ব্যুষিতেন [ময়া কৃতং] দ্বি-ষট্‌পঞ্চাশদ্রাত্রি-শতে যৎ (যতঃ) মঞ্চং বুদ্ধস্য শরীরং মঞ্চম্‌ আরূঢম্‌ ইতি।' কিঞ্চিৎ স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়— 'যদা বুদ্ধস্য শরীরং মঞ্চম্‌ আরূঢম্‌ অভবৎ ততঃ দ্বি-ষট্‌পঞ্চাশদ্রাত্রি-শতে ব্যুষিতেন ময়া ইদং শাসনং কৃতম্‌।' অর্থাৎ 'যখন বুদ্ধের শরীর মঞ্চারূঢ় হয়, তখন হইতে দুইশত ছাপান্ন রাত্রি প্রবাসে অতিবাহিত করিবার পরদিন আমি এই ঘোষণা প্রচার করিলাম।'

বৌদ্ধ সাহিত্যে 'বুদ্ধের শরীর' বলিতে ভগবান্‌ বুদ্ধের দেহাবশেষ বুঝায়। কথিত আছে যে, বুদ্ধের দেহাবশেষের উপর প্রাচীনকালে যে সকল স্তূপ নির্মিত হইয়াছিল, উহা হইতে অস্থি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া মৌর্য সম্রাট্‌ অশোক সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে চুরাশী হাজার স্তূপ নির্মিত করাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে সুবিখ্যাত অশোকারাম মৌর্যরাজধানী পাটলিপুত্রে অবস্থিত ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউ এন-চাং পূর্বে বাংলা দেশ এবং দক্ষিণ-মাদ্রাজের নিকটবর্তী কাঞ্চীপুরে পর্যন্ত অশোকনির্মিত স্তূপের সন্ধান পাইয়াছিলেন। হিউএন-চাঙের বিবরণ হইতে আরও জানিতে পারি যে, পাটলিপুত্রে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধের চরণচিহ্নসংবলিত একখানি শিলাপট্টকে অশোক প্রত্যহ পূজা করিতেন। কিন্তু শিলাপট্টটি অশোকারামে স্থাপিত ছিল কিনা তাহা জানা যায় না।

আমারা জানি, অশোকের অভিষেকের আট বৎসর পরে অর্থাৎ তাঁহার নবম রাজ্যবর্ষে (আনুমানিক ২৬১-২৬০ খ্রীঃ পূঃ) তিনি কলিঙ্গ দেশ জয় করেন। পরবর্তী বৎসরের শেষ ভাগে অশোক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। একাদশ রাজ্যবর্ষের (আনুমানিক ২৫৯-২৫৮খ্রীঃ পূঃ) শেষাংশে বৌদ্ধসঙ্ঘের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়া তিনি ধর্মপ্রচারে উৎসাহী হন এবং তীর্থযাত্রার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া প্রথমেই সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ তীর্থ সংবোধি বা বোধগয়াতে যান। দ্বাদশ রাজ্যবর্ষের মাঝামাঝি সময়ে অশোক দীর্ঘকালের জন্য তীর্থভ্রমণে বাহির হন এবং সাড়ে আট মাস পরে পরবর্তী বৎসরের (আনুমানিক ২৫৭-২৫৬ খ্রীঃ পূঃ) প্রথম ভাগে প্রবাস হইতেই ১নং ক্ষুদ্র শৈলানুশাসন প্রচারিত করেন। অনুশাসনের আহ্‌রৌরা প্রতি হইতে আমরা এখন জানিতে পারিলাম যে, পাটলিপুত্রে বুদ্ধের দেহাবশেষ মঞ্চারূঢ় হইবার দিন অশোক দীর্ঘকালের জন্য তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। অশোকই যে পূজার জন্য বুদ্ধের দেহাবশেষ মঞ্চোপরি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে এই মঞ্চটিকে কেন্দ্র করিয়াই পাটলিপুত্রের অশোকারাম স্তূপ নির্মিত হইয়াছিল কিনা, তাহা বলা কঠিন।

আহ্‌রৌরা অনুশাসনের উদ্ধৃত বাক্যটিতে কেহই 'অং মংচে' (সংস্কৃত 'যৎমঞ্চম্‌')

পড়িতে ও ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। এই তিনটি অক্ষরের স্থলে মহামহোপাধ্যায় মিরাশী পড়িয়াছেন 'সং বং সং'। ইহা একেবারে অসম্ভব। অধ্যাপক শর্মাও অক্ষরগুলি পড়িতে পারেন নাই। ডক্টর নারায়ণ ও শ্রীযুক্ত শঙ্করনারায়ণ পড়িয়াছেন 'অংমং চ'। তাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় অক্ষর নির্ভুলভাবে পড়িতে পারিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের ব্যাখ্যায় ভুল আছে। নারায়ণের মতে 'অং মং' শব্দটি প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃত 'অহ্মং' অর্থাৎ 'আমাদের'। কিন্তু যে যুগে ভগবান বুদ্ধের দেহাবশেষ অসীম শ্রদ্ধার সহিত পূজা করা হইত, তখন বৌদ্ধেরা তাঁহাকে 'আমাদের বুদ্ধ' বলিয়া আত্মীয়ভাবে উল্লেখ করিবেন, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। শঙ্করনারায়ণ বলেন যে, 'অংমং' শব্দে এখানে সংস্কৃত 'আশ্ম' অর্থাৎ 'প্রস্তরনির্মিত' বুঝিতে হইবে। সুতরাং 'অংমং চ বুধস সলীলে' কথাটির অর্থ হইবে 'বুদ্ধের প্রস্তরনির্মিত প্রতিকৃতি'। কিন্তু বৌদ্ধসাহিত্যে 'বুদ্ধের শরীর' বলিতে তাঁহার দেহাবশেষ বুঝায়, প্রতিকৃতি নহে। অধিকন্তু আদিম বৌদ্ধযুগে বুদ্ধের প্রতিকৃতি পূজিত হইত না, ইহা সকলেই অবগত আছেন। বুদ্ধের নামে শ্বেতহস্তী বা ধর্মচক্রচিহ্নের পূজা প্রচলিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু উহাকে 'বুদ্ধের শরীর' বলা হইত না।

আহ্‌রৌরা অনুশাসন একাদশ পংক্তিতে লিখিত। তন্মধ্যে প্রথম হইতে ষষ্ঠ পংক্তি পর্যন্ত অংশের অনেকগুলি অক্ষর ভাঙিয়া গিয়াছে। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তি ব্যতীত অন্য স্থানের লুপ্ত অক্ষরগুলি অনুশাসনটির অন্যান্য প্রতির সাহায্যে উদ্ধার করা যায়।

অনুশাসনের পাঠ

১। ....[দেবানং] পিয়ে (।*) সাতি—

২। [লেকানি]..........................(।*) সাধিকা [নি অঢ]—

৩। [তিয়ানি সংবছলানি অং উপাসকে সুমি (।*) নো] চ বাঢং পলকংতে (।*)

৪। [সংবছলে সাধিকে অং সুমি হকং সংঘ উপেত বাঢং] চ পলকংতে (।*) এতেন

৫। অংতলে [ন জংবুদীপসি অমিসংদেবা সংত মুনিসা] মিসংদেবা কটা (।*)

৬। পলকমস ই [য়ং ফলে (।*) নো হীয়ং মহ] ত্বন ব সক্য পাপোতবে (।*) খুদকেন পি

৭। পলকমমীনেনা বিপুলে পি স্বগ সক্যে আলাধেতবে (।*) এতায়ে অঠায়ে

৮। ইয়ং সাবনে (।*) খুদকা চ উডালা চ পলকমংতু (।*) অংতা পি চ জানংতু (।*)

৯। চীলঠীতীকে চ পলকমে হোতু (।*) ইয়ং চ অঠে বঢিসতি বিপুলংপি চ

১০। বঢিসতি দিয়ঢিয়ং অবলধিয়া বঢিসতি (।*) এস সাবনে বিবুথেন

১১। দুবে-সপংনা-লাতি-সতি অং মংচে বুধস সলীলে আলোঢে তি।

সংস্কৃত ছায়া

.... দেবানাম্প্রিয়ঃ। সাতিরেকাণি............ ...। সাধিকান্ অর্দ্ধতৃতীয়ান্ সংবৎসরান্ যদ্ [অহম্] উপাসকঃ অস্মি। নো চ [অহম্ আদৌ] বাঢং পরাক্রান্তঃ। সংবৎসরং সাধিকং যদ্ অস্মি অহং সঙ্ঘম্ উপেতঃ বাঢং চ [অহং] পরাক্রান্তঃ। এতেন অন্তরেণ জম্বুদ্বীপে অমিশ্রদেবাঃ সন্তঃ মনুষ্যাঃ [ময়া] মিশ্রদেবাঃ কৃতাঃ। [মম] পরাক্রমস্য ইদং ফলম্। নো হীয়ং মহাত্মনা এব শক্যং প্রাপ্তুম্। ক্ষুদ্রকেণ অপি পরাক্রমমানেন বিপুলঃ অপি স্বর্গঃ শক্যঃ আরাধয়িতুম্। এতস্মৈ অর্থায় ইদং শ্রাবণং [ময়া কৃতম্]। ক্ষুদ্রকাঃ চ উদারাঃ চ পরাক্রমন্তু। অন্তা অপি চ জানন্তু। চিরস্থিতিকঃ চ পরাক্রমঃ ভবতু। অয়ং চ অর্থঃ বর্দ্ধিষ্যতে, বিপুলম্ অপি চ বর্দ্ধিষ্যতে, দ্ব্যর্দ্ধম্ অবরাধিকেণ বর্দ্ধিষ্যতে। ইদং শ্রাবণং ব্যুষ্টেন (ব্যুষিতেন ময়া) [কৃতং] দ্বি-ষট্পঞ্চাশদ্রাত্রিশতে যৎ (যতঃ) মঞ্চং বুদ্ধস্য শরীরম্ আরূঢম্ ইতি।

বঙ্গানুবাদ

দেবপ্রিয় (অশোক)...। কিঞ্চিদধিক...। আড়াই বৎসরের কিছু বেশীদিন হইল, [আমি বৌদ্ধ] উপাসক হইয়াছি। কিন্তু [প্রথম দিকে আমি ধর্মবিষয়ে] বিশেষ উৎসাহী হই নাই। কিঞ্চিদধিক একবৎসর হইল, আমি [বৌদ্ধ] সঙ্ঘের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং [ধর্মবিষয়ে] উৎসাহী হইয়াছি। এই সময়ের মধ্যে জম্বুদ্বীপে (মৌর্যসাম্রাজ্যে) যে সকল মনুষ্য দেবতাগণের সহিত অমিশ্রিত (মিলিত হইবার অযোগ্য) ছিল, তাহাদিগকে [আমি] দেবতাদিগের সহিত মিশ্রিত (মিলিত হইবার যোগ্য) করিয়াছি। ইহা [আমার ধর্মবিষয়ক] উৎসাহের ফল। কিন্তু ইহা (এইরূপ সুফল) যে কেবল [আমার ন্যায়] বড় লোকের পক্ষেই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব, তাহা নহে। উৎসাহী হইলে গরীব লোকেও পরম স্বর্গ লাভ করিতে পারে। এই (নিম্নলিখিত) উদ্দেশ্যে এই ঘোষণাটি [মৎকর্তৃক বিঘোষিত হইল]। গরীব এবং বড় লোকেরা [ধর্মবিষয়ে] উৎসাহী হউক। প্রত্যন্তদেশবাসীরাও [এই ধর্মোৎসাহের বিষয়] জানুক। [ধর্মবিষয়ক] উৎসাহ চিরস্থায়ী হউক। এই বিষয়টি (ধর্মোৎসাহ) [ক্রমশঃ] বাড়িবে, বেশীরকমই বাড়িবে, কমবেশী দেড়গুণ বাড়িবে। এই ঘোষণাটি [রাজধানী পাটলিপুত্রে] বুদ্ধের দেহাবশেষ মঞ্চে আরূঢ় হইবার [দিন] হইতে দুইশত ছাপ্পান্ন রাত্রি প্রবাসে (তীর্থভ্রমণে) কাটাইবার পর [দিন ঘোষিত করিলাম]।

পাতঞ্জল মহাভাষ্য

শিবসূত্র ঃ প্রত্যাহারাহ্নিক

সটীক অনুবাদ

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

উপোদ্‌ঘাত

মহর্ষি পতঞ্জলি বিরচিত 'মহাভাষ্য' প্রাচীন ভারতীয় মনীষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন— ইহা জগতের পণ্ডিতসমাজ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। পাণিনীয় "অষ্টাধ্যায়ী" সূত্রপাঠের কাত্যায়ন প্রভৃতি বার্তিককার পরবর্তীকালে যে সকল দূষণোদ্ভাবন করিয়াছিলেন, মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার এই ভাষ্যগ্রন্থে সেই সকল বার্তিকেরই প্রধানতঃ সমীক্ষা করিয়া গিয়াছেন। অধিকাংশস্থলে বার্তিক-কারের আক্রমণ হইতে সূত্রকারকে রক্ষা করাই ভাষ্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য, যদিও তিনি নিজেও বহুস্থলে সূত্রকারের অভিমত খণ্ডন করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। সূত্রকার, বার্তিককার এবং ভাষ্যকার— পাণিনীয় সম্প্রদায় এই মুনিত্রয়ের মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য 'পাণিনীয় ব্যাকরণ' 'ত্রিমুনি ব্যাকরণ' রূপে কথিত হইয়া থাকে। মুনিত্রয়ের মধ্যে যেখানে পরস্পর মতবিরোধ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই স্থলে পরবর্তী আচার্যের মতই প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। সূত্রকার হইতে বার্তিককার, এবং সূত্রকার ও বার্তিককার হইতে ভাষ্যকারই প্রবল— "যথোত্তরং মুনীনাং প্রামাণ্যম্।"

দুঃখের বিষয়, এই অমূল্য ভাষ্যগ্রন্থের অদ্যাপি বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই। স্বামী বিবেকানন্দের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার ফলে ৺মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী মহাশয় 'উদ্বোধন' পত্রিকায় নবম আহ্নিক পর্যন্ত মহাভাষ্যের আক্ষরিক অনুবাদ প্রকাশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের ভূতপূর্ব আশুতোষ-অধ্যাপক ৺প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্তী মহোদয় মহাভাষ্যের প্রথম আহ্নিক 'পস্পশা'র ইংরাজী অনুবাদ *Indian Culture* পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। কয়েক বৎসর পূর্বে পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় 'বসুমতী' পত্রিকায় 'মহাভাষ্যে'র অনুবাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহার আকস্মিক পরলোকগমনে প্রথমাহ্নিকের কিয়দংশ মাত্র প্রকাশিত হওয়ার পর অনুবাদকার্য অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। ইহার পর মহাভাষ্যের অনুবাদকার্যে আর কেহ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। মহাভাষ্যের প্রথমাহ্নিক 'পস্পশা' অতিশয় গম্ভীরার্থক হইলেও উহার সহিত মূল

"অষ্টাধ্যায়ী'র অঙ্গাঙ্গিভাব সম্বন্ধ নাই। সেইজন্য প্রথমাহ্নিক ছাড়িয়া দিয়া দ্বিতীয় 'প্রত্যাহারাহ্নিক' হইতেই বর্তমান অনুবাদকার্য প্রারব্ধ হইল। দ্বিতীয় আহ্নিকে ভাষ্যকার পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ীর মূলভিত্তিস্বরূপ চতুর্দশসূত্রী বা অক্ষরসমাম্নায়ের (list of alphabet)ই সূক্ষ্মভাবে বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন। 'অ ই উ ণ্' প্রভৃতি চতুর্দশসূত্রী মহর্ষি পাণিনি দেবাদিদেব মহেশ্বরের ঢক্কানিনাদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন,— ইহাই পাণিনীয় সম্প্রদায়ের আচার্যগণের অভিমত।[১] সেইজন্য এই চতুর্দশসূত্রী 'শিবসূত্র'-রূপে প্রসিদ্ধ। লোকব্যবহারে শৈশবে আমরা যে-ক্রমে অ-কারাদিবর্ণ শিক্ষা করিয়া থাকি, শিবসূত্রে তাহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন আ-কার, ঈ-কার, ঊ-কার, ঋ-কার প্রভৃতি দীর্ঘ ও প্লুত বর্ণ এই সমাম্নায়ে (list) উপদিষ্ট হয় নাই। শিবসূত্রে কিজন্য লোকপ্রসিদ্ধ ক্রম (sequence) ত্যাগ করিয়া বিপরীত ক্রম আশ্রয় করা হইল, কেনই বা আ-কারাদি বর্ণের উপদেশ করা হয় নাই,—ইত্যাদি বিষয় সূক্ষ্মভাবে বিচার করাই 'প্রত্যাহারাহ্নিকে'র উদ্দেশ্য। এই 'প্রত্যাহারাহ্নিকে'র প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম না করিলে পরবর্তী আহ্নিকসমূহের ভাষ্যগ্রন্থ দুরূহ বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে। 'প্রত্যাহারাহ্নিক'ই পাণিনীয় সূত্রব্যাখ্যার প্রথম সোপান-স্বরূপ ॥

অনুবাদক

১. পাণিনির পূর্বেও যে বিভিন্ন প্রাতিশাখ্যে বিভিন্ন বর্ণসমাম্নায় এবং প্রত্যাহার প্রচলিত ছিল, ইহা এক্ষণে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। সামবেদীয় প্রাতিশাখ্য "ঋকৃতন্ত্রে" এইরূপ একটি অক্ষর-সমাম্নায় পঠিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে র এবং হ-সংজ্ঞক দুইটি প্রত্যাহারও স্বীকৃত হইয়াছে। "ঋকৃতন্ত্রে"র প্রণেতা আচার্য শাকটায়ন পাণিনির পূর্বগামী ছিলেন। তিনি এই 'অক্ষর-মাম্নায়'কে 'ব্রহ্মরাশি' নামে অভিহিত করিয়াছেন। তুলনীয়: "ইদমক্ষরং ছন্দোবর্ণশঃ সমনুক্রান্তম্। যথাচার্য্যা উচু-র্ব্রহ্মা বৃহস্পতয়ে প্রোবাচ বৃহস্পতিরিন্দ্রায় ইন্দ্রো ভরদ্বাজায় ভরদ্বাজ ঋষিভ্য ঋষয়ো ব্রাহ্মণেভ্যস্তং খল্বিমমক্ষর-সমাম্নায়মাচক্ষতে। ন ভুক্ত্বা ন নক্তং প্রব্রূয়াদ্ ব্রহ্মরাশিরিতি চ ব্রহ্মরাশিরিতি চ॥" —ঋকৃতন্ত্র, ১ম প্রপাঠক. পৃ. ৩, (পণ্ডিত সূর্য্যকান্ত শাস্ত্রিকর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণ'— লাহোর, ১৯৩৩)। অপি চ—"The device of *anubandhas* or signification endings, so advantageously used by Pāṇini is also found here, which shows that the device already existed and Pāṇini only utilised it to its utmost limits."—ঐ ভূমিকা, পৃঃ ৩৯, পাদটীকা ১। এই প্রসঙ্গে শৌনকীয় 'ঋক্প্রতিশাখ্যে'র 'পার্ষদবৃত্তি' এবং ডঃ মঙ্গলদেব শাস্ত্রিপ্রণীত ঋক্প্রতিশাখ্যের 'ভূমিকা' (পৃ. ১৬) দ্রষ্টব্য।

অনুবাদ ও টিপ্পনী

শিবসূত্র— অ ই উ ণ্ ॥ ১ ॥

(বিবৃতোপদেশপ্রতিজ্ঞাবার্তিকম্ ॥)

বার্তিকমূল। * অ-কারস্য বিবৃতোপদেশ আকারগ্রহণার্থঃ ॥*॥

(ভাষ্যম্)

ভাষ্যমূল।—অকারস্য বিবৃতোপদেশঃ কর্তব্যঃ।

কিং প্রয়োজনম্?

আ-কারগ্রহণার্থঃ। অ-কারঃ সবর্ণগ্রহণেনাকারমপি যথা গৃহ্ণীয়াৎ ॥

ভাষ্যানুবাদ। (শিবসূত্রে) অ-কারের বিবৃতপ্রযত্নযুক্তভাবে উপদেশ করা উচিত।

প্রশ্ন—কি প্রয়োজন?

উত্তর—আ-কারের গ্রহণই (ইহার) প্রয়োজন। যাহাতে [অণুদিৎ সবর্ণস্য চাপ্রত্যয়ঃ (১.১.৬৯)] সবর্ণগ্রাহক (এই) সূত্রানুসারে (বিবৃতপ্রযত্নযুক্ত) অ-কারের দ্বারা (বিবৃত-প্রযত্নযুক্ত) আ-কারেরও গ্রহণ হইতে পারে।

টিপ্পনী :—'তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্' এই সূত্রানুসারে যে বর্ণের সহিত যে বর্ণের উচ্চারণ-স্থান এবং আভ্যন্তরপ্রযত্নবিষয়ে সাম্য আছে, সেই বর্ণদ্বয় সবর্ণরূপে পরিচিত হইয়া থাকে ; এবং 'অণুদিৎ সবর্ণস্য চাপ্রত্যয়ঃ' এই সূত্রানুসারে অভিধীয়মান অ, ই, উ, ঋ, ঌ, এ ঐ, ও, ঔ, হ, য, ব, র, ল, এবং কু চু-টু-তু-পু এই পাঁচটি বর্গের অন্তর্বর্তী যে কোনও একটি বর্ণ স্থানপ্রযত্নসাম্যযুক্ত স্ব-স্ব সবর্ণের গ্রাহক হইয়া থাকে। এক্ষণে ইহা লক্ষণীয় যে, শিবসূত্রে আ-কারের উপদেশ করা হয় নাই। অবর্ণের উপদেশের দ্বারা আ-কারেরও উপদেশ সিদ্ধ হইয়াছে,—ইহাই আচার্যের মত। কিন্তু অ-কারের সহিত যদি আ-কারের স্থানসাম্য এবং প্রযত্নসাম্য না থাকে তবে সবর্ণগ্রাহক সূত্রানুসারে অ-কারের উচ্চারণের দ্বারা আ-কারের গ্রহণ হইতে পারে না। যদিও অ-কারের সহিত আ-কারের স্থানসাম্য (কণ্ঠ্যবর্ণ) আছে, তথাপি অ-কার স্বভাবতঃ সংবৃতপ্রযত্নযুক্ত, এবং আ-কারের বিবৃতপ্রযত্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং অ-কারের গ্রহণের দ্বারা কিরূপে আ-কারেরও গ্রহণ সম্ভব হইতে পারে? অতএব যাহাতে অ-কারের দ্বারা আ-কারেরও গ্রহণ হইতে পারে, সেইজন্য শিবসূত্রে প্রয়োগে সংবৃতপ্রযত্নযুক্ত হইলেও শাস্ত্রদৃষ্টিতে শাস্ত্রীয় কার্যসিদ্ধির জন্য অ-কারকে বিবৃতপ্রযত্নযুক্তরূপে উপদেশ করা হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। এইভাবে, শাস্ত্রদৃষ্টিতে অ-কার বিবৃতপ্রযত্নযুক্ত হওয়ার ফলে, বিবৃতপ্রযত্নযুক্ত আ-কারের সহিত উহার সাবর্ণ্য

থাকায়, সবর্ণগ্রাহক "অণুদিৎ—" সূত্রানুসারে অ-কারের উচ্চারণের দ্বারা আ-কারেরও গ্রহণ হইয়া থাকে। মহর্ষি পাণিনি অষ্টাধ্যায়ীর অন্তে 'অ অ' (৮. ৪. ৬৬) এই সূত্রে পুনরায় বিবৃতপ্রযত্নযুক্ত অ-কারের স্থলে প্রয়োগে সংবৃতপ্রযত্নযুক্ত অ-কারের আদেশ বিধান করিয়াছেন। 'অ অ' সূত্রটি 'পূর্বত্রাসিদ্ধম্' (৮. ২. ১) অধিকারস্থ ত্রিপাদীর সর্বশেষ সূত্র হওয়ায় সমগ্র অষ্টাধ্যায়ীর প্রতি অসিদ্ধ অর্থাৎ অসৎকল্প। সুতরাং শাস্ত্রদৃষ্টিতে অ-কার বিবৃতপ্রযত্নযুক্তই রহিল। প্রয়োগে সংবৃত অ-কারের মহর্ষি পাণিনি কিজন্য বিবৃতপ্রযত্নযুক্তরূপে উপদেশ করিলেন, তাহা নিম্নলিখিত কারিকাটিতে সংগৃহীত হইয়াছে :

"আদেশার্থং সবর্ণার্থমকারো বিবৃতঃ স্মৃতঃ।"

* * * * * *

ভাষ্যমূল। কিং চ কারণং ন গৃহ্নীয়াৎ ?॥
বিবারভেদাৎ ॥

ভাষ্যানুবাদ। প্রশ্ন—(অ-কার) কি হেতু (আ-কারকে) গ্রহণ করিবে না ?
উত্তর—বিবাররূপ প্রযত্নভেদ-বশতঃ।

টিপ্পনী—'বিবার'শব্দ এখানে 'বিবৃত'-সংজ্ঞক আভ্যন্তরপ্রযত্নকে বুঝাইতেছে। কেননা, যদিও বিবার নামে একটি বাহ্য প্রযত্নও প্রসিদ্ধ আছে, তথাপি সবর্ণসংজ্ঞার স্থলে কেবলমাত্র স্থান এবং আভ্যন্তরপ্রযত্নই উপযোগী বলিয়া, এস্থলে বিবারসংজ্ঞক আভ্যন্তরপ্রযত্নই বোধিত হইয়াছে, বাহ্যপ্রযত্ন নহে,—ইহা বুঝিতে হইবে। কৈটয় 'প্রদীপ'-টীকায় 'বিবার-পদের ব্যুৎপত্তিপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন :
"বিবারয়তি বিকাসয়তি আস্যমিতি বিবারঃ প্রযত্নঃ।"

নাগেশ তাঁহার 'উদ্দ্যোত' ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন :
"স চাভ্যন্তরপ্রযত্নঃ"।

দ্রষ্টব্য—"তাবতাঽপি তস্য বাহ্যে প্রসিদ্ধেস্তস্য সবর্ণসংজ্ঞায়ামগ্রহাদনুপপত্তিরেবাত আহ —স চেতি। তথাচ বিবারপদং বিবৃতপরং তেন ভেদাৎ ইত্যর্থঃ।"—ছায়াটীকা।

ভাষ্যমূল। কিমুচ্যতে—বিবারভেদাদিতি, ন পুনঃ কালভেদাদপি। যথৈব হ্যয়ং বিবারভিন্নঃ, এবং কালভিন্নোঽপি ?॥

ভাষ্যানুবাদ। প্রশ্ন—'বিবাররূপপ্রযত্নভেদবশতঃ'—শুধু এইটুকু কেন বলা হইল ? 'কালভেদবশতঃ' ইহাও কেন বলা হইল না ? (আ-কার) যেমন (অ-কার হইতে) বিবার-ভেদবশতঃ ভিন্ন, সেইরূপ কালভেদবশতঃও ত' ভিন্ন ?

টিপ্পনী—তাৎপর্য এই,—অ-কারের সহিত আ-কারের শুধু আভ্যন্তরপ্রযত্নভেদই আছে, তাহা নহে। কালভেদও আছে। অর্থাৎ হ্রস্ব অ-কারের কালকৃতপরিমাণ বা মাত্রা

এক, কিন্তু দীর্ঘ ও প্লুত আ-কারের মাত্রা যথাক্রমে দুই এবং তিন। সুতরাং, কালভেদবশতঃও অ-কার আ-কারকে গ্রহণ করিতে পারে না, ইহাও বলা উচিত ছিল।

ভাষ্যমুল।—সত্যমেব তৎ। বক্ষ্যতি "তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্"—ইত্যত্রাস্য-গ্রহণস্য প্রয়োজনম্—আস্যে যেষাং তুল্যো দেশঃ প্রযত্নশ্চ তে সবর্ণসংজ্ঞা ভবন্তীতি। বাহ্যশ্চ পুনরাস্যাৎ কালঃ। তেন স্যাদেব কালভিন্নস্য গ্রহণম্, ন পুনর্বিবারভিন্নস্য॥

ভাষ্যানুবাদ। উত্তর—এই আক্ষেপ একান্ত অসমীচীন নহে। "তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্" (১. ১. ৯) এই সূত্রে কিন্তু 'আস্য' শব্দগ্রহণের প্রয়োজন বলা হইবে যে, আস্যের মধ্যে যে সকল বর্ণের উচ্চারণদেশ তুল্য এবং প্রযত্নও তুল্য, তাহারাই কেবল সবর্ণসংজ্ঞক হইবে। (বর্ণের) উচ্চারণকাল (যাহা বর্ণের মাত্রাপরিমাণের ঘটক) কিন্তু আস্যের বহির্ভূত। সুতরাং, কালভেদে ভিন্ন হইলেও এক বর্ণের (অপর এক বর্ণের দ্বারা) গ্রহণ হইতে পারে, কিন্তু বিবারভিন্ন বর্ণের গ্রহণ হইতে পারে না।

টিপ্পনী—'তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্' (১. ১. ৯) সূত্রে 'আস্য' শব্দ (মুখবাচী) মুখমধ্যবর্তী উচ্চারণস্থানকে বুঝাইতেছে। 'আস্যে ভবম্ আস্যম্'। 'প্রযত্ন' শব্দও আস্যমধ্যবর্তী প্রযত্ন (অর্থাৎ চতুর্বিধ আভ্যন্তরপ্রযত্ন,—স্পৃষ্টতা, ঈষৎস্পৃষ্টতা, বিবৃতত্ব, এবং সংবৃতত্ব)-কেই বুঝাইতেছে। সুতরাং আস্যমধ্যবর্তী প্রযত্ন ভিন্ন হইলে সাবর্ণ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। সাবর্ণ্যের দুইটি ঘটক,— স্থানসাম্য ও আভ্যন্তরপ্রযত্নসাম্য। কিন্তু উচ্চারণকাল সবর্ণত্বের প্রযোজক হইতে পারে না। প্রযত্নের দ্বারা অভিনিষ্পন্ন হয় বলিয়া কালকে প্রযত্ন বলিয়া স্বীকার করিলেও, উহা সবর্ণত্বের ঘটক হইতে পারে না। কাল বাহ্য পদার্থ। বস্তুর স্বরূপ নহে। উচ্চারণের কালকৃত (পরিমাণ) প্রসিদ্ধই। ঈদৃশ কালপরিমাণই বর্ণের মাত্রাদিব্যবহারের নিমিত্ত হইয়া থাকে। অক্ষিপক্ষ্মে (eyelids) নিমেষ-উন্মেষাদি ক্রিয়াই বর্ণের কালিকপরিমাণের বোধক। সিদ্ধান্তে স্ফোটবাদ স্বীকৃত হওয়ায় শব্দ নিত্য ও বিভু। স্বরূপতঃ শব্দের পরিমাণ স্বীকৃত হয় নাই। শব্দের পরিমাণভেদ উপাধিকৃতই বলিতে হইবে। উচ্চারণস্থান এবং আভ্যন্তরপ্রযত্ন উপাধি হইলেও, তাহা আস্যমধ্যবর্তী বলিয়া আভ্যন্তর; কিন্তু হ্রস্বত্বাদি কালিকব্যবহার আস্যবহির্ভূত দ্রব্যান্তরের ক্রিয়াকে অপেক্ষা করে বলিয়া বাহ্য উপাধি। কালবহির্ভূত পরিচ্ছেদক দ্রব্যের ক্রিয়া। তাহার সহিত বর্ণের সম্বন্ধ দূরতর বলিতে হইবে। ইহা প্রথম সমাধান। যদি স্বতন্ত্র ক্ষণসমূহকেই কাল বলা হয়, তাহা হইলে হ্রস্বত্ব-দীর্ঘত্বাদি বর্ণের কালিকধর্মই বলিতে হইবে। কিন্তু

ঈদৃশকালের অভিব্যঞ্জক বায়ুই,– ইহা শিক্ষাশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। বায়ুর অল্পত্ব হ্রস্বত্বের ব্যঞ্জক, এবং আধিক্য দীর্ঘত্বাদির ব্যঞ্জক। এই মতানুসারে কালকে বাহ্য উপাধি বলা যাইতে পারে না। কারণ ইহা প্রযত্নাদির ন্যায় আভ্যন্তর উপাধিস্থানীয়। আভ্যন্তরপ্রযত্নাদি যেরূপ স্বরূপাভিব্যক্তির হেতু, কালও তদ্রূপ হওয়ায় কালকৃত ভেদও সবর্ণত্বের বিঘটক হইতে পারিবে, এই আশঙ্কার উত্তরে কৈয়ট দ্বিতীয় কল্পের উদ্ভাবন করিয়াছেন। কল্পান্তরে বায়ু বর্ণের অভিব্যঞ্জক হইলেও ইহা উচ্চারণ-স্থানের বহির্ভূত নাভিপ্রদেশেই হ্রস্বত্বাদির সম্পাদন করে। তন্নিমিত্ত কাল বাহ্য উপাধিই হইল। যাহা উচ্চারণস্থানের অন্তর্গত, সেইরূপ উপাধিই সবর্ণত্বের প্রযোজক। আস্যবর্তী উচ্চারণস্থান ও তদন্তর্বর্তী প্রযত্নই ঈদৃশ উপাধি। সুতরাং কালকৃত ভেদের দ্বারা সবর্ণত্বের ব্যাঘাত হইল না। "বাহ্যঃ পুনরাস্যাৎ কালঃ"— ভাষ্যকারের এই উক্তির অভিপ্রায়—উক্ত দুই প্রকারেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতএব কালভেদ হইলেও বর্ণসমূহের মধ্যে পরস্পর সাবর্ণ্য সিদ্ধ হইতে পারে। সেইরূপ দ্রুত, বিলম্বিত, মধ্যম বৃত্তিভেদ সত্ত্বেও সাবর্ণ্য অব্যাহত থাকে। তুলনীয় :

'প্রসিদ্ধপরিমাণবস্ত্বন্তরগতপরিচ্ছেদকক্রিয়ান্তরাপেক্ষণাৎ কালব্যবহারস্য বাহ্যত্বং কালস্য। যথা ব্রীহেঃ প্রস্থাদিব্যবহারঃ পরিমাণদ্রব্যকৃতঃ, এবমত্রাপি মাত্রাদিব্যপদেশো নিমেষাদিক্রিয়াভেদকৃতঃ॥ অথবা নাভিপ্রদেশ এব বিশিষ্টপ্রযত্নারম্ভাদ্ দীর্ঘাদি-নিষ্পত্ত্যা নাভেশ্চ আস্যাৎ বাহ্যত্বাদ্ কালস্য বাহ্যত্বম্। দ্রুতাদিবৃত্তয়স্তু যথা ন ভেদিকাস্তথা তপর-সূত্রে বক্ষ্যতে॥'—কৈয়ট : প্রদীপ।

'বাহ্যত্বং ব্যুৎপাদয়তি—প্রসিদ্ধেতি। ...এবং চ বাহ্যপরিচ্ছেদকক্রিয়াপেক্ষয়া বাহ্যত্বোক্তিরিতি ভাবঃ। ক্রিয়ৈব কালো নাতিরিক্ত ইতি মতে ইদম্॥ অতিরিক্তঃ ক্ষণসমূহঃ কালঃ ইতি মতে পরিহরতি—**অথবেতি**॥'—নাগেশ : উদ্দ্যোত।

ভাষ্যমূল।—কিং পুনরিদং বিবৃতস্যোপদিশ্যমানস্য প্রয়োজনমন্বাখ্যায়তে, আহোস্বিৎ সংবৃতস্যোপদিশ্যমানস্য বিবৃতোপদেশশ্চোদ্যতে ?॥

ভাষ্যানুবাদ। প্রশ্ন— (বার্তিককার) কি (উপরিউক্ত বার্তিকে, সূত্রকারকর্তৃক) উপদিষ্ট (উচ্চারিত) বিবৃত (অ-কারের) ফল খ্যাপন করিয়াছেন, অথবা (সূত্রকারকর্তৃক) সংবৃতরূপে উপদিষ্ট (অ-কারের স্থানে) (বার্তিককার) বিবৃত (অ-কারের) উপদেশ (কর্তব্য বলিয়া আক্ষেপ) করিতেছেন ?

টিপ্পনী—প্রশ্নের তাৎপর্য এই ; 'অ ই উ ণ্' সূত্রে অ-কার যদি বিবৃতরূপেই উচ্চারিত হইয়া থাকে, তবে 'অ-কারস্য বিবৃতোপদেশ আ-কারগ্রহণার্থঃ' এই বার্তিকে কাত্যায়ন শুধু সূত্রকারকর্তৃক অ-কারের বিবৃতোপদেশের সার্থকতাই প্রদর্শন করিয়াছেন বলিতে হয়। অপর পক্ষে, যদি শিবসূত্রে উচ্চারিত অ-কার সংবৃতপ্রযত্নযুক্তভাবে

উপদিষ্ট হইয়া থাকে, তবে বার্তিককার উপরি-উক্ত বার্তিকে সূত্রকারের ভ্রমপ্রদর্শন পূর্বক অ-কারের বিবৃতপ্রযত্ন আপাদন করিয়াছেন, স্বীকার করিতে হয়। প্রথম পক্ষে, অ-কারের বিবৃতত্ব সূত্রকারই স্বীকার করিয়াছেন ; দ্বিতীয় পক্ষে বার্তিককারই ইহার আবশ্যকতা প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু এই সন্দেহের হেতু কি ? 'অ ই উ ণ্' সূত্র শ্রবণেই ত' অ-কারের বিবৃতত্ব বা সংবৃতত্ব স্পষ্ট উপলব্ধ হওয়া উচিত ? ইহার উত্তরে কৈয়ট ও নাগেশ বলিয়াছেন যে, বর্ণের বিবৃতত্ব বা সংবৃতত্ব শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। সুতরাং বর্ণশ্রবণেও 'উহা বিবৃত কি সংবৃত'—এইরূপ সন্দেহ থাকিয়া যায়। সেইজন্যই ভাষ্যে এই প্রশ্নউত্থাপন করা হইয়াছে। দ্রষ্টব্য : 'দুরবধারত্বাৎ উপদিষ্টোঽপি বিবৃতো ব্যাখ্যানেন বিনা ন শক্যতে জ্ঞাতুমিতি প্রত্যক্ষেঽপি অকারে প্রশ্নোঽয়ং নাসমঞ্জসঃ ॥' —প্রদীপ। —'নমু প্রত্যক্ষতোঽকারে শ্রুতে তদ্গতগুণস্যাপি জ্ঞাতত্বাৎ প্রশ্নোঽয়ম্ অসঙ্গতোঽত আহ—দুরবধারত্বাৎ—ইতি। বিবৃতত্বাদীনাং শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বাভাবাদ্ ইতি ভাবঃ।'—উদ্দ্যোত

ভাষ্যমুল। বিবৃতস্যোপদিশ্যমানস্য প্রয়োজনমন্বাখ্যায়তে॥

কথং জ্ঞায়তে ?

যদয়ম্—"অ অ"—ইত্যকারস্য বিবৃতস্য সংবৃততা-প্রত্যাপত্তিং শাস্তি ॥

ভাষ্যানুবাদ। উত্তর—(সূত্রকারকর্তৃক) উপদিষ্ট বিবৃত অ-কারের প্রয়োজনই শুধু (বার্তিককারকর্তৃক উপরিউক্ত বার্তিকে) খ্যাপিত হইয়াছে।

প্রঃ—কিরূপে ইহা জানা যায় ?

উঃ—যেহেতু (সূত্রকার স্বয়ং) 'অ অ' (৮. ৪. ৬৬) সূত্রে বিবৃত-অ-কারের স্থানে সংবৃত অ-কারের প্রত্যাপত্তি বিধান করিয়াছেন।

টিপ্পণী—'অ অ' (৮. ৪. ৬৬) সূত্রে উদ্দেশ্যভূত প্রথম অ-কারটি বিবৃত, এবং বিধেয়ভূত দ্বিতীয়টি সংবৃত। বিবৃত অ-কারের স্থলে সূত্রকার এই সূত্রে সংবৃত অ-কারকেই বিধান করিয়াছেন। যদি অ-কারের বিবৃতত্ব সিদ্ধ না থাকিত, অ-কার যদি সংবৃতই হইত, তবে অ-কারের স্থানে সংবৃতবিধান ব্যর্থ হইত। অতএব যেহেতু সূত্রকার বিবৃত অ-কারের স্থলে সংবৃত অ-কারের বিধান করিয়াছেন, সেইহেতু ইহা অবশ্য সিদ্ধ হইতেছে যে, সূত্রকার 'অ ই উ ণ্' সূত্রে বিবৃত অ-কারেরই উপদেশ করিয়াছেন, সংবৃতের নহে। সুতরাং সূত্রকার কর্তৃক অ-কারের বিবৃতত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, বার্তিককারকর্তৃক নহে। বার্তিককার শুধু অ-কারের বিবৃতোপদেশের প্রয়োজনই উপরিউক্ত বার্তিকে উল্লেখ করিয়াছেন। জিনেন্দ্রবুদ্ধি তাঁহার 'ন্যাসে' 'প্রত্যাপত্তি' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—'স্বরূপাদ্ধি প্রচ্যুতস্য পুনস্তৎপ্রাপ্তিঃ প্রত্যাপত্তিঃ।'—Vol. I। স্বভাব হইতে অন্যথাভাব হইলে স্বরূপ-প্রচ্যুতি হয়। পুনরায় পূর্ব স্বরূপে প্রত্যাবর্তনই প্রত্যাপত্তি। অ-কার স্বভাবতঃ সংবৃত হইলেও

পাণিনিসূত্রে বিবৃতরূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে। 'অ অ' এই সূত্রে পাণিনি অ-কারের স্বাভাবিক সংবৃতত্বই স্বীকার করিতেছেন। বিবৃত উচ্চারণ কিংবা বিবৃতরূপে অভ্যুপগম শব্দসংস্কাররূপ প্রক্রিয়া সিদ্ধির জন্য 'অভ্যুপগমসিদ্ধান্তন্যায়ে' স্বীকার করা হইয়াছিল—ইহাই ব্যক্ত করিলেন।

ভাষ্যমূল।—নৈতদস্তি জ্ঞাপকম্। অস্তি হ্যন্যদেতস্য বচনে প্রয়োজনম্॥

কিম্?॥

'অতিখট্বঃ' 'অতিমালঃ'-ইত্যত্রান্তর্য্যতো বিবৃতস্য বিবৃতঃ প্রাপ্নোতি, সংবৃতঃ স্যাদিত্যেবমর্থা প্রত্যাপত্তিঃ॥

ভাষ্যানুবাদ। 'অ অ' সূত্রটি (সূত্রকারকর্তৃক অ-কারের বিবৃতোপদেশের) জ্ঞাপক হইতে পারে না। যেহেতু 'অ অ' সূত্র অনুশাসনের অন্য প্রয়োজন আছে। অন্য কি প্রয়োজন?

'অতিখট্বঃ' 'অতিমালঃ' প্রভৃতি স্থলে (স্থানী) বিবৃত (আ-কারের স্থলে) আন্তর্য্য (বা সাদৃশ্য) বশতঃ বিবৃত অ-কারেরই প্রাপ্তি ছিল; কিন্তু (বিবৃত অ-কার না হইয়া) সংবৃত অ-কারই হউক,—সেইজন্য ('অ অ' এই সূত্রে বিবৃত অ-কারের স্থলে সংবৃত অ-কারের) প্রত্যাপত্তি (উপদিষ্ট হইয়াছে)॥

টিপ্পণী—এস্থলে একদেশী পূর্বোক্ত সমাধানের (অর্থাৎ, 'অ অ' সূত্রে প্রয়োগে অ-কারের সংবৃতোপদেশের দ্বারা সূত্রকারই যে 'অ ই উ ণ্' সূত্রে অ-কারের বিবৃতোপদেশ করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞাপিত হইতেছে,—তাহার) বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন: 'অ অ' সূত্রে যে বিবৃত অ-কারের স্থানে সূত্রকার সংবৃত অ-কারের আদেশ বিধান করিয়াছেন—তাহার অন্য কারণ আছে। ইহার দ্বারা অক্ষরসমাম্নায়ে উপদিষ্ট বর্ণের বিবৃতত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। একদেশী বলেন, যে কারণে সূত্রকার 'অ অ' সূত্রে বিবৃত অ-কারের স্থানে সংবৃত অ-কারের আদেশ বিধান করিয়াছেন, তাহা এই, "খট্বাম্ অতিক্রান্তঃ", 'মালামতিক্রান্তঃ' প্রভৃতি স্থলে যখন "প্রাদয়ঃ প্রাপ্তাদ্যর্থে দ্বিতীয়য়া'—'কুগতি-প্রাদয়ঃ' (২. ২. ১৮) সূত্রস্থ এই বার্তিকানুসারে প্রাদিসমাস হইয়া থাকে, তখন 'খট্বা' এবং 'মালা' শব্দের 'একবিভক্তি চাপূর্ব-নিপাতে' (১. ২. ৪৪) সূত্রানুসারে উপসর্জন সংজ্ঞা হইয়া থাকে। ফলে সমাসের উত্তরপদভূত 'খট্বা' এবং 'মালা' শব্দের 'আ'-কারের "গোস্ত্রিয়োরুপসর্জনস্য" (১. ২. ৪৮) সূত্রানুসারে হ্রস্বত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ['হ্রস্বো নপুংসকে প্রাতিপদিকস্য' (১. ২. ৪৭) সূত্র হইতে 'গো-স্ত্রিয়োঃ—' (১. ২. ৪৮) সূত্রে 'হ্রস্বঃ' পদটি অনুবৃত্ত হইতেছে।] কিন্তু স্থানীভূত বিবৃত আ-কারের হ্রস্ব আদেশ কেবলমাত্র বিবৃত হ্রস্ব অ-কারই হইতে পারে। এইভাবে, 'অতিখট্বঃ'

'অতিমালঃ' প্রভৃতি সমস্ত পদের অন্ত্য অ-কার প্রয়োগেও বিবৃত হইবে। কিন্তু প্রয়োগে এইরূপ বিবৃত অ-কারের উচ্চারণ অনিষ্ট। অতএব, 'অতিখটঃ' 'অতিমালঃ, প্রভৃতি প্রয়োগে আন্তরতম্যবশতঃ প্রাপ্ত অনিষ্ট বিবৃত হ্রস্ব অ-কারের স্থানে ইষ্ট সংবৃত অ-কারাদেশ বিধানই 'অ অ' সূত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্য, ইহার দ্বারা ক্বচিৎ ('অতিখট্বঃ' প্রভৃতি স্থলে) প্রয়োগে প্রাপ্ত বিবৃত হ্রস্ব অ-কারের স্থলে সংবৃত হ্রস্ব অ-কারের আদেশই সূত্রকার বিধান করিয়াছেন। এই প্রয়োজন সিদ্ধির দ্বারাই 'অ অ' সূত্র প্রণয়ন চরিতার্থ হইয়াছে; সুতরাং তাহার দ্বারা 'অ ই উ ণ্' সূত্রে সূত্রকার কর্ত্তৃক অ-কারের বিবৃতোপদেশ জ্ঞাপিত হইতে পারে না। কৈয়ট একদেশিভাষ্যের তাৎপর্য্য এইভাবে উদ্ঘাটন করিয়াছেন :

"অস্তি হ্রস্বাদিতি প্রয়োগ এব প্রাপ্তে বিবৃতত্বে সংবৃতত্ব প্রত্যাপত্তিঃ স্যাদিত্যজ্ঞাপক-মেতদিত্যর্থঃ ॥"—প্রদীপ।

নাগেশ কৈয়টের উক্তি আরও স্পষ্ট করিয়াছেন :

"অতিখটঃ ইত্যাদিপ্রয়োগে হ্রস্বেনান্তরতম্যাদ্ বিবৃতোঽকারঃ প্রাপ্তঃ সংবৃত এব ভবতু-ইত্যর্থং প্রত্যাপত্তিবচঃ ইতি ভাবঃ ॥"—উদ্দ্যোত।

ভাষ্যমূল।—নৈতদস্তি। নৈব লোকে ন চ বেদেঽকারো বিবৃতোঽস্তি ॥

কস্তর্হি ? ॥

সংবৃতঃ। যোঽস্তি স ভবিষ্যতি। তদেতৎ প্রত্যাপত্তিবচনং জ্ঞাপকমেব ভবিষ্যতি 'বিবৃতস্যোপদিশ্যমানস্য প্রয়োজনমন্বাখ্যায়তে' ইতি ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এই (আপত্তি যুক্তিযুক্ত) নহে। (যেহেতু) লোকে অথবা বেদে বিবৃত অ-কার(ই) নাই।

তবে কোন্ (অ-কার আছে)?

সংবৃত (অ-কার)। যাহা আছে তাহাই (বিবৃত অ-কারের স্থানে আদেশ) হইবে। অতএব ('অ অ') এই প্রত্যাপত্তিবিধান (এই অর্থেরই) জ্ঞাপক হইবে যে,—"(সূত্রকার কর্ত্তৃক) উপদিষ্ট বিবৃত অ-কারের প্রয়োজনই শুধু (বার্তিককার কর্ত্তৃক উপরিউক্ত বার্তিকে) উল্লিখিত হইয়াছে।"

টিপ্পণী—এস্থলে ভাষ্যকার একদেশীর পূর্বোক্ত আপত্তি খণ্ডন করিয়া, সূত্রকারই যে অ-কারের বিবৃতত্ব উপদেশ করিয়াছেন, ইহা স্থাপন করিতেছেন। একদেশী আপত্তি দেখাইয়াছিলেন যে, 'অ অ' সূত্রে প্রত্যাপত্তি বিধানের দ্বারা সূত্রকারের বিবৃতো-পদেশকত্ব জ্ঞাপিত হইতে পারে না; কেননা, ঐ সূত্র প্রণয়নের অন্য উদ্দেশ্য আছে, এবং তাহা 'অতিখট্বঃ' প্রভৃতি স্থলে খট্বা প্রভৃতি উপসর্জনীভূত শব্দের অন্ত্য বিবৃত আ-কারের স্থানে আন্তরতম্যবশতঃ প্রাপ্ত বিবৃত হ্রস্ব অ-কারের নিরাকরণ করিয়া

তৎপরিবর্তে হ্রস্ব সংবৃত অ-কারের বিধান। সুতরাং সূত্রকার যখন 'অ ই উ ণ্' সূত্রে বিবৃত অ-কারের উপদেশ করেন নাই, তবে ইহা নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ হইতেছে যে, বার্তিককারই উপরিউক্ত বার্তিকে অ-কারের বিবৃতত্ব উপদেশ বিধান করিয়াছেন, শুধু বিবৃতোপদেশের প্রয়োজনই নির্দেশ করেন নাই। এই আপত্তি এক্ষণে ভাষ্যকার খণ্ডন করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন : একদেশী যে বলিয়াছেন যে, 'অতিখট্বঃ' প্রভৃতি স্থলে আন্তরতম্যবশতঃ বিবৃত অ-কারের প্রাপ্তি ছিল, তাহার নিবারণ করাই 'অ অ' সূত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্য, এই যুক্তি দুর্বল। কেননা, যে প্রযত্নযুক্ত অ-কার দৃষ্ট হইয়া থাকে, 'অতিখট্বঃ' প্রভৃতি শব্দে সেইরূপ প্রয়োগে অ-কারেরই কেবল প্রাপ্তি হইতে পারে। লৌকিক এবং বৈদিক প্রয়োগে অ-কারের সংবৃতপ্রযত্নই উপলব্ধ হইয়া থাকে, বিবৃতপ্রযত্ন নহে। সুতরাং 'অতিখট্বঃ' প্রভৃতি স্থলে অপ্রযুক্ত বিবৃত অ-কারের প্রসক্তিই থাকিতে পারে না, এবং সূত্রকারও সেইরূপ অপ্রসক্ত বিবৃত অ-কারের নিরাকরণের জন্য 'অ অ' সূত্র প্রণয়ন করেন নাই। ফলে 'অ অ' সূত্রপ্রণয়নের একদেশিপ্রদর্শিত প্রয়োজন অসিদ্ধ। 'অ অ' সূত্রে প্রত্যাপত্তি বিধানের দ্বারা শুধু একটি মাত্র অর্থ জ্ঞাপিত হইতে পারে এবং তাহা এই যে, সূত্রকার 'অ ই উ ণ্' সূত্রে শাস্ত্রীয় কার্য্য-সিদ্ধির জন্য (অর্থাৎ সাবর্ণ্য, আদেশ প্রভৃতি) শাস্ত্রদৃষ্টিতে অ-কারের যে বিবৃতত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহার স্থলে প্রয়োগে সংবৃত অ-কারের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। সুতরাং সূত্রকার স্বয়ং যে 'অ ই উ ণ্' সূত্রে অ-কারের বিবৃতত্ব উপদেশ করিয়াছেন, ইহা 'অ অ' সূত্রে অ-কারের প্রত্যাপত্তি বিধানের দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইতেছে। অতএব, বার্তিককার উপরিউক্ত বার্তিকে সূত্রকারকর্ত্তৃক অকারের বিবৃতত্বোপদেশের প্রয়োজনই শুধু উল্লেখ করিয়াছেন। বার্তিককার স্বয়ং অ-কারের বিবৃতত্ব উপদেশ করিতেছেন না॥ দ্রষ্টব্য :
'নৈব লোক ইতি। প্রযুক্তানামনুশাসনাৎ প্রয়োগে চ বিবৃতস্যাকারস্য অসম্ভবাৎ সংবৃত এব ভবিষ্যতি—ইতি প্রত্যাপত্তি-র্জ্ঞাপিকৈব॥'—প্রদীপ।

ভাষ্যমূল।—কঃ পুনরত্র বিশেষঃ—বিবৃতস্যোপদিশ্যমানস্য প্রয়োজনমন্বাখ্যায়েত, সংবৃতস্যোপদিশ্যমানস্য বা বিবৃতোপদেশশ্চোদ্যেতেতি ?॥

ভাষ্যানুবাদ—প্রঃ—(বার্তিককার উপরিউক্ত বার্তিকে সূত্রকারকর্ত্তৃক) উপদিষ্ট বিবৃত (অ-কারের) প্রয়োজনই উল্লেখ করুন, কিংবা (সূত্রকারকর্ত্তৃক) সংবৃতরূপে উপদিষ্ট (অ-কারের পরিবর্তে বার্তিককার) বিবৃত (অ-কারের) উপদেশই করুন—(এই উভয় পক্ষের মধ্যে) প্রভেদ কি ?

টিপ্পণী—প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই : যদি সূত্রকারই 'অ ই উ ণ্' সূত্রে অ-কারের বিবৃতত্ব উপদেশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও যেমন শাস্ত্রীয় কার্য্য সিদ্ধ হয়, সেইরূপ

বার্তিককার কর্তৃক উপরিউদ্ধৃত বার্তিকে অ-কারের বিবৃতত্ব উপদিষ্ট হইলেও তুল্যরূপে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং সূত্রকার কিংবা বার্তিককার যিনিই অ-কারের বিবৃতত্ব উপদেশ করুন না কেন, ফলে কোনও ভেদই লক্ষিত হয় না। অতএব অ-কারের বিবৃতত্বোপদেশের কর্তৃত্ব লইয়া বিবাদের অবতারণা নিষ্ফল। যদি সূত্রকার কর্তৃক উপদেশ অভিমত হয়, তবে "অ-কারস্য বিবৃতোপদেশঃ—" এই বার্তিকে 'কৃতঃ' এই পদ অধ্যাহার করিতে হইবে; অপরপক্ষে বার্তিককার কর্তৃক বিবৃতোপদেশ অভিমত হইলে বার্তিকে 'কর্তব্যঃ' এই পদটি অধ্যাহার করিতে হইবে। কিন্তু উভয়পক্ষে শাস্ত্রীয় উদ্দেশ্য সমানভাবেই সিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং এবিষয়ে তর্ক নিষ্ফল—ইহাই প্রশ্নের অন্তর্গূঢ় তাৎপর্য। দ্রষ্টব্য:

কঃ পুনরিতি। বিবৃতোপদেশ ইত্যত্র কৃতে ইতি বা, কর্তব্য ইতি বা বাক্যশেষাধ্যাহারে ন কশ্চিদ্ বিশেষ ইত্যর্থঃ॥—প্রদীপ॥

ভাষ্যমূল—ন খলু কশ্চিদ্ বিশেষঃ। আহোপুরুষিকামাত্রং তু ভবানাহ—সংবৃতস্যোপদিশ্যমানস্য বিবৃতোপদেশশ্চোদ্যত ইতি। বয়ং তু ব্রূমো বিবৃতস্যোপদিশ্যমানস্য প্রয়োজনমন্বাখ্যায়ত ইতি॥

ভাষ্যানুবাদ—উত্তর—(উভয়পক্ষের মধ্যে) প্রভেদ কিছুই নাই। ইহা কেবল আপনার (অর্থাৎ বার্তিককারের উপদেশকর্তৃত্বের সমর্থক একদেশীর) আহোপুরুষিকা (আত্মসম্ভাবনা বা অহঙ্কার) মাত্র, (যেহেতু) আপনি বলিতেছেন,—(সূত্রকার কর্তৃক) সংবৃতরূপে উপদিষ্ট (অ-কারের পরিবর্তে বার্তিককারই) বিবৃত (অ-কারের) উপদেশ করিতেছেন। আমরা কিন্তু বলি যে,—"(বার্তিককার উপরি-উক্ত বার্তিকে, সূত্রকার কর্তৃক) উপদিষ্ট বিবৃত (অ-কারের) প্রয়োজন(ই) উল্লেখ করিয়াছেন (মাত্র)।"

টিপ্পনী—ভাষ্যকার উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন: সূত্রকার কিংবা বার্তিককার যিনিই অ-কারের বিবৃতত্ব উপদেশ করুন না কেন, তাহাতে কোন ভেদই নাই। বার্তিককারের উপদেশকর্তৃত্ব খণ্ডন করিয়া সূত্রকারের উপদেশকর্তৃত্ব স্থাপন করিবার আগ্রহও আমাদের নাই। কেননা, উভয়পক্ষেই ফল তুল্য। তবে এইরূপ প্রশ্ন উঠিল কেন? ইহাতে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, বার্তিককারের যাঁহারা সমর্থক তাঁহারা—"বার্তিককারই সূত্রকারের অনবধান লক্ষ্য করিয়া সূত্রকারকর্তৃক অনুপদিষ্ট অ-কারের বিবৃতত্ব প্রথম উপদেশ করিয়াছেন"—এইরূপ প্রমাণ করিয়া বার্তিককারের সূত্রকারের অপেক্ষা প্রাধান্য প্রতিপাদন করতঃ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং অহঙ্কার বা আত্মাভিমানবশতঃ তাঁহারাই সূত্রকার এবং বার্তিককারের উপদেশকর্তৃত্ব লইয়া বিবাদের অবতারণা করিয়াছেন, আমরা করি নাই—কেননা, এইরূপ তর্ক নিষ্প্রয়োজন। পরন্তু যদি স্থির এবং অপক্ষপাত দৃষ্টিতে

বিষয়টি বিচার করা হয় তাহা হইলে সূত্রকারই যে অ-কারের বিবৃতত্ব উপদেশ করিয়াছেন ইহাতে কোন সন্দেহই থাকে না। এবং শাস্ত্রান্তে 'অ অ' সূত্রে বিবৃত অ-কারের স্থানে সূত্রকারকর্তৃক সংবৃত অ-কারের প্রত্যাপত্তি বিধানই এই সিদ্ধান্তের অনুকূল প্রমাণ। বার্তিককারের সমর্থকগণ কেবল আত্মাভিমানবশতঃ এইরূপ নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণকে উপেক্ষা করিয়াছেন। সূত্রকারকর্তৃক বিবৃতোপদেশ করা হইয়াছে এই সিদ্ধান্তই সমীচীনতর। যেহেতু, 'কর্তব্যঃ' এই পদ অধ্যাহার করিলে 'আজ্ঞা' সূচিত হয়। কিন্তু এই আজ্ঞা বা আদেশ কাহাকে লক্ষ্য করিয়া ? বস্তুতঃ এই চতুর্দশ-সূত্র বেদতুল্য, এইজন্য শাস্ত্রে ইহাকে অক্ষরসমাম্নায় বা বর্ণসমাম্নায় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ইহা অপৌরুষেয়। মহেশ্বর বা মহাদেব ইহার আদ্যোপদেষ্টা মাত্র। 'নিঃশ্বাসিত ন্যায়ে বেদ যেমন পুরুষের অযত্ননিষ্পাদ্য, এই অক্ষর সমাম্নায়ও বেদের ন্যায়ই অনাদি, অতএব পুরুষপ্রযত্নসাধ্য না হওয়ায় ইহার অন্যরূপ করা উচিত ছিল'— এইরূপ উক্তি নিষ্ফল। দ্রষ্টব্য : "তত্র প্রয়োজনান্বাখ্যানমিত্যেব ন্যায়ঃ প্রত্যাপত্তেঃ। অকর্তৃকে আজ্ঞাপাদনা ভাবাচ্চেত্যাহুঃ।" —নাগেশ : উদ্দ্যোত। ভাষ্যে 'আহোপুরুষিকা' শব্দের অর্থ অহঙ্কার, আত্মসম্ভাবনা। তুলনীয় : "আহোপুরুষিকা দর্পাদ্ যা স্যাৎ সম্ভাবনাত্মনি"— অমরকোষ : ২. ৮. ১০২। 'প্রদীপ'কার কৈয়ট 'আহোপুরুষিকা' শব্দের বুৎপত্তি দেখাইয়াছেন—

"অহো অহং পুরুষ ইতি অহঙ্কারবানহোপুরুষঃ। তস্য ভাবঃ—ইতি মনোজ্ঞাদি-ত্বাদ্ বুঞ্। অহঙ্কারবত্ত্বম্ ইত্যর্থঃ।"—প্রদীপ।

"অহো" এই নিপাতটি 'অহম্' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। "অহো পুরুষঃ" (অর্থাৎ অহং পুরুষঃ') এইরূপ বিগ্রহে ময়ূরব্যংসকাদয়শ্চ (২.১.৭২ ; অবিহিতলক্ষণস্তৎপুরুষঃ, ময়ূরব্যংসকাদৌ দ্রষ্টব্যঃ')—সূত্রানুসারে 'অহোপুরুষঃ, এইরূপ সমাস হইয়া থাকে। 'অহোপুরুষস্য ভাবঃ'—এই অর্থে 'অহোপুরুষ' শব্দের উত্তর-'দ্বন্দ্বমনোজ্ঞাদিভ্যশ্চ'(৫.১.১৩৩) সূত্রানুসারে ভাবার্থে 'বুঞ্' প্রত্যয় হইয়া থাকে। ['অহোপুরুষ' শব্দটি মনোজ্ঞাদিগণে পঠিত হইয়াছে। কোনও কোনও গণপাঠে কিন্তু মনোজ্ঞাদিগণে অহোপুরুষ শব্দটি পঠিত হয় নাই। দ্রষ্টব্য,—মহামহোপাধ্যায় শিবদত্ত শাস্ত্রিকর্তৃক প্রকাশিত সিদ্ধান্ত-কৌমুদী সংস্করণ, গণপাঠ।] দ্রষ্টব্য—"পুরুষিকেত্যত্র বুঞঃ প্রাগ্ ময়ূরব্যংসকাদিত্বাৎ সমাসঃ। অহো ইতি অহমিত্যর্থে।"—নাগেশ : উদ্দ্যোত। ভট্টিকাব্যে 'আহোপুরুষিকা' শব্দটির প্রয়োগ লক্ষণীয়। যথা—"আহোপুরুষিকাং পশ্য মম সদ্রত্নকান্তিভিঃ। ধ্বস্তান্ধকারেঽপিপুরে পূর্ণেন্দোঃ সন্নিধিঃ সদা॥" —ভট্টি : ৪. ২৭। ভরতমল্লিক তাঁহার টীকায় 'আহোপুরুষিকা' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :

"অহমেব পুরুষো যত্র ইতি সম্ভাবনায়াম্ আহোপুরুষিকা নিপাতনাৎ।··· অহো-পুরুষস্য ভাব আহোপুরুষিকা—ইতি কেচিৎ"—ঐ, ভরতমল্লিক টীকা। [ক্রমশঃ

হিন্দু মেলার বিবরণ

শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় সংকলিত

রাজনারায়ণ বসু জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার কার্যবিবরণে[১] যে অনুষ্ঠানপত্র রচনা করেন তাহা নবগোপাল মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত National Paper হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৭৮৭ শক চৈত্র সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।[২] প্রধানতঃ ইহারই প্রেরণায় নবগোপাল মিত্র কয়েকজনের সহায়তায় জাতীয় মেলা ও জাতীয় সভা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করেন। রাজনারায়ণ বসুর উক্তিতে 'আমরা যখন সঙ্কীর্ণ গৃহে অস্পষ্ট বর্ত্তিকার আলোকে জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার কার্য্য করিতাম তখন আমরা স্বপ্নেও মনে করি নাই যে, তাহা হইতে চৈত্র (হিন্দু) মেলারূপ বৃহৎ ব্যাপার সম্ভূত হইবে। মেলার ভাবটি নূতন, তাহা আমাদিগের মনে উদিত হয় নাই, কিন্তু মেলা সংস্থাপক মহাশয় তৎসংস্থাপন কার্য্যে আমাদিগের প্রকাশিত "Prospectus of a Society for the Promotion of National Feeling among the Eduated Natives of Bengal" প্রস্তাব দ্বারা যে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন ও তাহা হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং মেলার কোন কোন বিষয়ে ঐ প্রস্তাব অনুসারে অবিকল কার্য্য হইয়া থাকে ইহা তিনি স্বীয় ঔদার্য্য ও মহত্ত্বগুণে স্বীকার করিবেন।'[৩]

---

১ 'আমি ইংরাজী ১৮৬৬ সালে "Prospectus of a Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal" আখ্যা দিয়া ইংরাজীতে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করি। তাহার অনুবাদ "জাতীয় গৌরবেচ্ছা সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব" নামে এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইল। উক্ত অনুবাদ কার্য্য আমার পরম প্রিয় আত্মীয় ও স্বসম্পর্কীয় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। এই প্রস্তাব দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া বান্ধববর শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহাশয় হিন্দু মেলা ও জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন।'—রাজনারায়ণ বসু, ভূমিকা, 'বিবিধ প্রবন্ধ', প্রথম খণ্ড; ১২৮৯ শক।

রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিতে (১৩১৫) ভ্রমক্রমে 'prospectus'টির প্রকাশ কাল ১৮৬১ সাল বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে (পৃ ১১০)।

২ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল ইংরাজী অনুষ্ঠানপত্রখানি তাঁহার 'জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের (১৩৫২) পরিশিষ্টে মুদ্রিত করেন।

৩ রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, ১৩১৫, পৃ ১২৯-১৩০।

১৮৬৭ সালে বাংলা ১২৭৩ সনের চৈত্র-সংক্রান্তিতে আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়া উদ্যানে এই মেলার প্রথম অধিবেশন হয়। প্রথম বৎসরের অনুষ্ঠানে সমারোহ হয় নাই। 'জন্মদিনে কেবল কতিপয় বান্ধব ও প্রতিবেশীমাত্র উৎসাহী ছিলেন। অর্থাৎ নিজ বাটীর লোক ও নিজ কুটুম্ব বই নয়।'[৪] প্রথম বৎসরের কোনো মুদ্রিত কার্যবিবরণ পাওয়া যায় নাই। ১২৭৪ সনের ৩০ চৈত্র শনিবার তারিখে একই স্থানে দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনের কার্যবিবরণ 'চৈত্র মেলা' নামে প্রকাশিত হয়। তৃতীয় বৎসরের কার্যবিবরণে এই মেলার নাম হিন্দু মেলা বলিয়া স্বীকৃত হইলেও বস্তুতঃ পক্ষে চতুর্থ বৎসর হইতে ইহা স্পষ্টতঃ হিন্দু মেলা নামে পরিচিত হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর চতুর্থ বার্ষিক মেলায় তাঁহার সম্পাদকীয় প্রস্তাবে বলেন, 'অদ্যকার এই যে অপূর্ব্ব সমারোহ ইহা এতদিন পরে ইহার প্রকৃত নাম ধারণ করিয়াছে, ইহা হিন্দুমেলা নামে আপনাকে লোক সমক্ষে পরিচয় দিতেছে, বিহঙ্গ-শাবক যেমন অল্পে অল্পে আপনার বল পরীক্ষাপূর্ব্বক ক্রমে উচ্চতর নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইতে সাহসী হয়, সেইরূপ প্রথমে জাতীয় মেলা চৈত্র মেলা এইরূপ অস্ফুট শব্দ আমারদের শ্রবণে আনন্দ বর্ষণ করিয়াছিল, এক্ষণে "হিন্দুমেলা" এই সুস্পষ্ট নাম দ্বারা মেলার প্রকৃত মূর্ত্তি প্রকাশ পাইতেছে।'[৫] প্রথম তিন বৎসর মেলা চৈত্র সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হইত। চতুর্থ বৎসর হইতে মাঘ-সংক্রান্তিতে মেলা অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারিত হয়।

হিন্দুমেলা আমাদের স্বাদেশিকতার প্রথম সূচনা—'ইহাতে অধিক আহ্লাদের বিষয় এই, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হওনাবধি এদেশে যতকিছু উত্তম বিষয়ের অনুষ্ঠান হইয়াছে প্রায় রাজপুরুষগণ অথবা অপরাপর ইংরেজ মহাত্মারাই তাহার প্রথম উত্তেজক এবং প্রধান প্রবর্ত্তক। কিন্তু এই চৈত্রমেলা নিরবচ্ছিন্ন স্বজাতীয় অনুষ্ঠান, ইহাতে ইউরোপীয়দিগের নামগন্ধ মাত্র নাই, এবং যে সকল দ্রব্য সামগ্রী প্রদর্শিত হইবে, তাহাও স্বদেশীয় ক্ষেত্র, স্বদেশীয় ভূগর্ভ, স্বদেশীয় শিল্প এবং স্বদেশীয় জনগণের হস্ত-সম্ভূত। স্বজাতির উন্নতি সাধন, ঐক্য স্থাপন এবং স্বাবলম্বন অভ্যাসের চেষ্টা করাই এই সমাবেশের একমাত্র পবিত্র উদ্দেশ্য।'[৬] দ্বিতীয় বর্ষের অধিবেশনে সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার সম্পাদকীয় প্রস্তাবে ঘোষণা করেন, 'এই মিলন সাধারণ ধর্ম্ম কর্ম্মের জন্য নহে, কোন বিষয় সুখের জন্য নহে, কেবল আমোদ প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য—ইহা ভারতভূমির জন্য।

'ইহার আরো একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য আত্মনির্ভর।...যাহাতে এই

৪ মনোমোহন বসুর বক্তৃতা, হিন্দুমেলার কার্য্যবিবরণ, ১৭৯০ শক;

৫ হিন্দুমেলা, ১৭৯১ শক।

৬ মনোমোহন বসুর বক্তৃতা, চৈত্রমেলা, ১৭৮৯ শক।

আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়— ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। স্বদেশের হিতসাধন জন্য পরের সাহায্য না চাহিয়া যাহাতে আমরা আপনারাই তাহা সাধন করিতে পারি এই ইহার প্রকৃত ও প্রধান উদ্দেশ্য।'

রাজনারায়ণ বসুর অনুষ্ঠানপত্রে তাঁহার প্রস্তাবিত সভা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে বিরত থাকিবে এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছিল—'An attempt to shew that the religion of our ancestors contains much that is worthy of respect as well as union to represent political grievances to Government are calculated to promote national feeling; but the National Promotion Society will not take measures for the same as there are separate Associations, namely, the Brahmo Somaj and the British Indian Association, established solely for the purposes above-mentioned. It will abstain from the agitation of religious and political subjects।' তথাপি যে 'স্বাধীনতা' শব্দটি ভারতবর্ষীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে, দ্বিতীয় বর্ষের চৈত্র মেলায় মনোমোহন বসুর বক্তৃতায় বোধ করি প্রথম প্রকাশ্যে তাহা উচ্চারিত হইল—'তাহার ফলের নাম করিতে এক্ষণে সাহস হয় না, অপর দেশের লোকেরা তাহাকে "স্বাধীনতা" নাম দিয়া তাহার অমৃতাস্বাদ ভোগ করিয়া থাকে। আমরা সে ফল কখন দেখি নাই, কেবল জনশ্রুতিতে তাহার অনুপম গুণগ্রামের কথা মাত্র শ্রবণ করিয়াছি।'

হিন্দুমেলার ঐতিহাসিক ভূমিকা ও তাহার কার্যাবলীর যথার্থ মূল্যায়ণ বিস্তৃত গবেষণার বিষয়। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল তাঁহার 'জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে হিন্দুমেলার ধারাবাহিক ইতিহাস বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের কার্যবিবরণের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে। হিন্দুমেলার বার্ষিক কার্যবিবরণসমূহ বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। সম্প্রতি এক খণ্ড দ্বিতীয় বর্ষের কার্যবিবরণ পাইয়াছি। ইহার গুরুত্ব বিচারে সমগ্র কার্যবিবরণটি পুনর্মুদ্রিত হইল। ইহা ভিন্ন সম্প্রতি চতুর্থ বর্ষের কার্যবিবরণের সন্ধানও পাওয়া গিয়াছে। তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের কার্যবিবরণ বারান্তরে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

দ্বিতীয় বর্ষের কার্যবিবরণের সূচনায় সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সহকারী সম্পাদক নবগোপাল মিত্র মেলার প্রধান উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। তার পর 'বিশেষ বিশেষ উন্নতিসাধক কার্য সংসাধন জন্য বিশেষ বিশেষ' ছয়টি মণ্ডলীর নাম ঘোষিত হয়।

প্রারম্ভ সংগীতের পর গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চৈত্র মেলার উদ্দেশ্য' বিষয়ে প্রস্তাব পাঠ করেন। অতঃপর নবগোপাল মিত্র বিগত বৎসরের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত পাঠ করেন। ইহা ভিন্ন মনোমোহন বসু কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ এবং অধিবেশনের বিভিন্ন

অনুষ্ঠানের পরিচয় দেওয়া হয়। সর্বশেষে 'চৈত্র মেলার সাহায্যকারিদিগের নাম' ও 'খরচ' মুদ্রিত হয়।

ইহা ছাড়া যে-সকল গান ও কবিতা মেলায় গীত, পঠিত ও প্রচারিত হয় তাহাও অনুষ্ঠানের ক্রমানুসারে মুদ্রিত হয়।[৭]

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

---

৭ উদ্বোধনী সংগীত

মিলে সবে ভারত সন্তান। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিতা

যথা দেশ দেশান্তর, পর্য্যটিয়ে পান্থবর। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী

জাগ জাগ জাগ সবে ভারত সন্তান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

আহা কি অপূর্ব্ব শোভা আজি এ কাননে। শিবনাথ শাস্ত্রী

সংস্কৃত কবিতা

সারদা শারদাম্ভোদবর্ণা বর্ণাত্মিকা স্তু নঃ। তারানাথ শর্মা

কল্লাম্ভোখশ্বসন তরলোল্লোলমালাকবালে। রামতারণ শিরোমণি

পূর্ব্বং যে জনকাদয়ো নৃপবরাজাতাস্তদানীং। ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন

সংগীত

উঠ উঠ সকলে হে ভারত সন্তান।

লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এদেশের দুখে কার না সরে চখের জল।

ছাড় হে অসার অলস, প্রস্তুত হও লভিতে যশ।

প্রচারিত কবিতা

মানিলাম বঙ্গবাসি, বুদ্ধিতে চতুর।

ব্যায়াম বিষয়ক কবিতা

বিদ্যা শিক্ষা সঙ্গে সঙ্গে শিখিলে ব্যায়াম।

চৈত্র মেলা।

চৈত্র সংক্রান্তি শনিবার ১৭৮৯ শক।

গত বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে এই মেলা প্রথম সংস্থাপিত হয়, দেশীয় লোক মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন এবং দেশীয় লোক দ্বারা স্বদেশীয় সৎকার্য্য সাধন করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। এই বৎসরের মেলার কার্য্য যাহাতে সুচারু রূপে সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য কলিকাতাস্থ ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা যায় এবং নিম্নলিখিত প্রস্তাব সাধারণ মধ্যে প্রচার করা হয়।

১৭৮৮ শকের চৈত্র সংক্রান্তিতে যে একটি জাতীয় মেলা হইয়াছিল, স্বজাতীয়দিগের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন করা ও স্বদেশীয় ব্যক্তিগণ দ্বারা স্বদেশের উন্নতি সম্পাদন করাই তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু যদি এই জাতীয় মেলার উৎসাহ কেবল ক্ষণ কালের নিমিত্ত হয় এবং অস্মদ্দেশীয়দিগের মধ্যে সকল শ্রেণী ও সকল সম্প্রদায়ের এই বিষয়ে একটি অটল উৎসাহ ও যত্ন স্থাপনের উপায় না করা হয়, তাহা হইলে আমারদিগের এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ রূপে সফল হইবার ব্যতিক্রম ঘটিবে। এই অভিপ্রায়ে আমাদিগের দেশীয় কতিপয় ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে উদ্‌যোগী হইতে অনুরোধ করা হইয়াছে এবং স্বদেশের বিশেষ বিশেষ উন্নতি সাধক কার্য্য সংসাধন জন্য বিশেষ বিশেষ মণ্ডলী স্থাপিত হইয়াছে। ইহাঁরা সকলেই স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধন করিয়া সাধারণ কার্য্যের প্রতি যত্ন করিবেন। যেরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

১। এই মেলাভুক্ত একটি সাধারণ মণ্ডলী সংস্থাপিত হইবে, তাঁহারা সমুদায় হিন্দু জাতিকে উপরোক্ত লক্ষ্য সকল সংসাধন জন্য এক দলে অভিভুক্ত এবং স্বদেশীয় লোকগণ মধ্যে পরস্পরের বিদ্বেষ ভাব উন্মূলন করিয়া উপরোক্ত সাধারণ কার্য্যে নিয়োগ করত এই জাতীয় মেলার গৌরব বৃদ্ধি করিবেন।

২। প্রত্যেক বৎসরে আমাদিগের হিন্দু সমাজের কতদূর উন্নতি হইল, এই বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ জন্য চৈত্রসংক্রান্তিতে সাধারণের সমক্ষে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত পাঠ করা হইবে।

৩। অস্মদ্দেশীয় যে সকল ব্যক্তি স্বজাতীয় বিদ্যানুশীলনের উন্নতি সাধনে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করা যাইবে।

৪। প্রতি মেলায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীয় লোকের পরিশ্রম ও শিল্পজাত দ্রব্য সংগৃহীত হইয়া প্রদর্শিত হইবে।

৫। প্রতি মেলায় স্বদেশীয় সঙ্গীত-নিপুণ ব্যক্তিগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করা যাইবে।

৬। যাঁহারা মল্ল-বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, প্রতি মেলায় তাঁহাদিগকে একত্রিত করিয়া উপযুক্ত পারিতোষিক বা সম্মান প্রদান করা যাইবে এবং স্বদেশীয় লোক মধ্যে ব্যায়াম শিক্ষা প্রচলিত করিতে হইবে।

এই সকল কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে। যাঁহারা এই সকল কার্য্যকে স্বদেশের হিতকর বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহারা অর্থ সাহায্য করিয়া আমাদিগকে যথোচিত উৎসাহিত করিলে বাধিত হইব।

শ্রীগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

শ্রীনবগোপাল মিত্র।
সহকারি সম্পাদক।

যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া উপরোক্ত কর্ম্ম সাধনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, পর্য্যায় ক্রমে তাঁহাদের নাম নিম্নে লিখিত হইল।

১। শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীশ্বর মিত্র, দুর্গাচরণ লাহা, নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, জয়গোপাল সেন, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, কৃষ্ণদাস পাল, এবং যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর।

২। শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ভোলানাথ পাল, রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এবং জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, এবং হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত।

৪। শ্রীযুক্ত কুমার সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, বাবু জয়গোপাল সেন, প্রসাদদাস মল্লিক, প্রিয়নাথ ঘোষ, ব্রজনাথ দেব, জয়গোপাল মিত্র, যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং সালিকরাম।

৫। শ্রীযুক্ত কুমার সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, অক্ষয়কুমার মজুমদার এবং ব্রজনাথ দেব।

৬। শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, দুর্গাদাস কর, গোপাললাল মিত্র, এবং অম্বিকাচরণ গুহ।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ভবানীচরণ গুহ, নীলকমল মুখোপাধ্যায় এবং যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়। ইঁহারা আয় ব্যয় পরীক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

উপরোক্ত এই সকল প্রস্তাব প্রায় স্বদেশ হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রের নিকটে সমাদৃত হইয়াছে এবং প্রত্যেকে আপন আপন সাধ্যানুসারে সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। সাহায্যকারিদের নাম ভিন্ন স্থানে প্রকটিত করা গেল।

অবধারিত দিনে আশুতোষ দেবের বেলগেছিয়ার উদ্যানে বেলা প্রায় দশ ঘণ্টার সময় মেলার কার্য্য আরম্ভ হইল।

শ্রীযুক্ত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন মহাশয় সভা আহ্বান করিলেন এবং এই সঙ্গীত সহকারে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল।

সঙ্গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

১

মিলে সবে ভারত সন্তান,
একতান মন প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান॥

২

ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতঃস্বতী পুণ্যবতী,
শত খনি রত্নের নিধান॥
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৩

রূপবতী সাধ্বী সতী, ভারত ললনা,
কোথা দিবে তাদের তুলনা?
শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারত ললনা॥
হোক্ ভারতের জয়.
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৪

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ,
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন।
বাল্মীকি বেদব্যাস ভবভূতি কালিদাস,
কবিকুল ভারত ভূষণ॥
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৫

বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী;
অধীনতা আনিল রজনী,
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির,
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি॥
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৬

ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জুন নাহি কি স্মরণ,
পৃথ্বীরাজ আদি বীরগণ?
ভারতের ছিল সেতু, যবনের ধূমকেতু,
আর্ত্তবন্ধু দুষ্টের দমন॥
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৭

কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
যতোধর্ম্ম স্ততো জয় ॥
ছিন্ন ভিন্নে হীন বল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয় ?
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয় ॥ ১ ॥

—

পরে শ্রীযুক্ত বাবু গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মেলার উদ্দেশ্য বিষয়ে এই প্রস্তাব পাঠ করিলেন।

চৈত্র মেলার উদ্দেশ্য।

এই চৈত্র মেলার তত্ত্বাবধারকগণ এই মেলার উদ্দেশ্য বিবৃত করিবার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়াছেন এবং তজ্জন্যই আমি আপনাকে এই কর্ম্মের অনুপযুক্ত মনে করিয়াও তাঁহাদের অনুরোধে যথাসাধ্য ইহার উদ্দেশ্য প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছি। এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য বৎসরের শেষে হিন্দুজাতিকে একত্রিত করা, এইরূপ একত্র হওয়ার ফল যদ্যপি আপাততঃ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না কিন্তু আমাদের পরস্পরের মিলন এবং একত্র হওয়া যে কত আবশ্যক ও তাহা যে আমাদের পক্ষে কত উপকারী তাহা বোধ হয় কাহারও অগোচর নাই। এক দিনে কোন এক সাধারণ স্থানে একত্রে দেখা শুনা হওয়াতে অনেক মহৎ কর্ম্ম সাধন, অনেক উৎসাহ বৃদ্ধি ও স্বদেশের অনুরাগ প্রস্ফুটিত হইতে পারে, যত লোকের জনতা হয় ততই ইহা হিন্দুমেলা ও ইহা হিন্দুদিগেরি জনতা এই মনে হইয়া হৃদয় আনন্দিত ও স্বদেশানুরাগ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম্ম কর্ম্মের জন্য নহে, কোন বিষয় সুখের জন্য নহে, কেবল আমোদ প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য— ইহা ভারত ভূমির জন্য।

ইহার আরো একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য আত্মনির্ভর। এই আত্মনির্ভর ইংরাজ জাতির একটি প্রধান গুণ। আমরা সেই গুণের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আপনার চেষ্টায় মহৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া, এবং তাহা সফল করাকেই আত্মনির্ভর কহে। ভারতবর্ষের এই একটি প্রধান অভাব, আমাদের সকল কর্ম্মেই আমরা রাজপুরুষগণের সাহায্য যাচ্ঞা করি, ইহা কি সাধারণ লজ্জার বিষয় ? কেন আমরা কি মনুষ্য নহি ? মানব জন্ম গ্রহণ

করিয়া চিরকাল পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি আছে; অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়— ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। স্বদেশের হিতসাধন জন্য পরের সাহায্য না চাহিয়া যাহাতে আমরা আপনারাই তাহা সাধন করিতে পারি এই ইহার প্রকৃত ও প্রধান উদ্দেশ্য!

এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য আমাদের স্বদেশীয় কতিপয় ভদ্র মান্য ব্যক্তি এই মেলার কোন না কোন ভার গ্রহণ করিয়াছেন। একতা নিবন্ধন, স্বদেশানুরাগবর্দ্ধন ও স্বদেশের প্রকৃত উন্নতির পথ নির্দ্দেশ জন্য মণ্ডলী সকল সংস্থাপিত হইয়াছে, কেহ কেহ দেশের প্রকৃত উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছেন, কেহ কেহ যাহাতে ভারত যুবক যুবতী বিদ্যাভূষণে ভূষিত হয় তাহার জন্য যত্নশীল হইয়া সেই ভার গ্রহণ করিয়াছেন; বিদ্যা এবং জ্ঞান আমরা যেখান হইতে পাই তাহা লইতে কুণ্ঠিত হইব না, কেহ কেহ সেই বিদ্যার ফল-স্বরূপ শিল্পজাত নানাবিধ সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া ভারতবর্ষীয় লোকগণের তৎ তৎ বিষয়ে উৎসাহ বৃদ্ধি করিবার জন্য তাহার প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কেহ কেহ হৃদয়ের প্রকৃত স্বর যে সংগীত— সেই সংগীত বিদ্যার উন্নতি সাধনে ঐকান্তিক যত্ন করিতেছেন, কেহ কেহ বা আমাদের শারীরিক দুর্ব্বলতা বিমোচন জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন, কেহ কেহ এই মেলার জন্য সংগৃহীত অর্থ যাহাতে এই মেলারি নিমিত্ত ব্যয় হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতেছেন। যখন আমাদের সকলেরি এরূপ যত্ন, তখন আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে এই কর্ম্ম, বা এই উদ্দেশ্য সফল হইবেই হইবে, কিন্তু নিরুৎসাহের কর্ম্ম নহে এবং সেই উৎসাহের জন্যই সিদ্ধিদাতা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম ইতি।

তারিখ ৩০ চৈত্র।
শকাব্দ ১৭৮৯
শনিবার।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র সংক্ষিপ্ত রূপে এই বৃত্তান্ত পাঠ করিলেন।

আমরা বিশ্ববিধাতার— মঙ্গল দাতার কৃপায় সাংসারিক সমস্ত আপদ্ বিপদ্ উল্লঙ্ঘন করিয়া ১৭৮৯ শক অতিক্রম করিলাম। এক্ষণে গত বৎসরে আমাদের দেশ মধ্যে বা দেশ সম্পর্কে কি কি প্রধান প্রধান ঘটনা হইয়াছে, সেই সকল বৃত্তান্ত আপনাদের গোচর করিতে প্রবৃত্ত হই।

রাজ্য সম্বন্ধীয়।

এ বৎসর অস্মদ্দেশে, প্রদেশের যুদ্ধ বিগ্রহের কোন উৎপাত সহ্য করিতে হয় নাই, কেবল পঞ্জাব সীমায় বিজোটী জাতির উপদ্রব ঘটে।

আবিশিনিয়ায় যুদ্ধ যাত্রাকে ১৭৮৯ শকের ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের একটি প্রধান

ঘটনা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কেন না এই যুদ্ধ ব্যয়ের কিয়দংশ ভারতবর্ষকে সহ্য করিতে হইয়াছে।

অনেকেই এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন, মহীসুরের মহারাজ পরলোক গমন করিলেই উক্ত রাজ্য ব্রিটিশ রাজত্বভুক্ত হইবে; কিন্তু এই বৎসর বৃদ্ধ রাজা কলেবর পরিত্যাগ করাতে, তাঁহার পোষ্য পুত্রই রাজ্য পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, গত বৎসর মহীসুরের রাজ্য সম্বন্ধে ভারতবর্ষের সেক্রেটরি অব ষ্টেট্ মহারাণীর এক ঘোষণা পত্র প্রচার দ্বারা এই রূপ প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, যে তাঁহারা আর এদেশীয় রাজাদিগের রাজ্য আপনাদের রাজ্যাভিভুক্ত করিবেন না।

১৭৮৯ শকে ভারতবর্ষের হিতার্থ লণ্ডন নগরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং সভ্যেরা ষ্টেট্ সেক্রেটরির নিকট এই আবেদন করেন যে, ভারতবর্ষের চিহ্নিত কর্ম্মচারীর অর্থাৎ সিবিল সর্‌বিস পরীক্ষার দ্বার ভারতবর্ষীয়দিগের নিমিত্ত যে প্রকার উন্মুক্ত হইয়াছে, তাহাতে কোন ফল দর্শিতেছে না। অতএব যাহাতে লণ্ডনের ন্যায় কলিকাতা, মান্দ্রাজ, এবং বোম্বেতেও চিহ্নিত কর্ম্মচারীর পরীক্ষা হয় এরূপ প্রণালী প্রচলিত করা হউক।

প্রতি বৎসর রাজস্ব বৃদ্ধি হয় তথাচ অনটন যায় না। সাধারণে ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া গত বৎসর প্রতিনিধি প্রণালী স্থাপন করিতে অভিলাষ প্রকাশ করেন।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসন প্রণালীর অনুকরণ করিয়া জয়পুরের মহারাজ শাসন প্রণালী সংশোধন করিয়াছেন। নবাব সালার জঙ্গ এক কৃতবিদ্য হিন্দু জাতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপর তাঁহার রাজ্য-শাসন ভার দেন, তাহাতে ঐ রাজ্যের অতীব উপকার হইয়াছে।

অগ্রহায়ণ মাসে গবর্ণর জেনেরল লক্ষ্ণৌয়ে একটি দরবার করেন। ঐ দরবারে মানসিংহ প্রভৃতিকে ষ্টার অব ইণ্ডিয়া নামক প্রসিদ্ধ খ্যাতি-চিহ্ন প্রদান করেন।

গত বৎসর বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, গবর্ণর জেনরেলের ব্যবস্থাপক সমাজের আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অচিহ্নিত কর্ম্মচারীদিগকে (অর্থাৎ প্রায় এদেশস্থ লোককে) সহকারী কমিশনর প্রভৃতি উচ্চ পদ প্রদানের নিয়ম হইয়াছে। কিন্তু যে স্থানে ইংরাজ অধিক আছেন, সেই স্থানে অচিহ্নিতেরা উক্ত পদ পাইবেন না।

মুন্সেফদিগের বেতন বৃদ্ধির পথ পরিষ্কৃত হইয়া সদর-আমিনের পদ বৃদ্ধি ও প্রধান সদর আমিনের বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তাঁহারা শুবারডিনেট জজ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। গত বৎসরে শ্রীযুত বাবু মনোমোহন ঘোষ হাই কোর্টে বারিষ্টরের কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন।

বাণিজ্য।

গত বৎসর বাণিজ্যের অবস্থা বড় মন্দ গিয়াছে। কিন্তু রেলওয়ের অতিশয় উন্নতি হইয়াছে। অনেক স্থলে নতন লাইন সংযোজিত হইয়াছে, মাতলা রেলওয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট ঐ রেলওয়ের কর্তৃত্বভার লইয়াছেন।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয়।

১৭৮৯ শকের কার্ত্তিক মাসে ১৬ তারিখে রাত্রিকালে এক ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হইয়া অনেক অনিষ্ট সাধন করে। উহা অনেকের সম্পত্তি হানি এবং অনেক জীবের প্রাণ হানি করিয়াছে। কেবল কলিকাতা ও ইহার নিকটস্থ স্থান সমূহেই ন্যূনাধিক বার শত লোকের মৃত্যু হয়। এতভিন্ন কত স্থানে কত লোক মরিয়াছে, তাহার নির্ণয় হয় নাই। বহু সহস্র গৃহাদি ভূমিসাৎ ও দেশের অনেক শস্য সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। ঝটিকা কৃত ক্ষতির সংপূরণার্থে দেশীয় ও বিদেশীয় বহুতর ব্যক্তি অনেক অর্থ প্রদান করিয়া বদান্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই সাহায্য উপলক্ষে লক্ষ মুদ্রারও অধিক সংগৃহীত হইয়াছিল।

প্রসিদ্ধ ব্যাধিমন্দির রঙ্গপুর, দিনাজপুর ও পূর্ণিয়া প্রভৃতি প্রদেশ পূর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর হইয়াছে। নদিয়া, হুগ্‌লি, বারাশত, প্রভৃতি স্বাস্থ্য প্রদ প্রদেশগুলি ক্রমে যার পর নাই অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। মহামারী এই সকল স্থানে স্থিরাধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। সুন্দরবন অধিক পরিমাণে পরিষ্কৃত হইতেছে বটে, কিন্তু জনপদগুলি ক্রমে ক্রমে অরণ্যময় হইয়া উঠিতেছে। এ বিষয়ে সকলের বিশেষ দৃষ্টিপাত আবশ্যক।

ঢাকায় গত বৎসর ভয়ানক ওলাউঠা উপস্থিত হইয়া অনেক মনুষ্যকে নষ্ট করে।

মৃত্যু।

গত বৎসরে হিন্দু সমাজের অনেক সম্ভ্রান্ত, বিজ্ঞ, ও স্বদেশের অলঙ্কার স্বরূপ ব্যক্তির মৃত্যু হয়; যথা—

সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, অনরবিল শম্ভুনাথ পণ্ডিত, কবিকেশরী প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, ও রাম গোপাল ঘোষ।

বিদ্যা সম্বন্ধীয়।

গত বৎসর শিক্ষা বিভাগের কিছু উন্নতি হইয়াছে। কতকগুলি স্কুলের সংখ্যা বাড়িয়াছে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা এ বৎসর বিদ্যা শিক্ষার অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ লাহা উন্নতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। পূর্ব্বাপেক্ষা প্রদেশ মধ্যে অধিক পরিমাণ বিদ্যার চর্চ্চা হইতেছে। অনেক পল্লীগ্রামেও ইংরাজি ও বাঙ্গলা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে, কেম্ব্রিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সংস্কৃত ভাষায় অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। যশোহর স্থানের নিকটবর্ত্তী অমৃত বাজারস্থ অমৃত যন্ত্রালয় হইতে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে, রাজসাহী প্রদেশে রাজসাহী পত্রিকা নামক একখানি মাসিক সংবাদপত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং একটি মুদ্রাযন্ত্রও আনীত হইয়াছে।

ঢাকা নিবাসী শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক জানকী নাটক নামক এক পুস্তক, শ্রীযুৎ বাবু নবীন চন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক খগোল বিবরণ নামক এক পুস্তক, শ্রীযুৎ বাবু দ্বিজেন্দ্র নাথ

ঠাকুর কর্ত্তৃক তত্ত্ববিদ্যা নামক এক পুস্তক এবং বাবু শ্যাম চাঁদ দাস কর্ত্তৃক কাব্য সংগ্রহ নামক একখানি পুস্তক গত বৎসর প্রকাশ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন গত বৎসরে অন্যান্য অনেক পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে।

সমাজ সম্বন্ধীয়।

সমাজের উন্নতি জন্য নানা প্রকার উন্নতি চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। বহু স্থানে মদ্যপান নিবারণী সভা স্থাপিত হইতেছে। সামাজিক উন্নতির নিমিত্ত অনেক সম্ভ্রান্ত লোক চৈত্র মেলা আরম্ভ করিয়াছেন। ঈশ্বর করুন, ইহার দ্বারা হিন্দু সমাজের প্রকৃত মঙ্গল হউক, দেশীয় লোক দ্বারা দেশীয় সৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হউক এবং সকল জাতি ও শ্রেণী মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন করুক।

—

অনন্তর নিম্নলিখিত পদ্যসকল পঠিত হইল।

যথা দেশ দেশান্তর, পর্য্যটিয়ে পান্থবর,
হেরে নানা দৃশ্য মনোরম।
নবীন বান্ধব সনে, নব প্রেম আলাপনে,
করে সুখে সময় যাপন॥
কিন্তু যদি সে সময়, সমুখে উদয় হয়,
স্বদেশ সম্ভূত তরু লতা।
সব দুঃখ তিরোহিত, স্মৃতি পথে বিকটিত,
স্বদেশের সুধাময় কথা॥
অস্মদাদি সেইমত, অবিরত থাকি রত,
নানা মত কাজেতে জড়িত।
থাকিয়াও দেশান্তরে, থাকি যেন দেশান্তরে,
নানা ভাবে চিত আন্দোলিত॥
বিদেশের রীতি নীতি, বিদেশের কাব্য স্মৃতি,
অধ্যয়ন দিবস যামিনী।
তাই আজ পান্থরূপ, হেরি মেলা অপরূপ,
মনে পড়ে ভারত কাহিনী॥
প্রকৃতি প্রমোদোদ্যান, ভারত সুখদ স্থান,
স্বভাবের শোভার নিলয়।
মাধবী-মল্লিকা শ্রম, কোকিলের কুঞ্জবন
গর্ভে যার হীরা মণিময়॥

তুঙ্গ শৃঙ্গ অগোচর, অভ্র ভেদী ধরাধর,
চারি ধার করে যার রোধ।
লক্ষ লক্ষ স্রোতস্বতী, বহে যথা বেগবতী,
হেরে যারে হয় হেন বোধ।
ভারত স্বরূপ যুতা, প্রকৃতির প্রিয় সুতা,
স্বভাবের শোভার প্রতিমা।
প্রবাহিনী শত শত, সেবিয়া কিঙ্করী মত,
সম্পাদিছে সৌন্দর্য্য গরিমা॥
ভারত দুর্ল্লভ দেহে, প্রকৃতি জননী-স্নেহে,
পরায়েছে বিচিত্র ভূষণ।
পর্ব্বত প্রাচীর দিয়া, জল দল বিস্তারিয়া,
রাখে তারে করিয়া বেষ্টন॥
কিন্তু কি বিরূপ কথা, নিদারুণ মনোব্যথা,
আছে যার এমন সম্বল।
কিসের কারণে তার, অশ্রু নীরে অনিবার,
ভাসমান নয়ন যুগল॥?
প্রকৃতির দুঃখ গেল, এইতো বসন্ত এল,
পাত হলো শীতের পীড়ন।
হিমাচল ক্ষীণকায়, বিগত উত্তর বায়,
মৃদু বহে মলয় পবন॥
নবীন পল্লব ভরা, নব ফুলে আলো করা,
শোভে তরু নগরে গহনে।
পাইয়ে নূতন প্রাণ, সুতানে করিছে গান,
সুললিত বিহঙ্গম গণে॥
চক্রে ঘোরে ঋতু ছয়, হিমান্তে বসন্তোদয়,
সুপ্রফুল্ল স্বভাব সহসা।
কিন্তু সে বসন্ত কবে, প্রকাশিয়ে যবে যাবে,
ভারত গো! তব হীন দশা॥
কেমনে সুখের দিন, অনন্তে হইল লীন?
আর কি তা আসিবেনা ফিরি?।
কোথায় প্রতাপ শালী, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডাবলী,
অস্ত গেল ধরায় আঁধারি?॥

বলহে ভারত বাসী, অকর্ম্ম মৃত্তিকা রাশি,
ভীরুতায় ভীরুতা ভবন।
পড়ে কিনা পড়ে মনে, দাশরথি চারিজনে,
পড়ে মনে কুরুক্ষেত্রে রণ॥?
কেমনে কামিনী কুল, কেশরিণী সমতুল,
দুর্গাবতী গরা রাজ্যেশ্বরী।
স্বরাজ্য করিতে ত্রাণ, সমরে ত্যজিল প্রাণ,
স্বকৃপাণ নারী করে ধরি?॥
হেন সব বীর বর, ভারতের প্রভাকর,
কোথা গেল আঁধারি ভুবনে।
যে দেশে পদ্মিনী সতী, জনমে সে দেশ গতি,
হেন হবে, কে জানে স্বপনে॥
যথা রাম রঘুবরে, পিতৃ সত্য রক্ষা তরে,
রাজ্য সুখ পরিহার করে।
যে দেশে পাণ্ডব গণ, রাখিতে আপন পণ,
বিপিনে বিপিনে কাল হরে॥
শাক্য সিংহ যেই দেশে, সহজে সন্ন্যাসী বেশে,
পাশরিয়ে পিতৃ রাজ্য-ধন।
ধরম প্রচার তরে, ফেরে দেশ দেশান্তরে,
যাউক বা থাকুক জীবন॥
কোথায় কোকিল স্বর, কালিদাস কবিবর,
কোথা বাল্মীকি তপোধন।
বিদ্যার আশ্রয় স্থল, কোথা ব্যাস পাতঞ্জল,
গোতম কপিল ঋষিগণ॥
যাদের সমান আর, ত্রিজগতে পাওয়া ভার,
ত্রিজগতে ঘোষে এই রব।
কোথায় বা পরাশর, ভাস্কর পণ্ডিত বর,
জ্যোতিষের মূলাধার সব॥
ক্ষণ কাল প্রকাশিয়ে, ধরাধাম আমোদিয়ে,
কোথা গেল আঁধারি ভুবনে।
যে দেশেতে লীলাবতী, জনমে, সে দেশগতি,
হেন হবে কে জানে স্বপনে॥

হায় কি হইল শেষ, দাহন করিছে দেশ,
সুরায় অনল স্রোতস্বতী।
কত শত পরিবার, পুড়ে হল ছারখার,
হৃদি ফাটে দেখিয়ে দুর্গতি॥
কি কব লোকের গুণ, সুরাতে হতেছে খুন,
তবু তায় না ছাড়িতে পারে।
প্রদীপ পতঙ্গ প্রায়, প্রমত্ত হইয়ে ধায়,
না ভাবি কি হল, হবে পরে॥
জননীর হাহাকার, বনিতার অশ্রুধার,
দ্রবিতে কি পারে কভু তায়।
সন্তানের আর্ত্তনাদ, পরিজন কুৎসাবাদ,
ভূধরে মলয়াঘাত প্রায়॥
লোকের কি ব্যবহার, সদা করে কদাচার,
বলিতে অনল দহে কায়।
সবে তাই ঘরে পরে, অখ্যাতি ঘোষণা করে,
কুলিশ কসেরাঘাত প্রায়॥
বীর্য্যহীন শীর্ণকায়, দেহ ভরা ভীরুতায়,
মুখে মারে আকাশ পাতাল।
প্রচুর ধনের আশে, মনোবীর্য্য সর্ব্বনাশে,
হাতে সদা তোষামোদ জাল॥
ছিছি হে ভারতবাসী, এমন কুকর্ম্ম রাশি,
সাজে কি ভারতবাসী হয়ে।
ক্ষণতরে ক্ষমা দাও, নয়ন মিলিয়া চাও,
উঠ উঠ দিন যায় বয়ে॥
এই বেলা ভাঙ্গ ঘুম, ভারতে লেগেছে ধুম,
উঠেছে যে নব্য সম্প্রদায়।
নিষ্কাষিয়ে জ্ঞান অসি, বিনাশিয়ে ভ্রম রাশি,
দেশের উন্নতি দিগে ধায়॥
নব রাগে হয়ে স্ফীত, নব তেজে উত্তেজিত,
নব রসে হয়ে বলীয়ান্।
ভারত গো! তোমাতরে, আত্ম সমর্পণ করে,
আজ তার দেখ গো প্রমাণ॥

দেখ সব একস্তরে, সৌহৃদ্য শৃঙ্খল পোরে,
তব কথা করে উত্থাপন।
দুঃখের যামিনী ঘোর, ত্বরায় হইবে ভোর,
দেখ মাতা মিলিয়ে নয়ন॥

নারীকুল শিল্প কাজ, চারি দিকে হেরি আজ,
আশালতা উত্তেজিতা হয়।
ফিরে পাব কত দিন, হবে তুমি শোকহীন,
আস্যে তব হাস্যের উদয়॥

শ্রী অক্ষয় চন্দ্র চৌধুরি

—

"জন্মভূমি জননী, স্বর্গের গরীয়সী"।

জাগ জাগ জাগ সবে ভারত সন্তান!
মাকে ভুলি কতকাল রহিবে শয়ান?
ভারতের পূর্ব্ব কীর্ত্তি করহ স্মরণ
রবে আর কত কাল মুদিয়ে নয়ন?
দেখ দেখি জননীর দশা একবার
রুগ্ন শীর্ণ কলেবর, অস্থি চর্ম্ম সার;
অধীনতা অজ্ঞানাদি রাক্ষস দুর্জ্জয়
শুষিছে শোণিত তাঁর বিদরি হৃদয়;
স্বার্থপর অনৈক্যতা পিশাচ প্রচণ্ড,
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দেহ করে খণ্ড খণ্ড।
মায়ের যাতনা দেখি বল কোন প্রাণে
সুপুত্র থাকিতে পারে নিরুদ্বিগ্ন মনে?
যে জননী পয়ঃ-সুধা শতনদী-ধারে,
পিয়াইছে নিরবধি আমা সবাকারে;
যে জননী মৃদু হাসি সব দুঃখ ভুলি
উপাদেয় নানা অন্ন মুখে দেন তুলি;
এমন মায়েরে ভোলে যে কোন সন্তান,
নিশ্চয় হৃদয় তার পাষাণ সমান।
ঐ দেখ, মাতা বসি ঘোর কারাগারে
হাতে বেড়ি পায়ে বেড়ি অজ্ঞান-আঁধারে।

ঝরিতেছে অশ্রু-নীর-ঘন বহে শ্বাস,
ছট্ ফট্ করিছেন এ-পাশ ও-পাশ।
ঐ দেখ কাঁদিছেন জননী বিহ্বলা;
(গুমরিয়া কত কাল থাকিবে অবলা ?)
অত্যাচার, অবিচার আদি প্রেতগণ,
সে কারার দ্বার-দেশ করিছে রক্ষণ;
ভীষণ মুরতি সব ভীমদণ্ড করে
দ্বার দেশ আগুলিয়া সদা ঘোরে ফেরে।
বিলাপের ধ্বনি শুনি যত রক্ষগণ
তটস্থ হইছে সবে সচকিত মন।
কেহ বা বুঝায় কেহ মুখ চেপে ধরে
"চুপ্ চুপ্" বলি ওঠে সবে এক স্বরে
কিন্তু শোক-বেগ কভু না মানে বারণ
সাগর উথলে যদি কে করে শাসন ?
এ সকল দেখি শুনি কার প্রাণে সয়
ওঠরে ভারতবাসী! কি ভয়, কি ভয়!
কোষ মধ্যে অসি দেখ কাঁপিছে সঘনে,
রোষ করি ঝাঁকি ঝাঁকি উঠে ক্ষণে ক্ষণে।
ওরেরে দুর্ব্বল বন্ধু কৃপালু কৃপাণ!
ও নৃশংস প্রেতগণে কর খান্ খান্।
খসাইয়া ফেল্ শীঘ্র বন্ধনের রশি
'সাধু সাধু' তবে তোরে বলি ওরে অসি!
কিন্তু ফাটে যে হৃদয়! আবার কি শুনি!
ক্রমশঃ বাড়িছে দেখি ক্রন্দনের ধ্বনিঃ—

"ওরে নিদারুণ বিধি, কেন দিয়ে রূপ-নিধি,
মজালে এমন করো্যে আমায় বল না ?
তস্করে আনিলে ডাকি, অবলারে দিয়ে ফাঁকি,
বুঝিছি, বুঝিছি, তব কেবলি ছলনা।
প্রকৃতি জননী মম! রূপে গুণে নিরুপম।
তোমার ছিলাম আমি সোহাগের ধন।
কত যত্ন সাজাইতে, কত বিদ্যা শিখাইতে,
জানিতে কি মম দশা হইবে এমন ?

কমল-কোরক-মধু, ভ্রমরই পিইবে শুধু,
লুতার তা লুটিবার আছে অধিকার ?
এ সকল সাজসজ্জা, দিতেছে কেবলি লজ্জা,
অবশেষে হল ইহা বোঝামাত্র সার।
পৃথ্বী-তলে যত শোভা, ছিল যত মনোলোভা,
সকলি আমার তরে আনিলে হেথায় ;—
পঙ্কজ-শোভন-সর, গিরিসিন্ধু নদীবর,
কুসুমাভরণ বন—কত কব হায় !
কত করিতাম ক্রীড়া, জানি নাই কোন পীড়া,
তোমার আঁচল ধরি মনের উল্লাসে ;
কভু হিমাচল শিরে, কভু মান ! সরোনীরে,
মন সাধে ফিরিতাম আকাশে আকাশে।
এবে বিধি করি আড়ি, সকলি লইল কাড়ি,
অবশেষে ফেলে মোরে ঘোর কারাগারে ;
কারে কই দুঃখ-কথা, কে বুঝিবে মর্ম্ম ব্যথা,
এবে পুত্র করে লাজ মা বলিতে মারে !
থাকিত সে কালিদাস, আর ভবভূতিব্যাস,
বাল্মীকি আদি প্রিয় সন্তান সকল,
কিবা সুমধুর তানে, কিবা সুললিত গানে,
প্রতপ্ত হৃদয় মোর করিতে শীতল !
আর কি শুনিবে কান, বীর পুত্র যশোগান,
তাদের ছিলাম আমি প্রাণের জননী ;
শুনিলে তাদের কথা, তবু জুড়াইত ব্যথা,
অপার পাথার মাঝে পেতাম তরণী।
কোথা গেল ভীমার্জ্জুন, অস্ত্র শাস্ত্রে সুনিপুণ,
রামচন্দ্র পৃথ্বীরাজ আদি বীরগণ !
এস এস ফিরি পুন, জননীর কথা শুন !
(কিন্তু হায় বৃথা আশা—অরণ্যে রোদন)
তোমরা থাকিতে যদি, বহিত কি দুঃখ নদী,
সহিতে হত কি মোর এত অপমান ?
কোপেতে উঠিতে জ্বলি, দস্যুদলে দিতে বলি
সঁপিতে আমার তরে ধন মন প্রাণ।"

দেখ! কুহকিণী আশা, পশি কারাগারে
বুঝাইছে নানা মতে ভারত মাতারে—
"শান্ত হলো প্রিয়সখি—মুছ অশ্রুনীর,
পোহাইব দুঃখ নিশা—হয়ো না অধীর।
তোমার বিলাপ ধ্বনি ভেদিয়া পাষাণ
পোঁছিয়াছে শুন সখি সেই দিব্যধাম।
প্রকৃতি জননী তব শোকেতে বিহ্বল,
উঠেছে স্বরগে আজি মহা কোলাহল।
ভীমার্জ্জুন ব্যাস আদি দিব্যবাসীগণ,
মাগিতেছেন এই বর ব্রহ্মার সদন,
যেন তব গর্ভে করি জনম গ্রহণ,
উজ্জ্বল করেন পুন তোমার বদন
তোমারে জানাতে ইহা আইলাম হেথা,
শান্ত হও প্রিয়সখি! —কেন কাঁদ বৃথা।"

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

—

১

আহা কি অপূর্ব্ব শোভা আজি এ কাননে।
যেদিকে ফিরিয়া চাই,　　সে দিকে দেখিতে পাই,
হাসিছে খেলিছে সবে আনন্দিত মনে।

২

কোলাহলে পরিপূর্ণ সমুদয় স্থল!
জন স্রোত অনিবার,　　বহে নাহি সংখ্যা তার,
পদভরে যেন ভূমি করে টলমল!

৩

আজি কি অভাগা বঙ্গ মেলিল নয়ন রে মেলিল নয়ন?
ছাড়রে নিদ্রার ঘোর,　　রজনী হইল ভোর,
উঠে দেখ পূর্ব্বাচলে উদিত তপন।

৪

বঙ্গ বাসি ! আর কত থাকিবে নিদ্রায় রে থাকিবে নিদ্রায় ?
জাগ জাগ নারীনর, উঠ বাঁধ পরিকর,
অলসে পড়িয়া আর কেন রে শয্যায় ?

৫

জন্মে নাকি বীরপুত্র বঙ্গের উদরে রে বঙ্গের উদরে ?
আমরা কি চিরদিন, হয়ে আছি পরাধীন,
চিরদিন আছি কিরে নত মুখ করে ?

৬

বঙ্গজন ! ভ্রাতৃগণ ! কর প্রণিধান
পাব না সময় আর, মনসুখে একবার,
বঙ্গের পুর্ব্বের কথা করি আজি গান।

৭

রাজস্থয় করি যবে পাণ্ডব তনয়
এদেশ জয়ের তরে, পাঠাইল বৃকোদরে,
বঙ্গ কি এ-হেন ভীরু ছিল সে সময় ?

৮

সমুদ্র ও চন্দ্রসেন ভূপতি দুজন,
রাখিতে দেশের মান, সাহসে সঁপিল প্রাণ,
করিল পাণ্ডব সনে ঘোরতর রণ।

৯

বঙ্গের সে শুভ দিন আসিবে কি আর রে আসিবে কি আর ?
আর কি সে সুখ পাবে, হীনতা জড়তা যাবে,
জননী বিনত মুখ তুলিবে আবার ?

১০

সিংহবাহু নামে এক ছিল নরবর
বিজয় নামেতে তাঁর, ছিল পুত্র, নাম যাঁর,
করিলে নাচিয়া উঠে উল্লাসে অন্তর।

১১

অভিমানে পিতৃগৃহ ত্যজিল বিজয়।
রাজ্যসুখ বিসর্জ্জিয়ে, জলযানে আরোহিয়ে,
জলনিধি পথে বীর চলিল নির্ভয়।

১২

সাহসে অসম বীর বিক্রমে অটল
রাজধানী পরিহরি, সাহসে নির্ভর করি,
ভাসিল জলধিজলে লয়ে দলবল।

১৩

নবীনা রমণী তার পতিব্রতা সতী
ভোগসুখ অবহেলে, রাজভোগ পদে ঠেলে,
কুমারের পিছে পিছে চলিলা যুবতী।

১৪

বহরে পবন বহ খেলরে সাগর
অরে খেলরে সাগর।
বীরবালা বীরবর, হইয়াছে অগ্রসর,
কখন বিপদ ভয়ে কাঁপে না অন্তর।

১৫

বহিয়া চলিল তরী করে মার মার
দাপটে নাচিছে জল, দেখিয়া বীরের বল,
ভয়ে ভয়ে যেন পথ দেয় পারাবার।

১৬

এরূপে দম্পতি যায় আনন্দিত মন
দিক দশ আবরিয়ে, জলস্থল আছাদিয়ে,
এক দিন ঘন ঘটা ছাইল গগন।

১৭

নীরব নিস্তব্ধ দিক হইল গভীর।
সৌদামিনী তড় তড়, ছোটে বজ্র কড় মড়,
গগন ফাটিয়া যেন হয় শতচির।

১৮

দেখিতে দেখিতে উঠে বিষম তুফান,
সিন্ধু মত্ত ভাব ধরি, উথলে গর্জন করি,
নাচিল তরঙ্গ মালা উড়িল পরাণ।

১৯

উঠে আর পড়ে তরি, মত্তের মতন
ছিন্ন হলো রজ্জু জাল, ছিঁড়িয়া পড়িল পাল,
গেলরে গেলরে সব রাখে কোন জন।

২০

একে একে যত তরী ডুবিতে লাগিল
চারিদিকে হাহাকার, কেবল রোদন সার,
নির্দ্দয় সাগর সব উদরে পূরিল।

২১

কত বীর দিল প্রাণ জলধির জলে।
জানু পাতি বার বার, দেবে করি নমস্কার,
দেখিতে দেখিতে সবে গেল রসাতলে।

২২

এই কি তোমার খেলা গর্ব্বিত সাগর ?
কি সুখ ইহাতে পাও, কোথায় লইয়া যাও,
এত খাও তবু কিরে পূরে না উদর ?

২৩

এই কি নির্দ্দয় সিন্ধু খেলা রে তোমার ?
বঙ্গের হৃদয় ধন, ছিল যত বীরগণ,
তা সবে হরিলে আজ করি অন্ধকার।

২৪

এদিকে তরির পৃষ্ঠে, দাঁড়ায়ে বিজয়,
হাবু ডুবু করে তরী, একাপট দণ্ড ধরি (১)
বাহিরে দাঁড়ায়ে বীর নির্ভয় হৃদয়।

২৫

ঝঞ্ঝাবাতে কাঁপিতেছে সকল শরীর
করিছে অভয় দান, বীরের গর্ব্বিত প্রাণ,
মুহূর্ত্তের তরে কভু না হয় অস্থির।

২৬

সামাল সামাল রব মুখেতে কেবল।
কত সামালিবে আর, রুষিয়াছে পারাবার,
পদতলে গুঁড়া হয়ে পড়িছে অচল।

---

(১) পট দণ্ড মাস্তুল।

২৭

প্রেয়সীর তরে শুধু, হৃদয় কাতর
ভাবে, জল আস্ফালনে, না জানি সে এতক্ষণে,
পড়েছে অজ্ঞান হয়ে তরির উপর।

২৮

চকিতা হরিণী মত বুঝি এতক্ষণে।
ভাসিয়া নয়ন জলে, কোথা প্রাণনাথ বলে,
অভাগারে বার বার করিছে স্মরণ।

২৯

অথবা পবন বলে বুঝি রসাতলে
গিয়াছে তাহার তরি, আহা মম প্রাণেশ্বরি,
বুঝিবা মিশালো আজ জলধির জলে।

৩০

এরূপে ভাবিছে, তরি ভাসিয়া চলিল।
বিনা কর্ণ কর্ণধার, রোধে তারে সাধ্য কার,
দেখিতে দেখিতে গিয়া লঙ্কাতে পড়িল।

৩১

হেথা কামিনীর তরি ঝটিকা পবনে
বেগে, ছিন্ন ভিন্ন হয়ে, ক্রমে যুবতীরে লয়ে,
মহেন্দ্র দ্বীপেতে আসি লাগে কতক্ষণে।

৩২

দ্বীপের উপরে তবে উঠিল কুমার
বীরাগ্রণী ছিল যারা, কোথায় গিয়াছে তারা,
সে সকল রত্নাকর করেছে সংহার।

৩৩

তথাপি সাহসে ভর করিয়া বিজয়
লয়ে সৈন্য গুটিকত, গর্ব্বিত রাজার মত,
প্রবেশিল রাজপুরে নির্ভয় হৃদয়।

৩৪

বাজিল কঠোর রণ যক্ষরাজ সনে
যোঝে বীর ঘোরতর, ত্রাহি ত্রাহি নারীনর,
লক্ষ লক্ষ যক্ষ গেল শমন সদনে।

৩৫

সমর চত্বরে যেন নাচে যুবরায়।
কঠোর অসির ঘায়, মস্তক উড়িয়া যায়,
রুধিরাদ্র হয়ে কত ধরাতে লোটায়।

৩৬

মার মার রবে বীর হয় অগ্রসর।
প্রচণ্ড আঘাত তার, সহ্য করে সাধ্য কার,
"পলারে, পলারে" রব উঠে ঘোরতর।

৩৭

সর্পের জিহ্বার মত খেলে তরবার।
রথরথী গজ হয়, একেবারে চূর্ণ হয়,
গেলরে গেলরে যক্ষ কে করে নিস্তার।

৩৮

ধন্য ধন্য শস্ত্রশিক্ষা ধন্য বীরপণা!
অস্ত্রে অস্ত্রে ঠকাঠকি, খেলে যেন চকমকি,
লিক লিক উঠিতেছে অনলের কণা।

৩৯

এরূপে যুঝিছে বীর কালান্তের প্রায়।
পড়িল যক্ষের দল, বীর শূন্য রণ-স্থল,
কল কল শোণিতের নদী বহে যায়।

৪০

পরিশেষে যক্ষপতি করিল শয়ন।
অবশিষ্ট যক্ষ যত, হলো সবে পদানত,
কুমারেরে দিল সবে রাজ সিংহাসন।

৪১

রাজা হয়ে সিংহাসনে বসে বীরবর।
প্রখর দোর্দ্দণ্ড তাপে, যক্ষপুরী ভয়ে কাঁপে,
অনল সমান বীর জ্বলে নিরন্তর।

৪২

এরূপেতে কিছুকাল বিগত হইল
সুখের নাহিক পার, রূপে গুণে ভুলে তাঁর,
যক্ষরাজ বালা তারে পতিত্বে বরিল।

৪৩

শুনিলে এসব কথা লাগয়ে বিস্ময়।
মাথা তোল বঙ্গভূমি, সত্য করে বল তুমি,
দেছিলে কি হেন বীরে উদরে আশ্রয়?

৪৪

হায় রে সে দিন তব ফিরিবে কি আর?
আর কি আরোহী তরী, সাহসে নির্ভর করি,
তোমার তনয় যাবে সাগরের পার?

৪৫

এমনি সাহসী এবে বঙ্গের সন্তান
আবাস কোটর ফেলে, দুদিনের পথে গেলে,
যাই যাই করে যেন কেঁদে, উঠে প্রাণ।

৪৬

বঙ্গের পুর্ব্বের কথা জানে কোন্ জন?
সে কথা শুধাব কারে, কে তাহা বলিতে পারে,
বিস্মৃতি-সলিলে সব হয়েছে মগন।

৪৭

জন্মেছিল এই বঙ্গে কত বীরবর।
মাথা তোল বঙ্গভুমি, প্রকাশি বল মা তুমি,
তোমা বিনা জননী গো কে দিবে উত্তর।

৪৮

দেখাতে পারি না মুখ মরি মা লজ্জায়
সকলে দুর্ব্বল বলে, ঘৃণা করে পদে দলে,
ছি ছি এত অপমান সহা নাহি যায়।

৪৯

নাহি কোন স্মৃতিস্তম্ভ, নাহিক কবর।
নাহি নাম পরিচয়, হইয়া অঙ্গারময়,
মাটিতে মিশাল কত শূর বীরবর।

৫০

কি করিব? কোথা যাব? কে দিবে বলিয়া
বল মা কিরূপে তবে, তাদের উদ্ধার হবে,
কে তোমার আছে বন্ধু দেহ দেখাইয়া।

৫১

সাগরবাহিনি ! অয়ি দেবি ! ভাগীরথি !
যুগ যুগান্তর হতে, তুমিত গো এই পথে,
চিরদিন একভাবে যাও স্রোতস্বতি !

৫২

পতিতপাবনী তুমি বলে সর্ব্বজন।
সে কারণে তব তীরে, না জানি যে কত বীরে,
পুরাকালে বঙ্গবাসী করেছে দাহন।

৫৩

পার যদি পয়স্বিনি ! জীয়াও সকলে।
তা না পার এই ক্ষণে, নিস্তেজ বঙ্গীয়গণে,
ভাসায়ে লইয়া যাও সাগরের জলে।

৫৪

সগর সন্তানে তুমি ! করেছ উদ্ধার
বঙ্গেরে করুণা করি, অমৃত তরঙ্গ ধরি,
জীয়াও সে বীরগণে আজ একবার।

৫৫

তুমিত গো সিন্ধুপ্রিয়ে দেখেছ সকল।
মগধের রাজ্য যবে, ছিল এই দেশে তবে,
বল বঙ্গমাতা হলো কিরূপে বিকল ?

৫৬

বল শুনি বল শুনি সেই পুরাকালে
ছিল না কি হেন বীর ? সদর্পে যে দিত শির,
সমরচত্বরে সুখে আলিঙ্গিত কালে ?

৫৭

বাঙ্গালির পোড়া দেহে কিরে ছিল না রুধির ?
ছিল না কি তরবার, প্রখর আঘাতে যার,
ধরাতলে গড়াগড়ি যেত শত শির।

৫৮

ছি ছি এ লজ্জার কথা কহিব কাহায়।
হা অভাগি বঙ্গভূমি ! মৃতকল্প আছ তুমি।
নতমুখে কাঁদি শুধু হেরিয়া তোমায়।

৫৯

স্বাধীনতা হারা হয়ে মগধের করে।
শ্রীহীন অনাথ মত, কত কাল হল গত,
ডুবিল গৌরবরবি কলঙ্কসাগরে।

৬০

তারপর পালবংশ রাখিল সম্মান।
উঠ মা জননি বলে, তুলে নিজ বাহুবলে,
অপহৃত মণি তব করিল প্রদান।

৬১

আবার উড়িল কেতু তব করতলে
দূরে গেল মনো দুখ, তুলিলে মলিন মুখ,
শোভিল মধুর হাসি বদন মণ্ডলে।

৬২

রাজমাতা হয়ে মাতা রতন আসনে।
বসিলে তুলিয়া শির, যশোগান সুগভীর,
গাইল ভারতবাসী ভবনে ভবনে।

৬৩

পূজিতে জননি তব চরণ কমলে।
কত শত রাজা আসি, বিবিধ রতন রাশি,
লহ দেবি লহ বলে দিল পদতলে।

৬৪

তব পার্শ্বচরী ঘোর অটল বাহিণী।
শত শত নৃপতির, উন্নত গর্ব্বিত শির,
তব পদে নত করি দিল ওজস্বিনী।

৬৫

তোমার গর্ব্বিত কেতু কলিঙ্গ হৃদয়ে
নিখাতিয়া মদভরে, বীরদর্প চূর্ণ করে,
ফিরে এলো রণমদে উন্মাদিনী হয়ে।

৬৬

এইমাত্র জানি মাতঃ শুনি লোক মুখে
কিরূপে সে বীরবংশ, বল মা হইল ধ্বংস।
স্মরিলে তাদের কথা ভাসি মনোদুখে।

৬৭

ক্রমে গেল পালশশী অস্তাচলশিরে
এদিকে উজ্জ্বল ছবি, ধরি বৈদ্যবংশরবি,
দেখা দিল পূর্ব্বাচলে আসি ধীরে ধীরে।

৬৮

দিগন্ত প্রসারি তার ছুটিল কিরণ।
আবার বঙ্গের যশ, উজলিল দিক দশ,
আবার ভাতিল বঙ্গে রতন আসন।

৬৯

এই বংশে কত বীর জন্মি কত বার,
প্রকাশিয়ে ভুজবল, বিনাশিয়ে অরিদল,
ইন্দ্রপ্রস্থে নিজ রাজ্য করিল বিস্তার।

৭০

সে হেন উজ্জ্বল বংশ সেই ভুজবল,
সে হেন উন্নত নাম, সে হেন সুখের ধাম,
কালেতে বিলীন হায় হইল সকল।

৭১

কোথা হতে সিন্ধুপার হইয়ে যবন।
রাহুর সমান আসি, সুখের শশাঙ্ক গ্রাসি,
চাপিল বঙ্গের গলে গর্ব্বিত চরণ।

৭২

কাতরে কাঁদিলা মাতা পড়ি ধরা তলে
আলু থালু কেশ পাশ, ছিন্ন ভিন্ন হলো বাস,
কত রে তিতিল সুখ নয়নের জলে।

৭৩

মাতার এ দশা দেখি অন্ধের সমান ;
সুখাসক্ত পুত্রগণ, ফেলে তাঁরে সর্ব্বজন,
আপন আপন বিলে করিল প্রস্থান।

৭৪

অপমানে নতমুখী মুদিয়া নয়ন,
অনাথা বন্দীর মত, জননী কাঁদিলা কত,
বধির সে বঙ্গবাসী কে করে শ্রবণ!

৭৫

ধিক্ রে লক্ষ্মণসেন ধিক্ শতবার।
ধিক্ তব সিংহাসনে, ধিক্ তব মন্ত্রিগণে,
ধিক্ ধিক্ নরপতি নামেতে তোমার।

৭৬

ছিল না কি হলাহল তোমার ভবনে।
কেন রজ্জু দিয়ে গলে, না ডুবিলে গঙ্গাজলে
কেন তুমি বসেছিলে রাজসিংহাসনে।

৭৭

থাকিয়া স্বাধীনভাবে গৃহে আপনার,
যদি পাত্রমিত্রসনে, প্রবেশিতে হুতাশনে,
তা হলে ত এ কলঙ্ক ঘটিত না আর।

৭৮

হা কি লজ্জা! অপমানে, সরে না বচন
পলাইলে কি কারণে, ভেবেছিলে কি যে মনে,
পলালে উৎকলদেশে এড়াবে শমন।

৭৯

সেই যদি যমপুরে করিলে গমন
তবে ধরি তরবার, কেন হয়ে অগ্রসার,
না করিলে রণক্ষেত্রে গর্ব্বেতে শয়ন!

৮০

যদি নাই ছিল তব সৈন্যের সম্বল;
তবে কেন একেশ্বর, করি রণ ঘোরতর,
তুচ্ছ নরজন্ম নাহি করিলে সফল?

৮১

লম্বিত পলিত শ্মশ্রু রুধিরাক্ত করে।
সমররঙ্গেতে প্রাণ, দিতে যদি বলিদান,
ঘুষিত তোমার যশ আজি ঘরে ঘরে।

৮২

কারা নিবাসিনী কোন অভাগী কামিনী
যথা ঘোর অন্ধকারে, ভাসে শোক অশ্রুধারে,
বাম করে রাখি খড়্গ ভাবে একাকিনী।

৮৩

যবন নিগড়বদ্ধ হইয়া তেমন,
বঙ্গমাতা বহুদিন, আঁধারে যাপিলা দিন,
রোগে জীর্ণ শোকে শীর্ণ মলিন বদন।

৮৪

মাঝে মাঝে এক এক বীর পুত্র তাঁর
করি সৈন্য আহরণ, করিয়া জীবন পণ
মাতিল সমরে মাকে করিতে উদ্ধার।

৮৫

কিন্তু অসহায় কেবা কি করিতে পারে?
বল ছিল যত দিন, যুঝি সবে হলো ক্ষীণ
সাশ্রুনেত্র হয়ে শেষে হেরিল মাতারে।

৮৬

প্রতাপ আদিত্য রাজা আদিত্য সমান
এরূপে যবন সনে, করি রণ প্রাণপণে,
নিজ বীরত্বের সাক্ষ্য করিল প্রদান।

৮৭

ধন্য তুমি বীরবর করি নমস্কার
ধন্য তুমি গুণধাম, ভুলিব না তব নাম
রাখিব রাখিব গাঁথি হৃদয়ে আমার।

৮৮

আর সে পূর্ব্বের কথা কি হবে স্মরিলে!
স্মরিলে সে সব কথা, মরমে জনমে ব্যথা,
ডুবুক ডুবুক তাহা, বিস্মৃতি সলিলে।

৮৯

যবনের অত্যাচার অন্ধকার প্রায়,
ব্যাপ্ত ছিল এতদিন, ক্রমশ হতেছে ক্ষীণ,
সেই কাল রাত্রি বুঝি এখন পোহায়।

৯০

নিস্পন্দ নিস্তব্ধ হয়ে ছিনু সর্ব্বজন।
ইংরাজের সুশাসন, বহে মন্দ সমীরণ,
খোলো খোলো বঙ্গবাসী, খোলো রে নয়ন।

৯১

উদাসীন থাকিওনা এ হেন সময়।
খোলো হৃদয়ের দ্বার, উঠে দেখ চমৎকার,
পূর্ব্ব দিকে হইয়াছে অরুণ উদয়।

৯২

যামিনী প্রভাত হলো জাগ বঙ্গ জন।
যাহারা পশ্চাতে ছিল, ওই তারা ফেলে গেল,
আর কেন? চেয়ে দেখ— মেল নয়ন।

৯৩

আর কেন? আলস্যের হয়েছে প্রচুর।
উঠরে সাহস ধর, চল হই অগ্রসর,
হীনতা জড়তা সবে কর কর দূর।

৯৪

সবাই উন্নতি পথে হয় অগ্রসর।
দীন হীন হয়ে হেন, আমরা থাকিব কেন?
পশ্চাতে পড়িয়া কেন রব নিরন্তর?

৯৫

যত্নে রত্ন মিলে! কেন হইব হতাশ।
আঘাত করিব দ্বারে, দেখি কে রোধিতে পারে,
যুঝিব যুঝিব সবে যতক্ষণ শ্বাস।

৯৬

অভাগী মাতার পুত্র উঠ সর্ব্বজন।
বল বুদ্ধি উপার্জ্জনে, রত থাক প্রাণপণে,
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।

৯৭

রে দুর্ব্বল বঙ্গবাসী হওরে সবল।
মুছ মুছ জননীর, প্রবল নয়ন নীর,
বাঙ্গালির পোড়া নাম কররে উজ্জ্বল।

৯৮

দূর কর পরিহর বৃথা অভিমান।
হৃদয় সুন্দর কর, কররে সাহসে ভর,
আপনি হীনতা ক্রমে করিবে প্রস্থান।

৯৯

নিয়ত কালের চক্র ঘুরিছে সংসার।
সকল কলঙ্ক যাবে, আবার দেখিতে পাবে,
বঙ্গের সুখের রবি উঠিবে আবার।

১০০

ভ্রাতৃ ভাবে মিল সবে করহে সাধনা।
দেখিবে আসিবে দিন, মোহ, জন্য হবে ক্ষীণ,
পূরিবে পূরিবে ভাব পূরিবে কামনা।

শ্রী শিবনাথ শর্ম্মণঃ।

—

বক্তৃতা।

(মেলার উদ্দেশে।)

মনো মোহন বসু কর্ত্তৃক।[১]

স্থির চিত্তে বিবেচনা করিলে এই বোধ হয়, আজ্ আমরা একটী অভিনব আনন্দ বাজারে উপস্থিত হইয়াছি। সারল্য আর নির্ম্মৎসরতা আমাদের মূল ধন, তদ্বিনিময়ে ঐক্যনামা মহাবীজ ক্রয় করিতে আসিয়াছি। সেই বীজ স্বদেশ ক্ষেত্রে রোপিত হইয়া সমুচিত যত্নবারি এবং উপযুক্ত উৎসাহ তাপ প্রাপ্ত হইলেই একটী মনোহর বৃক্ষ উৎপাদন করিবেক। এত মনোহর হইবে, যে যখন জাতি গৌরব রূপ তাহার নব পত্রাবলীর মধ্যে অতি শুভ্র সৌভাগ্য পুষ্প বিকশিত হইবে, তখন তাহার শোভা ও সৌরভে ভারত ভূমি আমোদিত হইতে থাকিবে! তাহার ফলের নাম করিতে এক্ষণে সাহস হয় না; অপর দেশের লোকেরা তাহাকে "স্বাধীনতা" নাম দিয়া তাহা অমৃতাস্বাদ ভোগ করিয়া থাকে। আমরা সে ফল কখন দেখি নাই, কেবল জনশ্রুতিতে তাহার অনুপম গুণগ্রামের কথা মাত্র শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু আমাদিগের অবিচলিত অধ্যবসায় থাকিলে অন্ততঃ "স্বাবলম্বন" নামা মধুর ফলের আস্বাদনেও বঞ্চিত হইব না। ফলতঃ একতাই সেই মলিন সাধনের একমাত্র উপায় এবং অদ্যকার এই সমাবেশ রূপ অনুষ্ঠান যে সেই ঐক্যস্থাপনের অদ্বিতীয় সাধন, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

পুরাকালে এইরূপ মহা মেলার অনুষ্ঠান দ্বারাই গ্রীস দেশস্থ বিভিন্ন জাতির ঐক্য বন্ধন সাধিত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ ওলিম্পিক, পিথিয়ান, নিমিয়ান এবং ইস্থমিয়ান মেলা সমাজের নাম করিলে অদ্যাপি ভক্তির উদয় হয়। শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ প্রদর্শনার্থেই সময়ে সময়ে সেই সেই মেলার রঙ্গ ভূমিতে সমস্ত গ্রীক জাতির গুণী ও গুণজ্ঞ— দর্শক ও প্রদর্শক গণের সমাবেশ হইত। বিচিত্র প্রদর্শন-ভূমি জনতায় পূর্ণ হইয়া উঠিত। প্রতি-যোগিতার উৎসাহ এবং স্বদেশ বৎসলতার চিহ্ন সকলের মুখভঙ্গিতেই দীপ্তিমান থাকিত। এক দিকে চিত্রকর ও ভাস্করের শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শিত হইতেছে, অপরাংশে কবি ও পৌরাণিক বর্গ স্বীয় স্বীয় গাথা ও ঐতিহাসিক বর্ণনা পাঠ করিতেছেন, কোন স্থলে বা বাগ্মী মণ্ডলী অমৃতায়মানসালঙ্কার ও সদর্থ বাক্‌পটুতা প্রকাশ করিতেছেন, অন্যত্র মল্লযোদ্ধার

---

[১] মনোমোহন বসুর বক্তৃতামালা (১২৮০) গ্রন্থে এই বক্তৃতাটি 'মেলা কি ? মেলার উদ্দেশ্য কি ?' নামে পুনর্মুদ্রিত হয়। সেখানে স্থানে স্থানে অতিরিক্ত অংশ সন্নিবেশিত হয়। তাহা যথাস্থানে পাদটীকায় উল্লেখ করা হইল।

মালসাট, শস্ত্রপাণির শস্ত্রবিলাস, সারথির রথচালনা-কৌশল এবং অশ্বারোহির অশ্বচালনা শিক্ষা প্রদর্শিত হইতেছে। রঙ্গভূমি আনন্দ কোলাহলে প্রতিধ্বনিত, এবং স্বজাতি-গৌরব, উৎসাহ বায়ু যোগে দিগন্ত ব্যাপ্ত হইতেছে। গুণের পুরস্কারক বিচারক মণ্ডলী নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া পারিতোষিক বণ্টন করিতেছেন। সে পারিতোষিক কি? স্বর্ণ নয়, রজত নয়, মণিমাণিক্যও নয়, লারেল নামক পত্রমুকুট অথবা এবম্বিধ অন্য কোন জয় চিহ্ন তাহাদিগের শিরে অর্পণ করিতেছেন, কিন্তু কোন গ্রীক তদপেক্ষা— আর কোন পুরস্কারকে আর কোন গৌরবকে উচ্চতর বলিয়া জানিত না।

কিন্তু তাহাদিগের এই মহদ্ব্যাপার কি এক দিনে সিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল? তাহা নহে। তাহার মূল পত্তন সকল শুভকার্য্যের আদ্যাবস্থার ন্যায়— আমাদের এই চৈত্রমেলার ন্যায়— সামান্যাকারে আরব্ধ হইয়া অতি মহৎ কাণ্ডে পরিণত হইয়াছিল। তাহাও প্রথমে অল্প লোক দ্বারা অনুষ্ঠিত ও অল্প লোক দ্বারাই প্রতিপালিত হইয়াছিল। কাল সহকারে যেমন তাহার অপরিমেয় উৎকৃষ্ট ফলবত্তার বিষয় লোকের সুগোচর হইতে লাগিল, তেমনি ক্রমে ক্রমে তাহাতে সকলেই আসিয়া লিপ্ত হইতে আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিক হইতে প্রতিযোগী ও অনুরাগী আকর্ষিত হইতে লাগিল। দেশের সর্ব্ব বিভাগের ও সর্ব্ব শ্রেণীর লোকেই সর্ব্বান্তঃকরণে সেই শুভ ব্রতে ব্রতী হইয়া উঠিল। তখন সদ্‌গুণ, সৎশিক্ষা এবং স্বদেশানুরাগ বিষয়ে কে কাহাকে পরাজয় করিবে, পরস্পর এই জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া দেশের কতই শ্রীসম্পাদন করিয়া তুলিল।

আমরা এই ইতিহাস খণ্ডকে দৃষ্টান্তরূপে এস্থলে উপস্থিত করিলাম। ইহা কি আমাদিগের অনুকরণীয় অতি উপাদেয় আদর্শ নয়? আমরা কি চেষ্টা করিয়া ইহা সফল করিতে পারিব না? দেশ কাল অবস্থাভেদে যদিও তদ্রূপ অনুষ্ঠান ও তত্তুল্য ফলোৎপাদনে সমর্থ না হই, তথাপি আমাদিগের দেশের, আমাদিগের অবস্থার, এবং আমাদিগের সময়ের উপযুক্ত উপায় অবলম্বনে ও উপকার সাধনে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইব— কখনই নিরাশ হইব না।

বিশেষতঃ এ দেশে এ অনুষ্ঠান নূতন নহে। প্রকৃত ইতিহাস বিরহে বহু পূর্ব্বের কোন বিশেষ বিবরণ জানিতে আমরা বঞ্চিত আছি, তথাপি মহাভারতে বর্ণিত রাজচক্রবর্ত্তী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান বৃত্তান্ত এবং পুরাণোক্ত তদ্বৎ অন্যান্য যজ্ঞ বিবরণ পাঠে বিলক্ষণ জানা যায়, যে পূর্ব্বকালেও এই বহু বিস্তৃত ভারতভূমির পুণ্যবান লোকেরা সর্ব্ব জাতির একত্র সমাবেশ এবং সর্ব্ব দেশের দ্রব্যজাত প্রদর্শনের যে যে মহাফল, তাহার মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন। যদিও তাহার উদ্দেশ্যের নাম স্বতন্ত্র ছিল, কিন্তু ফলদানে উভয়বিধ অনুষ্ঠানের কিছুমাত্র তারতম্য নাই। নানা দেশীয় শিল্পজ, খনিজ, ও উদ্ভিজ্জ পদার্থের প্রদর্শন দ্বারা এখানকার সমৃদ্ধ ইউরোপীয় সাম্রাজ্য মণ্ডলীতে যে অভীষ্ট সাধন হইতেছে, তখনও তাহাই হইত। নানা স্থানীয় গুণি জনের অধিষ্ঠান দ্বারা পাণ্ডিত্য কবিত্ব বাগ্মিতা কারুকার্য্য চিত্র নৈপুণ্য সঙ্গীত প্রভৃতি অশেষবিধ বিদ্যার প্রসঙ্গ এখনও যেরূপ, তখনও

সেইরূপ বা কোন কোন বিষয়ে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টতর ছিল। শারীরিক বলবীর্য্যের তো কথাই নাই, আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্য ধর্ম্মাক্রান্ত ক্ষত্রিয় জাতির অনুপম শৌর্য্য ও ধর্ম্মমূলক সাহসের কথা পাঠ করিয়া গর্ব্বিত না হয় এমন হিন্দু অদ্যাপি জন্ম গ্রহণ করে নাই,[১] এবং বিস্ময়াবিষ্ট না হয়, এমন কোন শূরবীর কোন জাতির মধ্যে অদ্যাপি অবতীর্ণ হয় নাই! সেই বল বীর্য্যের প্রদর্শন ও রহস্যাভিনয় যে সময়ে সময়ে অনুষ্ঠিত হইত, তাহার প্রমাণ বিরাট পর্ব্বে "শঙ্কা মেলার বর্ণনায়" স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। কিন্তু সে কেবল মল্লযোদ্ধাদিগের নৈপুণ্য পরীক্ষার স্থল ছিল মাত্র।

তৎপরে অসীম প্রতাপান্বিত উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালেও গুণজ্ঞতা ও গুণ প্রদর্শনের রীতি বিলক্ষণ প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু সে প্রতিযোগিতা অধিকাংশ কেবল পাণ্ডিত্য ও কবিত্বেই আরব্ধ হইত, অন্য বিষয়ে তত উৎসাহ ছিল না, তথাপি তদ্দ্বারা ভারতের কি উপকার না হইয়াছে?

তৎপরবর্ত্তী অধুনাতন কালেও ঐরূপ শুভোদ্দেশে স্থানে স্থানে বিশেষতঃ বিবিধ পুণ্যতীর্থ স্থলে অসংখ্য মেলার সৃষ্টি হইয়াছে।[২] জগদ্বিখ্যাত হরিদ্বারের ও হরিহরছত্রের মেলার কথা সকলে শুনিয়াছেন। আমি এই শেষোক্ত মেলার বৃহদ্ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এই মেলা প্রতিবৎসর পৌষমাসের শেষে কয়েক দিবস পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। পাটনার পরপার মায়াপুর নামক জনপদে প্রায় যোজন বিস্তৃত স্থানের মধ্যে যতগুলিন গ্রাম আছে, তত্তাবৎ লোকারণ্য ও একীভূত হইয়া যায়। অবধারিত দিনের বহুদিন পূর্ব্ব হইতে কুমারিকা অবধি হিমালয় পর্য্যন্ত এবং তদতিরিক্ত বহু বহু দেশ বিদেশের অধিবাসীরাও আগমন করিতে থাকে। রাজকর্ম্মচারী এবং অন্যবিধ বহুসংখ্যক ইউরোপীয় মহাশয়েরা আগ্রহ পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হন। তথায় নানা জাতীয় নানা ব্যবসায়ী নানা ধর্ম্মাক্রান্ত এবং নানা আকৃতি প্রকৃতির মনুষ্য, শত শত হস্তী, সহস্র সহস্র মনোহর অশ্ব, অসংখ্য গো মহিষাদি এবং বিভিন্ন দেশজাত বিভিন্ন প্রকার অমূল্য অপ্রাপ্য অপূর্ব্ব শোভনতম দ্রব্যরাশির একত্র সমাবেশ দেখিতে দেখিতে মন বিস্ময় রসে দ্রবীভূত হইয়া যায়। ভাগীরথীর গর্ভে কত প্রকার বিচিত্র বিচিত্র জলযান এবং স্থলে কত প্রকার শকটাদি যান বাহন লক্ষিত হইতে থাকে তাহা বলা যায় না! এককালে কোথায় বা নৃত্য গীত আমোদ কোলাহল, কোথায় বা ভোজবিদ্যা বিশারদ ক্রীড়কগণের অত্যাশ্চর্য্য

১ ফলতঃ তাহাকে মেলা আখ্যা দেওয়া কষ্ট-কল্পনা। তাহাকে বরং কবির মেলা ও পণ্ডিতের মেলা বলা যাইতে পারে।

২ দূরদর্শী শাস্ত্রকারেরা সময় বিশেষে তীর্থ বিশেষ দর্শনের বিশেষ ফলশ্রুতি বর্ণনা করিয়া প্রকারান্তরে মহা মহা মেলার সূত্রপাত করিয়া দিয়াছেন— লোকে পারত্রিক শুভ-কামনায় চতুর্দ্দিগ হইতে এককালে এক স্থানে সমবেত হয়, তাহাতেই বৃহৎ বৃহৎ মেলা হইয়া সমাজের ঐহিক মঙ্গলও সাধিত হইয়া উঠে।

নেত্ররঞ্জক ক্রীড়া, কোথায় বা মল্ল যোদ্ধগণের অদ্ভুত রণনৈপুণ্য, কোথায় বা ইউরোপীয় রীত্যনুসারে ঘোড় দৌড়, কোথায় বা ভণ্ডদলের ভণ্ডামি ইত্যাদি প্রতি পদে পদে পরিবর্ত্তনশীল নূতন নূতন রহস্য ব্যাপার দর্শনে দর্শকের আগমন-ব্যয় ও পরিশ্রম সার্থক বোধ হয়। আবার যখন এ সকল হইতে অবসৃত হইয়া তত্রত্য অধিষ্ঠিত দেবতা— যাঁহার উদ্দেশে এই মহামেলার অনুষ্ঠান— তাঁহার মন্দির সন্নিহিত হওয়া যায়, তখন আর এক চমৎকার দৃশ্য! সহস্র সহস্র লোক— কি লক্ষ লক্ষ লোক বলিলেও অত্যুক্তি হয়না— কেননা গঙ্গাস্নান করিয়া দেব দর্শনে গমনশীল ব্যক্তিগণের আর্দ্রবস্ত্র নিঃসৃত জলধারা পথ ঘাট এরূপ কর্দ্দমময় হইয়া উঠে, বোধ হয় যেন শ্রাবণ মাসের ধান্য ক্ষেত্রে আগমন করিয়াছি! সেই সময় একেবারে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সৌরাষ্ট্র মহারাষ্ট্র উৎকল দ্রাবিড় কাশী অযোধ্যা মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি বিভিন্ন খণ্ডবাসী পণ্ডিত, যতি, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর বদন পরম্পরা বিনির্গত কত প্রকার স্তবপাঠ— কত প্রকার বেদধ্বনি— কত প্রকার ভক্তির উল্লাসবাক্য শ্রুতি গোচর হইতে থাকে তাহা নিতান্তই বর্ণনাতিরিক্ত— সে সমস্ত দর্শন শ্রবণে নাস্তিকের মনেও ভক্তির সঞ্চার না হইয়া যায় না!

শুনিয়াছি হরিদ্বারের মেলা এতদপেক্ষাও বৃহৎ— ইহা অপেক্ষাও অধিক সমারোহে সম্পন্ন হয়। ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই এরূপ না হউক, মধ্যবিধ রূপ এবং সামান্য রূপ কত তীর্থ কত যে মেলা হইয়া থাকে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। বারাণসী প্রভৃতি পুণ্য ভূমিতে মাসে মাসে— কথায় কথায় মেলার অনুষ্টান হইয়া থাকে।[১] কিন্তু সে সমস্ত মেলার প্রত্যেকটী এক এক ধর্ম্মাক্রান্ত এবং এক এক শ্রেণীস্থ লোকের নিজস্ব সম্পত্তি। তাহাতে সেই প্রকার লোকেই অনুরাগী। অপর যাহারা যায় তাহাদিগের ধনোপার্জ্জন ও কৌতুক দর্শন মাত্র অভিপ্রায় ও অধিকার। সেই সেই মেলা আড়ম্বর ও জনতায় অসামান্য ও উৎকৃষ্ট বটে, কিন্তু সুপ্রণালী ও সুব্যবস্থাতে অতি যৎসামান্য ও নিকৃষ্টবৎ বোধ হয়। তথায় বহুল প্রকার অসংখ্য লোকের সমাবেশ এবং বিবিধ পশ্বাদিও দ্রব্যজাতের সংগ্রহ হয় বটে, কিন্তু সকলি অব্যবস্থিত— সকলি গোলযোগ! তথায় এমন কোন সুযোগ্য অধ্যক্ষ, বিশারদ ব্যবস্থাপক এবং পারদর্শী পরিচারক নাই যে সেই পরম শুভদায়ক সমাবেশকে

১ এই বঙ্গদেশেও হিন্দু যবন উভয় ধর্ম্মাক্রান্ত লোকের কত শত মেলা কত শত গ্রামে বৎসরে বৎসরে অনুষ্ঠিত হইতেছে। এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, অস্মদ্দেশে যখন এত প্রকারের এত মেলা বিদ্যমান আছে, তখন আবার অভিনব মেলার প্রয়োজন কি? পূর্ব্বাবধি যে সমস্ত মেলা রহিয়াছে, তত্তাবতের অধ্যক্ষগণ মেলার জন্য কিছুমাত্র ব্যয় করেন না, ব্যয় দূরে থাকুক বরং তাঁহাদের বিলক্ষণ আয় হয়। কিন্তু এই অভিনব মেলা যাহা এক্ষণে অনুষ্ঠিত হইতে চলিল, ইহাতে মেলাধ্যক্ষগণকে বিস্তর ব্যয় করিতে হয়, তথাপি তত লোকের জনতা হয় না। এ অবস্থায় তবে আর নূতন মেলার চেষ্টা পাওয়ার আবশ্যক কি? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, যে সকল মেলা আছে সে সমস্ত…

যথার্থই শুভদায়ক করিয়া তুলে। তথায় বিদ্যার প্রভুত্ব এবং মার্জ্জিত বুদ্ধির পরাক্রম কিছুই নাই। অনেকানেক বুধমণ্ডলী অধিষ্ঠিত হন বটে, কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগের লৌকিক কল্যাণ সাধন ভিন্ন আর কিছুতেই হস্তক্ষেপ করেন না, অথবা কেই বা তাঁহাদিগকে নিয়োগ করে? সুতরাং সেখানে বিদ্যা বুদ্ধি অধ্যক্ষতা করিতে পাইলেন না, সেখানে সুব্যবস্থা ও সৎ ফলোৎপাদনের আশা করাও বৃথা!

অতএব হে স্বদেশহিতৈষি মহাশয়গণ! আমি বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করি, আমাদের এমন একটী সমাবেশ ক্ষেত্রের অভাব হইতেছে কি না, যেখানে ঐ সকল দোষের প্রতীকার হইতে পারে? দেশের বর্ত্তমান অবস্থানুসারে এমন একটি সমাজ স্থাপনের আবশ্যকতা আছে কি না, যাহা আধুনিক সমুন্নত বিদ্যা বুদ্ধির সমাশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমস্ত ভারত ভূমির মঙ্গল ভাণ্ডার স্বরূপ হইতে পারে?—বস্তুতঃ চতুর্দ্দিক্‌স্থ অসংখ্য প্রকার মেলার মধ্যে এমন একটি বিশেষ মেলার প্রয়োজন হইতেছে কি না, যাহা নির্ব্বিবাদে ভারতবর্ষস্থ সমস্ত শ্রেণীস্থ লোকের প্রীতিস্থল হইতে পারে—যেখানে ধর্ম্ম সংক্রান্ত মত ভেদ তিরোহিত হইয়া সকলেই সৌভ্রাত্র ও সৌহৃদ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবেন—যেখানে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, বৃদ্ধ, জৈন, নাস্তিক, আস্তিক সকলেই আপনাপন মেলা ভাবিয়া নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে উৎসবের সমভাগী হইতে পারেন—যেখানে অন্যান্য মেলার অনুষ্ঠিত অথবা নব নব প্রকারে ক্রীড়া কৌতুক আমোদ আহ্লাদ বিদ্যা সাধ্য শিল্প সাহিত্য কৃষি ব্যায়াম ইত্যাদি অধিকতর সুশৃঙ্খলা ও সুনিয়মে প্রদর্শিত ও পুরস্কৃত হইতে পারে। যদি এমন মেলার অভাব থাকে—যদি এমন রুচিকর কোন একটী মহামেলার আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইয়া থাকে, তবে এই "চৈত্র মেলা" সেই অভাব দূরীকরণার্থে—সেই প্রয়োজন সাধনার্থেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে অধিক আহ্লাদের বিষয় এই, ব্রিটিস সাম্রাজ্য হওনাবধি এদেশে যত কিছু উত্তম বিষয়ের অনুষ্ঠান হইয়াছে, প্রায় রাজপুরুষগণ অথবা অপরাপর ইংরাজ মহাত্মারাই তাহার প্রথম উত্তেজক এবং প্রধান প্রবর্ত্তক। কিন্তু এই চৈত্রমেলা নিরবচ্ছিন্ন স্বজাতীয় অনুষ্ঠান, ইহাতে ইউরোপীয়দিগের নাম গন্ধ মাত্র নাই, এবং যে সকল দ্রব্য সামগ্রী প্রদর্শিত হইবে, তাহাও স্বদেশীয় ক্ষেত্র, স্বদেশীয় উদ্যান, স্বদেশীয় ভূগর্ভ, স্বদেশীয় শিল্প, এবং স্বদেশীয় জনগণের হস্ত সম্ভূত! স্বজাতির উন্নতিসাধন, ঐক্য স্থাপন এবং স্বাবলম্বন অভ্যাসের চেষ্টা করাই এই সমাবেশের এক মাত্র পবিত্র উদ্দেশ্য। হিন্দুজাতি এই নামটী শুনিতে অতি প্রাচীন ও অতি উচ্চ। দুর্ভাগ্য ও কাল ধর্ম্ম বশতঃ সেই উচ্চ উচ্চ জাতি এখন অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। বহুদিনব্যাপী পরাধীনতা এবং অন্যান্য নানা কারণে হিন্দুজাতির মধ্যে অসংখ্য শ্রেণীভেদ, অসংখ্য মত ভেদ, সম্পূর্ণ আচার ভেদ সংঘটিত হইয়াছে। তাহাতেও বিশেষ হানি ছিলনা, কিন্তু স্বজাতীয় গৌরবেচ্ছা, সামাজিকতা এবং প্রকৃত সুখ-দুঃখানুভবশক্তি নিস্তেজ হওয়াতে কি নিদারুণ—কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে! যাহারা পূর্ব্বে এক পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের ন্যায় সামাজিক কর্ত্তব্য বিষয়ে পরস্পরের স্নেহকারুণ্য গুণে সংবদ্ধ ছিল, তাহারা

এখন বিভিন্ন দেশবাসী— দ্বীপ দ্বীপান্তরস্থ লোকের ন্যায় অপরিচিত ও শিথিল-সৌহার্দ্দ হইয়া গিয়াছে। সমাজের যতদূর বিশৃঙ্খল ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে। এই দুরবস্থা চাক্ষুষ করিয়া কোন চিন্তাশীল হিন্দু স্থির থাকিতে পারে? কোন সুশিক্ষিত স্বদেশবৎসল মন প্রতিবিধানে অগ্রসর না হইয়া স্বীয় ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও ধিক্কারে বধির থাকিতে পারে? যে সকল মহাশয়গণের এইরূপ উন্নত মন— যে সকল হিন্দু কুলোদ্ভব মহাত্মাগণ এইরূপ চিন্তাশীল, তাঁহারাই এই "চৈত্রমেলা" নামা হিন্দু সমাজ বন্ধনের অদ্বিতীয় উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে।[১] তাঁহারা হিন্দুমাত্রেরি কৃতজ্ঞতাভাজন, তাঁহাদিগকে সদ্বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদিগকে যাঁহার যাহা সাধ্য তদনুরূপ সাহায্য ও সহযোগিতা করা, হিন্দুমাত্রেরি অবশ্য কর্ত্তব্য। না করিলে যার পর নাই প্রত্যবায় ও ক্ষমার বহির্ভূত অপরাধ জন্মিবে, সন্দেহ নাই। তাঁহারা অতি সুবিবেচনা পূর্ব্বক অধ্যক্ষ সমাজকে ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রতি বিভাগের উপর মেলাসম্বন্ধীয় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছে।

অসম্বন্ধ হিন্দুসমাজ মধ্যে ঐক্য স্থাপন ও তাহাতে অনুরাগ উৎপাদন করিয়া দেওয়া এবং তাহার জীর্ণ সংস্কারের চেষ্টা করা প্রথম শ্রেণীর কার্য্য। তাহার বিশেষ তাৎপর্য্য পূর্ব্বক্ষণেই বলা গিয়াছে, সুতরাং পৌনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্য্যও অতি গুরুতর; অর্থাৎ এক মেলার সময় হইতে অপর মেলার দিন পর্য্যন্ত সম্বৎসর মধ্যে হিন্দুসমাজের যে কিছু উন্নতি বা দুর্গতি হইয়াছে, বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করিয়া মেলার দিবসে এই শ্রেণীর অধ্যক্ষগণ তাহা সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে বিজ্ঞাপন করিবেন।

তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যক্ষ মহাশয়েরা পবিত্র বিদ্যোৎসাহ কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়াছেন। অর্থাৎ যে সমস্ত দেশস্থ মহাশয়েরা স্বজাতীয় ও স্বাবলম্বিত শিক্ষাদানে ব্রতী হইয়াছেন বা হইবেন, তাঁহাদিগকে সমুচিত উৎসাহ প্রদান করাই এই বিভাগের বিশেষ কার্য্য হইবেক।

চতুর্থ শ্রেণীর নাম "প্রদর্শন বিভাগ"। তাঁহারা মেলায় প্রদর্শিতব্য দ্রব্যজাত সমূহ সংগ্রহ করিবেন।

পঞ্চম, সঙ্গীত বিভাগ। যাহাতে মেলাস্থলে বিবিধ প্রকার সঙ্গীতজ্ঞ গুণিমণ্ডলীর গুণ প্রদর্শন ও সঙ্গীত সম্বন্ধ দেশে সুধারায় প্রবর্ত্ত না হয় এই শ্রেণীর তাহাই মুখ্য কর্ম্ম হইবেক।

১ তাঁহাদের মধ্যে সিমুলীয়া-বাসী গুণরাশি, নির্ম্মৎসর, অধ্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র মহাশয় সর্ব্বাগ্রগণ্য। যে সকল গুণদ্বারা বহুজনসাধ্য বৃহৎকাণ্ডের আবিষ্কর্ত্তা ও নিয়ন্তা হওয়া সম্ভব, তাঁহাতে সে সমস্ত গুণ সর্ব্বতোভাবে বিদ্যমান আছে। সেই মহদ্গুণাবলীর শৃঙ্খলে অন্যান্য স্বদেশ-হিতৈষী মহাশয়েরা আবদ্ধ রহিয়া কয়েকটী মধুমক্ষিকার ন্যায় অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে স্বদেশের সৌভাগ্য মধুচক্র একখানি রচিত করিয়া তুলিয়াছেন। অতএব তাঁহারা…

ষষ্ঠ শ্রেণীস্থ অধ্যক্ষগণ মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি শারীরিক বল কৌশল নিষ্পন্ন বিষয় প্রদর্শনে বিশেষ মনোযোগী হইবেন, এবং যথাসাধ্য পুরস্কারাদি দান পূর্ব্বক যাহাতে দেশমধ্যে ব্যায়াম শিক্ষার প্রারম্ভ হয়— যাহাতে "ভেতো বাঙ্গালী" আর "ভীরু বাঙ্গালী" বলিয়া অপর দেশের লোকেরা ঘৃণা ও বিদ্রূপ করিতে আর না পারে, তৎসাধন পক্ষে যত্নশীল হইবেন।

এই উৎকৃষ্ট শ্রেণী বিভাগ ও কর্ত্তব্য বিভাগ দেখিয়া কে না আমার সহিত তৎপ্রণেতা মহাশয়গণের প্রতি আন্তরিক বাধ্যতা স্বীকার ও অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিবেন? কে না মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন, যে, এই অভিনব মেলার সংকল্প অতি পবিত্র, ইহার অভিপ্রায় অতি মহান্, ইহার উদ্দেশ্য অতি উচ্চ এবং ইহার আশা অতি সদাশা: সেই মঙ্গলাভিপ্রায়, সেই শুভ সংকল্প, সেই উচ্চ আশার কিয়দংশ সিদ্ধ করিয়া উঠিতে পারিলেও এই "চৈত্রমেলা" আমাদিগের পরম গৌরবের স্থল হইতে পারিবে। ইহার উৎকৃষ্ট ফলশ্রুতির কথা বাক্‌যন্ত্র অথবা লেখনী যন্ত্র দ্বারা কি ব্যক্ত করিব, ধ্যান করিয়া না দেখিলে তাহার প্রকৃত অবয়ব প্রত্যক্ষীভূত হইবার নহে। ইহা দ্বারা বিলুপ্তপ্রায় হিন্দু নামের পুনরুজ্জীবন এবং বিনষ্ট হিন্দু গৌরবের পুনরুত্থান হইতে পারিবেক। যবনদিগের নিদারুণ অধীনতারূপ লৌহ-নিগড়ে বহুকাল বদ্ধ থাকিয়া আমরা স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বনকে হারাইয়াছি, ইহা দ্বারা তাহাদিগকেও পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইব। তাহাদিগকে পাইলে আপনাদিগের ভাল মন্দ আপনারা ভাবিতে এবং আপনাদিগের হিতানুষ্ঠান আপনারা করিতে পারিব। তখন আর অন্যের মুখাপেক্ষায় থাকিতে হইবে না— মুখের গ্রাস অন্যে আসিয়া তুলিয়া দিবে না— তুলিয়া দিয়া এমন স্তোভবাক্যেও ভুলাইতে পারিবে না, যে তোমাদিগকে অমৃত দিলাম; কিন্তু বাস্তবিক তাহা বিষ!

অতএব হে স্বদেশস্থ ভ্রাতৃগণ! হে জ্ঞান-বৃদ্ধ মান্যতম মহাশয়গণ! হে আর্য্যাবর্ত্তের আর্য্য ধর্ম্ম রক্ষক পূজ্যপাদ অধ্যাপক মণ্ডলি! হে সৎক্রিয়ান্বিত ধন-কুবের মহাশয়গণ! হে মহিমান্বিত ভূস্বামিবর্গ! হে কৃতবিদ্য নব্য সম্প্রদায়! আসুন আমাদের পরম হিতের জন্য, জননী জন্ম ভূমির জন্য, সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ সংস্কৃত ভাষার জন্য, শারীরিক বলাধান জন্য, মনের ঔৎকর্ষ জন্য, শিল্পবিজ্ঞান জন্য, সুমধুর গান্ধর্ব্ব বিদ্যার জন্য, কৃষি-কার্য্যের কুশল জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য, আসুন আমরা সকলে একত্র মিলিত হই! নিদেন সম্বৎসরে এক দিনের জন্যও মিলিত হই! এক দিনের মিলনে যদি শুভ হয়, তবে কেন আলস্য করি! এক দিনের মিলনে যদি অজ্ঞাত পূর্ব্ব অশ্রুত পূর্ব্ব অপূর্ব্ব সুখাস্বাদনে সমর্থ হই, তবে আর তিলার্দ্ধ ঔদাস্য করা নয়— তবে সকলেরি একাগ্র চিত্ত হওয়া আবশ্যক— তবে অন্যান্য সহস্র কর্ম্মকেও উপেক্ষা করা উচিত— তবে এই মঙ্গল তরুকে বদ্ধমূল ও বর্দ্ধনশীল করিতে যত্ন পাওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য! আজ্ ইহাকে অতি ক্ষুদ্র দেখাইতেছে বলিয়া অনাদর করা নির্ব্বুদ্ধির কর্ম্ম, আপনাদিগের দ্বারা লালিত পালিত হইলে ইহাই তখন মহামহীরুহ হইয়া উঠিবে। যে শিল্পী, যে কৃষক, যে উদ্যান পালক, যে যন্ত্রী, যে গায়ক,

যে পাইক, যে পলওয়ানকে আজ্ অনুরোধ করিয়া ডাকিয়া আনিতে হইল, এবং যে সকল দ্রব্য সামগ্রী লোকের বাটী বাটী গিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইল; যখন দেখিবেন সেই সকল লোক ও সেই সমূহ দ্রব্য সম্ভার আপনা হইতেই আসিতেছে—যখন দেখিবেন ঢাকা ও শান্তিপুরের তন্তুবায়গণ, কাশী ও কাশ্মীরের কারুগণ, জয়পুর ও লক্ষ্ণৌয়ের ভাস্করগণ, চণ্ডালগড় ও কুমারটুলির কুমারগণ, পাটনার কৃষকগণ, অথবা সংক্ষেপে বলিতে গেলে উত্তর ও দক্ষিণের— পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সমব্যবসায়ী, সমশিল্পী, এবং সমবিদ্য গুণিগণ এই চৈত্রমেলার রঙ্গ-ভূমিতে আপনা হইতে আসিয়া পরস্পর প্রতিযোগিতা-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে— যখন দেখিবেন তাহারা এই মেলার প্রদত্ত প্রতিষ্ঠা ও পুরস্কারকে অমূল্য ও অতুল্য গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতেছে— যখন দেখিখেন এই মেলাকে স্বজাতীয় গৌরব-ভূমি বলিয়া সকলের প্রত্যয় জন্মিয়াছে, তখনই জানিবেন এই নব-রোপিত বৃক্ষের ফল লাভ হইল! সেই শুভকাল আসা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে হইবেক— ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষা করিতে হইবেক। এক দিনে কিছুই হয় না। প্রকৃতির নিয়মানুসারে বৃহদ্ব্যাপার মাত্রেই অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সেই অখণ্ডনীয় নিয়মানুসারে ইহারও বয়োবৃদ্ধি সহকারে শ্রীবৃদ্ধি হইবে। সেই শ্রীবৃদ্ধি আপনাদিগের উপরেই নির্ভর করিতেছে। আপনারা স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য ভার উপযুক্ত রূপে বহন করিতে পারিলেই এই ক্ষুদ্র মেলা জগতের একটী মহামেলা নাম পাইতে পারে। তখন ইহার গুণ গরিমা শ্রবণে লোকে বিস্ময় জনক গ্রীক মেলাকে বিস্মৃত হইতে পারে। অতএব পুনশ্চ বলি, আসুন, আমরা মিলিত হই! জননী জন্মভূমি অধিকতর আপনাদের আদেশ করিতেছেন, তাঁহার দুঃখ বিমোচনে অগ্রসর হউন! তাঁহার প্রথমাবস্থার কীর্ত্তিকুশল সন্তানগণের বিয়োগ দুঃখে তিনি জর্জ্জরিত হইয়া আছেন। অন্ততঃ আপনারা এখন সেই দুঃখানলে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা জল অর্পণ করুন! যে হিন্দুর মনে কণামাত্রও দয়াবৃত্তির সঞ্চার আছে, তিনি কখন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না। পূর্ব্বে স্বদেশ-বাৎসল্য ধর্ম্ম হিন্দুজাতির প্রাণাধিক প্রিয় পদার্থ ছিল, এখন দুর্ভাগ্যক্রমে অনৈক্য দুর্গের অজ্ঞানতার অন্ধকূপে অবরুদ্ধ আছে, তাহার সেই বন্ধন দশা বিমুক্ত করিতে চেষ্টা করুন! চেষ্টা করিলে কখনই ব্যর্থ হইবে না।

"সাধিলেই সিদ্ধ" ইটী প্রসিদ্ধ প্রাচীন বাক্য। যিনি আত্ম সাহায্য করেন, তিনি দৈবানুগ্রহের পাত্র। যিনি আত্ম কর্ত্তব্য বিস্মৃত, ঈশ্বরও তাঁহাকে বিস্মৃত হন। আমাদিগের ঐকান্তিক যত্ন, অকপট অনুরাগ, সমুচিত উৎসাহ, এবং অবিচলিত অধ্যবসায় দেখিলে সেই দয়ার সাগর সর্ব্বমঙ্গলাকর জগদীশ্বর অবশ্যই অনুকূল হইবেন। এই মহদনুষ্ঠান দ্বারা আমরা যে যে অমৃত-ফল লাভের আশা করিতেছি, তাহা অতি দুঃসাধ্য ও দুরূহ হইলেও ঈশ্বরানুকম্পায় সাধ্য ও সহজ হইবে, সন্দেহ কি? সেই ভগবদেচ্ছায় পর্ব্বত রেণু হইতেছে, রেণুকণাও পর্ব্বত হইয়া উঠিতেছে। এই মহা নীতি সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগরূক রাখিয়া, আসুন আমরা তাঁহার প্রতি কায়মনোবাক্যে নির্ভর করিয়া তাঁহার পবিত্র নামোচ্চারণ পূর্ব্বক এই

শুভ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। এরূপে প্রবৃত্ত হইলেই সুমধুর দুন্দুভি নিনাদের সহিত সেই মহোচ্চ স্থান হইতে এই প্রবোধ বাক্য শুনিতে পাইবেন, যে,

"স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি।"

—

সংস্কৃত কবিতা

চৈত্র সংসদ্বর্ণিকা

সারদা শারদাম্ভোদবর্ণা বর্ণাত্মিকা স্তু নঃ।
বদনে বদনেনেন্দুতুল্যাঽতুল্যা গুণৈঃ সদা ॥১॥

গাম্ভীর্য্যেণ যুতা সদাশয়বতী মাধুর্য্য ভাবান্বিতো
শুদ্ধ্যা দুগ্ধনিভা বিদগ্ধ-হৃদয়ানন্দপ্রদা সদ্রসা।
কালুষ্যেণ বিবর্জিতা দ্বিজবরৈঃ সংবেষ্টিতা বক্রগা বাণী
শারদবাহিনীব জয়তাৎ শশ্বৎ কবীনাং ভুবি ॥২॥

নানালঙ্কৃতিশালিনী গুণগণগ্রামৈক বাস্তব্যভুরৌ
দার্য্যাদিযুতা সতাং বশকরী ভাবপ্রকর্ষান্বিতা।
চাতুর্য্যেণ সুসঙ্গতা রসবতী হৃৎস্থানবিদ্যোতিণী
লোকে কোমলকামিনীব কবিতা মোদায় বিদ্যোততে ॥৩॥

আত্মভাবপরকীয় বোধনে হেতবো বিবিধরূপমাগতাঃ।
ঈশ্বরেণ জগতাং হিতৈষিণা সাধু বর্ণনিচয়া বিতেনিরে ॥৪॥
তৈরেব বর্ণৈর্নিখিলানি শাস্ত্রাণ্যনুশ্রিতানীহ সহস্রশোঽপি।
সংলাপনঞ্চ ব্যবহার-মার্গাস্তৈরেব বর্ণৈর্নিযতা জনেষু ॥৫॥

শাস্ত্রেষু লোকে বিবিধঃ প্রকারো বিদ্বত্ত মৈঃ কল্পিতভূরিভাবঃ।
আলস্যদোষাদিহ লোপমাপ ক্যচিচ্চ কস্যাপি সুবিস্তরোঽস্তি ॥৬॥

অধ্যাত্মদর্শনমথেঽ পদার্থবিদ্যা জ্যোতির্গতিস্থিতি বিবোধনমঙ্গবিদ্যা।
কালপ্রমাণমথ গীতি-বিধান-শাস্ত্রং হস্ত্যশ্ব শিক্ষণ বিধানমনঙ্গবিদ্যা ॥৭॥

যন্ত্রাদিলক্ষণপরাণি তথেন্দ্রজাল-জ্ঞানৈকসাধনমথো পশুলক্ষণঞ্চ।
কাব্যানি নাটকযুতানি তথেতিবৃত্তং বাণিজ্যকর্ষণবিধায়ক শাস্ত্রজাতম্ ॥৮॥

উদ্ভিদ্য শাস্ত্রমথবাস্তু রসায়নাদি সঙ্গামকৌশল চিকিৎসন শিল্পবিদ্যাঃ।
নীতিঃ কলাঙ্কগণিতানিচ ভূরিভেদাঙ্গানি লোকবিদিতানি বভূবুরাদৌ ॥৯॥

আসীদসীম গুণধামনি বিক্রমার্কে ভূপেঽত্র ভূমিবলয়ে হ্যখিল শাস্ত্র চর্চ্চা। স্বর্গং গতেহ এ নৃপতৌ কৃশতামবাপ্তা দেশান্তরং গতবতী শরণার্থিনীব ॥১০॥

ভ্রামং ভ্রামমনেক দেশনিবহং শান্তিং ন লব্ধা ক্যচিৎ শ্রান্তা খেদব-শাল্লিতান্তবিমনা বৈরাগ্যমালম্ব্য সা। শেষে নির্ব্বৃতি-লিপ্সয়াজলনিধেঃ পারং গতা সজ্জনৈস্তত্রত্যৈস্ত সমাদৃতা চিরদিনং তত্রৈব মোদান্বিতা ॥১১॥

সাত্রত্যলোকনিবহেষু চিরং রতাপি সম্মাননাবিরহমেত্য ভৃশং বিরক্তা। লোকালসত্ববশতো নৃপতেরনস্থা দোষেণ চ ক্রমবশাদিহ লোপমাপ ॥১২॥

ইংলণ্ডভূপতিবরৈরমুমান্ত যত্নাদ্দেশান্তরাৎ পুনরিহাগু সমাহৃতেয়ম্। সম্মাননাদিভিরসাবহুমোদিতা চেদস্মদ্বিরাগমপহায়রতা পুনঃস্যাৎ ॥১৩॥

লুপ্তপ্রায়েষু শাস্ত্রেষু পুনস্তেষাং চিচীষয়া। ইংলণ্ডীয়ৈর্নৃপলরৈঃ প্রোৎসাহঃ ক্রিয়তে নৃণাম ॥১৪॥

বিদ্যা বুদ্ধিবিবর্দ্ধনায় যদি নো যত্নান্বিতো ভূমিপা লোকানাং হিতসাধনায়চ তথা প্রোৎসাহযেযুর্নবা। প্রোৎসাহেন বিবর্জিতা বততদা বিদ্যা-বিরক্তা জনাস্তস্মাৎ সর্ব্বসমুন্নতেরহুগুণো রাজপ্রয়াসো ধ্রুবম্ ॥১৫॥

নৃপববরৈরহুমোদিত সৎপথে যদিজনাঃ সুরতাঃ সুখিনস্তদা
অথ বিরোধি পথং সমহুশ্রিতাঃ সততমেব পরং পরিতাপিনঃ ॥১৬॥

মেঘা ইবাপঃ সদ্বিদ্যাঃ সমাহৃত্যান্য দেশতঃ। বর্ষান্তি ভারতেবর্ষে ভূপা লোকবিবৃদ্ধয়ে ॥১৭॥

তেনানুরঞ্জিতা ভূপে সততং ভক্তিশালিনঃ। মোদন্তে সজ্জনাস্তস্য শুভাশংসনতৎপরাঃ ॥১৮॥

অখণ্ডভূমণ্ডলমণ্ডনায়িতৈ র্গৌরিস্তকৈর্লণ্ডনতঃ সমাগতৈঃ। সামাজিকৈর্বিজ্ঞবরৈঃ সভাজিতৈঃ সভাজিতৈবাগু সমস্তভূভৃতাম্ ॥১৯॥

তৈ রাজবর্গৈ রণুমোদিতা বয়ং বিদ্যাবিবৃদ্ধ্যৈ সততং যতামহে। যত্নস্য সাফল্যবিরোধনস্ত ক্রিয়াসু নৈপুণ্য নিদর্শনেন ॥২০॥

দৃষ্টে কৌশলতৎপরে নরবরে লোকা স্তথৈবাত্মনো নৈপুণ্যাদিবিধিৎসয়া সুভৃশয়া শশ্বত্তবস্ত্যৎসুকাঃ। তেনেষং প্রতিবর্ষমত্র পরমা চৈত্রে সমাপ্তে সতা বিদ্বত্তির্বিহিতা স্বদেশকুশলাকাঙ্ক্ষান্বিতৈর্মানবৈঃ ॥২১॥

চৈত্রান্তে মৈত্রবৃন্দৈ র্বিরচিত মিলনৈ রেকদেশে সুরম্যা দেশস্তা-স্তোন্নতীনামুপজননমভিপ্রেত্য সংসৎ কৃতেয়ম্। এতন্নীবৃজ্জনানাং বিবিধ-গুণচয়ে যত্নবত্ত্যং যথা স্যান্নানাশাস্ত্রাদি শিক্ষাবিবিধজনগণাচার দৃষ্টেশ্চ তোষঃ ॥২২॥

অশেষগুণ গুম্ফিতা সুমনসাং গণৈর্ভূষিতা বুধালিপরিষেবিতা সুরভিরত্ন বিদ্যোততে। বসন্তসময়োদ্ভবা স্রগিব সংসদেষা চিরং সতাং হৃদয়বাসিনী সতত মোদসন্ধায়িনী ॥২৩॥

কার্য্যস্য বৈচিত্র্য বিলোকনেন বিধাতরীশেহস্তি যথানুরাগঃ। প্রোৎসাহকে ভূপবরে গুণানাং বিলোকনেনৈব তথাস্তু রাগঃ ॥২৪॥

নানাবিদ্যাসুনৈপুণ্যং পুণ্যসঞ্চয় সঞ্চিতম্। সাম্রাজ্য সুখ-সন্তান-প্রখ্যং মানসরঞ্জনম্ ॥২৫॥

সর্ব্বে স্বার্থপরায়ণা ভূরি নরা দৃশ্যন্ত এবাধুনা কেচিৎ স্বানুগতোপকারকরণাৎ লোকে মহত্বং গতাঃ। যে দেশস্য হিতায় সন্তত সদুদ্যোগং সদা তন্বতে সর্ব্বেষামুপকারিণশ্চ মনুজা স্তে কেহপি লোকোত্তরাঃ ।২৬॥

এতৎপ্রচারণ বিধৌ সততং রতা যে তে মানবা ভুবি পরং সুখিনঃ সদা স্যুঃ। আশাস্মহে চিরদিনং জগদীশ এষা-মাকাঙ্ক্ষিতার্থ পরিপূরণকৃত্তথাস্তু ॥২৭॥

—

চৈত্রসংসম্বর্ণিকেয়ং শ্রীতারানাথ শর্ম্মণা

তারাশব্দে র্বিরচিতা শ্লোকৈ রস্তু সতাং মুদে ॥

—

কল্পান্তোত্থশ্বসনতরলোল্লোলমালাকরালে নাব্যারোপ্য প্রলয়জলধৌ সর্ব্ববীজৌষধীভিঃ। যোপাদ্বেদান্ ভুবনহিতকৃৎ শ্রাদ্ধদেবঞ্চ দেবঃ সানুক্রোশো দিশতু মহতাং মঙ্গলং মৎস্য মূর্ত্তিঃ।

ক্ষীরাম্ভোধৌ মথিগিরিবরে মজ্জতি প্রাজ্যভারে ভূরিশ্রান্তান হতপরিকরান্ বীক্ষ্য দেবাসুরাদীন্। বিভ্রৎ কৌর্ম্মং বপুরতিবৃহদেয়াদধত্তং গিরীন্দ্রং পৃষ্ঠে শ্বাসপ্রবলপবনো দ্বেল্লিতাব্ধিঃ স পায়াৎ।

প্রণয়ধলধিপাতোৎ ক্ষিপ্তবার্ব্বারিবিন্দু স্তিমিতপটশরীরৈর্যোজনো লোকসংস্থৈ তত উদহরদুর্ব্বীং দন্তলগ্নাং নিমগ্নাং হতবলবদরাতিঃ পাও স স্তব্ধ রোমাঃ॥ প্রখরতরনখাগ্রোৎখাতদৈত্যেন্দ্রবক্ষস্থলবিগলদদভ্রাস্রাস্তলোলায়িতাঙ্গঃ। অশনিচপলজিহ্বোব্যাত্তবক্ত্রোতিভীমাদ্রুতকনকনিভাক্ষঃ পাতু লোকান্ নৃসিংহঃ।

অথখলুৎক্ষিপ্ত ভগবৎ পাদাঙ্গুষ্ঠ প্রখর নখর নির্ভিন্নাণ্ডকটাহন্নিঃস্যন্দমান নিদান নীরনিকরেণাতিবলন্তী বিষ্ণোঃ পদাদতিরয়েণ সুমেরুশিখরাদিকমাপ্লাব্য মহোন্নতমহিকাচলাতিদূরেতর দরীবিদারণেন ভুব্যবতীর্য্য স্বশরীরভস্মাপ্লাবনেন কপিলকোপানল পরিদগ্ধসগরসন্ততীঃ সন্তার্য্য সহসাগরেণ সুরধুনী সমগংস্ত ॥

প্রত্যাদিৎসুঃ প্রদাতৃং হৃতমসুরগণৈ রাজ্য মৃদ্ধং মঘোনে ভূত্বা খর্ব্বো বলিং যশ্চ্ছলযতিদিতিজংয়ঃ সপায়াদ্বুপেন্দ্রঃ। যস্তো দক্ষৎ পদাজ্জ প্রখর নখশিখাভিন্ন বিধ্যগুরন্ধ্রাদশ্রান্তং কারণাম্ভঃ প্রসরতি বিমলং গঙ্গয়া সঙ্গমেত্য।

সপ্তাকূপারকাঞ্চী ধরধরণি বধূধৌত কৌষেয়কীর্ত্তি র্জ্বালামালাবলী-চাম্বরতলপবনোদ্ধূতদাবপ্রতাপঃ। নম্রক্ষৌণীশমৌলিস্ফুরদমলমণিদ্যোতি-বিদ্যোতিতাঙ্ঘ্রির্ধর্ম্মিষ্ঠানাং বরিষ্ঠঃ ক্ষিতিপতিরভবৎ পাণ্ডুপুত্রোমহাত্মা। সম্বর্ত্তোদীর্ণবাতক্ষুভিতজলনিধির্ধ্বানগম্ভীরঘোষোদঞ্চদগাণ্ডীবচাপচ্যুতনি-শিতশরব্রাতবিদ্রাবিতারিঃ। যুদ্ধেযেনাভ্যতোষি ত্রিভুবনজয়িনা ব্যাধরূপী গিরীশঃ কৃষ্ণঃ শ্রীকৃষ্ণ সূতো মলমতিরভবৎ পাণ্ডুপুত্রঃ প্রতাপী॥

শ্রীমতা রামতারণ শিরোমণিনা পঠিতং।

পূর্ব্বং যে জনকাদয়ো নৃপবরাজাতাস্তদানীং নরাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মপরায়ণাঃ পরসুখস্যান্বেষকাস্তে সদা রাজানোপি নচৈহিকেষ্বভিমতাবিদ্যোন্নতিস্তৎ-পরা সর্ব্বং বিক্রমভূপতৌ পরগতে শাস্ত্রঞ্চ নাকং গতঃ॥১॥ প্রাপ্তে বিক্রম-নন্দনে নৃপপদং শাস্ত্রস্য নিন্দান্বিতা যজ্ঞস্যাবিফলাপরে কিমপিনোকর্ত্তা-পিনোকশ্চন। ইত্যেবং মতিমন্ত এবচনরাভোজেন রাজ্ঞাতদা শাস্ত্রাণাং বহুশো বুধৈরতি শয়াদ্যত্নাৎকৃতঃ সংগ্রহঃ॥ তৎপশ্চাদপিবেদ মুখ্যসকলং দিল্লীশনষ্টীকৃতং শাস্ত্রং তেন বিবাদ এব বহুধা শাস্ত্রস্য জাতোধুনা। ব্যাসোক্তেষুততঃ পুরাণনিচয়েস্বেকার্থতানেক্ষতে-শাস্ত্রাণামধুনা সমুন্নতিরিয়ং রাজ্ঞাং সুজাতাযথা।৩। নষ্টীভূতং যদবধি কিয়ৎ শাস্ত্র মুর্ব্বীশ্বরেন্দ্রাস্তাবদ্বিদ্যাধনিনিনগতা গর্ব্বমেক্ষ্যেব্যা। বিদ্যা-বাসোভবতিহতদায় ত্রলক্ষ্যান দৃষ্টি লক্ষ্মী যুক্তং জন মুপগতং তজহাবস্থ-গাচ।৪। দেশে রাজ্ঞা মহত্যা বহুতর সুজনাভ্যর্থিতা সংস্থিতা সাবিদ্যাতাং দ্রষ্টুং কামোভরত নরবরেজ্যে রাজ্যেশ্বরস্য ধর্ম্মস্তত্রৈ বয়াতেস্তমপিচ পুনর্দ্দ্রষ্টুং কামাতি গর্ব্বা যাতাতত্রৈব সংস্থাপরিহৃতরি পুতা পূর্ব্বরাজ্যে-শলক্ষ্মীঃ।৫। বিদ্যানুগাং স্থিরতরাং সুসমীক্ষ্য লক্ষ্মীং বিদ্যাপুনর্ন্ন পবরস্য বিহায় বশং। অন্বেষ বস্থিতবতী মনুগাঞ্চ লক্ষ্মীং রাজ্ঞীবিধায় মহতী পরতৃপ্তিমাপ্তা।৬। নৈশ্বর্য্যং নাপিসৌখ্যং নচজন বরতায়াং বিনা সান্য-দেশং জাতাতত্রা দৃতাসীন্দ্বদি সুকৃতিবশাদাগতাশঙ্কিতাচ। তদ্রক্ষায়াং প্রযত্নেমতি রিহকৃতিভির্দ্দীয়তাং প্রার্থয়েহং নোচে দেগাপাল এতদনু মিত শুভবাক পালকস্যাদিভঙ্গঃ।৭॥

শ্রীমতা ভবশঙ্কর বিদ্যারত্নেন পঠিতং।

এই সমস্ত কবিতা পাঠের পর সঙ্গীত আরম্ভ হইল

রাগিণী সিন্দুড়া—তাল ধামাল।

উঠ উঠ সকলে হে ভারত সন্তান।
স্বদেশের হিত তরে কর প্রাণ পণ॥
দেখ ভেবে জগতের সব জাতি,
সাধিতে দেশ উন্নতি করিছে যতন॥

ভারত ভূমির দশা, ঘোর অন্ধকার নিশা,
উৎসাহ অনল তায় করহে জ্বলন॥
আপন কাজের তরে, আশ্রয় দেবে না পরে,
নিজ যতনতে তাহা করহে সাধন॥২॥

—

রাগিণী বাহার—তাল জৎ।

লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে।
লুটিতেছে পরে এই রত্নের আকরে॥
সাধিলে রতন পাই, তাহাতে যতন নাই।
হারাই আমোদে মাতি অবহেলা করে॥
দেশান্তর জনগণ, ভুঞ্জে ভারতের ধন,
এ দেশের ধন হায় বিদেশীর তরে॥
আমরা সকলে হেথা, হেলা করি নিজ মাতা,
মায়ের কোলের ধন নিয়ে যায় পরে॥

—

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল একতালা।

এ দেশের দুঃখে কার না সরে চখের জল।
নিদ্রায় নিঝুম তবু আমরা সকল॥
উঠ জাগ সকলেতে, সজীব কর ভারতে।
ভাই ভাই মিলে সবে হও এক দল॥
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, কত কাল রবে ভাই।
বিনা মিল কোন কাজ হয় কি সফল॥

—

রাগিণী পরজ— তাল একতালা।

ছাড় হে অসার অলস, প্রস্তুত হও লভিতে যশ।
সাধন কর ভারতের, উন্নতি জনমাঝে॥
নিরখি দেখ কাল বিকল, পূর্ব্ব বিভব সকল বিফল।
অঙ্গ ভঙ্গ জন্ম-ভূমি, নতশির হয় লাজে॥
যাহে দুখ ভার যায়, ঐক্যতায় সে উপায়।
ত্যজ ত্যজ ঔদাস্য ভাব, রত হও নিজ কাযে॥
মিলনে হয় হীন সবল, মিলিলে অতি লঘু তৃণ দল।
পায় লৌহ শৃঙ্খল বল, বান্ধে গজ রাজে?

—

পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এবার চৈত্র মেলায় অধিকতর সমারোহ হয়। উদ্যান প্রবেশ দ্বারে নহবৎ বসিয়াছিল তথা হইতে মেলার স্থান প্রায় ২৫ বিঘা দূর হইবে। এপর্য্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে নব পল্লবাবৃত অর্দ্ধচন্দ্রাকার বেড়া দেওয়া হয়; উদ্যানের স্থানে স্থানে এই কএকটি কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছিল।

—

মানিলাম বঙ্গবাসি, বুদ্ধিতে চতুর।
সকল বিষয়ে তাহা নহেত প্রচুর॥
করহে বিজ্ঞান চর্চ্চা; জ্ঞানের নয়ন।
খুলিবে; হৃদয়দ্বার হবে উদ্ঘাটন॥
কারু কর্ম্মে নানা জাতি কিবা শোভা পায়।
সে বিষয়ে অজ্ঞ বলে মরি যে লজ্জায়॥
চেষ্টার অসাধ্য, কার্য্য কি আছে এমন।
শিখিব শিখিব তাহা করিলে যতন॥
পরিহর দ্বেষ ভাব ধর হে বিনয়।
পরস্পরে পরস্পরে হও হে সদয়॥
একতা বিহনে কভু হবে না মঙ্গল।
ফলিবে বিরোধ বৃক্ষে বিষময় ফল॥
দুর্ব্বল বাঙ্গালি মোরা ঘৃণিত সবার।
না জানি কিরূপে দিব প্রতিশোধ তার॥
ঈশ্বর যদ্যপি দিন দেখান কখন।
হইবে হইবে বঙ্গ ভারত ভূষণ॥

—

মেলা স্থলে একটি দীর্ঘ হোগলার চালা প্রস্তুত হইয়াছিল। এই চালার মধ্যে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকগণের সূচীনির্ম্মিত শিল্পজপদার্থসকল প্রদর্শিত হয়। ঐ স্থানে নানা প্রকার আসন, জুতা, থলিয়া, সরপোস প্রভৃতি রমণীয় পদার্থ সকল সজ্জিত ছিল। ঐ সমুদায়ের মধ্যে স্ত্রীলোকের কৃত কতকগুলি কাজ অতি চমৎকার ছিল। এই চালার পূর্ব্ব দিকের চালায় কতকগুলি অলঙ্কার ও হস্তিদন্তের পুত্তলিকা প্রদর্শিত হয়। উক্ত চালার সম্মুখেই আর এক চালা ছিল। ইহার মধ্যে আলিপুরের জেলের কয়েদিদিগের কৃত কতকগুলি উৎকৃষ্ট তোয়ালে, ঝাড়ন প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়। এগুলি দেখিতে যেমন সুন্দর তেমনি শক্ত। এই চালার পূর্ব্বদিকে আর এক চালায় কতকগুলি ফল ও শাক প্রদর্শিত হয়।

বৈঠকখানা বাটিটী পূর্ব্বোক্ত চালা সকলের মধ্যস্থলে অবস্থিত। গৃহপ্রবেশের দ্বারে এতদ্দেশীয় শিল্পিগণকর্ত্তৃক পারিস-কর্দ্দমে নির্ম্মিত অভিষেক-বেশধারিণী ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতিমূর্ত্তি সন্নিহিত ছিল। এই প্রতিমূর্ত্তির পার্শ্বে নবদ্বীপের কুমারদিগের দ্বারা নির্ম্মিত কতকগুলি উত্তম পুত্তলিকা প্রদর্শিত হয়। প্রত্যেকের অঙ্গ সৌষ্ঠব এবং যেখানকার যে শিরা ও যে উচ্চতা জীব শরীরে বিদ্যমান থাকে তাহা ঐ পুত্তলিকাগুলিতে লক্ষিত হইয়াছিল। প্রাচীন কালের গ্রীক প্রতিমূর্ত্তিগুলিকে আদর্শ করিয়া ঐ সমুদায় নির্ম্মিত হয়। আর এক গৃহে এদেশীয় শিল্পিগণের কৃত কতকগুলি চিত্র ছিল। জয়পুরের প্রতিকৃতি; আলেকজাণ্ডারের সহিত ডেরায়সের পরিবারগণের সাক্ষাৎকার ও আয়ান ঘোষকে দর্শন করিয়া কৃষ্ণের কালীমূর্ত্তি ধারণ; এই পটগুলি এবং কলিকাতার শিল্পবিদ্যালয়ের কতকগুলি ছাত্র প্রকৃতিকে আদর্শ করিয়া যে কতকগুলি চিত্র করিয়াছেন, এস্থলে তাহাও সংগৃহীত হইয়াছিল। আর এক গৃহে পুরাণসংক্রান্ত কথকতা হইয়াছিল। ঐ বৈঠকখানার সম্মুখের গৃহে অধ্যাপকদিগের শাস্ত্রীয় আলাপাদি হয়। পূর্ব্বদিকের গৃহে কতকগুলি সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া রসায়নবিদ্যাসংক্রান্ত বিষয় সকল প্রদর্শন করেন।

বৈঠকখানার দক্ষিণ-পূর্ব্ব, দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে তিনটি বাটী আছে। এই তিনটি বাটীতে ঝামাপুকুর, জোড়াসাঁকো ও শ্যামপুকুরের শকের সমবেত বাদ্য বাদিত হইয়াছিল। মেলায় এদেশীয় মল্লদিগের কৌশল প্রদর্শিত হয়। এই মল্লেরা যে সকল কৌশল প্রদর্শন করে, তাহা ভারতবর্ষীয়দিগেরই সৃষ্ট; এই নিমিত্ত আমরা অন্য কাহারও নিকটে ঋণী নহি। প্রথমতঃ লাঠি খেলা; পরে লাঠিতে ভর দিয়া লম্ফ দিয়া পতিত হওয়া; তৎপরে কুস্তি করা হয়। দর্শকগণ বিশেষতঃ ইউরোপীয়গণ ঢেঁকি ঘুরান দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিলেন। এক স্কন্ধ হইতে অন্য স্কন্ধে ঢেঁকি লইয়া তাহা ক্রমাগত ঘূর্ণিত করা হয়। কিন্তু পশ্চাল্লিখিত কয়েকটি কৌশলদর্শনে সকলে অধিকতর তৃপ্তিলাভ করেন। একজন মল্ল এক ঢেঁকিতে বস্ত্র বাঁধিয়া তাহা দন্ত দ্বারা ধারণ পূর্ব্বক মস্তক ঘুরাইয়া পশ্চাতে নিক্ষেপ করে। আর একজন শয়ন করিলে প্রথমতঃ তাহার বক্ষে এবং তাহার পৃষ্ঠের উপর চারিখানি ইট রাখা হয়। একজন মল্ল এক ঢেঁকির মোনা

লইয়া এক আঘাতে ইটগুলি চূর্ণ করে। আর একজন শবের ন্যায় স্পন্দহীন হইয়া শয়ন করিলে তাহাকে মৃত্তিকার মধ্যে প্রায় দুই মিনিট পর্য্যন্ত সমাহিত রাখা হইয়াছিল।

ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে কতকগুলি যুবক ব্যায়াম প্রদর্শন করেন। তন্মধ্যে একজন এই ব্যায়াম উদ্দেশে একটি কবিতা পাঠ করেন। তাহার সার অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

বিদ্যা শিক্ষা সঙ্গে সঙ্গে শিখিলে ব্যায়াম।
সুস্থ চিত্তে সুস্থ দেহে, পাইবে আরাম॥
কেন বঙ্গবাসীগণ এমন দুর্ব্বল।
নীচেদের কায় শ্রম, তাই এমন॥
অন্য সব জাতি শ্রমে, সদাই আদরে॥
তাই তারা নানা মতে সুখ ভোগ করে॥

পরে একজন যুবক অশ্বারোহণ পূর্ব্বক বেড়া লঙ্ঘন করিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন। তৎপরে নৌকার বাচ খেলা হয়; পরিশেষে বেলা ৬টার সময় মেলা ভঙ্গ হয়।

—

১৭৮৯ শকের চৈত্রমেলার সাহায্যকারিদিগের নাম।

শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর	...	২৫
,, তিনকড়ি দাস	...	২
,, ভোলানাথ দত্ত	...	২
,, দেবনারায়ণ বসাক	...	২
,, কালীপ্রসন্ন ঘোষ	...	৫০
,, জীবনকৃষ্ণ ঘোষ	...	৪
,, দুর্গাচরণ লাহা	...	২৫
,, ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী	...	১
,, নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১০
,, নন্দলাল মৈত্র	...	১
,, গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৫
,, ভোলানাথ পাল	...	১
,, বেণীমাধব বসু	...	১০
,, নীলমণি চট্টোপাধ্যায়	...	১
,, রাজেন্দ্র মল্লিক (রায় বাহাদুর	...	৫০
,, তারাচরণ গুহ	...	২৫
,, বিহারীলাল ভট্টাচার্য্য	...	৫
,, যদুনাথ দে	...	২
,, দেবেন্দ্রদেব দাস	...	১
,, মহেন্দ্রলাল সোম	...	২
,, বৈকুণ্ঠনাথ নন্দী	...	১
,, দিগম্বর মিত্র	...	২৫
,, প্যারীচরণ সরকার	...	২৫
,, নন্দলাল পাল	...	৫
,, কাশীশ্বর মিত্র	...	২
,, গোপাললাল ঠাকুর	...	৫০
,, শ্যামলাল পাল	...	৫
,, শম্ভুনাথ মল্লিক	...	২৫
,, কালীচরণ রায়	...	৫
		৩৬৭

জের		৩৬৭
শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র	...	১০
" কুমারকৃষ্ণ মিত্র	...	২
" ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য্য	...	১
" রামেশ্বর বসু	...	২
" দিননাথ ঘোষ	...	৫
" অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ	...	২
" পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়	...	১০
" জয়গোপাল সেন	...	১০
" অভয়াদাস বসু	...	২
" নবীনচন্দ্র দেব	...	৫
" লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র	...	৩
" সারদাপ্রসাদ ঘোষ	...	২
" নীলমাধব মিত্র (শ্যামপুকুর)	...	৫
" দ্বারকানাথ বিশ্বাস	...	২৫
" রমানাথ ঠাকুর	...	৫০
" গোপালচন্দ্র মল্লিক	...	১
" ঈশানচন্দ্র বসু	...	২৫
" নীলমণি মিত্র	...	২
" কালীদাস শীল	...	২
" মহেন্দ্রলাল দে	...	৫
" অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	১৬
" যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর	...	৫০
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৪
" আশুতোষ ধর	...	২
" অক্ষয়কুমার ধর	...	১
" ভোলানাথ মিত্র	...	৫
" তুলসীদাস আঢ্য	...	১
" রমানাথ লাহা	...	৫
" রাজা কালীকুমার মল্লিকরায়	...	৫
" কালীকৃষ্ণ ঘোষ	...	৪
" নবীনকৃষ্ণ ঘোষ	...	৪
		৬৩৩

জের		৬৩৩
শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ ঘোষ	...	৪
,, রামচন্দ্র মিত্র	...	২
,, অক্ষয়কুমার মজুমদার	...	২
,, চণ্ডীলাল সিংহ	...	১০
,, দুর্গাদাস কর	...	২
,, গোপাললাল মিত্র	...	২
,, গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	...	২
,, অমৃতকৃষ্ণ বসু	...	২
,, খেলৎচন্দ্র ঘোষ	...	১০
,, অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	১০
,, মধুসূদন সরকার	...	৫
,, জগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	৫
,, অতীন্দ্রমোহন ঠাকুর	...	১০
,, সাতকড়ি পাল	...	২
,, কৃষ্ণদয়াল রায়	...	১
,, প্রসাদদাস মল্লিক	...	৫
,, মাধবচন্দ্র রুদ্র	...	৫
,, নবীনচন্দ্র বড়াল	...	২
,, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল	...	২
,, রামগোপাল মিত্র	...	৩
,, তারকনাথ দত্ত (হাট খোলা)	...	৫
,, হেমচন্দ্র দত্ত	...	৪
,, একজন বন্ধু	...	২
,, বেণীমাধব সেন	...	২০
,, বৃন্দাবনচন্দ্র বসু	...	১০
,, যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	১
,, রাজকৃষ্ণ হালদার	...	২
,, হরিমোহন নন্দী	...	১
,, গিরীশচন্দ্র ঘোষ	...	৫
,, অভয়াচরণ মল্লিক	...	১০
,, জয়গোপাল মিত্র	...	২
		৭৮১

জের		৭৮১
শ্রীযুক্ত নীলকমল দাস	...	৫
" বিহারীলাল ধর	...	৫
" শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২
" শ্রীনাথ রায়	...	১৫
" যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২
" কানাইলাল দে	...	২
" নীলকমল মুখোপাধ্যায়	...	২৫
" সাতকড়ি দত্ত	...	২
" উপেন্দ্রনাথ সরকার	...	১
" গিরীশচন্দ্র দেব	...	২
" আনন্দচন্দ্র দাস	...	২
" ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১৬
" নীলমাধব মিত্র	...	১
" শ্যামচাঁদ মিত্র	...	৫
" ভোলানাথ লাহিড়ি	...	৫
" ঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়	...	২
" বনমালী সেন	...	১
" শ্যামাচরণ সরকার	...	৫
" চন্দ্রশেখর গুপ্ত	...	৪
" তারকনাথ দত্ত (সিমুলিয়া)	...	৫
" ক্ষেত্রমোহন ঘোষ	...	৪
" নগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ	...	১০
" দেবীচরণ পাল	...	২
" হরনাথ ঠাকুর	...	১
" অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	৬
" তারাবল্লভ চট্টোপাধ্যায়	...	২
" গোবিন্দচন্দ্র ধর	...	১
" মতিচাঁদ চট্টোপাধ্যায়	...	৫
" হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	...	১
" পঞ্চানন মিত্র	...	২
" বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়	...	২
		৯২৪

জের		৯২৪
শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ আঢ্য	…	১
,, দ্বারকানাথ বসাক	…	১
,, ক্ষেত্রমোহন মিত্র	…	১
,, যাদবচন্দ্র রায়	…	১
,, শ্রীনাথ দাস	…	১০
,, হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	…	১
,, উমাচরণ দাস	…	১
,, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়	…	১
,, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ	…	৪
,, বলাইচাঁদ সিংহ	…	৫
,, ধর্ম্মদাস হালদার	…	২৫
,, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাতুরিয়াঘাটা)	…	১
,, রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	…	৫
,, কন্নলাল বর্ম্মা	…	১
,, কালীচরণ বর্ম্মা	…	১
,, ব্রজসুন্দর মিত্র	…	১০
,, শ্যামলাল দত্ত	…	৬
,, গিরীশচন্দ্র ঘোষ	…	১
,, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	…	১০০
,, তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়	…	১
,, প্রসাদদাস দত্ত	…	৫
,, যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	…	১০
,, মুরলীধর সেন	…	৮
,, শ্রীনাথ দাস	…	১
,, লক্ষ্মীনাথ ঘোষ	…	১
,, কালীকৃষ্ণ বসু	…	১০
,, অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়	…	১
,, গিরিশচন্দ্র ঘোষ	…	২
,, রাধিকাপ্রসাদ দত্ত	…	৫
,, ক্ষেত্রমোহন মজুমদার	…	২
,, চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	…	২
		১১৪৮

জের		১১৪৮
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	১
„ গোবিন্দচন্দ্র কর	...	১
„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	...	১
„ গিরিশচন্দ্র ঘোষ (ভবানীপুর)	...	১
„ কানাইলাল চন্দ্র	...	১
„ সিংহদাস রায়	...	১
„ রাখালদাস মিত্র	...	২
„ গোবৰ্দ্ধন ঘোষ	...	২
„ কৈলাসচন্দ্র দে	...	২
„ মথুরামোহন মজুমদার	...	১
„ রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১
„ শ্রীনাথ রুদ্র	...	১
„ কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায়	...	১
„ বিনোদবিহারি নাগ		১
„ মতিলাল মুখোপাধ্যায়	...	১
„ বেণীকুমার চক্রবর্ত্তী	...	১
„ নীলমণি মল্লিক	...	১
„ মতিলাল মিত্র	...	১
„ প্রেমচাঁদ বসু	...	৪
„ গোপালচন্দ্র ঘোষ (শ্যামপুকুর)	...	১
„ গোপালচন্দ্র ঘোষ (সিমুলিয়া)	...	২
„ ঈশানচন্দ্র সেন	...	১০
„ উমেশচন্দ্র ঘোষ	...	৫
„ রামহরি দাস	...	৫
„ হরিমোহন পাল	...	১
„ মনোহর দাস	...	২
„ ডি এন বসু	...	২
„ শিবচন্দ্র নিয়োগী	...	৫
„ হরমোহন চট্টোপাধ্যায়	...	২
„ তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৫
„ প্রিয়নাথ দত্ত	...	১
		১২১৪

জের		১২১৪
শ্রীযুক্ত রমানাথ পালিত	...	১
„ বিশ্বম্ভর চট্টোপাধ্যায়	...	১
„ যতীন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়	...	১
„ মহিমাচন্দ্র পাল	...	৫
„ চন্দ্রমোহন দাস	...	২
„ তারাবিলাস মিত্র	...	৫
„ শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়	...	২
„ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১০০
„ উমাপ্রসাদ ঘোষ	...	২
„ অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ	...	২
„ কাশীনাথ দত্ত	...	৪
„ নীলমাধব মুখোপাধ্যায়	...	৫
„ যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	...	২
„ তুলসীদাস মল্লিক	...	৫
„ বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়	...	১
„ ব্রজনাথ কাটমা	...	২
„ ত্রিগুণাচরণ বসু	...	১
„ মথুরামোহন কুণ্ডু	...	৫
„ উপেন্দ্রচন্দ্র বসু	...	৫
„ রাজেন্দ্রলাল সেট	...	২
„ কুমার সুরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের নিকট হইতে কয়েকজন সাহায্যকারির দান প্রাপ্ত	...	২২
		১৩৮৯
বাঁশ ও দরমা বিক্রয়	...	৩৫
কেমিকেল একস্‌পেরিমেণ্টের দরুণ ঔষধ বিক্রয়		৯
		১৪৩৩

খরচ

টাকা আদায়ের জন্য সরকারদিগের কমিসন ও কর্ম্মচারিদিগের বেতন ... ১৬৯৷৷১০

নহবত্ গেট ও বাউয়ার নির্ম্মাণের ব্যয় ... ৬০

পণ্ডিতদিগের বিদায় ও গাড়ি ভাড়া, গায়ক ও বাদ্যকরদিগের পুরস্কার, ব্যায়াম প্রদর্শনকারিদের পুরস্কারের জন্য পুস্তক ক্রয়; মালীদিগের পুরস্কার ও পাইকদিগের পুরস্কার ... ৩০৫।৶

নহবৎ বাদ্যকরের বেতন ... ৮

সমবেত বাদ্যকরদিগের গাড়িভাড়া ... ৩২

সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিবার ব্যয় ... ২১

বোটের ভাড়া ... ৩৪

পুলিশ প্রহরীদিগের পুরস্কার ... ৩৬

রসিদ ও ডাকের টিকিট ক্রয় ... ১

টিকিট ছাপিবার জন্য কাগজ ক্রয় ... ৫৷৷০

চালাঘর সাজানর জন্য কাপড়ের ভাড়া ... ৪৭৷৷০

কেদেরার ভাড়া ... ১০

বাগান পরিষ্কার ও মেরামতি ... ১৩৪।/০

নানাপ্রকার কার্য্যের জন্য গাড়ি ও পালকি ভাড়া ৮০ /৫

বিবিধ বিষয়ে ব্যয় ... ২৪৷৷/০

বাগানের ঘর তৈয়ারি ও সাজানর ব্যয় ... ৩০৩ /০

গরুরগাড়ি ভাড়া ও মুটে ভাড়া ... ৩৫।০

কেমিকেল একস্‌পেরিমেণ্টের জন্য ব্যয় ... ৩৪৵১৫

পীরখাঁ বাজীওয়ালা ... ১৫

টেলিগ্রাফ সংক্রান্ত ব্যয় ... ৮

বিবিধ দ্রব্যাদি ক্রয় ... ১৯।০

তাম্বুর ভাড়া ... ১২

পাখা ও মেজের ভাড়া ... ১২৷৷০

মেলার পুস্তক ছাপিবার জন্য কাগজ ক্রয় ... ১৬

১৪২৪৵১০

আয়	...	১৪৩৩
ব্যয়	...	১৪২৪৶১০
মজুত		৮৷৶১০

নবগোপাল মিত্র
সহকারী সম্পাদক

ভ্রম-সংশোধন

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৬৬ বর্ষ ২ সংখ্যায় প্রকাশিত "কবি অক্ষয়কুমার বড়াল" প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে—"১২৮৯ সালের অগ্রহায়ণের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'রজনীর মৃত্যু' অক্ষয়কুমারের প্রথম মুদ্রিত কবিতা।" ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য-সাধক-চরিত মালায় প্রকাশিত তাঁহার "অক্ষয়কুমার বড়াল" পুস্তকে (আষাঢ়, ১৩৫৩) যে অনুমান করিয়াছিলেন, উপরি-উদ্ধৃত ছত্র তাহার উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইয়া থাকিবে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুমান সংশোধন করিয়া পরে লিখিয়াছিলেন—

" 'রজনীর মৃত্যু' অক্ষয়কুমারের প্রথম মুদ্রিত রচনা নহে। ইহারও কয়েক মাস পূর্ব্বে ১২৮৯ সালের আষাঢ়-সংখ্যা 'ভারতী'তে তাঁহার 'পুনর্মিলনে' কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে।"

—সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ৬৬ সংখ্যক গ্রন্থ, প্রথম সংস্করণ, মাঘ, ১৩৫৪

শ্রীদেবপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

ষট্‌ষষ্টিতম বার্ষিক কার্যবিবরণ

লোকান্তরিত সুহৃদ্‌গণকে স্মরণ করিয়া পরিষদের বার্ষিক কার্যবিবরণ শুরু করা যেন একটি বিধিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। ইদানীংকালে এমন একটি বৎসর যাইতেছে না যখন আমরা এই প্রসঙ্গ বাদ দিয়া বাৎসরিক কার্যবিবরণ সাধারণ সভায় উপস্থাপিত করিতে পারিতেছি। এই কার্যটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক হইয়া উঠিয়াছে এবং আলোচ্যবর্ষে মৃত্যুজনিত এই ক্ষতির পরিমাণ ও গভীরতা আরও ব্যাপক বলিয়া বোধ হইতেছে।

মন্মথমোহন বসু : বিগত ২৭ আশ্বিন ১৩৬৬, ৯১ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। পরিষদের বাল্যাবস্থা হইতেই আজীবন তিনি নানাপ্রকারে নিষ্ঠার সহিত পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। সম্পাদক (১৩৪৪-৪৬), সহকারী সভাপতি (৪৩-৪৪, ৪৭-৫১, ৫৪-৫৬), সভাপতি (১৩৫২-৫৩) এবং শেষে বিশিষ্ট সদস্য (১৩৬৫)। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষদ্ একজন সুহৃৎ ও কর্মী হারাইলেন।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : বিগত ১৬ মাঘ ১৩৬৬ পরিষদের একদাতন সহকারী সভাপতি (১৩৬০-৬৫) ৭৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বাংলা-দেশের প্রাচীন ও নবীন, বিখ্যাত ও অখ্যাত সকল সাহিত্যিকের এবং বিশেষ করিয়া পরিষদের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন।

ক্ষিতিমোহন সেন : বিগত ২৮ ফাল্গুন ১৩৬৬ আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্বের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া যাঁহারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন তাঁহাদের অন্যতম। ভারতবর্ষের অবহেলিত জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাস ও তত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেশবাসীকে তাঁহার বহুবিস্তৃত জ্ঞানের ফল উপহার দিয়া গিয়াছেন। তিনি পরিষদের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন।

রাজশেখর বসু : পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য। সম্পাদক (১৩৪০-৪৪), সহকারী সভাপতি (১৩৫৩-৫৭)। বিশিষ্ট সদস্য (১৩৬৫) এবং জীবনের শেষকাল পর্যন্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্যে পরিষদের উৎসাহ ও পরামর্শদাতা রাজশেখর বসু বিগত ৮১ বৎসর বয়সে পরলোকে গমন করিয়াছেন। পরিণত বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইলেও পরিষদের যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়।

শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : সুকবি শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বিগত ৮ ভাদ্র পরলোকগমন করিয়াছেন।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী : বিগত ২৩ জুন ১৯৫৯ বিখ্যাত নট শিশিরকুমার ভাদুড়ী দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যবুদ্ধি ও অনুরাগ তাঁহার নটপ্রতিভা-বিকাশে

যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশ এক কৃতি সন্তান হারাইলেন। ইনি এক সময়ে পরিষদের সদস্য ছিলেন।

শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা : শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ভূতপূর্ব সহকারী সম্পাদক ও পত্রিকাধ্যক্ষ। গত ২৭।৩।৬৭ তারিখে অকস্মাৎ পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষৎ একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হারাইলেন।

সাধারণ সদস্য : শক্তিপদ ভট্টাচার্য, দীপ্তিময় ঘোষ, জ্যোতির্ময় ঘোষ।

পরিষদের বান্ধব ও বিভিন্ন শ্রেণীর সভ্য

বান্ধব : রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

আজীবন সদস্য : ১। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ২। শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৩। শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৪। শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৫। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৬। শ্রীতীশচন্দ্র বসু, ৭। শ্রীহরিহর শেঠ, ৮। শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে, ৯। শ্রীলীলামোহন সিংহরায়, ১০। শ্রীপ্রশান্তকুমার সিংহ, ১১। শ্রীরঘুবীর সিংহ, ১২। শ্রীবীণাপাণি দেবী, ১৩। শ্রীমুরারিমোহন মাইতি, ১৪। শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, ১৫। শ্রীহিরণকুমার বসু, ১৬। শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়, ১৭। শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, ১৮। শ্রীইন্দুভূষণ বিদ, ১৯। শ্রীত্রিদিবেশ বসু, ২০। শ্রীজগন্নাথ কোলে, ২১। শ্রীনির্মলকুমার বসু, ২২। শ্রীমহিমচন্দ্র ঘোষ, ২৩। শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন, ২৪। শ্রীহরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীসুধাকান্ত দে, ২৬। শ্রীবিভুভূষণ চৌধুরী, ২৭। শ্রীঅজিত বসু, ২৮। শ্রীঅনিলকুমার রায়চৌধুরী, ২৯। শ্রীআর্থার হিউজ, ৩০। শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ, ৩১। শ্রীবিজয়প্রসাদ সিংহরায়, ৩২। শ্রীকুমুদবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, ৩৩। শ্রীজগদীশচন্দ্র সিংহ, ৩৪। শ্রীদীনেশচন্দ্র তপাদার, ৩৫। শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী, ৩৬। শ্রীসুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৩৭। শ্রীদেবীচরণ চট্টোপাধ্যায়, ৩৮। শ্রীকেতকী গঙ্গোপাধ্যায়, ৩৯। শ্রীরঞ্জিত মুখোপাধ্যায়, ৪০। শ্রীপুষ্পমালা দেবী, ৪১। শ্রীমাধবী ঘোষ, ৪২। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪৩। শ্রীপ্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪৪। শ্রীহিরণ্ময় রায়চৌধুরী, ৪৫। শ্রীকল্যাণী দেবী, ৪৬। শ্রীরূপালী দেবী, ৪৭। শ্রীদেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোচ্য বর্ষে মোট ১৮ জন নূতন আজীবন সদস্য নির্বচিত হইয়াছেন।

বিশিষ্ট সদস্য বর্ষশেষে তিন জন : শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত।

সহায়ক সদস্য : বর্ষশেষে ৬ জন।

সাধারণ সদস্য : বর্ষশেষে কলিকাতা ডাকঘরসমূহের এলাকার অধীনে বসবাসী ১০৫১ জন ও কলিকাতা ডাকঘরসমূহের বহির্ভূত এলাকার বসবাসী ৫৩ জন মোট—১১০৪। আলোচ্যবর্ষে মোট ২০১ জন নূতন সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। দীর্ঘকাল চাঁদা বাকী পড়ায়

১৫৩ জনের নাম বর্ষশেষে সদস্য-তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ব্যক্তিগত কারণে ৮১ জন সদস্য পদত্যাগ করিয়াছেন। মৃত ৭ জন।

ষট্‌ষষ্ঠিতম বর্ষের কর্মাধ্যক্ষ ও কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যগণ :

সভাপতি : শ্রীসুশীলকুমার দে।

সহকারী সভাপতি : শ্রীঅজিত ঘোষ, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীনির্মলকুমার বসু, শ্রীবিজয়প্রসাদ সিংহরায়, শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, শ্রীসজনীকান্ত দাস।

সম্পাদক : শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। **সহকারী সম্পাদক :** শ্রীকুমারেশ ঘোষ ও শ্রীপ্রবোধকুমার দাস। **কোষাধ্যক্ষ :** শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ। **গ্রন্থশালাধ্যক্ষ :** শ্রীত্রিদিব-নাথ রায়। **চিত্রশালাধ্যক্ষ :** শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস। **পত্রিকাধ্যক্ষ :** শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও **পুথিশালাধ্যক্ষ :** শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত।

কার্য-নির্বাহক-সমিতির সদস্য : শ্রীঅমল হোম, শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য, শ্রীমনোমোহন ঘোষ, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীরজনীকান্ত রায়, শ্রীলীলামোহন সিংহরায়, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়, শ্রীসুধীরচন্দ্র লাহা, শ্রীসুশীল রায় ও শ্রীহেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। **শাখা-পরিষৎ পক্ষে :** শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন, শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়, শ্রীমাণিকলাল সিংহ ও শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। **পৌর প্রতিনিধি :** শ্রীকানাইলাল দাস।

পরিষদের বিবিধ কার্যকলাপ : (১) পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের কার্যে সহায়তার জন্য পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস বিজ্ঞান ও অর্থনীতি প্রভৃতি শাখা-সমিতি এবং চিত্রশালা, গ্রন্থাগার, ছাপাখানা, গ্রন্থপ্রকাশ ও আয়-ব্যয় উপসমিতি গঠিত হইয়াছে। উৎসাহের অভাবে শাখা-সমিতিগুলির কার্য আশানুরূপ সম্পন্ন হয় নাই। উপসমিতিগুলির কার্য যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে।

(২) নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিষদের প্রতিনিধি নিয়োজিত হইয়াছে :

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় :

(ক) বিদ্যাসাগর বক্তৃতা সমিতি—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী।

(খ) লীলাদেবী পুরস্কার সমিতি—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী।

(গ) জগত্তারিণী পদক সমিতি—শ্রীসুশীলকুমার দে।

(ঘ) ভুবনমোহিনী দাসী সুবর্ণপদক সমিতি—শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিখিল ভারত লোক-সংস্কৃতির ২য় অধিবেশন (বোম্বাই)—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য।

পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্রজন্ম-শতবার্ষিক সমিতি—শ্রীসুশীলকুমার দে।

পুথিশালা

পরিষদের হিতৈষী সদস্য শুভেন্দু সিংহরায় মহাশয়ের পরলোক প্রাপ্তির পর, তাঁহার সংগৃহীত পুথিসমূহ, তদীয় উত্তরাধিকারগণ আলোচ্য বর্ষে পরিষৎকে দান করিয়াছেন এবং তন্মধ্য হইতে ৫৮ খানি পুথি পাওয়া গিয়াছে। ইহা ভিন্ন সঞ্চিত পত্ররাশির মধ্য হইতে ৪ খানি পুথি উদ্ধার করা হইয়াছে। এই ভাবে বর্ষ মধ্যে ৬২ খানি পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে বাঙ্গালা পুথি ১৬ খানা ও সংস্কৃত পুথি ৪৬ খানা। শুভেন্দুবাবুর সংগৃহীত সংস্কৃত পুথির মধ্যে দুইখানি পুথি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একখানি ১৪৩১ শকাব্দে লিখিত অর্থাৎ ৪৫০ বৎসরের প্রাচীন বৃহন্নারদীয় পুরাণ, অন্যখানির নাম পুরাণ সর্বস্ব। যদিও দ্বিতীয় পুথির সংগ্রহকর্তা, সংগ্রহকাল ও লিপিকাল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নাই, তথাপি পুরাতন হস্তাক্ষর এবং সমস্ত পুরাণের প্রয়োজনীয় অংশসমূহ সংগৃহীত থাকায় ইহার বিশেষ মূল্য আছে। এই পুথিগুলি তালিকাভুক্ত হইবার পর বর্ষশেষে সর্ববিধ পুথির সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে,—বাঙ্গালা পুথি ৩৩৬৫, সংস্কৃত পুথি ২৫৮৬, তিব্বতী পুথি ২৪৪, ফার্সী পুথি ১৩, মোট ৬২০৮।

আলোচ্য বর্ষে ১৬৩৬ হইতে ১৯৪০ পর্যন্ত ৩০৫ খানা বাঙ্গালা পুথির বিবরণযুক্ত তালিকা লিখিত হইয়াছে। কিন্তু নানা কারণে প্রাচীন পুথির বিবরণের পরবর্তী খণ্ড মুদ্রণের কোন ব্যবস্থা করা যায় নাই। আশা করি, আগামী বর্ষে ইহার মুদ্রণকার্য আরম্ভ করা যাইবে। সদস্য ও গবেষণারত পণ্ডিতগণ আলোচ্য বর্ষে পরিষদে বসিয়া ১১৩ খানা পুথি পাঠ ও আলোচনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া বরোদার ওরিয়েণ্টাল ইনষ্টিটিউটকে আলোচ্য বর্ষেও দুইখানি রামায়ণের পুথি ধার দেওয়া হইয়াছে।

পরিষদের অধিবেশন :—১। ৬৫ বার্ষিক অধিবেশন ৮ শ্রাবণ। ২। ১ম মাসিক অধিবেশন ৫ ভাদ্র ১৩৬৬। ৩। ২য় মাসিক অধিবেশন ২ আশ্বিন ১৩৬৬। ৪। ৩য় মাসিক অধিবেশন ২৭ কার্তিক ১৩৬৬। ৫। ৪র্থ মাসিক অধিবেশন ২৫ অগ্রহায়ণ ১৩৬৬। ৬। ৫ম মাসিক অধিবেশন ২ মাঘ ১৩৬৬। ৭। ৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশন ২৮ ফাল্গুন ১৩৬৬। ৮। ৭ম মাসিক অধিবেশন ১৭ বৈশাখ ১৩৬৭। ৯। ৮ম মাসিক অধিবেশন ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭। ১০। ৯ম মাসিক অধিবেশন ২৫ আষাঢ় ১৩৬৭। ১১। বিশেষ অধিবেশন : ভূতপূর্ব সভাপতি মন্মথমোহন বসুর স্মরণে শোকসভা—৪ অগ্রহায়ণ ১৩৬৬। ১২। বিশেষ অধিবেশন : অক্ষয়কুমার বড়ালের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিকের সভাপতিত্বে অধিবেশন—১৯ চৈত্র ১৩৬৬। ১৩। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমাধি-স্তম্ভে মাল্যদান—১৫ আষাঢ় ১৩৬৭।

গ্রন্থপ্রকাশ :

(ক) সাধারণ তহবিল : সাহিত্যসাধক চরিতমালার অন্তর্গত ৪, ৫, ১২, ১৪, ৩০ ও ৫৯ সংখ্যক পুস্তক, শকুন্তলা এবং শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য কৃত চর্যাপদগুলির বঙ্গানুবাদ ও পাদটীকাসহ বৌদ্ধগান ও দোহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

(খ) ঝাড়গ্রাম তহবিল : শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় নবীনচন্দ্র সেনের আমার জীবন (১-৫), অবকাশরঞ্জিনী, পলাশীর যুদ্ধ ও রঙ্গমতী প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্রজাঙ্গনা-কাব্য, নীলদর্পণ, বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ প্রবন্ধ, গদ্যপদ্য কবিতা পুস্তক ও রামমোহন গ্রন্থাবলী ৪র্থ খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

(গ) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকুল্যে অধ্যাপক বিমানবিহারী মজুমদার কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত "চণ্ডীদাস পদাবলী"র মুদ্রণ ও পরিষদের সংরক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পুনর্মুদ্রণ আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় "পদাবলী সংগ্রহের" মুদ্রণ কার্য সম্পাদকের অসুস্থতা নিবন্ধন আরম্ভ করা সম্ভব হয় নাই।

(ঘ) রবীন্দ্রশতবর্ষ জন্মোৎসব উপলক্ষে পরিষৎ শ্রীপুলিনবিহারী সেনের সম্পাদনায় "রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ" নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করিবেন স্থির হইয়াছে।

ঐ উপলক্ষে পরিষৎ "রবীন্দ্রমঙ্গল" (১৮৬১-১৯১৩) নামে আর একটি পুস্তক প্রকাশ করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট অর্থসাহায্য চাহিয়াছেন। শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায় পুস্তকটির প্রণয়নে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন কিন্তু সরকারের অর্থসাহায্য না পাইলে এ কার্যে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হইবে না।

(ঙ) শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত পরিষৎ চিত্রশালা সংগ্রহের 'Historical Relics Etc. in the Bangiya Sahitya Parisad Museum' প্রস্তুত করিয়াছেন। শীঘ্রই তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার : আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডার হইতে ২১৬৲ টাকা দুঃস্থ সাহিত্যিকদের সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : পরিষৎ পত্রিকার ৬৫ বর্ষের ৪র্থ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশিত অংশের পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট ৩১২। প্রবন্ধের সংখ্যা ৭টি।

পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও পত্রিকা প্রকাশের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট হইতে দুই হাজার টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে ইহার প্রকাশ-ব্যয় চতুর্গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। বিজ্ঞাপন বাবদ অর্থ সংগ্রহ করিয়া ক্ষতির পরিমাণ লাঘব করিবার চেষ্টা করা হইতেছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও পত্রিকা প্রকাশের সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান করা সম্ভবপর হইতেছে না। এই শ্রেণীর গবেষণামূলক পত্রিকার চাহিদার ক্ষেত্র সংকীর্ণ। কাজেই এই খাতে সরকারের দান বেশ কিছু বৃদ্ধি না পাইলে পত্রিকা পরিচালনার ব্যয়ভার নির্বাহ করা দুরূহ হইয়া উঠিবে।

গ্রন্থাগার : আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ গ্রন্থাগারে মোট ৫৭৯ পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১২১ ক্রীত, ৪৫৮ উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত। পরিষৎ পত্রিকার বিনিময়ে ৭টি দৈনিক, ৮টি সাপ্তাহিক এবং ১৫টি বিবিধ পত্রিকা পাওয়া গিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে প্রতিদিন গড়ে ৭৫ জন পাঠক পাঠিকা ও গবেষক গ্রন্থাগার ব্যবহার করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তুল্যাংশিক (matching) দানের সহায়তায় আলোচ্য বর্ষে মোট ৩২,৩৫৮.৭১ টাকা ব্যয়ে পরিষৎ গ্রন্থসংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত মোট ৮৭৫৭ খানি পুস্তক ও পত্রিকা বাঁধানো ও ১২৪৩ খানি পুস্তক ও পত্রিকা মেরামত করা হইয়াছে। অনেক পুস্তক এত জীর্ণ ও কীটদষ্ট হইয়াছিল যে তাহাদের সংস্কারে অনুমিত ব্যয়ের অধিক হইয়াছে। সরকার আগামী বর্ষে অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ বর্ষেও আরও বার হাজার টাকা এই খাতে দিতে প্রতিশ্রুত আছেন।

গ্রন্থতালিকা প্রস্তুতির কার্য যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। এইখাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এতাবৎ তুল্যাংশ ভাবে মোট তের হাজার টাকা দান করিয়াছেন। সর্বসমেত মোট ১৩,৫৮৭.২০ টাকা ব্যয়ে বর্ষশেষ পর্যন্ত মোট ১৭৬৭৪ পুস্তকের গ্রন্থ-তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। এই বৎসরের আষাঢ় মাস পর্যন্ত আরও ৩৭৪৫ পুস্তকের তালিকা প্রস্তুত হইয়া এখন তালিকাসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে মোট ২১৪১৯। এইখাতে যে টাকা এখন পর্যন্ত উদ্বৃত্ত আছে তাহা দ্বারা পরিষৎ গ্রন্থাগারের বাকী পুস্তকগুলির গ্রন্থতালিকা প্রস্তুত ও পুস্তকাকারে তাহার মুদ্রণ সম্ভবপর হইবে না। (বিনা শর্তে) সরকারের নিকট হইতে পুনরায় অর্থসাহায্য না পাইলে কাজটি অসমাপ্ত থাকিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে এবং এই কয়বৎসরের বিপুল পরিশ্রম ও অর্থব্যয় বিফলে যাইবার আশঙ্কা হয়।

চিত্রশালা: পরিষদের চিত্রশালার সংগ্রহগুলি নূতন ভাবে সজ্জিত করার কাজ গত পূর্ব বৎসরে কিছুটা অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু আর্থিক অনটনবশতঃ সে কাজ দুই বৎসর বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। বর্তমান বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকার চিত্রশালার প্রদর্শন-পরিসর বৃদ্ধি করিবার সাহায্যে রমেশ ভবনের উপর কয়েকটি কক্ষ নির্মাণ-কল্পে কুড়ি হাজার টাকা, শো-কেস্ ও আলো ইত্যাদির ব্যবস্থার জন্য তিন হাজার ছয় শত পঁচিশ অর্থাৎ মোট ২৩৬২৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। কক্ষ-নির্মাণ ও শো-কেস্ ইত্যাদি নির্মাণের কার্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে এবং আশা করা যাইতেছে যে শীঘ্রই এ কাজগুলি সমাপ্ত করা যাইবে।

শাখা-পরিষৎ: আলোচ্যবর্ষে ভাগলপুর, মেদিনীপুর, শিলং, বিষ্ণুপুর ও নৈহাটি শাখার কয়েকটি অধিবেশন হইয়াছে। নূতন কোন শাখা-পরিষৎ স্থাপিত হয় নাই।

বিষ্ণুপুর শাখা পরিষৎ: তাঁহাদের 'আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের' ভিত্তি স্থাপনা হইয়াছে। শ্রীহুমায়ুন কবীর গত ২১ বৈশাখ ১৩৬৭ তারিখে উক্ত ভবনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনা করিয়াছেন। নৈহাটী শাখা-পরিষদের সম্পাদক শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন জানাইতেছেন যে তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক ভবনে "ঋষি বঙ্কিম-বিশ্ববিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠা করিতে অনুরোধ করিয়া পত্র দিয়াছিলেন। সরকার ঐ প্রস্তাবটি সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন।

ভারত-কোষ: ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে পরিষৎ "ভারত-কোষ" নামক একটি কোষ-গ্রন্থ প্রণয়নে ব্রতী হইয়াছেন এ সংবাদ গত বৎসরের বার্ষিক কার্য-

বিবরণে উল্লেখ করা হইয়াছে। কাজটি অত্যন্ত দুরূহ ও সময়-সাপেক্ষ। বাঙলা ও বাঙলার বাহিরের কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি আমাদের এই কার্যে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমাদের অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

কয়েকটি উপসমিতির সাহায্যে প্রসঙ্গ-নির্বাচনের কার্য দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে এবং কয়েকটি প্রসঙ্গ ইতিমধ্যে লিখিত হইয়া আমাদের হস্তগত হইয়াছে। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিমত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অল্প কয়েকটি প্রসঙ্গ লিখিত হইয়া একটি নমুনা-পুস্তিকা প্রকাশিত হইতেছে। সমগ্র কাজটি শেষ করিতে অন্যূন দুই বৎসর সময় লাগিবে এবং ইহার প্রকাশে দুই লক্ষ টাকার উপর ব্যয় হইবে অনুমান করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে আমরা সরকারের নিকট হইতে ৭৯,৫০০৲ টাকা অর্থসাহায্য পাইয়াছি ও চৈত্র মাসের শেষ পর্যন্ত ১০৪৬৩·৩২ টাকা ব্যয় করিয়াছি। আগামী বৎসরেও এই খাতে সরকারের নিকট হইতে অর্থসাহায্য পাওয়া যাইবে। ব্যয়ের বাকী টাকা পরিষৎ গ্রন্থ-প্রকাশের পূর্বে গ্রন্থ-মূল্য বাবদ অগ্রিম লইয়া পরিশোধ করিবেন স্থির হইয়াছে। কয়েকজন অভিজ্ঞব্যক্তির উপর সম্পাদনার ভার ন্যস্ত হইয়াছে।

আর্থিক অবস্থা: কয়েকটি উন্নতিমূলক কার্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার তুল্যাংশ শর্তে (matching grant) অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। শর্তানুযায়ী অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করিতে পরিষৎকে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ এ বৎসর পুস্তক বিক্রয় বাবদ অর্থ প্রাপ্তি ও এককালীন ও অন্যান্য দান আশাতীত হওয়ায় কোন রকমে সর্তরক্ষা সম্ভবপর হইয়াছে কিন্তু এইরূপ অনিশ্চিত আয়ের উপর নির্ভর করিয়া ভবিষ্যতে এই দায় গ্রহণ করা সমীচীন নহে। সেই কারণে সরকারের নিকট বিনা সর্তে অর্থ সাহায্যের জন্য আমরা আবেদন করিয়াছি। এইরূপ ব্যবস্থা না হইলে উন্নতিমূলক কার্য ব্যাহত হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়।

আনন্দ সংবাদ: পরিষদের শুভাকাঙ্খী শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎ-স্মৃতি পুরস্কার পাইয়াছেন ও ভারত-সরকার কর্তৃক রাজ্যপরিষদের সদস্য মনোনীত হইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক অনুষ্ঠিত গুণীজন সম্বর্ধনায় শ্রীসজনীকান্ত দাস সাহিত্যিক হিসাবে সম্বর্ধিত হইয়াছেন। শ্রীপ্রমথনাথ বিশি এ বৎসরের রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র একাডেমী পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই সম্মান লাভে আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি এবং তাঁহাদের প্রত্যেককে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন: পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিষৎকে তাঁহাদের নিয়মিত বাৎসরিক সাহায্য, পরিষৎ পত্রিকা প্রকাশের জন্য দুই হাজার এবং গ্রন্থাদি প্রকাশের জন্য এক হাজার দুই শত, মোট তিন হাজার দুইশত টাকা ব্যতিরেকে চণ্ডীদাস পদাবলী প্রকাশে ১২,১১৫৲ টাকা, প্রাচীন পুথির বিবরণ প্রকাশে ৬,৮৩০৲ টাকা, পদাবলী সংগ্রহ প্রকাশে ২,৪১৫৲ টাকা মোট ২১,৩৬০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীরেকে তাঁহারা পুস্তক

মেরামত ও বাঁধাইয়ের জন্য ১২,৪৬৩৲ টাকা, গ্রন্থ-তালিকা প্রস্তুতির জন্য ৬,৫০০৲ টাকা ও তাঁহাদের অনুমোদিত কয়েকজন নূতন কর্মচারীর বেতনের অর্ধাংশ মোট ২,৮৭'৮২ টাকা দান করিয়াছেন। "ভারত-কোষ" প্রকাশের সাহায্যকল্পে ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এতাবৎ ৭৯,৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। চিত্রশালার বিস্তৃতি ও উন্নতিকল্পে ভারত-সরকার ২৩,৬২৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু ও শ্রীসরলকুমার চট্টোপাধ্যায় পরিষদের হিসাবাদি সযত্নে পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের ও পরিষদের অন্যান্য হিতৈষী যাঁহারা অর্থসাহায্য করিয়া ও নানা ভাবে পরিষদের কাজে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে কার্য-নির্বাহক-সমিতির পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

উপসংহার ঃ সরকারের অর্থসাহায্যের ফলে পরিষদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃতিতর হইয়াছে এবং কয়েকটি দুরূহ কার্যে ব্রতী হইবার সুযোগ লাভ করিতে পারিয়া আমরা উৎসাহিত বোধ করিতেছি। আরব্ধ কার্যের সম্পাদনার মধ্যেই আমাদের সকল উৎসাহ পর্যবসিত না হয় সেদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধির বহু কাজ আমাদের সম্মুখে পড়িয়া আছে, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত শব্দের অভিধান প্রণয়ন, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলন প্রভৃতি বহু কাজের অন্ত নাই। উৎসাহ ও কর্মশক্তির কার্যকরী নিদর্শন পাইলে এই সমস্ত কাজের জন্য সরকারী অর্থসাহায্য পাইতে আমাদের অসুবিধা হইবে না। এই সব কাজ ছাড়াও সাহিত্য-পরিষদের একটি বৃহৎ দায়িত্ব পালন করিবার আছে, এ দায়িত্ব-পালন শুধু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষেই সাধ্য। ভাষার প্রশ্ন লইয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে উৎকট উত্তেজনা ও ভেদবুদ্ধি প্রকট হইয়া উঠিয়াছে তাহার দূরীকরণে সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ দায়িত্ব আছে। এই বিষয়ে মাঝে মাঝে সম্মেলন আহ্বান করিয়া ও পরামর্শ সভা ডাকিয়া ভারতবর্ষের সংবিধানসম্মত বিভিন্ন ভাষার সহিত যোগাযোগ, ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে ক্রমিক ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইতে পারে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্যক্ষেত্রের পরিধি বর্তমানে বিস্তৃততর হইয়াছে বলিয়াই এই দায়িত্ব পরিষদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হইতে পারে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের মনীষীবৃন্দ এবং সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নানা কারণে আমাদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই কারণেই এই দুঃসাধ্য কাজে অগ্রসর হইবার ভরসা আমরা রাখি।

৮ই শ্রাবণ, ১৩৬৭

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক

সপ্তষষ্টিতম বার্ষিক কার্যবিবরণ

প্রতি বৎসরের চৈত্র মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত বাৎসরিক কার্যবিবরণের সময় নির্দিষ্ট থাকিলেও পরবর্তী বৎসরের বার্ষিক সভার দিন পর্যন্ত পরিষদের অনুষ্ঠিত বিবিধ কার্যাবলীর বিবরণ দিবার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। সেই কারণে বর্তমান ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে অনুষ্ঠিত হইলেও অনেক কার্যের প্রস্তুতি ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে আরব্ধ হইয়াছে এবং কয়েকটি কার্য বর্তমান বৎসরে এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমস্ত কার্যের বিবরণ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দের বিবরণে স্থান পাইবে। সে সকল বিবরণ উল্লিখিত হইবার পূর্বে আজ পর্যন্ত যে সকল সাহিত্যসেবী, মনস্বী ও পরিষদের সদস্য লোকান্তরিত হইয়াছেন প্রথমেই তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতেছি।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী : বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য দেশিকোত্তমা, প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সহধর্মিণী ও রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী সঙ্গীত বিশেষজ্ঞা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী বিগত ১২ই আগষ্ট, ১৯৬০ তারিখে ৮৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। জীবিতকালে নানাভাবে তিনি পরিষৎকে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন এবং 'রবীন্দ্র-সংগ্রহে' রক্ষিত কয়েকটি দ্রব্য তাঁহারই আনুকূল্যে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার বিয়োগ দেশবাসীর পক্ষে, বিশেষ করিয়া পরিষদের পক্ষে শোককর।

চারুচন্দ্র বিশ্বাস : ভারত রাষ্ট্রের প্রাক্তন আইনমন্ত্রী, পরিষদের ভূতপূর্ব সহকারী সভাপতি ও অন্যতম ন্যাস-রক্ষক বিগত ২৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭ তারিখে ৭২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত : বিশিষ্ট আইনজ্ঞ, সবুজপত্র গোষ্ঠীর সুরসিক লেখক, পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য ও ভূতপূর্ব সহকারী সভাপতি। অতুলচন্দ্র গুপ্ত গত ১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১ তারিখে ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া তিনি নানাভাবে পরিষৎকে সেবা করিয়া আসিয়াছেন। দুঃসময়ে তাঁহার অকুণ্ঠ দান পরিষৎকে নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে সাহায্য করিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষৎ একজন প্রধান সুহৃদ হারাইয়াছেন।

কিরণচন্দ্র দত্ত : প্রায় ৬০ বৎসর একাদিক্রমে পরিষদের সদস্য ছিলেন। কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য, কোষাধ্যক্ষ, সহকারী সভাপতি হিসাবে নানাভাবে তিনি পরিষদের সেবা করিয়াছেন। পরিষদের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ শেষ বয়স পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। বার্ধক্য হেতু ইদানীং সক্রিয়ভাবে পরিষদের কাজকর্মে যোগদান করিতে না পারিলেও পরিষদের মঙ্গলচিন্তা শেষ পর্যন্ত করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুতেও পরিষৎ একজন সুহৃদ হারাইয়াছেন।

বিমলচন্দ্র সিংহ : পরিষদের সহকারী সভাপতিদের মধ্যে তরুণতম বিমলচন্দ্র মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে গত ৪ঠা বৈশাখ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে

শুধু পরিষৎ নয়, বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা অপূরণীয়। বিগত পনেরো বৎসর ধরিয়া তিনি একাদিক্রমে পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন, কখন কোষাধ্যক্ষরূপে, কখনও সহকারী সভাপতিরূপে, কখনও বা কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যরূপে। দুঃসময়ে পরিষৎ তাঁহার নিকট হইতে নানাভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এমন কি মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বেও অসুস্থ শরীর লইয়া তিনি পরিষদে অনুষ্ঠিতব্য রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যেভাবে আমাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের স্মরণে জাগরূক থাকিবে। ইদানীং রাজনীতি লইয়া ব্যাপৃত থাকিলেও তিনি আসলে সংস্কৃতিবান মানুষ ছিলেন। অল্পবয়সে লোকান্তরিত হওয়ায় তাঁর মনীষার সম্যক্ পরিচয় দেশবাসী পায় নাই। বিমলচন্দ্রের জীবন ও তাঁহার সাহিত্যকীর্তির পরিচয় দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিলে তাঁহার প্রতি আমাদের যথাকর্তব্য পালিত হইবে।

শচীন সেনগুপ্ত : সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও সাংবাদিক শচীন সেনগুপ্ত আলোচ্যবর্ষে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশ একজন শক্তিশালী নাট্যকার হারাইলেন।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্রনাথের বংশধর রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আকস্মিক লোকান্তর বর্তমান রবীন্দ্রশতবর্ষের আর একটি অত্যন্ত শোকাবহ ঘটনা। আজীবন নীরবে তিনি তাঁহার পিতার সকল কর্মে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। বিরাট প্রতিভার ছায়াতলে থাকিবার ফলে তাঁহার গুণাবলীর পরিচয় দেশবাসী পায় নাই। নানাপ্রকার শিল্প সম্বন্ধে তাঁহার অনুরাগ ছিল আমরা জানিতাম কিন্তু সাহিত্যরচনায় যে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন তাহার পরিচয়ের আনন্দ আমরা তাঁহার পিতার অবর্তমানে পাইলাম। পরিষদের রবীন্দ্র-সংগ্রহ সমৃদ্ধতর করিতে আমরা তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তিনি সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু এই কারণে আমাদের পক্ষে আরও বেদনাদায়ক।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ সদস্য অক্ষয়কুমার সরকার, সুরেশচন্দ্র মৌলিক ও হেমচন্দ্র নস্করের পরলোকগমনে পরিষদের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে।

৬৭ বর্ষের কর্মাধ্যক্ষগণের তালিকা

সভাপতি : শ্রীসুশীলকুমার দে।

সহকারী সভাপতি : শ্রীনির্মলকুমার বসু, শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী, শ্রীবিজয়প্রসাদ সিংহ রায়, শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ (মৃত্যু ৪।১।৬৮), শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদক : শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সহকারী সম্পাদক : শ্রীকুমারেশ ঘোষ ও শ্রীপিণাকীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

কোষাধ্যক্ষ : শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ।

পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস।

চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীত্রিদিবনাথ রায়।

গ্রন্থশালাধ্যক্ষ : শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত।

কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য : শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীকামিনীকুমার কররায়, শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীপ্রবোধকুমার দাস, শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, শ্রীমনোমোহন ঘোষ, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীরজনীকান্ত রায়, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়, শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুশীল রায়, শ্রীহেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৌর প্রতিনিধি শ্রীকানাইলাল দাস।

শাখা-পরিষৎ-পক্ষে : শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন, শ্রীলক্ষ্মীকান্ত নাগ, শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়।

পরিষদের বান্ধব ও বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্যগণ

বান্ধব : পরিষদের একমাত্র বান্ধব রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব।

বিশিষ্ট সদস্য : ১। শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, ২। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু।

আজীবন সদস্য : ১। শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ২। শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৩। শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৪। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৫। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ৬। শ্রীহরিহর শেঠ, ৭। শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে, ৮। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ৯। শ্রীপ্রশান্তকুমার সিংহ, ১০। শ্রীরঘুবীর সিংহ, ১১। শ্রীবীণাপাণি দেবী, ১২। শ্রীমুরারীমোহন মাইতি, ১৩। রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, ১৪। শ্রীহিরণকুমার বসু, ১৫। শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়, ১৬। শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, ১৭। শ্রীইন্দ্রভূষণ বিদ, ১৮। শ্রীত্রিদিবেশ বসু, ১৯। শ্রীজগন্নাথ কোলে, ২০। শ্রীনির্মল-কুমার বসু, ২১। শ্রীমহিমচন্দ্র ঘোষ, ২২। শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন, ২৩। শ্রীহরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৪। শ্রীসুধাকান্ত দে, ২৫। শ্রীবিভূভূষণ চৌধুরী, ২৬। শ্রীঅজিত বসু, ২৭। শ্রীঅনিলকুমার রায় চৌধুরী, ২৮। শ্রীআর্থার হিউজ, ২৯। শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ, ৩০। শ্রীবিজয়প্রসাদ সিংহ রায়, ৩১। শ্রীকুমুদবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, ৩২। শ্রীজগদীশচন্দ্র সিংহ, ৩৩। শ্রীদীনেশচন্দ্র তপাদার, ৩৪। শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী, ৩৫। শ্রীসুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৩৬। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৭। শ্রীপ্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৮। শ্রীহিরণ্ময় রায় চৌধুরী, ৩৯। শ্রীকল্যাণী দেবী, ৪০। শ্রীরূপা দেবী, ৪১। শ্রীদেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪২। শ্রীদেবীচরণ চট্টোপাধ্যায়, ৪৩। শ্রীকেতকী গঙ্গোপাধ্যায়, ৪৪। শ্রীরঞ্জিৎ মুখোপাধ্যায়, ৪৫। শ্রীপুষ্পমালা দেবী, ৪৬। শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ, ৪৭। শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ, ৪৮। শ্রীঅসীম দত্ত, ৪৯। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

সহায়ক সদস্য : বর্ষশেষ ৬ জন।

সাধারণ সদস্য : (ক) কলিকাতাবাসী ১০৪৭ জন। (খ) মফস্বলবাসী ৫৭ জন, মোট ১১০৪ জন।

আলোচ্যবর্ষে মফস্বলবাসীসহ মোট ১৮০ জন সাধারণ সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। দীর্ঘকাল চাঁদা.বাকী পড়ায় বর্ষশেষে ১০৪ জন সাধারণ সদস্যের নাম সদস্য-তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ৮৫ জন সাধারণ সদস্য নানাবিধ কারণে পদত্যাগ করিয়াছেন।

পরিষদের কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(ক) পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের কার্যের সহায়তার জন্য পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্যবর্ষেও সাহিত্য, অর্থনীতি, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান শাখা-সমিতি এবং আয়-ব্যয়, গ্রন্থাগার, গ্রন্থপ্রকাশ, ছাপাখানা, চিত্রশালা, পুথিশালা ও রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি উৎসবের জন্য উপসমিতি গঠিত হইয়াছিল। উপসমিতিগুলি কার্যনির্বাহে যথেষ্ট সাহায্য করিলেও শাখাসমিতিগুলির নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায় নাই। পরিষৎকে শক্তিশালী করিতে হইলে শাখা-সমিতিগুলিকে যথেষ্ট সক্রিয় হইতে হইবে। এ বিষয়ে আমাদের আরও মনোযোগ দেওয়া বিশেষ কর্তব্য।

(খ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশেষ কার্যে সহায়তার জন্য পরিষৎ-পক্ষে নিম্নলিখিত প্রতিনিধিবৃন্দ মনোনীত হইয়াছিলেন :

(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় :
সরোজিনী পদক-সমিতি (১৯৬১) : শ্রীসজনীকান্ত দাস
গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা-সমিতি (১৯৬০) : শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
কমলা বক্তৃতা-সমিতি (১৯৬১) : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা-সমিতি (১৯৬১) : শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

(২) নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন : শ্রীকুমারেশ ঘোষ

(৩) ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রেকর্ডস কমিশন : শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

(৪) এশিয়াটিক সোসাইটি : রবীন্দ্রপুরস্কার-সমিতি : শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

পরিষদের অধিবেশন

১। ৬৬ বার্ষিক অধিবেশন ৮ শ্রাবণ ১৩৬৭
২। প্রথম মাসিক অধিবেশন ৪ ভাদ্র ১৩৬৭
৩। দ্বিতীয় " ১ আশ্বিন ১৩৬৭
৪। তৃতীয় " ২৬ কার্তিক ১৩৬৭
৫। চতুর্থ " ২৮ অগ্রহায়ণ ১৩৬৭
৬। পঞ্চম " ২৩ পৌষ ১৩৬৭

৭।	ষষ্ঠ	„	২১ মাঘ ১৩৬৭
৮।	সপ্তম	„	২৭ ফাল্গুন ১৩৬৭
৯।	অষ্টম	„	২৫ চৈত্র ১৩৬৭
১০।	নবম	„	১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮
১১।	দশম	„	২৩ আষাঢ় ১৩৬৮

এতদ্ব্যতীত ১৪ আষাঢ় ১৩৬৮ তারিখে মধুসূদনের সমাধি-স্তম্ভে মাল্যাদি অর্পণ করা হইয়াছে।

গ্রন্থপ্রকাশ : (ক) সাধারণ তহবিল : ১। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ১ম খণ্ড : (পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত ১-৪০০ পুথির তালিকা) সম্পাদক শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, ২। চণ্ডীদাসের পদাবলী : সম্পাদক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, ৩। বেথুন সোসাইটি : শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, ৪। Historical Relics Etc. in the Bangiya Sahitya Parisad Museum : শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, ৫। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : ১৬।৩২।৪৬।৪৮।৬৭।৭৫।৮৬ সংখ্যাগুলি (পুনর্মুদ্রণ)

(খ) **ঝাড়গ্রাম তহবিল :** ১। রামমোহন-গ্রন্থাবলীর ২য় ও ৭ম খণ্ড, ২। দীনবন্ধু গ্রন্থাবলীর জামাই বারিক, লীলাবতী ও বিয়েপাগলা বুড়ো, ৩। বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থাবলীর দেবী চৌধুরাণী, বিষবৃক্ষ, মৃণালিনী ও লোকরহস্য। (পুনর্মুদ্রণ)

(গ) উপরিউক্ত গ্রন্থগুলি ব্যতীত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" (১ম।২য় খণ্ড) ও "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস" পুনর্মুদ্রণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। শ্রীমালবিকা চাকী-সম্পাদিত "বাসু ঘোষের পদাবলী"র মুদ্রণকার্য প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে।

(ঘ) আগামী বৎসর নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশ করিতে কার্যনির্বাহক সমিতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন :

১। "বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ" (৩য় খণ্ড) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে।

২। শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত "পদাবলী সংগ্রহ"। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে।

৩। শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী-সম্পাদিত "রামেশ্বরের রচনাবলী"।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত : "রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ" রবীন্দ্র-শততম জন্মোৎসব উপলক্ষে পরিষদের শ্রদ্ধার্ঘ্য।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : পত্রিকার ৬৬ ভাগের ২য় সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার : এই ভাণ্ডার হইতে তিনজনকে বাৎসরিক ৭২৲ টাকা করিয়া সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্যবর্ষেও পত্রিকাদি প্রকাশের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০০০৲ অর্থসাহায্য করিয়াছেন।

গ্রন্থাগার : কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের সাহায্য বন্ধ হওয়ার জন্য আলোচ্যবর্ষে নূতন পুস্তক বিশেষ ভাবে ক্রয় করা সম্ভবপর হয় নাই। উপহার হিসাবে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হইতে মোট ৮৭৬ খানি পুস্তক ও খুচরা পত্রিকাদি পাওয়া গিয়াছে। ক্রীত পুস্তকের সংখ্যা মাত্র ৫৭ খানি। পরিষদের ভূতপূর্ব পত্রিকাধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের পুত্রগণ তাঁহাদের পিতার স্মৃতিরক্ষার্থ ৭০০ খণ্ড পুস্তক ও খুচরা পত্রিকা দান করিয়াছেন। ভট্টাচার্য মহাশয়ের একটি ফটো-চিত্রও তাঁহারা পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন। ৮০ জন গবেষক গ্রন্থাগারের সাহায্য লইয়াছেন এবং ৪৫০ জন সদস্য পুস্তকাদির আদানপ্রদান করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তুল্যাংশিক (matching grant) দানের সহায়তায় আলোচ্য-বর্ষে মোট ২৯,৭৩০.২৭ ব্যয়ে মোট ৮০৫৯ খানি পুস্তক ও পত্রিকা বাঁধানো ও মেরামত করা হইয়াছে। অনেক পুস্তক এত জীর্ণ ও কীটদষ্ট হইয়াছিল যে তাহাদের সংস্কারে অনুমিত ব্যয়ের অধিক ব্যয় করিতে হইয়াছে।

গ্রন্থতালিকা প্রস্তুতির কার্য যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। কয়েকজন কর্মচারীর অসুস্থতার জন্য ও অন্যান্য কার্যে ছুটি লওয়ায় সংকলন কার্য আশানুরূপ অগ্রসর হয় নাই। সর্বসমেত মোট ৯,৯২০.৮২ টাকা ব্যয়ে ১৩৬৮ আষাঢ় মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত ২৮,৭৪২ খানি পুস্তকের গ্রন্থতালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। এই খাতে গত বৎসর সরকারী সাহায্যের উদ্বৃত্তের তুল্যাংশ খরচ করিয়াও পরিষৎ অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

সরকারের নিকট হইতে (Matching grant) দান গ্রহণ করিয়া তুল্যাংশ শর্তে বাকী টাকা সংগ্রহ করা পরিষদের পক্ষে প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। সেই কারণে উন্নতিমূলক কার্যাদির জন্য পরিষৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট হইতে বিনাশর্তে বাৎসরিক ত্রিশ হাজার টাকা পৌনঃপুনিক (recurring) দান হিসাবে অর্থসাহায্য এই বৎসর হইতে প্রার্থনা করিয়াছেন। এইরূপ বিনাশর্তে দান না পাইলে উন্নতিমূলক কার্য যাহা এ যাবৎ অগ্রসর হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ বিফলে যাইবার আশঙ্কা আছে।

পুথিশালা : আলোচ্যবর্ষে তিনখানি পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছে এবং সঞ্চিত পত্ররাশি বাছিয়া তিনখানি পুথি উদ্ধার করা হইয়াছে। এই ছয়খানির মধ্যে দুইখানি বাংলা ও চারখানি সংস্কৃতের মধ্যে একখানি মলয়ালম অক্ষরে লেখা অভিজ্ঞান শকুন্তলের পুথি। ইহা তালিকাভুক্ত হইয়া বর্ষশেষে পুথির সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে—বাংলা পুথি ৩০৬৭, সংস্কৃত পুথি ২৫৯০, তিব্বতী পুথি ২৪৪, ফার্সি পুথি ১৩, মোট ৬২১৪। পরিষদের বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণের পূর্বপ্রকাশিত খণ্ডগুলি বহুপূর্বে নিঃশেষিত হইয়াছিল; পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থসাহায্যে আলোচ্যবর্ষে ঐগুলি কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত আকারে নূতনভাবে 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ' প্রথম খণ্ডরূপে এবং আরও তিনশত পঁচিশখানি পুথির বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া ১৯৪১ সংখ্যক হইতে ২১০০ সংখ্যা পর্যন্ত ১৬০ খানা বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার হইতে প্রাপ্ত অর্থের উদ্বৃত্ত অর্থে প্রাচীন পুথির বিবরণ তৃতীয় খণ্ড মুদ্রণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

পরিষদে বসিয়া সদস্য ও গবেষকগণ ১১৪ খানা পুঁথি গবেষণা কার্যে ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন বরোদা ওরিয়েণ্টাল ইনষ্টিটিউটকে তাঁহাদের রামায়ণ সংস্করণের কার্যের জন্য ১৫ খানা রামায়ণের পুথি ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছে।

চিত্রশালা :

ভারত সরকারের এককালীন ২৩,৬২৫৲ দানে রমেশ ভবনের ত্রিতলে তিনটি হালকা ধরনের কামরা নির্মিত হইয়াছে ও আনুসঙ্গিক আসবাবে সজ্জিত করা হইয়াছে। চিত্রশালার সংগ্রহগুলি নূতনভাবে বিন্যস্ত করার কার্য পূর্ববৎসরে আরম্ভ করা হইয়াছিল, আলোচ্যবর্ষে আরও কয়েকটি শো-কেস (আধার) নির্মিত করিয়া সংগ্রহভুক্ত পুরাবস্তুগুলির আংশিক সুবিন্যস্ত করিয়া রাখিতে পারা গিয়াছে।

অর্থাভাবে বিভিন্ন সংগ্রহ-বস্তুগুলির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ ও বিস্তারিতভাবে প্রদর্শন সম্ভবপর হয় নাই। এই বাবদে ভারত সরকারের নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং আশা করা যাইতেছে যে সরকারী অর্থানুকূল্যে আগামী বৎসর পরিষৎ-চিত্রশালা সমৃদ্ধতররূপে সজ্জিত হইবে।

বঙ্গদেশের গ্রামাঞ্চলে বহু প্রাচীন শিল্প ও প্রত্ন-বস্তু অবহেলিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। সেগুলি সংগৃহীত হইয়া উপযুক্তভাবে সংরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। পরিষৎ এ বিষয়ে সরকারের সহিত আলোচনা করিতেছেন।

পরিষৎ ও রমেশ ভবন :

রমেশ ভবনের ছাদে তিনখানি কামরা তৈয়ারী করা হইয়াছে এ সংবাদ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি উৎসবের অঙ্গহিসাবে ভবন দুইটির সংস্কার এবং ইলেকৃট্রিক আলো-পাখার লাইন ইত্যাদির সংস্কার করা হইয়াছে। নিরাপত্তার জন্য কোনো কোনো জায়গায় লোহার জাল দিয়া ঘেরা হইয়াছে।

পরিষৎ ভবনের ছাদের অবস্থা ভাল না থাকায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ছাদটি পরীক্ষা করিয়া তাহার মেরামতের জন্য আমাদের প্রার্থিত টাকা দানের সুপারিশ করিয়াছেন। ঐ বাবদ টাকা শীঘ্রই আমাদের হস্তগত হইবে আশা করা যাইতেছে।

কলিকাতা কর্পোরেশন পরিষদের ভবন দুইটির জন্য ট্যাক্স মকুব করিবেন না স্থির করিয়াছেন। এ বিষয়ে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের সহিত বৎসরাধিক কাল হইতে পত্রব্যবহার চলিতেছে।

ভারত-কোষ ঃ

ভারত-কোষ সম্পাদনার কার্য আশানুরূপ গতিতে অগ্রসর করিতে পারা নানা কারণে সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। সমগ্র পুস্তকের প্রায় এক তৃতীয়াংশ প্রবন্ধ ভারতবর্ষের কয়েকটি অঞ্চলের প্রায় দুই শত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা লিখিত হইতেছে। ইহার মধ্যে ৯৫০টি প্রসঙ্গ লিখিত হইবার জন্য প্রেরিত হইয়াছে এবং ৩৬৫টি নিবন্ধ ইতিমধ্যে আমাদের হস্তগত হইয়াছে এবং তাহার অনেকগুলির সম্পাদনকার্য ইতিমধ্যে শেষ হইয়াছে। অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি আগামী পূজার ছুটির পূর্বে হস্তগত হইবে আশা করা যাইতেছে। ইংরেজী বা হিন্দীতে লিখিত নিবন্ধগুলি সাহিত্যিক বুদ্ধিসম্পন্ন উপযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা বাংলায় অনূদিত হইতেছে। বিশেষজ্ঞগণ সকলেই নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় বারংবার অনুরোধসত্ত্বেও তাঁহাদের রচনা সময়মতো দিতে পারেন নাই। তবে আমরা আশা করিতেছি যে গ্রন্থটির প্রথম দুই খণ্ডের সমস্ত নিবন্ধগুলি আগামী চৈত্র মাসের মধ্যে আমাদের হস্তগত হইবে ও সেগুলি সম্পাদিত হইয়া আগামী বর্ষেই ছাপাখানায় পাঠাইতে পারিব। সাধারণ প্রসঙ্গগুলি সম্পাদকমণ্ডলীর নির্দেশমত উপযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা লিখিত হইতেছে। প্রায় দশ হাজার প্রসঙ্গ গ্রন্থটিতে স্থান পাইবে। সন্নিবিষ্ট প্রসঙ্গ নির্বাচনের কার্য মোটামুটি ভাবে প্রায় শেষ হইলেও লিখিত প্রবন্ধের মধ্যে কিছু কিছু নূতন প্রসঙ্গের অবতারণা হইবে। সেই জন্য নির্বাচিত সমস্ত প্রসঙ্গগুলি অল্প সময়ে বর্ণানুক্রমে সাজাইয়া ছাপাখানায় পাঠানো সম্ভবপর নয়। অবশ্য অল্প কয়েকটি প্রসঙ্গ বাদ পড়িতে পারে, সেগুলির মুদ্রণের ব্যবস্থা পরিশিষ্ট গ্রন্থে হইবে।

সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত ৭৯,৫০০ টাকার মধ্যে ১৩৬৭ বঙ্গাব্দের শেষ তারিখ পর্যন্ত ৩৭,৪৫৪.৯৮ নঃ পঃ খরচ হইয়া আমাদের হস্তে এখন ৪৩,২৯৫.০২ টাকা মজুত আছে। খরচের হিসাব উদ্বর্তপত্রে দেওয়া হইয়াছে। মজুত টাকা ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের মধ্যে ব্যয়িত হইবে। সেই জন্য ইতিমধ্যে আমরা সরকারের নিকট হইতে তাঁহাদের অঙ্গীকৃত বাকী ৯৪,৭০০ টাকা ১৯৬২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে পাইবার জন্য আবেদনপত্র পাঠাইয়াছি। মুদ্রণের জন্য কিছু কাগজ ও অল্প সংখ্যক টাইপ আমরা ইতিমধ্যে ক্রয় করিয়া রাখিয়াছি। প্রার্থিত বাকী সরকারী সাহায্য সময়মতো হস্তগত হইলে আমরা পরিষদের অঙ্গীকৃত দেয় অর্থ ক্রয়েচ্ছুক গ্রাহকদের নিকট হইতে অগ্রিম-প্রকাশন নিম্ন মূল্যে সংগ্রহ করিয়া সমগ্র গ্রন্থটির প্রকাশন ব্যবস্থা করিতে পারিব। অবশ্য প্রার্থিত সরকারী অর্থ সাহায্য সময়মতো হস্তগত না হইলে পুস্তকটির প্রকাশকাল বিলম্ব হইবে।

ভারত-কোষ সঙ্কলনকার্যে সহায়তার জন্য আমাদিগকে অনেক গুণী জ্ঞানী ব্যক্তির সাহায্য লইতে হইতেছে। সকলেই অকুণ্ঠচিত্তে আমাদের সর্বপ্রকারে সহায়তা করিতেছেন। তাঁহাদের সকলকেই পরিষদের পক্ষ হইতে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

ভারত-কোষ গ্রন্থের সংকলন ও সম্পাদনার কার্য অতীব দুরূহ ও সময়-সাপেক্ষ।

বর্তমান আদর্শে পরিকল্পিত কোষ-গ্রন্থ সংকলন বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে প্রবর্তিত হয় নাই। আমাদের ভুলত্রুটি নিশ্চয় থাকিবে কিন্তু বিশেষজ্ঞদের সাহায্যপুষ্ট হইয়া ত্রুটির পরিমাণ অধিক হইবে না এই ভরসা লইয়া আমরা এই কঠিন কার্যে ব্রতী হইয়াছি।

রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি উৎসব :

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ১৪ই মাঘ কলিকাতার টাউনহলে এক কবি-সংবর্ধনার আয়োজন করিয়াছিলেন। নোবেলপ্রাইজ প্রাপ্তির পূর্বে দেশবাসীর পক্ষ হইতে এই প্রকাশ্য সংবর্ধনার আয়োজন করিয়া পরিষৎ জাতির নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। সেই গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া পরিষদের পক্ষ হইতে যথার্থ মর্যাদার সহিত কবির জন্মশতবর্ষপূর্তি উদ্‌যাপনের জন্য পরিষৎ সভাপতি গত ২৭ ফাল্গুন ১৩৬৭ তারিখে এক আবেদন-পত্র প্রচার করেন এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি লইয়া এক উৎসব সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির পরিচালনায় ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে একমাসকালব্যাপী উৎসব পালন করা হয়।

২ বৈশাখ তারিখে সন্ধ্যায় রমেশভবনে আয়োজিত এক সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে শ্রীসর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ আনুষ্ঠানিক ভাবে উৎসব উদ্বোধন করেন। পরিষৎ সভাপতি তাঁহার ভাষণে রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিষদের সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন। তারপর শ্রীরাধাকৃষ্ণণ ভাষণ দেন এবং মঞ্চোপরি শতপ্রদীপ প্রজ্বালনান্তে উৎসবের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণণের ভাষণ পরে আকাশবাণীর কলিকাতাকেন্দ্র হইতে পুনঃপ্রচার করা হইয়াছিল। সভায় শ্রীনীলিমা সেন গান গাহিয়া শোনান এবং শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভাশেষে শ্রীরাধাকৃষ্ণণ পরিষদের সংগ্রহশালা কক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এই প্রদর্শনীতে রবীন্দ্রনাথ ও তৎসম্পর্কিত শতাধিক আলোকচিত্র, রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত কয়েকটি চিত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, শ্রীমুকুল দে ও রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী-অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি ও রবীন্দ্রজীবন সম্পর্কিত চিত্র, রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ, ভারতীয় ও বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত গ্রন্থ, রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি, রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরসংবলিত পরিষদ ভবনের ট্রস্টডীড, রবীন্দ্রনাথের হস্তলিখিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে অভিনন্দন, জগদীশচন্দ্র, প্রিয়নাথ সেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ সরকারকে লিখিত মূল পত্রসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রদর্শিত দ্রব্যসম্ভারের কিছু কিছু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক পরিষদের রবীন্দ্রসংগ্রহে প্রদত্ত দ্রব্যাদি এবং অবশিষ্ট প্রদর্শনীর জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির নিকট হইতে সংগৃহীত। এই প্রদর্শনী এক মাসকাল জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল। পরিষদের স্থানাভাব ও অর্থের অপ্রতুলতা হেতু বহু সংগৃহীত দ্রব্য প্রদর্শিত করা সম্ভব হয় নাই। তথাপি এই দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যসমূহের বিচিত্র সমাহার কয়েক সহস্র দর্শকমণ্ডলীর বিশেষ প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। পত্রপত্রিকাতেও ইহার প্রশংসাসূচক সমালোচনা

প্রকাশিত হইয়াছে। দর্শকসাধারণের অভিমত একটি খাতায় রক্ষা করা হইয়াছে। এই প্রদর্শনীর জন্য একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পুস্তিকা প্রকাশ করা হইয়াছিল।

উৎসবের অন্যতম অঙ্গরূপে এক বক্তৃতামালার আয়োজন করা হইয়াছিল। শ্রীরাধাকৃষ্ণণের উদ্বোধনী বক্তৃতার দ্বারা ইহার সূচনা হয়। বিভিন্ন তারিখে রমেশ-ভবনে বিভিন্ন বক্তা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন দিক্ লইয়া আলোচনা করেন।

৯ই বৈশাখ তারিখে শ্রীচিন্তামন দেশমুখ 'মহারাষ্ট্র-সাহিত্যের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব' বিষয়ে আলোচনা করেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী। ১০ বৈশাখ তারিখে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ' বিষয়ে আলোচনা করেন। সভাপতি শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীসজনীকান্ত দাস। পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৬ বৈশাখ। বক্তা শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরীর অনুপস্থিতিতে শ্রীনির্মলকুমার বসু 'রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। ২৩ বৈশাখ তারিখের সভায় শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ 'রবীন্দ্র-সাহিত্যে দেশ ও মানবতাবোধ' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। সভাপতি শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসু কবির সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয়ের ইতিহাস উল্লেখ করেন। বক্তৃতামালার শেষ বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয় ৩০ বৈশাখ তারিখে শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদারের সভাপতিত্বে। এই সভায় শ্রীসজনীকান্ত দাস 'রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ' বিষয়ে আলোচনা করেন। এই দিন সভাশেষে শ্রীসত্যজিৎ রায়-প্রযোজিত তথ্যমূলক চলচ্চিত্র 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' প্রদর্শিত হয়।

প্রত্যেক দিনের সভায় প্রচুর শ্রোতৃসমাগম হয় এবং নানা বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষ পরিতৃপ্ত করে। এই বক্তৃতামালার সকল বক্তৃতা প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত করা স্থির হইয়াছে।

মাসকালব্যাপী উৎসবের শেষ সন্ধ্যায় ৩১ বৈশাখ তারিখে এক সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে শ্রীগীতা রক্ষিতের পরিচালনায় তাঁহার ছাত্রছাত্রীর জন্মদিনের গান গাহিয়া শোনান।

উৎসবের অঙ্গরূপে ১, ২ এবং ২৫ বৈশাখ তারিখে পরিষৎ-ভবন আলোকসজ্জিত করা হয় এবং ভবনশীর্ষে নিয়ন আলোকে 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' এই বাণীটি উৎকীর্ণ করা হয়। উক্ত দিবসগুলিতে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সানাই বাদ্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষের শুভসূচনা উপলক্ষে মূল উৎসবের পূর্বদিন ১ বৈশাখ প্রভাতে পরিষৎভবনে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে নববর্ষের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী স্বস্তিবচন উচ্চারণ করেন এবং শ্রীঅজয় হোমের প্রযোজনায় 'একতারা' গোষ্ঠী কর্তৃক সংগীতের অনুষ্ঠান হয়। এই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচনা

অংশ পাঠ করেন শ্রীকালিদাস নাগ। সভাপতি শ্রীচট্টোপাধ্যায় ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের গুরুত্ব উল্লেখ করিয়া ভাষণ দেন।

রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে পরিষৎ শ্রীপুলিনবিহারী সেনের সম্পাদনায় 'রবীন্দ্রনাথের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দীর্ঘ সম্পর্ক' প্রসঙ্গে একখানি তথ্যমূলক গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন।

একমাসকালব্যাপী উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে যাঁহারা নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞ। আনন্দবাজার পত্রিকা, জাতীয় গ্রন্থাগার, বসুবিজ্ঞান মন্দির, বিশ্বভারতী, যাদবপুর স্কুল অব প্রিন্টিং অ্যাণ্ড টেক্‌নলজি, রবীন্দ্রভারতী, শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ, সাহিত্য আকাদমি, শ্রীঅমল হোম, শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীপ্রমোদনাথ সেন, শ্রীশম্ভু সাহা, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিশী, শ্রীহিরণকুমার সান্যাল, প্রদর্শনীতে নানা উপাদান দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। অল ইণ্ডিয়া রেডিও শ্রীরাধাকৃষ্ণণের ভাষণ পুনঃপ্রচারিত করিয়া ও সংবাদপত্রসমূহ সভাবিবরণী প্রকাশ করিয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। প্রদর্শনীর পরিকল্পনা ব্যাপারে প্রভূত সাহায্য করেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন এবং প্রদর্শনীকক্ষ ও মঞ্চ-পরিকল্পনা করেন শ্রীসুনীল পাল। পরিষৎ ইঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। পরিষদের কর্মীবৃন্দ উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিগত ২৬ জুন উৎসবের কর্মীগণকে এক আনন্দ অনুষ্ঠানে আপ্যায়িত করা হয়।

পরিষৎ রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে যে আয়োজন করিয়াছেন তাহা পরিষদের রবীন্দ্রচর্চার স্থায়ী পরিকল্পনার সূচনামাত্র। আমাদের বাসনা আছে পরিষদের রবীন্দ্র-সংগ্রহটিকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করিয়া সংগ্রহশালার জন্য একটি স্থায়ী কক্ষের ব্যবস্থা করিয়া ইহাকে রবীন্দ্র-গবেষণার অপরিহার্য কেন্দ্র করিয়া তুলিব। এই বিষয়ে পরিষদের সদস্য, জনসাধারণ ও সরকারের সাহায্য এবং সহানুভূতি প্রার্থনা করি।

আর্থিক অবস্থা ঃ

কয়েকটি উন্নতিমূলক কার্যের জন্য গত দুই বৎসরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট হইতে যে অর্থসাহায্য পাওয়া গিয়াছিল তাহার সমতুল্যাংশ পরিষৎ নিজ আয় হইতে খরচ করিয়াছেন। বর্তমান বৎসরে পুস্তকাদি মেরামত ও বাঁধানো কাজের জন্য সরকার ১২,৪৬২ টাকা দান করিয়াছেন। এই অর্থে গ্রন্থাদি বাঁধানোর কাজ চলিতেছে। কয়েকটি গ্রন্থপ্রকাশ করিবার জন্য সরকারের নিকট ২১,৩৬০ টাকা অর্থসাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। সেই অর্থে অধ্যাপক বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত "চণ্ডীদাসের পদাবলী" ও "বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ" দুইখণ্ড আলোচ্যবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে এবং "বাসু ঘোষের পদাবলী" ও "পদাবলী সংগ্রহ" ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইবে। আরও কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশে সাহায্যের জন্য আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বারস্থ হইয়াছি।

সরকারী সাহায্যপুষ্ট কর্মচারীদের বেতনের অর্ধাংশ ৫৬৪৪.৪০ টাকা আমরা আলোচ্যবর্ষে পাইয়াছি।

তুল্যাংশিক শর্তের দেয় অর্থ সৌভাগ্যবশতঃ এ বৎসর আমরা পুস্তক বিক্রয় ও বিশেষ চাঁদা আদায় বাবদ অর্থ হইতে কঠোর পরিশ্রমে এবং কিছুটা ভাগ্যবলে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। প্রতি বৎসর এইরূপ অনিশ্চিত আয়ের আশার উপর নির্ভর করিয়া দায় গ্রহণ করা সমীচীন নহে। সেই কারণে সরকারের নিকট বিনাশর্তে আমরা বাৎসরিক ত্রিশহাজার টাকা পৌনঃপুনিক (recurring) দান হিসাবে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়াছি। এই অর্থসাহায্য না পাইলে আমাদের উন্নতিমূলক কার্যগুলি বন্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। ভরসা করিতেছি সরকার এই অর্থ মঞ্জুর করিয়া পরিষৎকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সহায়তা করিবেন।

উপসংহার ঃ

গত চার বৎসর ধরিয়া পরিষদের সম্পাদক-পদের গুরুকর্মভার আমার উপর ন্যস্ত ছিল। আজ সেই কর্মভার পরিষদের নবীনকর্মী শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের যোগ্যতর হস্তে অর্পণ করিয়া আমি ভারমুক্ত হইব। আজিকার দিনটি আমার পক্ষে বিশেষ আনন্দের দিন; এই বিশেষ দিনটিতে পরিষদের সহিত আমার দীর্ঘকালের যোগাযোগ সম্বন্ধে পূর্বাপর অনেক কথাই মনে পড়িতেছে। প্রায় আঠারো বৎসর পূর্বে স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় আমি পরিষদের কর্মে আকৃষ্ট হই। তাহার পর পরিষদের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছি। চার বৎসর পূর্বে পরিষদের সম্পাদক-পদের গুরুদায়িত্ব যখন ঘটনাচক্রে আমার উপর ন্যস্ত হইবার প্রস্তাব হয় তখন উপায়ান্তর নাই দেখিয়া দ্বিধাগ্রস্ত ও শঙ্কিতচিত্তে এই ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু আজ বলিতে পারি এই চারিটি বৎসর আমি অত্যন্ত আনন্দের মধ্যে কাটাইয়াছি। আমার বন্ধু ও সহযোগীদের অকৃত্রিম আনুকূল্যে গুরুভার আমার নিকট ভার বলিয়া বোধ হয় নাই। এই কয়বৎসরে পরিষদের কর্মে কতদূর সফল হইয়াছি বলিতে পারি না তবে নিষ্ঠার সহিত কাজ করিতে পারিয়াছি মনে করিয়া আমি সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এই সূত্রে পরিষদের সকল কর্মচারী ও কর্মীকে বিশেষ করিয়া শ্রীসুশীলকুমার দে, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীনির্মল-কুমার বসু, শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীশুভেন্দু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রবোধকুমার দাসকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আগামী বৎসর হইতে পরিষদের মধ্যেই কর্মান্তরে ব্যাপৃত থাকিব। প্রার্থনা করিতেছি, যতদিন আমার কর্মশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে ততদিন যেন পরিষদের কর্মী হিসাবে নিজেকে নিযুক্ত রাখিতে পারি। পরিষৎই আমার কর্মজীবনের শেষ আশ্রয়স্থল হউক।

৬ শ্রাবণ, ১৩৬৮

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

অষ্টষষ্টিতম বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বিগত ৬ শ্রাবণ ১৩৬৮ তারিখ পরিষদের পূর্ব্ববর্ত্তী বার্ষিক অধিবেশনের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত মৃত্যুর নির্ম্মম আঘাতে আমাদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা প্রথমেই আপনাদের নিকট উল্লেখ করিতে নিজেকে বিশেষ বিচলিত বোধ করিতেছি। এত জন পণ্ডিত ও বরেণ্য ব্যক্তি একই বৎসরের মধ্যে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

প্রথমেই কোষাধ্যক্ষ সজনীকান্ত দাসের মৃত্যুর বিষয় আমাদের মনে উদয় হয়। তাঁহার মৃত্যু আত্মীয়বিয়োগব্যথার ন্যায় অনেকেরই মনে রেখাপাত করিয়াছে। সজনীকান্ত কিশোর বয়স হইতেই বাংলা দেশের রসিকজনসমাজে তাঁহার যে আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা সহসা পূর্ণ হওয়া কঠিন। পরিষদের সহিত তাঁহার কি সম্পর্ক ছিল, তাহা তাঁহার বিভিন্ন কর্ম্মাধ্যক্ষতার তালিকা দিয়া প্রকাশ করা সম্ভব নহে। তিনি পরিষদ্‌কে একান্ত নিজের বলিয়া জানিতেন এবং পরিষদ্‌ও তাঁহাকে সকল প্রয়োজনে ডাকিয়াছে এবং পাইয়াছে। একটি বড় সংস্থা পরিচালনে আপদে বিপদে একজন বলিষ্ঠ পুরুষের নেতৃত্ব প্রয়োজন হয়। সজনীকান্ত যে-কোন কর্ম্মাধ্যক্ষই থাকুন না কেন, তাঁহার চরিত্রগত দৃঢ়তার জন্য তিনি সেই নেতৃত্বপদ অনেক দিন পূরণ করিয়াছেন। তাঁহার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

পরিষদের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মাধ্যক্ষগণের মধ্যে আমরা এই বৎসরে খগেন্দ্রনাথ মিত্রকে হারাইয়াছি। তিনি সহকারী সভাপতি ও সম্পাদক হিসাবে অনেক দিন পরিষদের সেবা করিয়াছেন। আলোচ্য বৎসরের সহকারী সভাপতি বিজয়প্রসাদ সিংহরায় কিছুদিন পূর্ব্বে পরলোকগমন করিয়াছেন। নানা কাজে ব্যস্ত থাকিলেও তিনি পরিষদ্‌কে বিশেষ ভাল বাসিতেন। বিশিষ্ট বার্ত্তাজীবী হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ পরিষদের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। এই সকল স্বর্গত আত্মার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

পণ্ডিতজনসমাজে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের পরলোকগমন বিশেষ শোকাবহ। তিনি পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন। তাঁহার মহাভারতের টীকা একটি অক্ষয় কীর্ত্তি। সেই কীর্ত্তিই তাঁহার স্মৃতি বিদ্বদ্‌জনসমাজে চির জাগরূক রাখিবে।

মহিলা সাহিত্যিক সরলাবালা সরকার, সাহিত্যিক ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুতে পরিষদের পক্ষ হইতে শোকপ্রকাশ করা হইতেছে। এ বৎসরে পরিষদের যে সকল সদস্যের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহাদের নাম উল্লেখপূর্ব্বক শোকপ্রকাশ করিতেছি :—(১) খগেন্দ্রলাল মিত্র, (২) নগেনবালা দাসী, (৩) প্রকাশচন্দ্র শেঠ, (৪) বীরেন্দ্রনাথ গুহ, (৫) সুকেশচন্দ্র মৌলিক, (৬) সুহৃদচন্দ্র মিত্র।

বাংলাদেশের, তথা ভারতবর্ষের বৃহত্তর জীবনে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পরলোকগমন অতীব মর্ম্মন্তুদ ঘটনা। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে বাংলাদেশে সাহিত্য, শিক্ষা, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সকল দিকে এক অদ্ভুত উন্মেষ পরিলক্ষিত হয়। সেই মহান্ যুগের মহান্ পুরুষ বিধানচন্দ্র। তৎকালের উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত বিধানচন্দ্র, দ্রুতবেগে সঞ্চরমান বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের কি কি উপায় অবলম্বনে বঙ্গজননীকে সমৃদ্ধির পথে লইয়া যাওয়া যায়, এই চিন্তায় ও চেষ্টায় অনলসভাবে ব্রতী ছিলেন। পরিষদ্ তাঁহার স্নেহে অভিসিঞ্চিত। পরিষদের নিকট সরকারী সাহায্যের দ্বার উন্মুক্ত হয় তাঁহারই উৎসাহে। পরিষদের শুভার্থে তাঁহার এই মন্দিরে পদার্পণের কথা আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করি।

এতগুলি শোকাবহ ঘটনাবলীর মধ্যেও কয়েকটি আনন্দের কথা উল্লেখ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। ডাঃ রায়ের মৃত্যুর পর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে আমরা অভিনন্দন জানাই। ভরসা করি, তাঁহার আনুকূল্যে পরিষদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর হইবে।

পরিষদের অন্যান্য কর্ম্মাধ্যক্ষ ও সদস্যগণ নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের জন্য সমাদৃত হইয়াছেন; এ জন্য তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জানাই। ইঁহাদের মধ্যে পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত এবং সদস্য শ্রীপুলিনবিহারী সেনের বিভিন্ন পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।

৬৮ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণের তালিকা

সভাপতি : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সহকারী সভাপতি : শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীবিজয়প্রসাদ সিংহ রায় (মৃত : ৮ অগ্রহায়ণ ১৩৬৮), শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীসুশীলকুমার দে।

সম্পাদক : শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ।

সহ-সম্পাদক : শ্রীকুমারেশ ঘোষ ও শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়।

কোষাধ্যক্ষ : শ্রীসজনীকান্ত দাস (মৃত : ২৮ মাঘ ১৩৬৮), পরে শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

পুথিশালাধ্যক্ষ : শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস।

চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থশালাধ্যক্ষ : শ্রীত্রিদিবনাথ রায়।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য : শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, শ্রীকালীকিঙ্কর সেন গুপ্ত, শ্রীগোপালচন্দ্র ভটাচার্য্য, শ্রীচণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীচারু হোম, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য,

শ্রীমনোমোহন ঘোষ, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়, শ্রীসুশীল রায়, শ্রীহেমরঞ্জন বসু, শ্রীহেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শাখা-পরিষদের পক্ষে শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন, শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, শ্রীলক্ষ্মীকান্ত নাগ, শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

পৌর প্রতিনিধি : শ্রীবিপ্লবকুমার দাস।

এই বৎসর ন্যাস-রক্ষক-সমিতির কার্য্যকাল সম্পূর্ণ হওয়ায় নিয়মানুসারে এই সমিতি পুনর্গঠিত হইয়াছে। এখন এই সমিতির মধ্যে আছেন—রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী; রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, শ্রীলীলামোহন সিংহ রায় ও পদাধিকার-বলে শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

পরিষদের বান্ধব ও বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য

বান্ধব : রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

বিশিষ্ট সদস্য : শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু।

আজীবন সদস্য : ১। শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ২। শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৩। শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৪। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ৫। শ্রীহরিহর শেঠ, ৬। শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে, ৭। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ৮। শ্রীপ্রশান্তকুমার সিংহ, ৯। শ্রীরঘুবীর সিংহ, ১০। শ্রীবীণাপাণি দেবী, ১১। শ্রীমুরারিমোহন মাইতি, ১২। রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, ১৩। শ্রীহিরণকুমার বসু, ১৪। শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়, ১৫। শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, ১৬। শ্রীইন্দ্রভূষণ বিদ, ১৭। শ্রীত্রিদিবেশ বসু, ১৮। শ্রীজগন্নাথ কোলে, ১৯। শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু, ২০। শ্রীমহিমচন্দ্র ঘোষ, ২১। শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন, ২২। শ্রীহরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীসুধাকান্ত দে, ২৪। শ্রীবিভুভূষণ চৌধুরী, ২৫। শ্রীঅজিত বসু, ২৬। শ্রীঅনিলকুমার রায় চৌধুরী, ২৭। শ্রীআর্থার হিউজ, ২৮। শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ, ২৯। শ্রীকুমুদবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, ৩০। শ্রীজগদীশচন্দ্র সিংহ, ৩১। শ্রীদীনেশচন্দ্র তপাদার, ৩২। শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী, ৩৩। শ্রীসুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৩৪। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৫। শ্রীপ্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৬। শ্রীহিরণ্ময় রায় চৌধুরী, ৩৭। শ্রীকল্যাণী দেবী, ৩৮। শ্রীরূপালী দেবী, ৩৯। শ্রীদেবীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪০। শ্রীকেতকী গঙ্গোপাধ্যায়, ৪১। শ্রীরঞ্জিৎ মুখোপাধ্যায়, ৪২। শ্রীপুষ্পমালা দেবী, ৪৩। শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ, ৪৪। শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ, ৪৫। শ্রীঅসীম দত্ত, ৪৬। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

সহায়ক সদস্য : বর্ষশেষে ৬ জন।

সাধারণ সদস্য : কলিকাতাবাসী ৯৮৬ জন ও মফস্বলবাসী ৭৯ জন=মোট ১০৬৫।

আলোচ্য বর্ষে ২১৫ জন সাধারণ-সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নানাবিধ অসুবিধা হেতু ৬৮ জন সাধারণ-সদস্য পদত্যাগ করিয়াছেন। অনাদায়ী চাঁদার পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়া একটি বিশেষ চিন্তার কারণ। বোধ হয়, নিয়মাবলীর কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া

অনাদায়ী চাঁদা বৃদ্ধির হার আয়ত্তে আনা প্রয়োজন। উপযুক্ত নিয়মানুসারে এই বিষয়ে অচিরে যথাবিহিতব্যবস্থা করা হইবে।

পরিষদের কার্য্যকলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১। বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যের সহায়তার জন্য, বিগত বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও সাহিত্য, অর্থনীতি, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান শাখা-সমিতি এবং আয়-ব্যয়, গ্রন্থাগার, গ্রন্থপ্রকাশ, ছাপাখানা, চিত্রশালা ও পুথিশালা উপসমিতি গঠিত হইয়াছিল।

২। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিষদের পক্ষে নিম্নলিখিত প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছিলেন :—

(ক) নিখিলভারত লেখক সম্মেলনের বোম্বাই অধিবেশনে—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ।

(খ) নিখিলভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে
—শ্রীকুমারেশ ঘোষ।

(গ) সাহিত্য আকাদমীর (দিল্লী) জেনারেল কাউন্সিলে তিন জনের নাম প্যানেলে প্রেরিত হইয়াছে—শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু, শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত ও শ্রীসুশীলকুমার দে

(ঘ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় :
সরোজিনী বসু পদক সমিতি—শ্রীসুশীলকুমার দে।
শরৎচন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতা সমিতি—শ্রীকালীকিঙ্কর সেন গুপ্ত।
লীলা পুরস্কার সমিতি—শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(ঙ) দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় :
নরসিংহদাস বাংলা পুরস্কার সমিতি—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

(চ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে পরিষদের পক্ষে প্রতিনিধি—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত।

৩। আলোচ্য বর্ষের প্রথমে "রমেশ ভবন" ও "পরিষৎ মন্দির" উপযুক্তভাবে মেরামত করা হইয়াছে এবং ত্রিতলে তিনটি ঘর নির্ম্মাণকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে।

পরিষদের অধিবেশন

১। ৬ শ্রাবণ ১৩৬৮—৬৭তম বার্ষিক অধিবেশন।

২। ৮ শ্রাবণ ১৩৬৮—প্রতিষ্ঠা দিবস।

৩। ২ ভাদ্র ১৩৬৮—মাসিক অধিবেশন। বক্তা : পরিষৎ-সভাপতি শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। বিষয়—"ভারত ও চীন সাংস্কৃতিক বিনিময়"।

৪। ২ পৌষ ১৩৬৮—মাসিক অধিবেশন। বক্তা : পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু। বিষয়—"ভারতের গ্রামজীবন"।

৫। ১৩ চৈত্র ১৩৬৮—পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সজনীকান্ত দাসের মৃত্যুতে শোক-সভা।

৬। ১৪ আষাঢ় ১৩৬৯—মাইকেল মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভে মাল্যাদি অর্পণ করা হয়।

পরিষদের অধিবেশন নানা কারণে এই বৎসর নিয়মিত ভাবে প্রত্যেক মাসে আহ্বান করা সম্ভব হয় নাই। তজ্জন্য আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

এখানে নিবেদন করি যে, পরিষদের পূর্ব্বসূরিগণ যে উদ্দেশ্যে মাসিক অধিবেশনের প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা উপযুক্তভাবে প্রতিপালনের চেষ্টা করা প্রয়োজন। কেবল নামমাত্র বিজ্ঞপ্তি-পত্র প্রচার করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনের পরে কয়েক মিনিটের জন্য মাসিক অধিবেশনে কয়েকটি গতানুগতিক কার্য্য শেষ করা এই প্রথার উদ্দেশ্য নহে। যাহাতে কোন একজন বিশেষজ্ঞ কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেন, তাহাই এই প্রথার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই প্রথায় মাসিক অধিবেশন আহ্বান করা কঠিন হয় বলিয়াই অধিবেশনের সংখ্যা ক্ষীয়মান। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি এইরূপ আলোচনা-সভা আহ্বান সহজ করিবার জন্য প্রধান বক্তাকে দক্ষিণা দিবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং সুখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গ-সরকার প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনে ৫০৲ টাকা করিয়া দক্ষিণা এবং ডাক ইত্যাদি খরচের জন্য ২৫৲ টাকা সাহায্য দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। বিজ্ঞপ্তিপত্র প্রচারের সহায়তার জন্য সরকার একটি ডুপ্লিকেটর যন্ত্র কিনিতে ১০০০৲ টাকা সাহায্যও দিয়াছেন। উপস্থিত বিদ্বদ্‌জনমণ্ডলীর নিকট বিনীত অনুরোধ, তাঁহারা যেন পরিষদের আগামী বৎসরের মাসিক অধিবেশনে অধিকতর ভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া পরিষদের জীবনস্রোতে নূতন প্রবাহের সঞ্চার করেন।

গ্রন্থপ্রকাশ :

(ক) সাধারণ তহবিল : বাসু ঘোষের পদাবলী—নূতন গ্রন্থ। সম্পাদিকা—শ্রীমালবিকা চাকী। পুনর্ম্মুদ্রণ—সাহিত্যসাধক-চরিতমালা—৩১, ৩৫, ৪০, ৬৫, ৭৪, ৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮১ এবং ৯০ সংখ্যক গ্রন্থ। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—"বৃত্রসংহার কাব্য" দ্বিতীয় সংস্করণ।

(খ) লালগোলা তহবিল : পুনর্ম্মুদ্রণ—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—৪র্থ সংস্করণ। "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" ও শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত "কবি রামেশ্বরের রচনাবলী" এই তহবিল হইতে মুদ্রিত হইতেছে।

(গ) ঝাড়গ্রাম তহবিল : পুনর্ম্মুদ্রণ—বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণচরিত্র"। "পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী—১ম খণ্ড।" দীনবন্ধু মিত্রের "লীলাবতী," "কমলে কামিনী," "দ্বাদশ কবিতা," "নবীন তপস্বিনী"। মধুসূদন দত্তের "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য," "বীরাঙ্গনা কাব্য," "ব্রজাঙ্গনা কাব্য," "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী"।

(ঘ) এতদ্ব্যতীত গিরিশচন্দ্রের "সিরাজদ্দৌলা," মীর কাশিম" ও "ছত্রপতি" নাটকের একটি সংস্করণ ও প্রিয়নাথ সেন প্রণীত "প্রিয় পুষ্পাঞ্জলি"র নূতন সংস্করণ অর্থাভাবে মুদ্রিত করা সম্ভব হয় নাই।

(ঙ) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "সংবাদপত্রে সেকালের কথা," ফণিভূষণ

তর্কবাগীশ প্রণীত "ন্যায়দর্শন" এবং দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য গ্রন্থাবলী নিঃশেষিত। অর্থের সুবিধা হইলেই এই পুস্তকগুলি পুনর্মুদ্রণ করা হইবে।

(চ) বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগারের গ্রন্থ-তালিকা প্রণয়ণের জন্য যে যে শিরোনামা ব্যবহার করা যাইতে পারে, এ বিষয়ে একটি পুস্তক প্রণীত হইয়াছে এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা হইলেই তাহা মুদ্রণের জন্য প্রেরিত হইবে। পরিষৎ এই বিষয়ে পথিকৃৎ। এই পুস্তক প্রকাশিত হইলে সকল দেশজ ভাষায় এই সকল শিরোনামা ব্যবহৃত হইতে পারিবে বলিয়া ভরসা হয়।

পুথিশালা ঃ

১৩৬৮ বঙ্গাব্দে তিনখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে—১। বৈষ্ণব পদাবলী, ২। ভগবদ্‌গীতা, ৩। পদাবলী। এগুলি তালিকাভুক্ত হইয়া পুথির সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে—বাংলা পুথি ৩০৭০, সংস্কৃত পুথি ২৫৯০, তিব্বতী পুথি ২৪৫, ফার্সি পুথি ১৩, মোট ৬২১৭। পুনার ভাণ্ডারকার রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট এবং বরোদার ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট বণ্ড দিয়া পুথি গবেষণার জন্য লইয়াছেন। গবেষক ও ছাত্রগণ যথারীতি পুথিশালা ব্যবহার করিতেছেন।

গ্রন্থাগার ঃ

বর্ত্তমান বৎসরে ৫২৫ খণ্ড পুস্তক গ্রন্থাগারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অদ্য প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে যে উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সদস্য ও বিভিন্ন প্রকাশক পুস্তক উপহার দিয়া পরিষদের আনুকূল্য করিয়াছেন। তাঁহাদের উদারতায় ও শ্রীপুলিনবিহারী সেনের চেষ্টায় আমরা যে সকল পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা অদ্য প্রদর্শিত হইবে। সকল দাতাগণকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থাগারের দুইটি কাজ পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ আগ্রহের সহিত করা প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। প্রথম-পুরাতন পুস্তক ও পত্রিকা প্রভৃতি বাঁধাই। দ্বিতীয়, গ্রন্থতালিকা প্রকাশ। ১৩৬৭ সাল পর্য্যন্ত এই দুই কাজের জন্য সরকারের সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। তাহার পর পরিষদ্‌কে নিজের তহবিল হইতেই এই কাজ চালাইয়া যাইতে হইতেছে। ইহার কারণ কি এবং আর্থিক সাহায্য পাইবার কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা আর্থিক অবস্থা প্রসঙ্গে আলোচনা করিব।

গ্রন্থাগারে ব্যবহারের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সূচী প্রণয়ন করা হইয়াছে। ইহা পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য পত্রিকায় প্রকাশ করা হইবে।

চিত্রশালা ঃ

পরিষদের চিত্রশালার সম্পদ্ উপযুক্তভাবে জ্ঞানপিপাসু জনসাধারণের নিকট প্রদর্শিত করিবার আমরা সুযোগ দিতে পারি না। তাহার প্রধান কারণ স্থানাভাব ও গৌণ কারণ, যে স্থান আছে, তাহার মধ্যেও আমরা সকল দ্রব্যাদি উপযুক্তভাবে প্রদর্শন করিতে পারি নাই।

ভারত-সরকারের নিকট আবেদন করিয়া এ বিষয়ে একটি পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য পরিষদের পক্ষে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ভারত-সরকার ২৫,০০০৲ টাকার একটি পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়া প্রথম কিস্তীতে ১০,০০০৲ টাকা সাহায্য পাঠাইয়াছেন। পরিষদের কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে লইয়া গঠিত একটি শাখাসমিতি এই অর্থ হইতে চিত্রশালা পুনর্বিন্যাসের কার্য্যে ব্রতী আছেন। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, ডঃ সরসী-কুমার সরস্বতী এবং ডঃ দেবপ্রসাদ ঘোষ এই শাখাসমিতিতে যোগদান করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাই। আশা করা যায়, অচিরেই এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে এবং আগামীতে সরকারী সাহায্য পাইলে এই উন্নতির প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকিবে।

ভারতকোষ ঃ

গত বৎসরের বার্ষিক কার্য্যবিবরণে আশা প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসের মধ্যে ভারতকোষের দুই খণ্ডের প্রবন্ধগুলি আমাদের হস্তগত হইতে পারিবে এবং ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে সেগুলির মুদ্রণ কার্য্য আরম্ভ হইতে পারিবে। কিন্তু নানাবিধ প্রতি-বন্ধকতার জন্য এই আশা ফলবতী হয় নাই। লেখকগণের নিকট হইতে প্রবন্ধগুলি যথাসময়ে আমাদের হস্তগত হয় নাই। অন্যতম সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের মৃত্যুতে এই বিভাগের সকল কার্য্যের অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। এই গ্রন্থের সংকলন ও সম্পাদনার কার্য্য—এমন কি, প্রসঙ্গ নির্ব্বাচনের কার্য্যও বিশেষ দুরূহ। নির্ভুল ও ত্রুটিশূন্য ভাবে এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে আশার অতিরিক্ত সময় ব্যয় করিতে হইতেছে। যাহা হউক, যাহাতে প্রথম খণ্ডটি বর্ত্তমান বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য আমরা সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টিত আছি। আট শত পৃষ্ঠার প্রথম খণ্ডে "অ" হইতে "খ" পর্য্যন্ত প্রায় তের শত বিভিন্ন প্রসঙ্গ এবং গ্রন্থপঞ্জী সন্নিবেশিত হইবে। অবশিষ্ট খণ্ডগুলির প্রসঙ্গ-তালিকাও প্রস্তুত হইয়াছে এবং উহা বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত হইতেছে। উপযুক্ত লেখকগণের দ্বারা লিখিত প্রথম খণ্ডের ৪৩৪টি প্রবন্ধ ইতিমধ্যে আমাদের হস্তগত হইয়াছে এবং অন্যান্য খণ্ডের কয়েক শত রচনার কার্য্যও সম্পন্ন হইয়াছে। আশা করা যায়, প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবার অল্প সময়ের মধ্যে অন্যান্য খণ্ডও প্রকাশ করা সম্ভব হইবে। আগামী পূজার অবকাশের পরেই প্রথম খণ্ডের মুদ্রণ কার্য্য আরম্ভ হইবার ব্যবস্থা করা হইবে।

ভারতকোষ বিভাগের কর্ম্মিবৃন্দের মধ্যে কিছু পরিবর্তন হইয়াছে। পরিষদের পক্ষে ক্ষতিকর নানা কার্য্যে লিপ্ত থাকায় অন্যতম কর্মী শ্রীদেবব্রত ভৌমিকের বিষয় একটি বিশেষ উপসমিতি কর্ত্তৃক বিচার করা হয়। উক্ত উপসমিতির সুপারিশক্রমে তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করা হয়।

প্রকাশকার্য্য ত্বরান্বিত করিবার জন্য ১৫ই আষাঢ় ১৩৬৯ হইতে শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে সম্পাদকমণ্ডলীর কার্য্যের সহায়তা করিবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রবন্ধাদির ক্যাপি প্রস্তুত কার্য্যের জন্য একজন অতিরিক্ত কর্ম্মী নিযুক্ত করা হইয়াছে।

সরকারী সাহায্যের মোট ৭৯,৫০০৲ টাকার মধ্যে ৩১শে চৈত্র ১৩৬৮ তারিখে তহবিলে ২৪৫৮১'০৪ টাকা মজুদ আছে। প্রকাশনার কার্য্যে অধিক সময় অতিবাহিত হওয়ায় কার্য্যালয়ের মোট খরচ কিছু পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। সরকার কর্ত্তৃক প্রতিশ্রুত সাহায্যের অর্দ্ধেক আগামী চৈত্র মাসের মধ্যে আমাদের হস্তগত হইলে প্রথম খণ্ড প্রকাশের ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব হইবে। পুস্তক প্রকাশের পূর্ব্বে যাঁহারা গ্রাহক হইবেন, তাঁহাদের নিকট হইতে যে টাকা সংগৃহীত হইবে, তাহা হইতেও এই বিভাগের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পাইবে। সরকারী মঞ্জুরী সাপেক্ষে এই শ্রেণীর গ্রাহকদের জন্য চার খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ৪০৲ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার :

এই ভাণ্ডার হইতে চারি জন দুঃস্থ মহিলাকে বাৎসরিক ৭২৲ হিসাবে সাহায্য দান করা হইয়াছে।

পরিষৎ-পত্রিকা :

আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। ১৩৬৬ সালের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা রবীন্দ্র-সংখ্যারূপে প্রকাশ করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু পরিষদের পক্ষ হইতে রবীন্দ্র-শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠানজন্য পত্রিকা-প্রকাশের আয়োজন অল্প সময়ে সম্ভব হয় নাই। অতি শীঘ্রই ইহা প্রকাশ করা সম্ভব হইবে বলিয়া বোধ হয়।

১৩৬৭ সালের পত্রিকার সংখ্যাগুলি ১৩৬৬ সালের তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশ হইবার জন্য বিলম্বিত না করিলেও চলে, এই বিবেচনায় পৃথক্‌ভাবে মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ বৎসরের পত্রিকাও একই সঙ্গে প্রকাশের চেষ্টা করা হইতেছে।

নির্ম্মলকুমার বসু "ভারতের গ্রামজীবন" বিষয়ে যে প্রবন্ধ পরিষদে পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা ভারত-সরকারের নৃতত্ত্ব সমীক্ষা বিভাগের অনুসন্ধানের ফলে যে সকল তথ্য সংকলিত হইয়াছে, তাহারই কোন কোন অংশ। সকল তথ্যাদি বিস্তৃতভাবে একত্র সঙ্কলন করিয়া সমগ্র ১৩৬৮ সালের পত্রিকা হিসাবে রয়াল কোয়ার্টার আকারে বিভিন্ন মানচিত্র ও অন্যান্য চিত্রাদি সহ এক সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। সদস্যগণের নিকট উহা যথাসময়ে প্রেরিত হইবে।

আর্থিক অবস্থা :

পরিষদের যে আয়-ব্যয় বিবরণ ও আগামী বৎসরের আনুমানিক আয়-ব্যয় বিবরণ আপনাদের নিকট পাঠান হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা বুঝা যায় যে, অধিকতর সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে পরিষদ্‌কে উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করার কোন উপায় নাই। দ্রুত সামাজিক পরিবর্ত্তনে জনসাধারণের দানের উপর নির্ভর করিয়া এই সকল প্রতিষ্ঠান বাঁচাইয়া রাখিবার

প্রচেষ্টা আকাশকুসুমসদৃশ। অপর পক্ষে পরিষদের ন্যায় প্রতিষ্ঠানের, জাতীয় সরকারের উপর নির্ভর করার যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়া মনে করি।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে পুস্তক বাঁধাই, গ্রন্থতালিকা প্রণয়ন এবং উপযুক্ত কর্ম্মচারিগণের বেতন ইত্যাদি বাবদে যাহা খরচ হইত, তাহার অর্দ্ধেক পশ্চিমবঙ্গ-সরকার দিবেন, এই মর্ম্মে একটি আদেশ হয়। পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ এই ভাবে কার্য্যানুবর্ত্তী হইতে যথেষ্ট সচেষ্ট হন এবং বহু চেষ্টা করিয়া সরকারের সাহায্য হিসাবে প্রদত্ত অর্থের সমতুল অর্থ উল্লিখিত খাতে ব্যয় করেন। কিন্তু ক্রমশই ইহা প্রতীয়মান হয় যে, এই ভাবে কার্য্য পরিচালন সম্ভব হইবে না। সে জন্য ১২ই আগষ্ট ১৯৬০ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের কাছে একটি নূতন আবেদন করা হইয়াছে। এই আবেদনে প্রার্থনা করা হইয়াছে যে, পরিষদের সকল কার্য্যাদি পরিচালন জন্য বৎসরে ৩০,০০০৲ টাকা পৌনঃপুনিক সাহায্য বিনা শর্তে দেওয়া হউক। এই আবেদন বিবেচনার জন্য সরকার সাধারণভাবে গত কয়েক বৎসরে পরিষদের পরিচালনে কি আর্থিক ঘাটতি হইয়াছে অথবা কি প্রয়োজনীয় কাজ করিতে পারা যায় নাই, তাহার বিশদ বিবরণ চাহিয়া পাঠান। আমরা সেই সকল বিবরণ পেশ করিয়াছি এবং আশা করা যায়, এই প্রার্থনা মঞ্জুর হইলে আমাদের অবস্থার কিছু উন্নতি হইবে। এই প্রার্থনা বিবেচনাধীন আছে বলিয়া গ্রন্থতালিকা প্রণয়ন বা পুস্তক বাঁধাই বাবদে ১৩৬৮ বা ১৩৬৯ সালে কোন সাহায্য পাওয়া যায় নাই। নূতন কর্ম্মচারীর বেতন বাবদ যাহা খরচ হইতেছে, তাহার অর্দ্ধেক পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের নিকট হইতে পাইয়াছি এবং অন্যান্য বাবদে সাহায্যের পরিমাণ ১৩৬৮ সালে ৪৮৬০৲।

আমরা আলোচ্য বর্ষে সরকারের নিকট অন্যান্য যে সাহায্য পাইয়াছি, তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত এখানে উল্লেখ করিতেছি :—

(ক) পত্রিকা মুদ্রণ—১২০০৲

(খ) পুস্তক মুদ্রণ—২০০০৲

(গ) "রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্" শীর্ষক পুস্তক প্রকাশ ২০০০৲
(অঙ্গীকৃত টাকার পরিমাণ ৫০০০৲)

(ঘ) রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিক উৎসবে মন্দির সংস্কারের সাহায্য—৫০৭১৲।

উপসংহার :

গত বৎসর বার্ষিক অধিবেশনে যখন আপনারা সকলে আমাকে পরিষদের সম্পাদকপদে নির্ব্বাচন করেন, আমি বিশেষ চিন্তার সহিত কার্য্যে যোগদান করি। এই পদে বহু যোগ্যতর ব্যক্তি পূর্ব্বে পূর্ব্বে আসীন ছিলেন এবং আমি নিজেকে উপযুক্ত বলিয়া মনে করি না। তবে আপনাদের সকলের শুভেচ্ছায় নিজের সাধ্যমত কার্য্য সম্পাদনের চেষ্টা করিয়াছি। সভাপতি শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সহকারী সভাপতি শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু ও সহকর্ম্মী শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমাকে এই কাজে যে ভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাহার জন্য

আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। পরিষদের অন্যান্য কর্ম্মাধ্যক্ষগণ নানাভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। আপনারা আমাকে কি কারণে পুনরায় পরিষদের সম্পাদকপদে নির্ব্বাচন করিলেন জানি না। আমার সাধ্যমত পরিষদের সেবা করিব। এই কার্য্যে আপনাদের সকল সাহায্য প্রার্থনা করি।

পরিশেষে পরিষদের বিষয়ে দু-একটি কথা সাধারণভাবে আপনাদের কাছে নিবেদন করিব, ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। পরিষদের জন্ম হইতে যে ঐতিহ্য রচিত হইয়াছে, তাহা অতীব মহান্। কিন্তু যে মহাপুরুষগণের চেষ্টায় পরিষদ্ আজ সুউচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদের আদর্শে আমরা নিজেদের কতটা পরিচালিত করিতে পারিতেছি, তাহা বিশেষ ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। সুখের বিষয় ভারতকোষের কার্য্যারম্ভের পর হইতে পণ্ডিতসমাজের অনেকে পরিষদে পদার্পণ করিতেছেন এবং পরিষদের শুভার্থে মনোনিবেশ করিতেছেন। কিন্তু যদি কোন সঙ্কীর্ণতা আমাদের স্পর্শ করে, তাহা হইলে কোন শিক্ষায়তনের ভবিষ্যৎ শুভ নহে। সে জন্য আপনাদের সকলকে এই অনুরোধ করিব যে, পাঠকবর্গ এবং গবেষকশ্রেণীর সংখ্যা ক্রমশ বর্দ্ধমান হইবার জন্য আপনারা সচেষ্ট হউন। সাহিত্য-পরিষৎ জ্ঞানচর্চ্চার পীঠস্থান, এ কথা স্বীকার করিতে কোন জ্ঞানপিপাসুর যেন কুণ্ঠা বোধ না হয়। নব নব স্থানের বিভিন্ন শ্রেণীর নব নব বিষয়ের গবেষক আসুন—এই পুণ্য প্রাঙ্গণে, দেবী সরস্বতীর উপযুক্ত অর্চ্চনা হউক নানা উপচারে, আর পণ্ডিতমুখে এবং নূতন গ্রন্থের মধ্য দিয়া সেই পূজার সার্থক আশীষ বর্ষিত হউক শিক্ষিত জনসমাজে নূতন নূতন তথ্য পরিবেশনে।

আপনাদের প্রত্যেককে আমার যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানাই।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ
সম্পাদক

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৬৯ বর্ষের কার্যবিবরণ

শ্রীভগবানের কৃপায় ও আপনাদের সকলের উৎসাহে ও শুভেচ্ছায় আজ পরিষদের উনসপ্ততিম সাধারণ অধিবেশনে মিলিত হইয়াছি। সকল সভ্য মহোদয়গণকে আমার যথাযোগ্য শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভালবাসা জানাইতেছি।

গত বৎসরে যে কয়জন সাহিত্যসেবী বা সাহিত্যামোদী এ জগৎ হইতে বিদায় লইয়াছেন আমরা তাঁহাদের শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন, নৃতাত্ত্বিক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং সাহিত্যিকদ্বয় নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও হেমেন্দ্রকুমার রায় আলোচ্য বর্ষে পরলোক গমন করেন। তাঁহাদের স্বর্গতঃ আত্মা শান্তিলাভ করুক ইহাই প্রার্থনা জানাই।

আমাদের মধ্যে কয়েকজন নানাভাবে সম্মানিত হইয়াছেন। সভাপতি ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। তিনি সুস্থ শরীরে পরিষদের সেবায় নিযুক্ত থাকুন, ইহাই আমাদের সকলের বাসনা। পরিষদের সহকারী সভাপতি ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল যথাক্রমে ১৯৬০, ১৯৬১ ও ১৯৬২ বৎসরের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'সরোজিনী' পদক দ্বারা ভূষিত হইয়াছেন। তাঁহাদের আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি।

১৩৬৯ বঙ্গাব্দের পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য সংখ্যা এইরূপ ছিল :

বান্ধব—শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর। বিশিষ্ট সদস্য—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু। আজীবন সদস্য—৪৭। সাধারণ সদস্য : শহর—৮১৩। মফঃস্বল সদস্য—১২০।

১৩৬৯ বঙ্গাব্দের পরিষদের কর্মাধ্যক্ষগণ :

সভাপতি—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সহকারী সভাপতি—শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য, শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীসুশীলকুমার দে।

সম্পাদক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকুমারেশ ঘোষ ও শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

পুথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী।

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস।

গ্রন্থশালাধ্যক্ষ—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত।

কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য—শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকল্যাণী দত্ত, শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য, শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনির্মলকুমার বসু, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীপূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য, শ্রীপ্রবোধকুমার দাস, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, শ্রীমনোমোহন ঘোষ, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায় ও শ্রীসুধীরচন্দ্র লাহা।

শাখা-পরিষদ পক্ষে কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য—শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন, শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, শ্রীলক্ষ্মীকান্ত নাগ ও শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

পৌর-প্রতিনিধি—শ্রীবিপ্লবকুমার দাস।

পরিষদের কার্যবিবরণ ঃ পরিষদের সকল কার্যভার মুখ্যত কার্যনির্বাহক সমিতির হস্তে ন্যস্ত ছিল। মোট দশটি অধিবেশনে সমিতি বিভিন্ন কার্যাদির বিষয় উপযুক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে যে সকল বিশেষ বিশেষ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে নিম্নে সেগুলির সারাংশ উল্লিখিত হইতেছে :

(ক) ১৯৬৫ সালের পরেও অন্যতম সরকারী ভাষা হিসাবে ইংরাজির ব্যবহার প্রচলিত রাখার ভারত সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহা সমর্থন করা হয় এবং তদনুসারে যাহাতে আইন প্রণীত হয় তজ্জন্য সকলকে অনুরোধ জানান হয়।

(খ) পশ্চিমবঙ্গ নামের পরিবর্তে কেবলমাত্র বঙ্গদেশ বা বাংলাদেশ নামে ঐ ভূখণ্ডকে পরিচিত করিবার প্রচেষ্টার প্রতিবাদ করা হয়।

(গ) চীন কর্তৃক ভারতভূমি আক্রমণের উপযুক্ত প্রতিবাদ জানান হয়।

এই সকল ছাড়া কার্যনির্বাহক সমিতি চাঁদা আদায়ের পদ্ধতি ও আরও কয়েকটি বিষয়ে কিছু কিছু নিয়মাবলী পরিবর্তনের বিষয় বিবেচনা করেন ও তদনুসারে যে সকল নূতন নিয়মের মুসাবিদা রচিত হয় সেগুলি যথাযথভাবে ২০শে পৌষ ১৩৬৯ তারিখে বিশেষ সাধারণ অধিবেশনে মঞ্জুরীকৃত হইয়া কার্যকর হইয়াছে। আশা করা যায় যে নূতন নিয়মানুসারে কাজ হইলে পরিষদের কার্যালয়ের ভার লাঘব হইবে ও চাঁদা আদায়ের কাজও উন্নততর ভাবে পরিচালিত হইবে।

১৩৭১ ভাদ্র মাসে পরিষদের একটি বিশেষ দায়িত্ব বহন করিতে হইবে। ঐ বৎসরে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের জন্ম শতবর্ষ। কার্যনির্বাহক সমিতি এই ঋষিঋণ পরিশোধের জন্য সাধ্যমত উদ্যোগী হইয়াছেন। এই কার্যের জন্য একটি শাখাসমিতি গঠিত হইয়াছে এবং তাঁহারা মোটামুটি নিম্নলিখিত কার্যক্রম মঞ্জুর করিয়াছেন :

(ক) পরিষদের বিশেষ সাধারণ অধিবেশন আহ্বান। (খ) উক্ত অধিবেশনে রামেন্দ্রসুন্দরের বিষয় শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত ও শ্রীসতীশচন্দ্র খাস্তগীর প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। (গ) উক্ত অধিবেশনে আচার্যদেবের রচনা হইতে সঙ্কলিত অংশ পাঠ করা হইবে। (ঘ) আচার্যদেবের রচনাবলী হইতে একটি সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে এবং উক্ত গ্রন্থের সম্পাদনা

করিবেন পরিষৎ-সভাপতি শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। (ঙ) আচার্যদেবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য পরিষৎ পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। (চ) আচার্যদেবের ব্যবহৃত বা তাঁহার বিষয়ক বিভিন্ন দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া একটি প্রদর্শনী করা হইবে।

আচার্যদেবের জন্মস্থান জেমো-কান্দীর শতবার্ষিকী উৎসবের জন্য একটি স্থানীয় সমিতি গঠিত হইয়াছে। তাহাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনকে সভাপতি করিয়া একটি নিখিলবঙ্গ আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর শতবার্ষিকী সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই উভয় সমিতির সহিত পরিষৎ-কর্তৃপক্ষ সংযোগ রক্ষা করিতেছেন। যে সাধারণ সভায় কেন্দ্রীয় সমিতি গঠিত হয় তথায় কেন্দ্রীয় সমিতির কার্যালয় পরিষৎ মন্দিরে স্থাপনের আহ্বান জানাই এবং ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয়। কেন্দ্রীয় সমিতি এ বিষয়ে এ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই।

পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও পরিষদের অর্থনীতি, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্য শাখা সমিতি এবং আয়ব্যয়, গ্রন্থপ্রকাশ, চিত্রশালা-পুথিশালা, ছাপাখানা ও পুস্তকালয় উপসমিতি গঠিত হয়। এই সকল বিভাগ স্বস্ব কার্যে ব্রতী ছিলেন।

পরিষৎ পক্ষে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে যে সকল সদস্য প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁহাদের নাম নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে :

(ক) শরৎচন্দ্র বক্তৃতা সমিতি—শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, (খ) ভুবনমোহিনীপদক সমিতি—শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, (গ) সরোজিনী বসু পদক সমিতি (১৯৬২)—শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, (ঘ) কমলা বক্তৃতা সমিতি—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, (ঙ) গিরিশচন্দ্র বক্তৃতা সমিতি—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, (চ) বিদ্যাসাগর বক্তৃতা সমিতি—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, (ছ) নিখিলভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন—শ্রীকুমারেশ ঘোষ, (জ) সরোজিনী বসু পদক সমিতি (১৯৬৩)—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত।

পরিষদের আর্থিক অবস্থা : পরিষদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি বিষয়ে কোন সংবাদ দিতে পারিতেছি না। আলোচ্য বর্ষে আমরা নিম্নলিখিত সরকারী সাহায্য পাইয়াছি : (ক) পত্রিকাদি প্রকাশ বাবদ পশ্চিমবঙ্গ সরকার—২০০০৲. (খ) গ্রন্থ প্রকাশ বাবদ পশ্চিমবঙ্গ সরকার—১২০০৲, (গ) পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ বাবদ ভারত সরকার—২২০০৲, (ঘ) ডুপ্লিকেটর মেসিন ক্রয় বাবদ পশ্চিমবঙ্গ সরকার—১০০০৲, (ঙ) 'রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' পুস্তক প্রকাশ বাবদ পশ্চিমবঙ্গ সরকার—২০০০৲, (চ) কর্মচারী নিয়োগ খাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার—৪৮৮৭৲

দুঃখের বিষয় কর্মচারী নিয়োগের জন্য পরিষদের যাহা ব্যয় হয় তাহার অর্ধেক পরিমাণ টাকা সরকার পরিষদকে দান করেন। এই কারণে আর্থিক অস্বচ্ছলতা খুবই ভয়াবহ। তদুপরি বর্গীকরণ বিভাগের জন্য পূর্বে পৃথক সরকারী সাহায্য পাইতাম। কিন্তু তাহাও আজ দুই বৎসর ধরিয়া বন্ধ। সেজন্য উক্ত বিভাগের সমুদায় খরচ সাধারণ তহবিল হইতে বহন করিতে হইতেছে। পরিষদের আর্থিক অস্বচ্ছলতার ইহাও একটি কারণ। আমরা সরকারী সাহায্য যাহাতে বর্ধিত হারে পাইতে পারি তাহার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টিত আছি।

এই প্রসঙ্গে অদ্যকার সভায় যে গত বৎসরের আয়ব্যয় বিবরণ ও বর্তমান বর্ষের আনুমানিক আয়ব্যয় বিবরণ যাহা আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছি সে বিষয়ে দুই একটি মন্তব্য করিতে চাই।

(ক) বর্গীকরণ বিভাগের খরচ সাধারণ তহবিল হইতে নির্বাহ করা হইতেছে বলিয়া দপ্তর সরঞ্জামী খরচ বৃদ্ধি পাইয়াছে। (খ) গ্রন্থপ্রকাশের জন্য ১৩৭০ বঙ্গাব্দে মাত্র ৫০০০৲ টাকা খরচের প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই টাকায় কোন কাজ হইবে কিনা তাহা স্থির করা কঠিন। (গ) আসবাব ক্রয় ও পুথিশালার খরচ এই দুই খাতের প্রত্যেকটিতে ৫০০৲ টাকা করিয়া খরচের প্রস্তাব করা হইয়াছে। সাময়িক পত্রিকাদি সুরক্ষিত করিবার জন্য আসবাব খরিদ অতীব প্রয়োজন। পুথিশালার জন্য বহুদিন পাটা, কাপড় ইত্যাদি কেনা হয় নাই—সেজন্য ঐ খাতেও টাকার প্রয়োজন।

গ্রন্থপ্রকাশ : আলোচ্য বর্ষে শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত "রামেশ্বর রচনাবলী" মুদ্রণের কাজ "লালগোলা তহবিল" হইতে নির্বাহ হইতেছে। ঐ তহবিল হইতে "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" আলোচ্যবর্ষে পুনর্মুদ্রিত করা হইয়াছে।

ঝাড়গ্রাম তহবিল হইতে নবীনচন্দ্রের "কুরুক্ষেত্র" প্রকাশিত হইয়াছে। "রৈবতক" কাব্য মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাছাড়া উক্ত তহবিল হইতে "ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী"; বঙ্কিমচন্দ্রের "রাধারাণী", "রাজসিংহ"; মধুসূদনের "কৃষ্ণকুমারী নাটক"; "রামমোহন গ্রন্থাবলী" ২য় খণ্ড; বিহারিলালের "সারদামঙ্গল" পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

সাধারণ তহবিল হইতে "রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ" শীর্ষক পুস্তক প্রকাশিত হইবে এবং এই পুস্তকের সম্পাদনা করিতেছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন। এই পুস্তকে যে সকল পত্রাদি স্থান পাইবে তাহার মধ্যে একটি মুদ্রিত হইয়া অদ্যকার সভায় বিতরণ করা হইল। এই তহবিল হইতে সাহিত্য সাধক-চরিতমালার নয়খানি গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে এবং এই গ্রন্থমালায় শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলের নূতন কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে।

গ্রন্থপ্রকাশ শাখাসমিতি আগামীতে প্রকাশের জন্য নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নির্বাচন করিয়াছেন : (ক) সংবাদপত্রে সেকালের কথা (পুনর্মুদ্রণ); (খ) প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি—প্রিয়নাথ সেন; (গ) পরিষৎ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা হইতে সঙ্কলন; (ঘ) সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় নূতন গ্রন্থ; (ঙ) যদুনাথ সরকারের বাংলা রচনাবলী।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার : আলোচ্য বর্ষে চারিজন দুঃস্থ সাহিত্যিককে সাহায্য ভাণ্ডার হইতে মোট ২৮৮৲ টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

চিত্রশালা-পুথিশালা : চিত্রশালা পুনর্বিন্যাসের বিষয় গত বৎসর আপনাদের গোচরীভূত করিয়াছি। চিত্রশালা উপসমিতি ও কার্য নির্বাহক সমিতির মঞ্জুরী অনুসারে পুনর্বিন্যাসের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। শীঘ্রই আমরা নূতনভাবে সজ্জিত করিয়া চিত্রশালার দ্বার উন্মোচন করিব। ভারত সরকারের আর্থিক সাহায্যে এই পুনর্বিন্যাস সম্ভব হইয়াছে এবং সরকার হইতে প্রাপ্ত প্রথম কিস্তি ১০,০০০৲ টাকা হইতে আমাদের পরিকল্পনার প্রথম

পর্যায় কার্যকরী করা হইল। আশা করি আগামী মার্চ মাসের পূর্বেই আমরা দ্বিতীয় কিস্তি ১৫,০০০৲ টাকা এবং তাহা হইতে স্থিরীকৃত পরিকল্পনার সমস্ত কাজ সুশেষ হইবে।

শ্রীসোমনাথ ভট্টাচার্য চিত্রশালার এই পুনর্বিন্যাসের কাজ করিতেছেন। আগামী শীতকালে মাদ্রাজে মিউজিয়াম সংক্রান্ত যে আলোচনা সভা হইবে তাহাতে পরিষদ পক্ষে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার নাম প্রস্তাব করা হইয়াছে।

পুথিশালায় আলোচ্য বর্ষে কোন পুথি উপহার পাওয়া যায় নাই। তবে পূর্বসঞ্চিত পত্ররাশির মধ্য হইতে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ কৃত তন্ত্রসার—১; বৃহদারণ্যক উপনিষৎ—১; ছান্দোগ্য উপনিষৎ—১; শব্দ রত্নাবলী—১; কালিকাপুরানোক্ত দুর্গোৎসববিধি—১; চিত্রসমন্বিত ভগবদ্গীতা—১; মোট ছয়খানি পুথি পাওয়া গিয়াছে। এই ছয়খানি পুথি তালিকাভুক্ত হইবার পর সংস্কৃত পুথির সংখ্যা হইয়াছে ২৫৯৬, বাংলা পুথির সংখ্যা হইয়াছে ৬২২৩। আলোচ্য বর্ষে ২৩০১ সংখ্যা হইতে ২৫০০ সংখ্যা পর্যন্ত বাংলা পুথির বিবরণ যুক্ত তালিকা লিখিত হইয়াছে। বহু সদস্য ও গবেষকগণ পুথিশালায় ১১০ খানি পুথি আলোচনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া পুনার ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটকে "হরিবংশে"র একটি পুথি ধার স্বরূপ ব্যবহারের জন্য পাঠান হইয়াছে।

গ্রন্থাগার ঃ যথারীতি গ্রন্থাগার সাধারণ পাঠক ও গবেষকগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে। তবে বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে গ্রন্থাগারের যে যে বিষয় উন্নয়ন করা উচিত তাহা অর্থাভাবে করা সম্ভব হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে ৫১৯ খানি পুস্তক ও পত্রিকা উপহার পাওয়া গিয়াছে; ক্রীত পুস্তকের সংখ্যা খুবই অল্প।

প্রতিষ্ঠা উৎসবে আমরা বহু পুস্তকাদি উপহার পাইয়াছি। উহার তালিকা এবং প্রদাতাগণের নাম যথাসময়ে পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

গ্রন্থাগার যাহাতে অধিকভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে সেজন্য নিয়মাবলী পরিবর্তন করিয়া কেবল গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য পৃথক শ্রেণীর সভ্য মনোনীত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ছাত্র সমাজের ইহাতে প্রভূত উপকার হইবে বলিয়া ভরসা করি।

বই বাঁধাইবার কাজ আরও দ্রুততর হওয়া উচিত। কিন্তু এ কাজেও অর্থাভাবের প্রশ্ন। পরিষদের একটি বিশিষ্ট সম্পদ উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সমাবেশ। কিন্তু বর্তমানে যে সকল সাময়িক পত্রাদি পরিষদে আসিতেছে সেগুলি যথাযথভাবে বাঁধাইয়া রাখিতে পারিতেছি না। এ জন্য ভবিষ্যৎ গবেষণার ক্ষেত্রে পাঠকদের ইহাতে বিশেষ অসুবিধা হইবে।

গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তকাদির মাঝে মাঝে হিসাব নিকাশ হওয়া প্রয়োজন। নানা কারণে এইরূপ হিসাব-নিকাশ অনেকদিন হয় নাই। আগামী পূজাবকাশের ঠিক পরেই কিছুদিন গ্রন্থাগার বন্ধ রাখিয়া হিসাব নির্ণয় করা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ধীরে ধীরে, সম্পূর্ণ গ্রন্থাগারের সকল পুস্তকাদির হিসাব-নিকাশ শেষ করিবার চেষ্টা করা হইবে।

পরিষৎ পত্রিকা ঃ গত বৎসর এই সময়ে ১৩৬৮ সালের পত্রিকা "ভারতের গ্রাম

জীবন" এই বিষয়ে প্রবন্ধ সম্বলিত বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়। এক্ষণে ১৩৬৬ সালের পত্রিকার তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা রবীন্দ্রসংখ্যা হিসাবে বিরাট আকারে প্রকাশিত হইতেছে এবং তাহা সদস্যগণের নিকট যথাশীঘ্র প্রেরিত হইবে। ১৩৬৭ সালের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে এবং বাকী সংখ্যাগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইতেছে। পত্রিকা প্রকাশের বিলম্বের জন্য সদস্যগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

ভারতকোষ: ভারতকোষের কার্যে পরিষদের সকল কর্মী বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়াছেন। আলোচ্যবর্ষে এই বিভাগের আর্থিক ব্যবস্থার জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সহিত বিশেষভাবে আলোচনা হয়। এই আলোচনায় পরিষদপক্ষে সভাপতি শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও পরিষদ সম্পাদক যোগদান করেন। সরকার হইতে ইহার ফলে ভারতকোষ প্রকাশের জন্য সাহায্যের পরিমাণ বর্ধিত হইয়া মোট ২,২৫০০০৲ দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা ধার্য হইয়াছে। এক্ষণে অধিকদিন যদি বেতন দিয়া এই বিভাগের কর্মচারী নিযুক্ত রাখিতে হয় তাহা হইলে নির্ধারিত অর্থের মধ্যে সকল কাজ সুসম্পন্ন করা কঠিন হইবে। অপর পক্ষে সরকার হইতে ইহাও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে এই বৎসরে ৩৩,০০০৲ টাকা পরিষদকে দান করার পর এবং প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পূর্বে আর কোন সাহায্য দান করা হইবে না। সেজন্য প্রথম খণ্ড প্রকাশের কাজ ত্বরান্বিত করিবার জন্য বিশেষ তৎপর হইতে হইয়াছে। সেই অনুসারে আমাদের কার্যপদ্ধতি পরিচালিত করা হইতেছে এবং আশা করা যায় যে শীঘ্রই প্রথম খণ্ড মুদ্রণের জন্য প্রেরিত হইবে।

কিছু অর্থসঞ্চয় করিবার জন্য কার্যনির্বাহক সমিতির অনুমতি অনুসারে ৫০০০ গ্রাহককে ৪০৲ টাকা দামে চার খণ্ড ভারতকোষ বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত স্থির হয়। সেই অনুসারে বিজ্ঞাপন দিবার ফলে ৫০০০ হইতে অনেক অধিক গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য আবেদন আসিয়াছে। তন্মধ্যে যাঁহারা মার্চ মাসের মধ্যে আবেদন করিয়াছেন তাঁহাদের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে এবং আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাঁহাদের ৪০৲ টাকা হিসাবে জমা দিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বাংলা দেশের কথা বাংলার বাহিরের অনেকের নিকট হইতে পরিষদের এই কোষগ্রন্থ প্রকাশের চেষ্টায় যে ভাবে আস্থা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা গৌরবের বিষয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় কয়েকজন সম্পাদক শ্রীসুশীলকুমার দে, শ্রীনির্মলকুমার বসু, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ভারতকোষ বিভাগের কার্য পরিচালনা করিতেছেন। তাহা ছাড়া বৈতনিক কর্মচারীগণের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে। শ্রীপুলিনবিহারী সেন নানা কারণে ভারতকোষের কার্যে নিযুক্ত থাকিতে পারেন নাই। সহকারী সম্পাদক শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় কিছু দিন কাজ করেন। এক্ষণে বর্গীকরণ বিভাগের কর্মী শ্রীকৃষ্ণময় ভটাচার্য অস্থায়ীভাবে ভারতকোষ বিভাগের কাজ করিতেছেন। তাহা ছাড়া বিজ্ঞান বিভাগের কাজ করিবার জন্য শ্রীঅলক চক্রবর্তীকে সহকারী হিসাবে ও শ্রীসুবিমল লাহিড়ীকে মুদ্রণ সহায়ক হিসাবে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

তাহা ছাড়া সম্পাদনা কার্যের সহায়তার জন্য সম্পাদনা সমিতি ডঃ শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়কে অন্যতম সম্পাদক হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। দৈনন্দিন কার্য পরিচালন উন্নততর এবং দ্রুততর করিবার জন্য শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, শ্রীনির্মলকুমার বসু ও পরিষদ সম্পাদককে লইয়া সম্পাদনা সমিতি একটি কার্যকরী উপ-সমিতি নিযুক্ত করিয়াছেন।

অনেক পণ্ডিত মহোদয়গণও দৈনন্দিন কার্যে কোন পদ গ্রহণ না করিয়াও নানাভাবে ভারতকোষের কার্যে সহায়তা করিতেছেন। তাঁহাদের পরিষদ পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিতেছি।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ঃ পরিষদের কার্য পরিচালনায় যাঁহাদের নিকট সাহায্য পাইয়াছি তাঁহাদের মধ্যে সভাপতি শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সকল সময়েই তাঁহার অমূল্য উপদেশ দিয়া আমাদের সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কেবল ভারতকোষ বিভাগ নহে পরিষদের সকল কার্যে সহায়তা করিয়া আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। শ্রীনির্মলকুমার বসু পরিষদের সকল সুখে দুঃখে আমাদের একজন বিশিষ্ট ধারক ও বাহক। কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও সহকারী সম্পাদক শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় ভারত-কোষের এবং অন্যান্য কাজে বহু সাহায্য করিয়া তাঁহাদের পরিষদের প্রতি গভীর অনুরাগের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের সকলকেই আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

উপসংহার ঃ পরিষদের সম্পাদকের কাজ আমার ন্যায় অপণ্ডিতের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। যে পদে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের ন্যায় পণ্ডিতপ্রবর আসীন ছিলেন সেই পদে কাজ করিতে সব সময়েই বিব্রত বোধ করি। তবে আত্মপ্রসাদ যে, বহু পণ্ডিত, গুণী ও জ্ঞানীর সঙ্গ-সুখ লাভ করিতেছি। আমার সাধ্যমত সেবায় যদি আপনারা সকলে বঙ্গ ভারতীর অর্চনার সুযোগ পান তাহা হইলেই পরম তৃপ্তি।

এই উপলক্ষে একটি কথা আপনাদের নিকট নিবেদন করিব। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গ-ভারতীর নানা বরপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের জন্মশত বার্ষিকী আমরা দুই বৎসর পূর্বে প্রতিপালন করিয়াছি।

১৩৬৯ সালের পৌষ মাসে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী। বাংলা দেশের এই বিরাট প্রতিভার প্রকৃত মূল্যায়ণ করা এই বিবরণীর মধ্যে বা আজিকার উৎসবে সম্ভব নহে। আমরা তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। সময়ান্তরে বিশেষ সভা আহ্বান করিয়া আমরা বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিব।

দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, মানকুমারী, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিসাধন মুখোপাধ্যায় সকলের জন্মশতবার্ষিকী এই বৎসর। এই সকল সাহিত্য-সাধকগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। ইঁহাদের মধ্যে ক্ষীরোদপ্রসাদ পরিষদের সূচনা হইতে সভ্য শ্রেণীভুক্ত ছিলেন এবং ১৩১১ সন হইতে আট বৎসর কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য এবং ১৩২৫ ও ১৩৩০ সালে অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। দ্বিজেন্দ্রলাল পরিষদের সহিত নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। পরিষদ মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন কবি স্ব-কণ্ঠে গাহিয়াছিলেন :

আজি গো তোমার চরণে, জননি ! আনিয়া অর্ঘ্য করি মা দান ;
ভক্তি-অশ্রু-সলিল-সিক্ত শতেক ভক্ত দীনের গান
মন্দির রচি মা তোমার লাগি, পয়সা কুড়ায়ে পথে পথে মাগি,
তোমাকে পূজিতে মিলেছি জননি, স্নেহের সরিতে করিয়া স্নান !
জননি বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি অমল-কমল-চরণে স্থান !

কবি মানকুমারী বসু পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত হন। কেদারনাথ ও হরিসাধন বহুদিন পরিষদের সাধারণ সদস্য হিসাবে যুক্ত ছিলেন।

শতবর্ষ পূর্বে বা তন্নিকটবর্তী সময়ে ভারতীর কি স্নেহ বাংলাদেশের উপর বর্ষিত হইয়াছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ তাহার কিছুকাল পরে জন্মগ্রহণ করে। আর ৩০ বৎসর পরে আমরা পরিষদের শতাব্দী উৎসব সমারোহের সহিত পালন করিব। বঙ্গভারতীর এক শ্রেষ্ঠ সন্তান বলিয়া রবীন্দ্রনাথ পরিষদকে লোক সমাজে পরিচিত করেন। ১৩১৫ সালে পরিষৎ মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তিনি বলেন :

"আমাদের দেশমাতাকে বহু পুত্রবতী হইতে হইবে। এই পুত্রদের কেহ বা দেশের জ্ঞানকে, কেহ বা দেশের ভাবকে, কেহ বা দেশের কর্মকে অনুবৃত্তি দান করিয়া তাহাকে উত্তরোত্তর পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবে। তাহারা নানা লোকের উদ্যমকে একস্থানে আকর্ষণ করিয়া লইবে, তাহারা নানা লোকের চেষ্টাকে একত্রে বাঁধিয়া চলিবে। তাহারা দেশের চিত্তকে নানা ব্যক্তির মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিবে এবং অনাগত কালের মধ্যে বহন করিয়া চলিবে, এমনি করিয়াই দেশের বন্ধ্যা অবস্থার সঙ্কীর্ণতা ঘুচিয়া যাইবে, সে জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে সকল দিকেই পরিপূর্ণ হইবে।

এইরূপ পুত্রের জন্য বঙ্গভূমির কামনা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে—পুত্রেষ্ঠী যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদকে আমি দেশমাতার এইরূপ একটি পুত্র বলিয়া অনুভব করিয়া অনেকদিন হইতে আনন্দ পাইতেছি।"

জানি না পরিষদ বঙ্গভারতীর পুত্রের স্বধর্ম কি পরিমাণে প্রতিপালন করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু ভরসা করি গঙ্গাযমুনা বিধৌত পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে কোন পুত্র স্বধর্ম হইতে বিচ্যুত হইবে না। বঙ্গভারতীর সেবা পরিষদের স্নেহশীল আশ্রয়ে ক্রমবর্ধমান ভাবে হইতে থাকিবে।

নমস্কার জ্ঞাপন : উপস্থিত সকলকে পুনরায় যথাযোগ্য শ্রদ্ধা, প্রীতি ও নমস্কার জানাইয়া এই কার্যবিবরণী শেষ করিলাম। আমার এই বিবরণী-মধ্যে যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হইয়া থাকে আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন।

নিবেদক

৭ ভাদ্র ১৩৭০

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ

সম্পাদক : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

পরমপূজনীয়া শ্রীমতী হেমলতা দেবী মহোদয়ার

একনবতিতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কলিকাতা আর্ট-সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত অর্ঘদান উৎসব

শ্রীমতী হেমলতা দেবীর ভাষণ—

আমার জীবনে আমি যা পেয়েছি, তা অনির্বচনীয়। মানুষ অনির্বচনীয়। শিশু অনির্বচনীয়। নারীদের মধ্যে আমি যা দেখেছি, তাও অনির্বচনীয়। নারীদের মধ্যে যে পতিভক্তি আমি দেখেছি, তার তুলনা হয় না।

ষোল বৎসর বয়সে আমার বিবাহ হয়। বিবাহের ৬।৭ বৎসর পরে আমার দাদাশ্বশুর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে ডেকে বললেন যে, "এই বৌমার ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার আছে। আপনি এঁকে দশটা উপনিষদ্ পড়ান।" আমি তিন বৎসর ধরে তাঁর কাছে উপনিষদ্ পড়েছি।

মানুষকে কি ভাবে ভালোবাসতে হয়, মানুষকে কি রকম স্নেহ করতে হয়, সে কথা দাদাশ্বশুর মহাশয়ের কাছে দেখেছি। আমার যখন বিবাহ হয়, তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিবারে ১১৬ জন লোক। এই বৃহৎ পরিবারে আমরা মানুষ হয়েছি। সেই জন্য বহুজনকে নিয়ে সংসার করার শিক্ষা পেয়েছি। মহর্ষিকে দেখেছি, বাড়ীর সরকার সামনে এলে তাঁকে চেয়ারে বসাতেন। বাড়ীর চাকরদের কি রকম আদর করতেন, তা বলে বোঝাতে পারবো না। সেই আদর দেখে আমার স্বামী[1] বলতেন—"এবার ম'রে কর্তাদাদার চাকর হবো।" এই ভাবেই আমাদের জীবনে শিক্ষা হয়েছে—ধর্মশিক্ষাও হয়েছে।

এই সৃষ্টিতে যা কিছু আছে, সব জিনিষের মধ্যে মূল বস্তু বর্তমান, সেটা হলো চৈতন্য। জগৎ চৈতন্যময়। এই চৈতন্যের কথাই উপনিষদে বলা হয়েছে। এই চৈতন্যটা কি, সেটা উপনিষদ্ থেকেই অনুভব করেছি এবং শিক্ষা পেয়েছি। রাজা রামমোহন রায় মূর্তিপূজার উপাসনা করতে বারণ করেছেন, এ কথা বলা ভুল। তিনি উপনিষদের এই সর্বব্যাপী চৈতন্যের উপাসনার কথাই বলেছেন। আমি দশ বৎসর বয়সে রাজা রামমোহন রায়ের

---

(১) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চারি পুত্র—দীপেন্দ্রনাথ, অরুণেন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ ও কৃতীন্দ্রনাথ। দীপেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া স্ত্রী হলেন হেমলতা দেবী। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে দীনেন্দ্রনাথের জন্ম। অরুণেন্দ্রনাথের পুত্র হলেন অজীন্দ্রনাথ এবং সুধীন্দ্রনাথের পুত্র হলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ।

কনিষ্ঠা পুত্রবধূ দ্রবময়ী দেবীর[২] কাছে ছিলাম। আমি দেখেছি, তিনি রাত্রি তিনটায় উঠে ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করতেন। আমি সেই সঙ্গে গায়ত্রী জপ করতে শিখেছি।

আমার ছোট কাকাকে লয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন বুদ্ধগয়ায় গিয়েছিলেন, সে সময় তিনি অতি প্রত্যূষে উঠে একা মন্দিরে যেতেন। আমি ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়[৩] একবার লুকিয়ে লুকিয়ে মন্দিরে ঢুকেছিলাম। বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধমূর্তিটা একটু উঁচুতে আছে। আমরা দেখি, কবি একদৃষ্টিতে সেই মূর্তির দিকে চেয়ে আছেন আর তাঁর দুই চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে। আমার মনে হলো, নিরাকারবাদী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথ—তিনি বুদ্ধমূর্তির দিকে চেয়ে এমন অভিভূত হয়েছেন কেন? বুদ্ধদেব মানুষকে ভালো বেসেছিলেন। কবিরও দেখছি, বুদ্ধদেবের উপর বিশেষ টান ছিল। মানুষকে তিনিও ভালো বাসতেন। নিজের কাপড়চোপড় নিজে কেচেছেন, চাকরকে দেন নি। জল খেতে হলে নিজে জল গড়িয়ে নিতেন—চাকরকে ডাকতেন না।

আমি শিশুদের মধ্যে বিশেষ করে অনির্বচনীয় ভাব দেখেছি। শান্তিনিকেতনে যখন ছিলুম, রাত্রে অনেক শিশু এসে আমার কাছে শুয়ে থাকতো। অনিমেষ[৪] রাত্রির খাবার খেয়েই চোখ রগড়িয়ে কাঁদতে সুরু করতো—আমার কাছে শোবে বলে। তারা একসঙ্গে দল বেঁধে আমার কাছে জড়ো হতো—আমার উপর তারা উপদ্রব করতো। সুধাকান্ত[৫] বল্‌তো—"তোরা বড়মাকে মেরে ফেল্‌বি।" কিন্তু আমি বলতাম—"ওরা আমার কাছেই থাক।" এই শিশুদের নিয়ে জীবনে খুব আনন্দ পেয়েছি এবং এখনও আমার জীবন তাদের মধ্যেই কাটছে। তাদের আমি কখনও কোন কাজে বাধা দেই নাই। ওরা যা করতে চায়, করতে দিই, তাতেই আমার আনন্দ।

ইউরোপ ভ্রমণকালে সেখানকার একজন পণ্ডিত বলেছিলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান যদি কোথাও থাকে, তা ভারতবর্ষেই উপনিষদের মধ্যেই আছে। আগে আমি মনে করতুম যে, মানুষকে ভালবাসার এই যে বাণী, সে কেবল হিন্দুদের মধ্যেই আছে। তার পর দেখেছি, যীশুখ্রীষ্টের

---

২ রাজা রামমোহন রায়ের দুই পুত্র—রাধাপ্রসাদ এবং রমাপ্রসাদ। রমাপ্রসাদ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা থেকে ১৬ বৎসরের ছোট ছিলেন। রমাপ্রসাদের স্ত্রী দ্রবময়ী দেবী। রাধাপ্রসাদের পুত্রসন্তান ছিল না—কন্যা চন্দ্রজ্যোতি দেবী। চন্দ্রজ্যোতির বিবাহ হয়—তাঁদের পুত্রসন্তান ললিতমোহন। ললিতমোহনের পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহিনীমোহন এবং ইঁহার তিন পুত্রের মধ্যে তপনমোহন কনিষ্ঠ। হেমলতা দেবী ললিতমোহনের কন্যা। ইনি অপুত্রক।

৩ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সে-কালের একজন নামকরা সাহিত্যিক—কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কবি গিরীন্দ্রনাথ বাগচি, লেখক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সমসাময়িক ও অন্তরঙ্গ বন্ধু।

৪ ব্যারিস্টার ও বক্তা শ্রীনীহারেন্দু দত্ত মজুমদার। শান্তিনিকেতনে শিশু অবস্থায় তার নাম ছিল অনিমেষ।

৫ শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী। শান্তিনিকেতনেই চিরকাল অধ্যয়ন করেছেন এবং সে স্থানেই বাস করেন। কবিগুরুর শেষ বয়সে ইনি তাঁর একান্তসচিব ছিলেন।

বাণীতে এই কথাও রয়েছে। মোহম্মদও সেই কথাই বলেছেন। শান্তিনিকেতনে আমার একটি মুসলমান ছেলে ছিল। তার কাছে আমি কোরান চেয়ে নিয়ে পড়েছি। মোহম্মদ বলেছেন যে, ক্রীতদাসদের মেরো না। তাঁর একজন শিষ্য বললে—"আমি ক্রীতদাসকে মাঠে চাষ করতে পাঠাই, সে চাষ না করে বসে থাকে। না মারলে এরা কাজ করে না। এদের কি করব।" মোহম্মদ বললেন, "সকালের এক সূর্য থেকে সন্ধ্যের আর এক সূর্য পর্যন্ত সত্তর হাজার বার ক্ষমা করবে।"

আমি যে চৈতন্যের কথা বলছিলাম, তা বৃহদারণ্যক উপনিষদে একটি আখ্যানে বেশ বুঝিয়ে বলা হয়েছে। ইন্দ্র একদিন দেখলেন, আকাশে আলোকমূর্তি এক পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। ইন্দ্র তখন অগ্নিকে বললেন—"জাতবেদা, তুমি গিয়ে জেনে এস—এই পুরুষ কে ?" সেই পুরুষ অগ্নিকে বললেন, "তোমার পরিচয় ?" অগ্নি বললেন, "আমি জাতবেদা—অগ্নি। আমার শক্তি, আমি সমস্ত জিনিস জালিয়ে পুড়িয়ে দিতে পারি।" সেই পুরুষ অগ্নির সামনে একটি তৃণ দিয়ে বললেন, "এটি জালাও তো দেখি।" অগ্নি অনেক চেষ্টা করেও সেই তৃণ জালাতে পারলেন না। অগ্নি তখন ফিরে গিয়ে ইন্দ্রকে সমস্ত কথা বললেন। ইন্দ্র তখন বায়ুকে বললেন, "মাতরিশ্বা. তুমি গিয়ে জেনে এস তো এই পুরুষ কে ?" বায়ু তাঁর কাছে গেলেন এবং তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বায়ুকে বললেন, "তোমার পরিচয় ?" বায়ু বললেন, "আমি মাতরিশ্বা—বায়ু। আমি ইচ্ছা করলে সমস্ত সৃষ্টি উড়িয়ে দিতে পারি।" সেই পুরুষ বায়ুর সামনে একটি তৃণ রেখে বললেন—"এই তৃণটিকে উড়াও দেখি।" বায়ু অনেক চেষ্টা করেও তৃণটিকে উড়াতে পারলেন না। তিনি ইন্দ্রের কাছে ফিরে গেলেন। তখন আকাশে উমা আবির্ভূতা হলেন। তিনি বললেন, "ইনি হচ্ছেন ব্রহ্ম—আমি তাঁর শক্তি। আমার শক্তিতে সকলে শক্তিমান্।" এই যে শক্তি, এই হচ্ছে চৈতন্যের শক্তি। এই চৈতন্যেই সমস্ত শক্তি ব্যাপ্ত হয়ে আছে। আমার জীবন দিয়ে এই কথাই আমি উপলব্ধি করেছি।

জন্মাবার সময় ভগবান্ আমার ভিতরে কি যে একটা যন্ত্র দিয়েছিলেন, যাতে করে সমস্ত মানুষের অনুভূতি আমার কাছে ধরা যায়। এই সৃষ্টির মধ্যেই চৈতন্যের ক্রিয়া চলছে, আমি যেন সেটা দেখতে পাই।

আজকে দেশের নানা রকমের উন্নতি হচ্ছে। আমার প্রার্থনা, লোকে যেন অন্ন-বস্ত্রের অভাব কেউ না পায়। লোকে যেন শিক্ষা পায়। শিক্ষার ব্যবস্থা একরকম হচ্ছে—অনেকটাই হয়েছে। কিন্তু অন্নবস্ত্রের দুঃখ এখনও যাচ্ছে না। আমি সকলের জন্য প্রার্থনা করি, লোকের এই অন্নবস্ত্রের কষ্ট দূর হোক। সকলে সুখী হোক, সকলের শ্রীবৃদ্ধি হোক, সকলে দীর্ঘজীবন লাভ করুক।

এই সম্বর্ধনা উপলক্ষে শ্রীমতী হেমলতা দেবীর রচিত কবিতা—

শেষ পুরস্কার

তুমি ভালোবাসো যারে দাও তারে শেষ পুরস্কার।
সে হয় তোমার আর তুমি হও যে তাহার॥
তুমি আমি দোঁহে থাকি ঊর্ধ্বপানে মেলে আঁখি,
স্থলে জলে ফুলে ফলে ভালোবাসা মাখামাখি।
ভালোবাসি পৌর্ণমাসি অমানিশি অন্ধকার—
কর পার কর পার।
মৃত্যুরে ভুলায়ে দাও জীবনে তুলিয়া নাও
অনন্ত জীবন পথ অন্তহীন অভিসার—
সে তোমার নিত্য পুরস্কার প্রভু নিত্য পুরস্কার॥
জগতে ছড়ায়ে আছো জীবনে জড়ায়ে আছো,
আমি তুমি আছে আছো বল বারংবার—
আনন্দ ঝংকার সে যে আনন্দ ঝংকার।
ভালোবাসি জগতেরে ফিরিতেছি দ্বারে দ্বারে
আমারে দিয়েছো তুমি জগতেরে উপহার—
সে তোমার শেষ পুরস্কার প্রভু শেষ পুরস্কার॥

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি ডাঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লিখিত ভাষণ—

পরমশ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী ঠাকুরাণী মহোদয়ার এক নবতিতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে, বঙ্গভাষিজনগণের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমরা তাঁহাকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন ও অভিনন্দন জানাইতেছি, এবং কামনা করিতেছি ও শ্রীভগবৎচরণে প্রার্থনা নিবেদন করিতেছি, যেন আমাদের পিতামহদের আকাঙ্ক্ষা "জীবেমঃ শরদঃ শতম্" তাঁহার পক্ষেও ফলবতী হয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সহিত অর্ধশতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া শ্রীহেমলতা দেবী এই আশ্রমের এক অচ্ছেদ্য অংশরূপে সংযুক্তা আছেন। আশ্রমের "বড়দাদা" দ্বিজেন্দ্রনাথ, আশ্রমের আচার্য "গুরুদেব" রবীন্দ্রনাথের মত, আশ্রমের "বড়মা"রূপে শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী ঠাকুরাণী আশ্রমের অন্তেবাসিগণের ও অন্য অধিবাসিগণের স্নেহময়ী মাতার স্থান পূরণ করিয়া, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শকে কার্যকর করিতে সহায়তা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার এই অতন্দ্র সেবায় আশ্রম বিশেষ ভাবে পুষ্টি লাভ করিয়াছে এবং রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে সহযোগিতা পাইয়া তাঁহার আরব্ধ

জাতীয়তার পোষক ও পরিবর্ধক এই শিক্ষাব্রত পরিচালনে সমর্থ হইয়াছেন। এই হেতু শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী ঠাকুরাণী সমগ্র বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতার পাত্রী।

আমরা তাঁহাকে আমাদের বিনীত নমস্কার জানাইতেছি, এবং তাঁহার নিরাময় ও শান্তিপূর্ণ অবস্থান কামনা করিতেছি। ইতি ১৩ই পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৭০। ২৯শে ডিসেম্বর, খ্রীষ্টাব্দ ১৯৬৩।

কৌলীন্য হিসাবে বাংলাভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হতে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের সম্পাদক শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ এবং আর একজন বিশিষ্ট সভ্য অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসু। শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ মহাশয় পরিষদের সভাপতি ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক লিখিত ভাষণটি পাঠ করার পূর্বে বলেন, "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠার সময় প্রতিষ্ঠাতারা ঠিক করেন—জীবিত কোনও ব্যক্তিকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে না। কিন্তু যাঁরা ঐ প্রস্তাব করেন, তাঁরাই কয়েক বৎসর পরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ৫০শতম বৎসর পূর্তি উপলক্ষে তাঁকে পরিষদের পক্ষ হতে সম্বর্ধিত করেন। তার পর আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে সম্বর্ধিত করা হয়। সুতরাং এটা আনন্দের এবং গৌরবের কথা যে, আজ রবীন্দ্রনাথের পরিবারস্থ একজন অতি সম্মাননীয়া মহিলাকে পরিষদ্ শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।"

শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুরের
বংশলতা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বর্ষ ৬৭ ॥ সংখ্যা ৩-৪

সূচীপত্র

প্রতি সংখ্যা দুই টাকা । বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা

পরিষদের সদস্য পক্ষে বিনামূল্যে প্রাপ্তব্য

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৬৭ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা
১৩৬৭

বিদ্যাসাগরের 'অপূর্ব্ব ইতিহাস'

শ্রীসুকুমার সেন

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই অজ্ঞাতপূর্ব পুস্তিকাটির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডের সাম্প্রতিক সংস্করণে দেওয়া গেছে। প্রস্তুত প্রবন্ধে বিস্তৃত পরিচয় দিচ্ছি।

পুস্তিকাটি ডিমাই আকারের, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫১। নামপত্রে 'অপূর্ব্ব ইতিহাস' ছাড়া কিছু নেই। মুদ্রাযন্ত্রের উল্লেখ নেই, প্রকাশকালেরও উল্লেখ নেই। তবে মূল রচনার শেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সই (অর্থাৎ নাম ছাপা) আছে, আর তারিখ আছে ১লা অগ্রহায়ণ ১২৯২ সাল। সুতরাং প্রকাশকাল ১২৯২ সালের অগ্রহায়ণ-পৌষের মধ্যেই হবে। মূল অংশটুকু, যাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সই আছে, তা ১ থেকে ৪৩ পৃষ্ঠা। বাকি পৃষ্ঠাগুলি পরিশিষ্ট। প্রথম পরিশিষ্ট (পৃ ৪৪) ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সই করা। দ্বিতীয় পরিশিষ্ট (পৃ ৪৫-৪৮) ইংরেজীতে লেখা ও রামশঙ্কর সেনের সই করা (তারিখ ২১ আগস্ট ১৮৮৫)। তৃতীয় পরিশিষ্টে (পৃ ৪৯) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিঠি (তারিখ ১২ ভাদ্র ১২৯২) এবং রামশঙ্কর সেন ও ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জবাব (তারিখ ৫ আশ্বিন ১২৯২)। চতুর্থ পরিশিষ্টে (পৃ ৫০-৫১) ছয়টি সংস্কৃত শ্লোক ও সেগুলির অনুবাদ। শ্লোকগুলি সবই বিশ্বাসঘাতকতা নিয়ে। দুটি শ্লোক পদ্যে অনূদিত, চারটি গদ্যে। পদ্যে অনুবাদের নমুনা মূলসহ—

পরিতোষয়িতা ন কশ্চন স্বগতো যস্য গুণোঽস্তি দেহিনঃ।
পরদোষকথাভিরল্পকঃ স্বজনং তোষয়িতুং স ইচ্ছতি॥

নাহি হেন কোন গুণ নিজের যাহার।
জনময়ে পরিতোষ যাহে সবাকার॥
সেই নীচ করি পরদোষের কীর্ত্তন।
স্বজনে তুষিতে সদা করে আকিঞ্চন॥

'অপূর্ব্ব ইতিহাস' পুস্তিকাটি আদালতের নথির মতো, বিচার-কমিশনের পূর্ণ রিপোর্টের মতো। মনে হয় বইটি আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে প্রচারের জন্য ছাপা হয়েছিল, বিক্রয়ের জন্য নয়। তাই রচনাটি এতকাল গুপ্ত রয়ে গেছে।

পুস্তিকাটির মূল অংশ তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত। শেষে বিদ্যাসাগরের সই আছে, যেন তাঁর এজাহার। সমস্ত ব্যাপারটা এতে উপস্থাপিত আছে। নামগুলি বাদ দিয়ে সারাংশ দিই—

কোন এক বিশেষ শিক্ষিত ভদ্রলোক মফস্বলের এক গভর্নমেণ্ট স্কুলে হেডমাস্টার ছিলেন।

তাঁর চাকরি যায়। তারপর বিদ্যাসাগরের এক বিশেষ পরিচিত ও স্নেহভাজন ব্যক্তিও— ইনিও গভর্নমেণ্টের শিক্ষাবিভাগে কাজ করতেন— বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করেন তাঁর বিদ্যালয়ে— মেট্রোপলিটান্ ইন্‌স্টিটিউশনে— চাকরি দিতে। বিদ্যাসাগর সে ব্যক্তিকে স্কুল বিভাগে নিযুক্ত করেন। কিন্তু সে ব্যক্তি স্কুল বিভাগে পড়াতে নারাজ হন, কলেজ বিভাগে নিযুক্তি চান। শীঘ্রই কলেজে চাকরি দিতে বিদ্যাসাগর রাজি হন। এই খবর শুনে বিদ্যাসাগরের কয়েকজন বন্ধু আপত্তি করেন। কলেজের কয়েকজন ছাত্র, যারা স্কুলে ঐ ব্যক্তি হেডমাস্টার থাকা কালে ছাত্র ছিল, তারা এসে বিদ্যাসাগরকে ব্যক্তিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে এবং তাঁর চাকরি যাওয়ার আসল কারণটিও বলে দেয়। তখন বিদ্যাসাগর তাঁকে চাকরিতে যোগ দিতে নিষেধ করেন। বিদ্যাসাগরের বিশেষ অনুগত এবং তাঁর ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধায়ক এক ব্যক্তির বিশিষ্ট আত্মীয় ছিলেন ওই চাকরিপ্রার্থী ভদ্রলোক। তাঁর চাকরি না হওয়ায় বিদ্যাসাগরের ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধায়ক তাঁর নামে কুৎসা রটনা করতে থাকেন। এই ব্যাপারে ঘোঁট পাকিয়ে তুলেছিলেন যিনি তিনি উভয় পক্ষেরই বন্ধু, নাম —চাঁদ মিত্র। —চাঁদ মিত্রের দ্বিমুখ কার্যকলাপে আর তাঁর ব্যবসায়-তত্ত্বাবধায়ক (সপুত্র) মহাশয়ের ব্যবহারে বিদ্যাসাগর উত্ত্যক্ত হয়ে উভয়পক্ষের বিশ্বাসভাজন দুই ব্যক্তিকে তাঁর নিজের দোষগুণ বিচারের ভার দেন। বিচারক দুজন হলেন রামশঙ্কর সেন ও ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগরের বিবৃতি ও বিচারকদের নিয়ে 'অপূর্ব্ব ইতিহাস'।

আরম্ভ এইরূপ৹—

অপূর্ব্ব ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

এক দিবস, শ্রীযুতবাবু —মুখোপাধ্যায় আমায় বলিলেন, আপনি, —চাঁদের নিকট, আমার বিষয়ে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা শুনিয়া, আমার মনে অতিশয় দুঃখ হইয়াছে। —চাঁদের মুখে শুনিয়া, আমার পুত্র —আমায় ঐ সংবাদ লিখিয়াছিল। আমি, তাহার কথায় নির্ভর না করিয়া, লিখিয়াছিলাম, —চাঁদকে বলিবে, সে, পত্র দ্বারা, ঐ সকল কথা লিখিয়া পাঠায়। তদনুসারে, —চাঁদ, পত্র দ্বারা, আমায় ঐ সকল কথা জানাইয়াছে।[১]

---

১. এ বিষয়ে একটি জনশ্রুতি উল্লিখিত হইতেছে।

—চাঁদবাবু, প্রথমতঃ, ঐরূপ পত্র লিখিয়া দিতে, কোনও মতে সম্মত হয়েন নাই; অবশেষে, —বাবুর ও —বাবুর সবিশেষ অনুরোধ বশতঃ, —গিয়া, —বাবুর সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের পর, তদীয় আদেশ অনুল্লঙ্ঘনীয় বিবেচনা করিয়া, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক, ঐ পত্র খানি লিখিয়া দিয়াছিলেন।

৹ প্রতিপক্ষদের নামগুলি ও তাঁদের নিবাসনাম ইচ্ছা করেই বাদ দিলুম।

এই সময়ে আমি অতিশয় অসুস্থ ছিলাম; এজন্য, —বাবুকে বলিলাম, এ অবস্থায়, আমি এরূপ অপ্রিয় বিষয়ের আলোচনা করিতে অক্ষম; অতএব, এক্ষণে আপনি ক্ষান্ত হউন; আমি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, এ বিষয়ের আলোচনা করা যাইবেক। পরে, আষাঢ় মাসে, তিনি, কলিকাতায় আসিয়া, ঐ বিষয় উপস্থিত করিলে, তাঁহাকে বলিলাম, দুইজন মধ্যস্থ রাখিয়া, তাঁহাদের সমক্ষে, এ বিষয়ের মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। আমার এরূপ প্রস্তাব করিবার উদ্দেশ্য এই যে, —বাবুর রীতি এই, কোনও বিষয়ে যেরূপ কথোপকথন হয়, অন্য লোকের নিকট, উহার প্রকৃতরূপে নির্দ্দেশ না করিয়া, সুবিধা মত বা আবশ্যক মত, প্রকারান্তরে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।[২] দুইজন ভদ্রলোকের সমক্ষে উপস্থিত বিষয়ের বিচার হইলে, উহার প্রকারান্তরে নির্দ্দেশ নিতান্ত সহজ হইবেক না, এবং অভ্যাসবশতঃ তাদৃশ নির্দ্দেশ করিলেও প্রতিবিধানের পথ থাকিবেক।

যাহা হউক, আমার এই প্রস্তাব অনুসারে, উভয়ের সম্মতিক্রমে, শ্রীযুত বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুত রায় রামশঙ্কর সেন বাহাদুর মধ্যস্থ স্থলে পরিগৃহীত হইলেন। অনন্তর, তাহারা উভয়ে ও —বাবু একদিন সন্ধ্যার পর, উপস্থিত হইলে, আমি মধ্যস্থ মহাশয়দিগকে বলিলাম, —চাঁদবাবু —বাবুকে, যে বিষয় উপলক্ষ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, তৎসংক্রান্ত পূর্ব্ববৃত্তান্ত অবগত না হইলে, আপনারা ঐ পত্রের মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিবেন না; এজন্য অগ্রে ঐ বৃত্তান্ত, আদ্যোপান্ত সংক্ষেপে আপনাদের গোচর করিতেছি।

বিদ্যাসাগরের বক্তব্যের শেষ অংশ (তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষ ভাগ) এইরূপ—

পরিশেষে বক্তব্য এই, আমি, —বাবুকে প্রকৃত ভদ্র ও যথার্থ আত্মীয় ভাবিয়া, পূর্ব্বাপর, সর্ব্ব বিষয়ে, তাঁহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া চলিয়াছি; আদ্যোপান্ত, তাঁহার সহিত সরল ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি; যাহাতে তাঁহার মনোরঞ্জন ও হিতসাধন হয়,

২. ইহার একটি অভিনব উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

আমার প্রার্থনা অনুসারে, একদিন, —বাবু —চাঁদবাবুর পত্রখানি আমায় পড়িতে দিলেন। আগ্রহপূর্ব্বক পড়িয়া, আদ্যোপান্ত মিথ্যা কথায় পরিপূর্ণ দেখিয়া, আমি, নিরতিশয় বিরক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক, পত্রখানি ফেলিয়া দিলাম। —বাবু পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম, ছিঁড়িবেন না, আমার নিকটে থাকুক; এই বলিয়া, আমি পত্রখানি লইয়া আমার নিকটে রাখিলাম।

দুই তিন দিন পরে, শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। —বাবু গল্প করিয়াছেন, আমি, —চাঁদবাবুর পত্র পড়িয়া, —বাবুকে বলিয়াছি, "আমার পেজেমি হয়েছে, আপনি আমায় ক্ষমা করুন; মানুষের কি পেজেমি হয় না", ইত্যাদি।

যথাশক্তি সে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যাহাতে আমি মর্ম্মান্তিক বেদনা পাই, উন্নতচিত্ত, উদারচরিত —বাবু, সর্ব্ব প্রযত্নে, সে চেষ্টা করিয়া থাকেন।[১]

এ স্থলে, ইহাও, স্পষ্টাক্ষরে, নির্দ্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক, সজ্জনচূড়ামণি —বাবু, পরোক্ষে যতই বিপক্ষতাচরণ করুন, সমক্ষে কিন্তু, নিতান্ত অমায়িক ভাবে, যার পর নাই, আত্মীয়তা-প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

সমস্ত বিষয়ের সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, —বাবু এক অতি অদ্ভুত প্রকৃতির অবতার। তদীয় অনুপমেয় প্রকৃতির যে প্রচুর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে আত্মাভিমান, পরচ্ছিদ্রান্বেষণ ও পরকীয়কুৎসাকীর্ত্তন তদীয় জীবনযাত্রার সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য; সৌজন্য, চক্ষুলজ্জা ও উচিতানুচিতবিবেচনা কাহাকে বলে, তাহা তিনি অবগত নহেন।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

কলিকাতা।
১লা অগ্রহায়ণ, ১২৯২ সাল।

ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রায় একপাতার মধ্যে। এটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি—

শ্রীযুক্তবাবু —চাঁদ মিত্র শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর উৎকট দোষারোপ করিয়া শ্রীযুক্তবাবু —মুখোপাধ্যায়কে যে পত্র লিখেন তদুপলক্ষে আমাদের সমক্ষে যে সমস্ত কথোপকথন হইয়াছিল তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইল, —চাঁদবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট —বাবুর যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় —চাঁদবাবুর নিকট —বাবুর নিন্দা করিয়াছেন তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। স্পষ্ট দৃষ্ট হইল বিদ্যাসাগর মহাশয় —বাবুর নিন্দা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার

---

১. —বাবু বড় সহজ লোক নহেন; আপনি, কিঞ্চিৎ সাবধান হইয়া, তাঁহার সহিত ব্যবহার করিবেন; বহু দিন পূর্ব্বে, অনেকে, এইরূপ বলিয়া, আমায় সতর্ক করিতেন। তদ্ভিন্ন, সময়ে সময়ে, অনেকের মুখে শুনিতে পাইতাম, —বাবু আমার বিলক্ষণ কুৎসাকীর্ত্তন করেন, এবং কেহ, কোনও বিষয় উপলক্ষে, তাঁহার সমক্ষে, আমার সুখ্যাতি করিলে, তিনি উপহাস ও টীকা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি ঐ সকল কথায় বিশ্বাস করিতাম না; মনে করিতাম, তাঁহারা, বিদ্বেষ বশতঃ, —বাবুর ঐরূপ দোষকীর্ত্তন করিতেছেন। ক্রমে ক্রমে, —বাবুর আচরণের বিশিষ্টরূপ পরিচয় পাইয়া, এক্ষণে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি, তাঁহারা যথার্থ আত্মীয়ের কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া, সাবধান হইয়া চলিলে, আমার এত লাঞ্ছনা-ভোগ হইত না। ফলকথা এই, —বাবুর ন্যায় সাধুবেশধারী অসাধুশিরোমণি সংসারে অত্যন্ত বিরল।

উপর দোষারোপ করিয়া —চাঁদবাবু পত্রে যে সকল কথা লিখিয়াছেন সে সমস্ত সম্পূর্ণ অলীক। আমরা —চাঁদবাবুর আচরণ দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। আক্রোশ বশতঃ বা অন্য কারণে কল্পিত দোষের আরোপ করিয়া কাহার অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত নৃশংস ব্যবহার।

শ্রীঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

রামশঙ্কর সেনের রায় ইংরেজীতে, চার পাতা। হাকিমের রায়ের মতো মামলার সার দেওয়া আছে। শেষ অনুচ্ছেদে এই—

On the whole we feel it our duty to express our regret at Babu—Mukherjea's calling upon Babu—chand to write to him, when he could have easily satisfied himself, sooner or later, by referring to the Pandit Vidyasagar himself in the matter, and we consider it extremely unbecoming on the part of Babu—chand to have, in response to that call, sent to Babu— an incorrect, and what appears to us, an unreliable statement of what passed between himself and the Pandit and his son-in-law Surya Babu in the course of a *confidential* conversation. It is abuse of confidence of this kind which leads to misunderstanding amongst friends. In the present instance it has been the cause of great unpleasantness···

Calcutta Ramsunker Sen

21*st August* 1885

তারপর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিঠি ও মধ্যস্থদের জবাব।

সাদরসম্ভাষণমাবেদনমিদম্

শ্রীযুত বাবু —মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত বাবু —চাঁদ মিত্র, ও আমি, আমরা তিন জনে, আপনাদের সমক্ষে, যে কথা যেরূপ বলিয়াছিলাম, এই পত্রে সে কথা সেইরূপ লিখিত হইয়াছে কি না, ইহা আপনারা লিপি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিলে, আমি সাতিশয় উপকৃত ও সবিশেষ অনুগৃহীত হইব ইতি। ১২ই ভাদ্র ১২৯২ সাল।

ভবদীয়স্য

শ্রীঈশ্বরচন্দ্রশর্ম্মণঃ

বহুপ্রণতিপুরঃসর নিবেদনমিদম্

আমাদিগকে, যে বিষয়ের মীমাংসার জন্য, আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহার সবিস্তার জানিবার জন্য, আপনি স্বয়ং ও শ্রীযুক্ত —মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত —চাঁদ মিত্র মহাশয়গণ, আমাদের সমক্ষে, উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে, যে যে কথা যেরূপ বলিয়াছিলেন, এই পত্রে সেই সকল কথা সেইরূপ লিখিত হইয়াছে ইতি। ৫ই আশ্বিন ১২৯২ বাং

অনুগত

শ্রীরামশঙ্কর সেন

শ্রীঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

চিঠিতে উল্লিখিত পত্র পুস্তিকাটিকে বোঝাচ্ছে।

বাংলায় জীমূতবাহনের কাহিনী

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

জীমূতবাহন রাজার আত্মদানবৃত্তান্ত সংস্কৃত-সাহিত্যরসিকদের নিকট সুপরিচিত। শ্রীহর্ষের নাগানন্দ নাটক, সোমদেবের কথাসরিৎসাগর, ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থে এই রাজার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।

বাংলাভাষায় এই কাহিনীর একটি স্বতন্ত্র রূপের সন্ধান সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানি পুথিতে (পুথি সংখ্যা ৮৯০) পাওয়া গিয়াছে। পুথির বর্ণনীয় বিষয়— 'জীবিত (জিবিত) বাহনরাজার উপাখ্যান'। এই জীবিতবাহন জীমূতবাহনের অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। উপাখ্যানের রচয়িতা শ্রীকবিশঙ্কর বা কবিচন্দ্র। একটি ভণিতায় (পত্র ৪ক) কবির নাম কবিকঙ্কণ রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। মহাভারতাদি গ্রন্থে (মহাভারত, বনপর্ব ১৯৭; আর্যশূরের জাতকমালা ২; Fausböll, *Jataka*, ৪৯৯ সংখ্যক শিবিরাজের আত্মোৎসর্গের যে বিভিন্ন কাহিনী বর্ণিত আছে তাহারই অনুরূপ একটি কাহিনী ইহাতে আছে। কাহিনীটি এইরূপ: একদিন অযোধ্যার রাজা জীমূতবাহন সভায় বসিয়া আছেন এমন সময় এক ঘুঘু পাখি আসিয়া রাজার আশ্রয়প্রার্থী হইল। সঙ্গে সঙ্গে এক সয়চান আসিয়া উপস্থিত হইল এবং রাজা তাহার খাদ্য লুকাইয়া রাখায় অনুযোগ করিল। ঘুঘুর বদলে রাজা তাহাকে অন্য জন্তুর মাংস বা ধনদৌলত দিতে চাহিলে সয়চান তাহাতে অসম্মত হয়। শেষ পর্যন্ত সয়চান রাজার নিজদেহের মাংস দাবি করে এবং জানায় যে রাজার স্ত্রীপুত্রকে অকাতরে এই মাংস কাটিয়া দিতে হইবে। রানীদের মধ্যে 'দুর্ভাগা রাজার নারী সোমদত্তের ঝি' এ বিষয়ে রাজাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলে রাজা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। স্নানপূজা করিয়া রাজা সকলের নিকট বিদায় লইলেন এবং পূর্বমুখে অজিন আসনে উপবিষ্ট হইলেন। এই সময়—

তনয় করিয়া সাথে করাত করিয়া হাথে
সমুখেতে রহে রাজরানি।
স্বামীর পদে ধরি প্রণাম দুঁহেতে করি
ডাণ্ডাইলা হয়্যা পুটপাণি॥ (১৪ ক)

রাজার নির্দেশে পুত্র রাজার গলায় রুদ্রাক্ষ ও তুলসীর মালা পরাইয়া দেয় এবং গঙ্গামাটি কপালে মাখাইয়া শিবনাম লিখিয়া দেয়। তারপর, মাতাপুত্রে সাবধানে মাংস কাটিতে থাকে। রাজার চক্ষে জল দেখিয়া সয়চান ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলে রাজা তাহাকে বুঝাইয়া বলেন—

বাম দক্ষিণ অঙ্গ দুহে সম এবে।
তার মধ্যে দক্ষিণাঙ্গ পায় ধর্মলাভ॥
আপনা নিন্দিয়া বাম চক্ষে পড়ে নীর॥ (১৫ক)

এদিকে যতই রাজার মাংস কাটা হয় কিছুতেই উহা ওজনে ঘুঘুর মাংসের সমান হয় না। রাজা বলিলেন—

ঘুঘুর সমান মাংস না হয় যাবৎ।
সর্বশরীরের মাংস কাটিবে তাবৎ॥ (১৫খ)

রানী চিন্তিত হইলেন— রাজার বুঝি প্রাণরক্ষা পায় না।

দুই হস্ত মুখ নাসা পৃষ্ঠমাত্রে আছে।
মলিন হইল মুখ রাজা নাহি বাঁচে॥ (১৫খ)

সয়চান তাড়া দিতে লাগিল—

ঝটিতি কাটহ মাংস কিবা কর মায়া।
প্রায় বুঝি পতি প্রতি তোর হইল দয়া॥
পুত্রের সমেত মাগি গেলি অধোগতি।
মনে কর পারা আর বাঁচাব পতি॥ (১৫খ)

রাজা বলিলেন—

যতক্ষণ শরীরেতে আছে মোর প্রাণ।
যতক্ষণ নাহি হয় ঘুঘুর সমান॥
কাটিতে শরীর মোর না করিহ হেলা।
সারাদিন কিবা কাট দুই এক চেলা॥ (১৬ক)

সকল শরীরের মাংস কাটা হইল— মাথা মাত্র বাকি। রাজপুত্র পিতার মাথা কাটিতে অসম্মত হইল।

অধোমুখ হইয়া মায় পোঞ কহে কথা।
কেমনে বাপের আমি কাটিব যে মাথা॥
যে বল সে বল মাগো ইহা না পারিব।
আপনা আপুনি নিজ তনু কাটি দিব॥ (১৬ক)

শেষ পর্যন্ত—

অশ্রুমুখী রাজরানী ধরিয়া করাত।
উচ্চস্বরে বারে বারে ডাকে ভূতনাথ॥
করাত বসাল্য কণ্ঠে মহারাজার শিরে।
বিদরিয়া যায় ছাতি ধরিবারে নারে॥ (১৭ক)
জননী বলেন বাছা কর রে সাহস।

ঠেকিল তোমার ঠাঞি যত অপযশ ॥
পুত্র বলে জননী ধর দৃঢ় করি।
চিড়িব বাপের মাথা যে করে শ্রীহরি ॥
মহেশে ভাবিয়া দুহে মাথে টান দিতে।
কৃপার ঠাকুর ধর্ম ধরিলেন হাথে ॥
মূর্ছিত হইয়া রাজা পড়িল ভূতলে।
নিরঞ্জন করিলেন ভূপতিরে কোলে ॥
আকাশে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ।
ধন্য ধন্য বলি ডাকে যত দেবগণ ॥
পক্ষ হাথ ধীরে ২ বুলাইল গায়।
সব ব্যথা দূর হোল হৈল্য পূর্বকায় ॥ (১৭খ)

পাখিরা ইতিমধ্যে অন্তর্হিত হইলে রাজা চক্ষু মেলিয়া শচীপতি ও ধর্মঠাকুরকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাদের পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন। দেবতাদ্বয় রাজার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে নিজ মূর্তি ধারণ করিতে অনুরোধ করিলে—

একান্তি দেখিয়া ভক্তি দেব নিরঞ্জন।
ধরিলেন নিজ মূর্ত্তি উলূকবাহন ॥
ঐরাবতে রহে ইন্দ্র শচীর ঠাকুর।
পদে পড়ি স্তুতি রাজা করিল প্রচুর ॥ (১৮ক)

অপর এক কাহিনীর মতে জীমূতবাহন, জীবিতবাহন, জিতবাহন বা জিতা ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত সূর্যপুত্র[১]। গৌণ আশ্বিন (মুখ্য ভাদ্র) মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে বাংলা ও বিহারের নানা স্থানে মহিলারা পুত্রের দীর্ঘজীবন কামনায় ইঁহার ব্রত পালন করিয়া থাকেন। বাংলা দেশে ইহা জিতাষ্টমী নামে পরিচিত। সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে ব্রতের যে বিধান বিভিন্ন গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে জীমূতবাহনকে শালিবাহন রাজার পুত্র বলা হইয়াছে। তবে ব্রতকথায় প্রদত্ত পরিচয় অনুসারে তিনি সূর্যপুত্র। সংস্কৃত ও বাংলায় ইঁহার অনেকগুলি ব্রতকথা পাওয়া যায়। গৌরীপ্রস্তার নামক অপরিচিত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বলিয়া উল্লিখিত বিহারে প্রচলিত সংস্কৃত ব্রতকথায়[২] জীমূতবাহনের কোনও জন্ম বিবরণ দেওয়া হয় নাই— কেবল ব্রতমাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে।

ভবিষ্যপুরাণান্তর্গত বলিয়া কথিত ব্রতকথা শরৎচন্দ্র শীল অ্যাণ্ড সন্‌স প্রকাশিত ব্রতমালা গ্রন্থে (পৃ. ২৪৯-৫৬) পাওয়া যায়। ইহাতে জীমূতবাহন সূর্যপুত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ শ্রীমুরারিমোহন মিশ্র রচিত কাঁথি নীহার প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত ভবিষ্যপুরাণোক্ত জিতাষ্টমী ব্রতকথা স্বতন্ত্র বস্তু— সংস্কৃত ব্রতকথার সহিত ইহার মিল নাই। ইহার কাহিনী অনুসারে সূর্যপুত্র জীমূতবাহন কথাসরিৎসাগর বর্ণিত

জীমূতবাহনের মত অপরের প্রতিনিধিরূপে গরুড়ের নিকট আত্মদেহ সমর্পণ করেন— কিন্তু গরুড় তাঁহাকে নাড়িতেও অসমর্থ হন।

এই সমস্ত মুদ্রিত গ্রন্থ ছাড়া অমুদ্রিত কিছু কিছু পুথিতেও জীমূতবাহন ও তাঁহার ব্রতের বিবরণ পাওয়া যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালায় সীতারাম দাসের জীবিতবাহন বা জীমূতবাহনের বন্দনার পুথির একটিমাত্র পাতা পাওয়া গিয়াছে (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৬৫।১৫১)। শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়ালের ব্যক্তিগত সংগ্রহে কবি নন্দরাম রচিত জিতবাহনের পাঁচালির একখানি পুথি আছে। পুথিখানির প্রাপ্তিস্থান মেদিনীপুর; পত্রসংখ্যা ১৩; লিপিকাল সন ১১৮৭ সাল। বীরভূম রতন লাইব্রেরিতে দ্বিজ হরিশ্চন্দ্র রচিত জিতাষ্টমীর পাঁচালি বা ব্রতকথার পুথির বিবরণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ' (দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, পৃ. ৪১) গ্রন্থে পাওয়া যায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় আলোচ্য জীমূতবাহন সম্পর্কে দুইখানি পুথি আছে। একখানি জিতাষ্টমী ব্রতকথা (পুথিসংখ্যা ৩৫৫০); ইহা গোপাল মৈত্রের আদেশে কায়স্থ কুলোদ্ভূত বিষ্ণুপুরবাসী মধুসূদন কর্তৃক রচিত। দ্বিতীয় জীমূতমঙ্গল (পুথিসংখ্যা ৬১০৪) দ্বিজ শম্ভুরাম মজুন্দার বিরচিত। ভঞ্জভূমের অধিপতি নারাজোলের মোহনলাল খান কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[৩] শম্ভুরামের গ্রন্থ প্রভুরামের গ্রন্থ অবলম্বনে প্রভুরামের আদেশে রচিত।[৪] ফুলোই গ্রামের পঞ্চানন পণ্ডিতও তাঁহাকে এই গ্রন্থ রচনার নির্দেশ দিয়াছিলেন (৩০খ, ১০১খ)। শম্ভুরাম 'গোবিন্দ ব্রাহ্মণ দ্বিজ প্রধান পণ্ডিত' রচিত 'ছড়াবন্দি' গ্রন্থেরও উল্লেখ করিয়াছেন (৭৮খ) এবং তাঁহার গ্রন্থের একস্থানে (১২০ক) কেনারামের ভণিতা পাওয়া যায়। শম্ভুরাম জীমূতবাহনের ব্রত ও কাহিনীর সহিত সূর্যপুরাণ, স্কন্দপুরাণ ও বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণের যোগের উল্লেখ করিয়াছেন।[৫] বস্তুতঃ শম্ভুরাম নানা গ্রন্থ দেখিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন (৪৩ক)।

শিক্ষিত বাঙালী সমাজে জীমূতবাহনের ব্রত ও কাহিনী অপরিচিত। তাই মধুসূদন ও শম্ভুরামের গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

মধুসূদনের ব্রতকথায় জীমূতবাহনের কাহিনী এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

হেমন্ত নগরে ধর্মশীল নামে রাজা ছিলেন। কায়স্থ কুলোদ্ভব 'বুদ্ধের পবিত্র' বিদ্যাধর তাঁহার প্রিয় পাত্র। পারিষদেরা এক একজনে ইন্দ্রতুল্য—

ধর্মশীল রাজা বড় ধর্মেতে তৎপর।
প্রতাপেতে ইন্দ্রতুল্য বুদ্ধের সাগর॥ (২খ)

একদিন রাজা পিতৃশ্রাদ্ধের তিথি সমীপবর্তী জানিয়া পাত্রকে দ্রব্যসম্ভার প্রস্তুত করিতে বলিলেন। পাত্র দেখিলেন— ভাণ্ডারে সমস্ত দ্রব্য আছে, একমাত্র তণ্ডুলের অভাব। তখন বর্ষাকাল— তাই পাত্র চিন্তিত হইলেন। রাজা সত্বর তণ্ডুল সংগ্রহের নির্দেশ দিলেন। স্থির হইল, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে যতটা চাল প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিবে তাহাকে ততটা 'ধান্য খুত্তা' দেওয়া হইবে। আর—

যে জন হইতে চালু শীঘ্র না হইব।
মস্তক ছেদন করি মার্গে শূলি দিব ॥ (৩খ)

শ্রীমতী নামে এক অনাথা দরিদ্রা ব্রাহ্মণী কিছু চাল প্রস্তুত করিয়া দিতে সম্মত হইল। তাহাকে 'দুই মাপ' ধান্য দেওয়া হইল। ব্রাহ্মণী সমস্ত ধান সিজাইলেন। এদিকে প্রবল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল—

মেঘেতে আচ্ছন্ন দেখি হৈল অন্ধকার।
সূর্যের কিরণ তবে নাই দেখি আর ॥ (৪খ)

এইরূপে দুইদিন গত হইল। ব্রাহ্মণী চিন্তিত ও ভীত হইয়া সূর্যকে স্তব করিতে লাগিলেন।

গলে বাস জোড়করে উচ্চস্বরে কয়।
অবলা সরলা জাতি কাতরা হৃদয় ॥
স্তুতি ভক্তি নাই জানি আমি নারীজাতি।
আলিঙ্গন করিব প্রভু তুমার সংহতি ॥ (৫ক)

ব্রাহ্মণীর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া সূর্যদেব প্রকাশিত হইলেন। ব্রাহ্মণী এই অবসরে ধান শুখাইয়া লইলেন। কিন্তু নিজ প্রতিশ্রুতির জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি রাত্রিকালে নিজ গৃহে সুন্দর শয্যা রচনা করিয়া অন্য গৃহে শয়ন করিলেন। এদিকে সূর্য আসিয়া ব্রাহ্মণীকে ডাকিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে না পাইয়া শয্যায় শয়ন করিলেন ও নিদ্রিত হইলেন। পরদিন প্রভাতে ঘর হইতে বাহির হইয়া সম্মুখে 'দিব্য চাঁপা নট্যা শাক' দেখিতে পাইলেন এবং তাহার উপর নিজ বীর্য স্থাপন করিয়া চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণী সেই সুন্দর শাক খাইয়া গর্ভবতী হইলেন। প্রসবকাল উপস্থিত হইলে নিঃসহায়া বিধবাকে সাহায্য করিবার জন্য সূর্য রাজাকে স্বপ্নাদেশ দিলেন—

শ্রীমতী ব্রাহ্মণী নামে নগরে বসতি।
আমার কৃপাতে সেই হৈল গর্ভবতী ॥
রূপের মাধুরী পুত্র হৈবে বিদ্যাবান্।
পালন করিবে তুমি হও সাবধান ॥ (৮ক)

রাজা আদেশ অনুসারে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পঞ্চম বৎসরে হাতে খড়ি দিয়া সেই পুত্রের পড়ার ব্যবস্থা করিলেন এবং তাহাকে পুত্রের অধিক যত্ন করিতে লাগিলেন। একদিন সেই শিশুপুত্র অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলা করিতেছিল। শিশুরা তাহাকে জারজ বলিয়া গালি দিলে সে মাতার নিকট হইতে পিতার নাম শুনিতে চাহে এবং পিতা সূর্যদেবের নিকটে যাইয়া অপবাদ খণ্ডনের অনুরোধ জানায়। সূর্য তাহাকে বর দিয়া বলিলেন—

আজি হইতে তব নাম জীবিতবাহন।
নরলোক তোমারে করিবে আরাধন ॥

নানা দ্রব্যে বিধিমতে করিবে অর্চনা।
পূজিবে সমস্ত নিশি সভে দিয়া থানা॥ (১০ক)

এই গ্রন্থের পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠায় জিতাষ্টমী ব্রতের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। শম্ভুরাম কৃত 'জীমূত-মঙ্গলে' জীমূতবাহনের বিস্তৃততর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। শম্ভুরামের মতে সূত সুরথরাজার নিকট জীমূতবাহনের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিলেন (২০ক)। এই কাহিনী অনুসারে কাঞ্চীপুরের রাজা বৃষধ্বজের রাজ্যে ধর্মশীল নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহাকে লোকে সুমন্ত বলিয়া ডাকিত। রাজা একদিন ব্রাহ্মণকে বহু ধন দান করিলেন এবং তাঁহার বিবাহের ব্যবস্থা করিবার জন্য ঘটক নিযুক্ত করিলেন। 'পৃথিবীর পূর্বদেশ পারিজাতপুরে' ধনপতি নামে এক সম্পন্ন ব্রাহ্মণের বার পুত্র ও সাত কন্যা। কন্যাদের মধ্যে অমলা বা লীলাবতীর সহিত ধর্মশীলের বিবাহ হইল। বিবাহের পরে জামাতার নিকট শাশুড়ির করুণ প্রার্থনা উল্লেখযোগ্য—

ভিক্ষা মাগি আমি এই শুন বাছাধন।
অমলাকে কভু না করিবে অন্য মন॥
আঠু ঢাকা বস্ত্র দিবে পেট ভর‍্যা ভাত।
শাশুড়ী হইয়া ধরে জামাতার হাত॥ (২৯খ-৩০ক)

বিবাহের পরে ধর্মশীল গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে যাইয়া ধর্মানুষ্ঠানরত কপিলমুনিকে ব্যঙ্গ করিতেন। একদিন কপিল যখন সূর্যকে অর্ঘ্যদান করিতেছিলেন সেই সময় ধর্মশীল

মুনি অগ্রে দাণ্ডাইয়া অঙ্গে হাত বুলাইয়া
দাড়ি নাড়ে মুচড়ে সকরে। (৩১ক)

ক্রুদ্ধ মুনির অভিশাপে ধর্মশীল ভস্মসাৎ হইলেন। অমলার করুণ বিলাপ ও আকুল প্রার্থনায় ব্যথিত হইয়া মুনি তাহাকে পুত্রবর দিলেন—

সূর্য অর্ঘ্যদানে তব স্বামী হৈল হত।
সূর্যবরে তব কোরে হইবেক সুত॥ (৩৩খ)

* * *

সঙ্গম হবেক নাই প্রকার অন্তরে।
মুনিবর বরভেদ প্রচার না করে॥
যেই শিশু জন্মিবেক তোমার গর্ভেতে।
সতীসুত সে হইব সূর্যের শুক্রেতে॥ (৩৪ক)

অতি দুঃখে অমলার দিন কাটিতে লাগিল।

কুথা মাতা কুথা পিতা কুথা কারে হেরি।
অমলা হইয়া বুলে নাছের ভিখারী॥ (৩৫ক)

রাজার পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে অমলা কিছু চাল তৈয়ারি করিয়া দিবার ভার পাইল। এদিকে সাতদিন অনবরত ঝড়বৃষ্টি হইতে লাগিল। বিপন্ন হইয়া অমলা সূর্যদেবের শরণাপন্ন হইল। এদিকে সূর্যদেবও সুযোগ বুঝিয়া ব্রাহ্মণের বেশে অমলার বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি ব্রাহ্মণীর প্রেমালিঙ্গন প্রার্থনা করিলে নিরুপায় ব্রাহ্মণী তাহাতে সম্মতি দিল। তখন—

আশয় পাইয়া দ্বিজ আপনার অঙ্গ নিজ
দ্বিধামূর্তি ধরিল সুরেন্দ্র।
এক মূর্তি অবনীতে আর মূর্তি আকাশেতে
যেন ক্রীড়া কৈল কৃষ্ণচন্দ্র॥

* * *

প্রচণ্ড এমনি হয় সকলে ব্যাপক নয়
ধূপে ধাপ ধরিল ধরণী।
কেবল রাণ্ডীর গৃহে সূর্য তেজ ধরি রহে
মুনিবর কার্য অনুমানি॥ (৩৯খ)

অমলা এই সুযোগে ধান শুখাইয়া চাল প্রস্তুত করিল এবং দ্বিজরূপী সূর্যকে পরে আসিতে বলিয়া তাড়াতাড়ি চাল জোগাইবার উদ্দেশ্যে রাজবাড়িতে গেল। এই দুর্যোগের মধ্যে চাল প্রস্তুত করিয়া দেওয়ায় সকলেই খুব সন্তুষ্ট হইল। এ দিকে পূর্ব কথানুসারে সূর্যদেব আসিয়া ব্রাহ্মণীকে পূর্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দিলে ব্রাহ্মণী পা ধুইবার ছলে রাজবাড়ি চলিয়া গেল। তাহার বিলম্ব দেখিয়া সূর্যদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং উঠানের শাকের উপর শুক্রপাত করিয়া চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণী বাড়ি ফিরিয়া সেই শাক রাঁধিয়া খাইল এবং গর্ভবতী হইল। ক্রমে রাজা তাহার গর্ভের কথা শুনিলেন এবং যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন। রাজার ক্রোধের খবর পাইয়া অমলা অত্যন্ত ভীত হইল এবং একাকিনী গৃহ ত্যাগ করিল। সূর্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছায়ই মনে হয় সে পূর্বদিকে মুখ করিয়া চলিতে লাগিল।

পৃথিবীর পূর্ব ধার পারিজাত গ্রাম।
সেই স্থানে সদা হয় সূর্যের বিরাম॥ (৫৩খ)

সূর্য পথে তাহাকে ব্রাহ্মণের বেশে দেখা দিলেন এবং নিজ পরিচয় দিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন। তার পর সুনন্দের রাজা চিত্রসেনের সুখ্যাত মন্ত্রী সুদেবের বাড়িতে আশ্রয় নিবার জন্য তাহাকে নির্দেশ দিলেন। সুদেব এইরূপ নারীকে আশ্রয় দিয়াছেন জানিয়া রাজা চিত্রসেন ক্ষুব্ধ হইলেন। এই প্রসঙ্গে চিত্রসেনের নিকট সুদেবের উক্তি সুদেব-চরিত্রের মহনীয়তার সাক্ষ্য দেয়—

সুদেব বলেন রায় শুন সুগোচরে।
যেই জন আমার শরণ লয় ডরে॥
প্রাণে মরি তাকে পারি নাই করি ত্যাগ।
ক্ষেম্যা মোরে ক্ষিতিপতি ক্ষেমা কর রাগ॥
ছোট লোক ছটপটে ছুট্যা যদি এসে।
ছোট ভাবি নাই তারে ছোটোর আদেশে॥ (৫৯ক)

অমলা যথাসময়ে পুত্র প্রসব করিল—সুদেব যথোচিত আনন্দ উৎসবের ব্যবস্থা করিলেন। ষষ্ঠ মাসে অন্নপ্রাশনের সময় সূর্যদেব ব্রাহ্মণবেশে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার পরামর্শ অনুসারে পুত্রের নাম হইল জীমূতবাহন।

প্রলয় জীমূত বাহে ঘন সমীরণ।
সেকালে হইল জন্ম শাকাভিলম্বন॥
তিমিরারি কহে তবে জানিয়া কারণ।
নরোত্তম নাম রেখ্য জীমূতবাহন॥ (৬৯ক-খ)

যথাসময়ে জীমূতবাহনের বিদ্যারম্ভ হইল এবং তিনি অল্পকালের মধ্যে নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। বন্ধুবান্ধবদের নিকট পিতৃপরিচয় দিতে না পারায় অপ্রস্তুত হইয়া তিনি মাতার নির্দেশে পিতার সন্ধানে পূর্বদিকে যাত্রা করেন এবং পিতা সূর্যের সহিত মিলিত হন। পিতা তাঁহাকে বর দেন ও পূজা প্রচারের জন্য উৎসাহিত করেন।

সূর্য কহে শুন সুত সবিশেষ কই।
জীবদাতা দেখি নাই আমি তোমা বই॥
জগতের যত জীবে জীবদান দিবে।
জগজন জীমূতবাহন বল্যা কবে॥

* * *

আর এক কথা তুমি শুনহ আমার। (৭৫খ)
যাহাতে জগতে হব পূজার প্রচার॥
কুবের উদ্যানে এক আছে সরোবর।
তথি এক বটবৃক্ষ অতি মনোহর।
সেই বট বৃক্ষে রবে হয়্যা অধিষ্ঠান।
যাহ অবনীতে বাপু জানিলে সন্ধান॥
কিবা নর কিবা নারী কিবা পক্ষযোনি।
কিবা পশু কিবা জন্তু যে বা ধরে প্রাণী॥
যে জীব করিব বাপু অপুত্রের খেদ।
বর দিবে বিচক্ষণ বুঝ্যা তার ভেদ॥

আর এক কহি তুমি করিবে সত্বরে।
অগ্রে পূজা লহ গিয়া এই পাত্রপুরে ॥
মগধ বলিয়া দেশ বড় ভয়ঙ্কর।
পশ্চাতে লইবে পূজা কর্যা পাঠান্তর ॥
মগধের রাজ্যাধিপ রাজেন্দ্র ভূপতি।
ঘটকর্প নামে চণ্ডী তথা অবস্থিতি ॥
সেই চণ্ডী ঘরে গিয়া হবে অধিষ্ঠান।
পূজার প্রচার কর্যা লইয়া সন্ধান।
একজনা আছে তথি লৌহ কর্মকার।
তাহা হৈতে কর গিয়া পূজার প্রচার ॥
সেই গ্রামে গণ্ডার সদত এক স্থিতি।
তাহার ভয়েতে কেহ না করে বসতি
পক্ষরাজ অশ্ব লহ ধনুর্বাণ হাতে।
খরসান খড়্গ লহ গণ্ডার মারিতে ॥ (৭৬ক-খ)

সূত একদিন সুরথ রাজাকে বলিলেন—দ্বাপরের শেষে কলির আদিভাগে মেধস নামক মুনির আশ্রমকাননে দেবগণ আগমন করিতেন। এক সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র শচীসহ সেখানে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাদের সম্মুখে চঞ্চলা চপলা নামে দুই বিদ্যাধরী সতত নৃত্য করিত। একদিন দুর্বাসা প্রভৃতি মুনিগণ উপস্থিত হইলে ইন্দ্র তাঁহাদিগের যথোচিত সংকার করিলেন। চঞ্চলা চপলা কামমোহিত হইয়া নৃত্যের তাল ভঙ্গ করিলে দুর্বাসা তাহাদিগকে শাপ দিলেন—'পশু পক্ষ হয়্যা জন্ম লভ দুই স্বসা' (৭৮ক)। ফলে—

চঞ্চলা লভিল জন্ম শৃগালী হইয়া।
চিল হয়্যা জন্ম নিল চপলা আসিয়া ॥ (৭৮খ)

কালক্রমে সন্তান না হওয়ায় 'শুকিনী শৃগালী' মনের খেদে 'সরোবরে মরিবারে যায়' (৭৯ক)। সরোবরতীরে বটবৃক্ষে জীমূতবাহন অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি তাহাদিগকে জীমূতবাহনের পূজা করিতে নির্দেশ দিয়া বলিলেন—

জীবহিংসা না করিবে দুহে নিরামিষ্য রবে
অতন্দ্রিত শুচি শুদ্ধ মনে। (৭৯খ)

জীমূতবাহনের নির্দেশে 'শুকিনী শৃগালী' মৃত্যু সংকল্প ত্যাগ করিয়া 'সেবে দেবে করিয়া নিয়ম।' লোভবশে শৃগালী নিয়মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া 'জলোকা কষ্কটী লয়্যা সুখে ভুঞ্জে সহোদরা লুকি' (৮০ক)। ব্রতভঙ্গের ফলে শৃগালীর পুত্রলাভ হইবে না বুঝিয়া দুইজনেই জলে ডুবিয়া মৃত্যু বরণ করিল। তখন—

শৃগালী শালুক হয় সুন্দি হইয়া গৃদ্ধী রয়
প্রফুল্ল কমল পানি পরে ॥ (৮০খ)

চিত্রসেন রাজার স্ত্রী চারুনেত্রা ও মন্ত্রী সুদেবের স্ত্রী চম্পাবতী দুই সখী। পুত্রলাভ না করায় তাহারাও সরোবরের জলে ডুবিয়া মরিতে যায়। তাহাদিগকেও দ্বিজবেশী জীমূতবাহন নিজের পূজার নির্দেশ দেন। তখন তাহারা সরোবরে স্নান করিতে যায় এবং সেই সুন্দি ও শালুক ফুল খাইয়া ক্ষুধা দূর করে। রানী নিজেকে বড় মনে করিয়া শালুক নেয় এবং মন্ত্রীর স্ত্রীকে সুন্দি দেয়। ঘরে ফিরিয়া রানী জীমূতের কথা ভুলিয়া যায়।

যথানিয়মে চম্পাবতী জীমূতবাহনের পূজা করিতে লাগিলেন— রাজরানী পূজার নির্দেশ উপেক্ষা করিলেন। কালক্রমে চম্পার সাতপুত্র জন্মগ্রহণ করিল। তাহাদিগকে দেখিয়া রানীর মনে হিংসা হইল এবং তিনি তাহাদিগকে মারিবার সংকল্প করিলেন। একদিন তাহারা যখন খেলা করিতেছিল তখন তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের হাত-পা কাটিয়া ফেলিলেন এবং আখের টুকরা বলিয়া তাড়াতাড়ি সখী চম্পাবতীর নিকট পাঠাইলেন। এদিকে জীমূতবাহনের বরে সাতপুত্র পুনর্জীবন লাভ করিল।[৬]

পরদিন শিশুগণকে খেলা করিতে দেখিয়া রানী বিস্মিত হইলেন। তাহাদিগকে ডাকিয়া আনাইয়া—

কাটি সবে নাক-কান দিব্য বনাইয়া পান পাঠাইল স'য়ের গোচরে ॥ (৮৭ক)

কিন্তু জীমূতবাহনের বরে সাতপুত্র তখন নিরাপদে মাতৃক্রোড়ে শোভা পাইতেছে। তৃতীয় দিন শিশুগণকে একটি ঘরের মধ্যে পুরিয়া সকলের মুণ্ড কাটিয়া তাল বলিয়া নিজেই সখীর নিকট লইয়া গেলেন। জীমূতবাহনের বরে জীবিত সাত ভাই রানীকে দেখিয়া কৌতুক করিল। চতুর্থ দিনে চর পাঠাইয়া শিশুগণকে ভুলাইয়া আনিয়া তাহাদিগকে ঢেঁকীর মুষলে কুটিয়া 'ক্ষপানাথমুখী খালে' ফেলিয়া নিজে তাহার উপর বসিয়া রহিলেন। এই ভক্তিহীনা, পুত্রকন্যাহীনা নারীকে কি করিয়া স্পর্শ করা যায়, এই চিন্তা করিয়া জীমূতবাহন কৈলাসে মহাদেবের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। জীমূতবাহনের নিকট সমস্ত কথা শুনিয়া শিব মর্ত্যে যাইতে সম্মত হইলেন। যোগীবেশে ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে শিব রাজার নিকট আসিয়া বলিলেন, আমি অনাহারী, তোমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলিয়া আমাকে ভিক্ষা দাও। আমার আশীর্বাদে জীমূতবাহন তোমাদের পুত্র দান করিবেন। দুইজনে যোগীকে ভিক্ষা দিতে গেলে সেই অবসরে জীমূতবাহন শিশুগণকে বাঁচাইয়া দিলেন। ভিক্ষা দিয়া তাড়াতাড়ি রানী গর্তের মুখ খুলিয়া দেখিলেন, কোথাও কিছুই নাই। ক্রুদ্ধা সর্পিণীর মত গর্জন করিয়া রানী গোঁসাঘরে প্রবেশ করিলেন। দাসীরা রাজাকে সংবাদ দিল। রাজা নানাভাবে রানীর মান ভাঙাইতে চেষ্টা করিলে রানী অবশেষে বলিলেন—

দ্বীপিচক্ষু দুটী যদি দেই পাত্র মোরে।
উভানির দুগ্ধ যদি দেখাইতে পারে ॥

তবে প্রাণ রাখি আমি কহিনু নিশ্চয়।
নাই দিলে নরপতি এই দেখা হয়॥ (৯৬খ-৯৭ক)

রাজা পাত্র সুদেবকে ঐ দুইটি বস্তু আনিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। সুদেব বাড়ি আসিয়া স্ত্রীকে সব কথা বলিলে স্ত্রী জীমূতবাহনের শরণ লইলেন। আকাশে দৈববাণী হইল যে, বনের ভিতর সেই সরোবরে গেলে বাঞ্ছিত বস্তু মিলিবে। পবনবেগে সেখানে গিয়া বাঞ্ছিত বস্তু আনিয়া চম্পাবতী স্বামীর হাতে দিলেন। পাত্র আসিয়া রানীকে সেই দুইটি বস্তু উপহার দিলে রানী মুখে হাসির ভাব দেখাইয়া অন্তরে জ্বলিয়া মরিলেন। ঈর্ষান্ধ রানী তখন সত্যবদ্ধ চম্পাবতীকে নিজের সঙ্গে ডুবাইয়া মারিবার সিদ্ধান্ত করিলেন। সখীর নিকট গিয়া কহিলেন, আমার ছেলে হইল না, চল দুজনে জলে ডুবিয়া মরি, যেহেতু আমরা উভয়ে সত্যবন্দী আছি। এই বলিয়া সখীকে লইয়া সেই শালুক ফোটা সরোবরের দিকে চলিলেন। পথে ব্রাহ্মণবেশী জীমূতবাহন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহারা ছেলে ফেলিয়া কোথায় চলিয়াছে। রানী বলিলেন, আমি নিঃসন্তান বলিয়াই ডুবিয়া মরিতে যাইতেছি। ব্রাহ্মণ বলিলেন, মিছামিছি মরিবে কেন, জীমূতবাহনের পূজা করিলেই তো পুত্রলাভ হইবে। তুমি অবিশ্বাস করিয়া অনাচার করিয়াছিলে বলিয়াই সন্তান লাভ কর নাই। জীমূতবাহনের উপদেশে রানী গলায় আঙুল দিয়া 'কক্টা' তুলিয়া লইলে শকুনি ও শৃগালী দুইটি প্রাণীই বাহির হইয়া আসিল। বিদ্যাধরী চপলা ও চঞ্চলা এতদিনে শাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে চলিয়া গেল। রাজারানী মন্দির তুলিয়া খুব জাঁকজমকের সহিত তিন বৎসর জীমূতবাহনের পূজা করিলেন। জীমূতবাহন তুষ্ট হইয়া তাঁহার ক্রোড়ে কন্দর্পতুল্য সাতটি পুত্র দান করিলেন।

সুরথ সুতের নিকট চারুনেত্রা ও চম্পাবতীর পরিচয় জানিতে চাহিলে মুনি বলিলেন যে, কাঞ্চীদেশে অনন্ত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার অনিন্দ্যসুন্দরী পত্নী কমলার গর্ভে যথাক্রমে চারুনেত্রা ও চম্পাবতীর জন্ম হয়। দুই বোন কুবেরের উদ্যান-সরোবরে নিত্য স্নান করিতে যায়। একদিন রাজা চিত্রসেন পাত্র সুদেবকে সঙ্গে লইয়া শিকার করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হন। কন্যাদ্বয়ের পরিচয় জানিয়া রাজা পাত্রসহ ব্রাহ্মণের বাড়ি গেলেন। ব্রাহ্মণকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করাইয়া নিজে চারুনেত্রাকে ও সুদেব চম্পাবতীকে বিবাহ করিলেন। এইখানেই প্রথম পালা সমাপ্ত। তারপর মগধের পালা (১১১ক-১৩০খ)।

একদিন সূর্যপুত্র চিন্তা করিলেন, পৃথিবীর সব লোক আমার পূজা করে, কিন্তু মগধের অধিপতি রাজেন্দ্র আমার পূজা করিল না। মগধেশ্বরের বিরুদ্ধে জীমূতবাহন যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিলে সহচর কিরণ বলিল, এই ক্ষুদ্রকে শাসন করিতে এত বৃহৎ শক্তি নিয়োগ করা কেন? আগে তাহাকে স্বপ্ন দাও, তারপর পূজা না করিলে বিহিত ব্যবস্থা করা যাইবে। এই কথায় রজনীর শেষভাগে জীমূতবাহন—

কালদণ্ড খড়্গ নিল কর্‌য়া করতলে॥
অশ্বপরে আসোয়ার অর্যমা সন্তান।
আরুণি অরুণাম্বুজ অনল নয়ান॥

এথা চুলে ধেয়্যা বুলে মারে তাল হাতে।
মাণিকমণ্ডিত শোভে মুকুট মাথাতে॥
অবনীতে আঠু পেত্যা অর্যমার স্থত।
শিয়রে বসিয়া স্বপ্ন দেখান অদ্ভুত॥ (১১২খ)

মগধদেশের ঈশান কোণে এক গভীর অরণ্যে ঘটকর্প চণ্ডী বিরাজ করেন। সেই বনের মধ্যে এক ভীষণ গণ্ডার বাস করে। তাহার খড়্গে কাহারও নিস্তার নাই। জীমূতবাহন চণ্ডিকাকে স্তবে তুষ্ট করিয়া এই বর প্রার্থনা করিলেন, 'আমার সমরে যেন খড়্গী পড়ে রণে।' তারপর সহচরগণকে সঙ্গে লইয়া পিতৃদত্ত খড়্গ হস্তে বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে এক ভাঙা কুঁড়েঘরে এক ভয়বিহ্বল বৃদ্ধকে দেখিতে পাইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে জানাইল যে, তাহার নাম 'বিধুজন', সে জাতিতে কর্মকার। দেশের রাজা তাহাকে বনের রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহার স্ত্রীপুত্র সকলকেই গণ্ডারে বিনাশ করিয়াছে। এই কথা বলিতে না বলিতে সেই 'বাউলে গণ্ডক' তাহার দলবলসহ সেখানে হাজির হইল।

এল্য সবে মহারবে অরণ্য হইতে।
ঝলকে ঝলকে অগ্নি নিকষে আঁখিতে॥
টস্ টস্ পড়ে রস খস্ খস্ মাটি।
দারুণ দাপটে এল্য দশদিগ লুটি॥ (১১৭ক)

জীমূতবাহন কিরণকে যুদ্ধের আদেশ দিলেন। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। সমস্ত দেবদেবী জীমূতবাহনের সহায়তা করিতে লাগিলেন। জীমূতবাহন প্রথমে গণ্ডারের শাবকের মুণ্ড ছিন্ন করিলেন। তারপর কালান্তক খড়্গে গণ্ডারের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিলেন। গণ্ডার একটু এদিক্-ওদিক্ করিয়াই মারা গেল। ভক্তিগদ্গদচিত্ত কর্মকার জীমূতবাহনের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে জীমূতবাহন স্বীয় পরিচয় দিলেন। কর্মকার কাঁদিয়া বলিল—

যাহা হৈতে অবনীতে নামের বিদিত।
ত্রিলোকের নাথ তাহে করিল বঞ্চিত॥
তিন স্থতে তীক্ষ্ণ শৃঙ্গে কর্যাছে সংহার।
কিবা দেখ কৃপানাথ কেহ নাহি আর॥ (১২২খ)

জীমূতবাহন জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাদের কোন দেহাবশেষ আছে কি? কর্মকার উল্লসিত হইয়া জীমূতবাহনকে শ্মশানে লইয়া চলিল। মাটি খুঁড়িয়া কঙ্কাল বাহির করিলে জীমূতবাহন—

স্থশীতল শতদল কর বুলাইয়া
সঞ্জীবনী মন্ত্র পড়ি দিল বাঁচাইয়া॥ (১২৩ক)

শ্মশানে যত কঙ্কাল ছিল, সবগুলিকেই জীমূতবাহন বাঁচাইয়া দিলেন। ব্যাপার দেখিয়া সকলে জীমূতবাহনের পায়ে লুটাইয়া পড়িল। কামার-কুটিরে উৎসবের রোল পড়িয়া গেল।

রাজার কোটাল রাজাকে গিয়া সব সংবাদ দিল। রাজা তখন স্বপ্ন সত্য এবং দেবতা জাগ্রত বুঝিতে পারিলেন। মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া রাজা সপারিষদ পদব্রজে কামার-কুটিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন সেখানে স্বর্ণমন্দিরে মহাধূমধামের সহিত কুলনারীরা এক দেবতার পূজা করিতেছে—

দিব্য রত্ন সিংহাসনে দেব বৈসে মধ্যখানে তুরঙ্গ কিরণ দুইপাশে। (১৩০ক)

রাজা গললগ্নীকৃতবাসে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। এইখানেই দ্বিতীয় পালার শেষ (১৩০খ)। এইবার জাগরণ পালা (১৩১ক-২১৬)—

একদিন কিরণ ও অরুণ দুইজনে জীমূতবাহনকে বলিল: সূর্যের বরে সুর-নরে তোমার পূজা করিলেও রাজা বীরসিংহ তোমার পূজা করিতেছে না। ইহার প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিয়া সূর্যপুত্র ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের সাহায্য লইতে মনস্থ করিলেন। প্রথমে শিব ও ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাদের কাছে অভীষ্ট পূরণের বর আদায় করিলেন। তারপর অশেষপ্রকারে নারায়ণের স্তব করিয়া বলিলেন, রাজা চিত্রসেন, বিশু কর্মকার প্রভৃতি আমার পূজা করিলেও সে পূজার প্রচার তেমন 'গরিষ্ঠ' নয়।

ব্রাহ্মণের ঘরে পূজা যেন করে রহে সদা অনুগত।
কামার কুমার চাষা পরিবার টাঠারি বণিক যত॥
কিবা তেলি শুঁড়ি নীচ জাতি হাড়ি সেবয়ে আনন্দ মনে।
ইহার বিধান কহ ভগবান্ যুকতি ভাবিয়া দীনে॥
—(১৩৪খ-১৩৫ক)

নারায়ণ বলিলেন, তুমি ছল করিয়া মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ কর, তখন সব ব্যবস্থা হইবে।

কাঞ্চন নগরাধিপতি বীরসিংহ সুপণ্ডিত সভাসদ্‌বর্গের সহিত সদালোচনা করিতেছেন, এমন সময় এক বৃদ্ধ ভিখারি ব্রাহ্মণের বেশে নারায়ণ রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। যথোচিত সংবর্ধনাসহকারে রাজা ব্রাহ্মণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ দ্ব্যর্থক ভাষায় আপন পরিচয় ও বার মাসের দুঃখ বর্ণনা করিলেন। রাজা তাঁহাকে প্রচুর ধনরত্ন দান করিতে উদ্যত হইলে ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'ধনধান্যে বাড় বাপু বাড় দুধে পুতে'। রাজা বিমর্ষ হইয়া বলিলেন যে, তাঁহার কোন সন্তান নাই। তখন অপুত্রক রাজার দান গ্রহণে ব্রাহ্মণ অসম্মত হইলেন—

পুত্রহীন লোকমুখ দরশনে পাপ।
তাতে তব দান লয়্যা বাড়াইব তাপ॥
বরঞ্চ বিদুর হই বনে বাস করি।
তথাচ তোমার হাতে দান নিতে ডরি॥ (১৪২ক)

ব্রাহ্মণের বাক্য রাজার বুকে শেলের মত বিঁধিল। সভাসদ্‌বর্গ নিরুত্তর। রাজা ব্রাহ্মণের পদতলে পড়িয়া বলিলেন যে, তিনি দান গ্রহণ না করিলে রাজার পরকালে গতি নাই। ভক্তবৎসল নারায়ণ অকস্মাৎ যুগল মূর্তিতে রাজার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। সভাসদ্‌বর্গসহ রাজা মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা চৈতন্যলাভ করিলে নারায়ণ বলিলেন, পুত্র না দেখিলে পিতৃপুরুষ অসন্তুষ্ট হন। তুমি পূষার উদ্দেশ্যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ কর।

রাজা মুনিগণকে ডাকিয়া যজ্ঞের কথা নিবেদন করিলে তাঁহারা তাঁহাকে লক্ষ মন ঘৃত ও তদনুযায়ী যজ্ঞকাষ্ঠাদি আহরণের উপদেশ দিলেন। রাজা গোপ ও গ্রহবিপ্রগণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। গোয়ালারা ঘৃত ও গ্রহবিপ্রেরা যজ্ঞকাষ্ঠাদি সংগ্রহে নিযুক্ত হইল। তারপর শুভদিনে শুভক্ষণে বিহিত নিয়ম অনুযায়ী ব্রহ্মাদি পূজা করিয়া তিন দিন আদিত্যের উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হইল। এমন সময় দৈববাণী হইল, 'রাজা, তুমি অবশ্যই পুত্রলাভ করিবে। তুমি একমনে জীমূতবাহনের পূজা কর। সুনন্দনগরের রাজা চিত্রসেনের নিকট তাঁহার পূজার পদ্ধতি মিলিবে।' পূর্ণাহুতি দিয়া পুরোহিত রাজাকে আশীর্বাদ করিলেন এবং রানী রমাপ্রিয়া যজ্ঞের চরু ভক্ষণ করিলেন।

সূর্য জীমূতবাহনকে বলিলেন, 'অংশরূপে জন্ম লভ রানীর গর্ভেতে'। জীমূতবাহন বলিলেন, আমি পুত্ররূপে জন্মিলে রাজা যদি আমার পূজা না করেন ?

সূর্য বলিলেন—

বীরসিংহ রাজা যদি না পূজে তোমারে।
যুদ্ধ ছলে যাবে চল্যা অরণ্য ভিতরে ॥
তত্ত্বকথা না কহিবে ত্যজি কলেবর।
ঐমনি আসিবে তুমি অমরনগর ॥
ভক্তিভাবে যদি সেবে হয়্যা একমনে।
পূর্ণরূপে দেখা দিবে রাজার ভবনে ॥ (১৫৫ক-খ)

রানী গর্ভবতী হইয়া যথাসময়ে পুত্র প্রসব করিলেন। শিশু দিন দিন শশিকলার মত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। ষষ্ঠ মাসে রাজা শিশুর নাম রাখিলেন মনোহর। মনোহর যখন পঞ্চম বর্ষের শিশু, তখন একদিন ক্রীড়াস্থলে এক প্রচণ্ড হস্তী আসিয়া তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

শুণ্ড ধর্যা মুণ্ড তার প্রচণ্ড হুতাশে।
মুচড়িয়া মনোহর মারে এক পাশে ॥ (১৫৭খ-১৫৮ক)

আরও একটি হস্তীর ঐরূপ দুর্দশা হইল। 'দশদিগ যোধা' দুইটি হস্তীর নিধনের সংবাদে রাজা মাহুতকে ধরিয়া আনাইলেন। মাহুত প্রাণভয়ে সব সত্য কথা প্রকাশ করিল। স্বপ্নের মত সকলে শিশুর কথা শুনিল। মন্ত্রী বীরবর অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন।

'আগামী জানিল পাত্র সুগামী সংবাদ'। দ্বাদশ বৎসর বয়সে একদিন মনোহর ঘোড়ায় চাপিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে কলিঙ্গ দেশে উপনীত হইল। সেখানে এক বনে একদল অশ্বকে চড়িতে দেখিয়া মনোহর ভাবিল—

জাতি গেলে যুক্তিবলে যায় পাওয়া জাতি।
হয় গুলা ছেড়্যা গেলে হইবে অখ্যাতি॥ (১৬২খ)

এইরূপ মনে করিয়া অশ্বগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া মনোহর নিজের গৃহের দিকে চালনা করিল। দীর্ঘদন্তা ও গজস্কন্ধ নামে দুইজন অশ্বরক্ষী ছুটিয়া আসিয়া আপত্তি জানাইল মনোহর 'ধনুকের হুলে' দীর্ঘদন্তাকে মারিয়া ফেলিলে গজস্কন্ধ প্রাণভয়ে কলিঙ্গরাজের নিকট ছুটিল। ক্রুদ্ধ কলিঙ্গরাজ অশ্ব-অন্বেষণে চতুর্দিকে অনুচর পাঠাইলেন। তাহারা নানাদেশ ঘুরিয়া অবশেষে কাঞ্চননগরে অশ্বের সন্ধান পাইল। তখন কলিঙ্গরাজ সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইলেন। সমরে অপ্রস্তুত মনোহরের নিকট হইতে কলিঙ্গরাজ সমস্ত অশ্ব কাড়িয়া লইলেন। গৃহে ফিরিয়া মনোহর বিমর্ষভাবে বসিয়া থাকিলে মন্ত্রী বীরবর তাহাকে নানা উপদেশে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া মনোহর প্রথমে 'তালবিঙ্ক'কে কলিঙ্গে পাঠাইয়া দিল। তালবিঙ্ক অপূর্ব মোহিনীর বেশ ধারণ করিয়া কলিঙ্গের সৈন্যসামন্তকে মজাইয়া রাখিল। সেই সুযোগে মনোহর চতুর্দল সেনা লইয়া কলিঙ্গ আক্রমণ করিল। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। শেষ অবধি কলিঙ্গরাজ পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন।

জীমূতবাহন পূজা পাইবার আশায় রাজার ঘরে জন্ম লইয়াছিলেন, কিন্তু রাজা পূজার নামও করেন না দেখিয়া একদিন রজনীর শেষভাগে মনোহর রণসাজে সজ্জিত হইয়া পিতামাতার নিকট বিদায় চাহিলে তাঁহারা ঘুমঘোরে 'যাহ' বলিয়া বিদায় দিলেন। বনপথ ধরিয়া হস্তী গণ্ডার ব্যাঘ্রাদি বিনাশ করিতে করিতে মনোহর এক পর্বতশিখরে উপনীত হইল। সেখানে তৃষ্ণায় কাতর হইয়া সরোবর খুঁজিতে লাগিল। দূরে এক জলাশয় দেখিতে পাইয়া একটি তমাল গাছে অশ্ব বাঁধিয়া অঞ্জলি পুরিয়া জল পান করিল। তারপর তমালগাছের তলায় শুইয়া পড়িল। সেই বৃক্ষতলে এক সর্পরাজ বাস করিত। সাপের সাড়া পাইয়া মনোহর খড়্গ ধরিয়া উহাকে কাটিতে গেলে সর্পরাজ ভয়ে পলাইয়া গেল। পরিশ্রান্ত মনোহর শীঘ্রই নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িল। বিনা অপরাধে বিবাদ করিবার জন্য সর্পরাজ মনসাকে সাতবার স্মরণ করিয়া মনোহরকে দংশন করিল। বিষ-জর্জর মনোহর ধীরে ধীরে প্রাণত্যাগ করিল।

এদিকে সারাদিন গেল, মনোহর ফিরিয়া আসিতেছে না দেখিয়া সকলে বিচলিত হইয়া পড়িল। চতুর্দিকে অমঙ্গল লক্ষণ দেখা দিতে লাগিল। পাত্র সৈন্যসামন্ত লইয়া মহানদী পার হইয়া বনে প্রবেশ করিলেন। সন্ত্রোমৃত জীবজন্তু ও অশ্বখুরের চিহ্ন ধরিয়া তাঁহারা মৃত মনোহরের সন্ধান পাইলেন এবং মনোহরের মৃতদেহ লইয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজপুরীতে ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল। রানী আত্মহত্যায় উদ্যত

হইলে ভক্তবৎসল নারায়ণ রাজারানীর সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। নারায়ণ বলিলেন, পুত্রের মৃত্যুর জন্য তোমাদের কর্মফলই দায়ী। পূর্বজন্মে সামান্য অপরাধে এক দ্বিজকন্যাকে হত্যার আদেশ দিয়াছিলে। ইহজন্মে সূর্যের নির্দেশ অমান্য করিয়া জীমূতবাহনের পূজা করিলে না।

পূর্বজন্মে সেই ভোগ ইহকালে এই যোগ বিষভাণ্ডে বিষ মিশাইলে।
বিষেকুথা বিষ দিলে মন্থনে অমৃত মিলে বুঝ রায় কর্ম অনুবলে॥ (২০২ক)

নারায়ণের বাক্যে বীরসিংহের চৈতন্যোদয় হইল। তিনি জীমূতবাহনের পূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন। জীমূতবাহনের মূর্তি ও পূজাপদ্ধতি যাজ্ঞা করিয়া তিনি সুনন্দনগরের রাজা চিত্রসেনকে পত্র লিখিলেন এবং জয়ধর সদাগরের মারফত উহা পাঠাইয়া দিলেন। সাত ডিঙা সাজাইয়া জয়ধর সুনন্দনগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। চাকদহ, হেত্যাগড়, কালীঘাট, হুসনপুর, গড়পোতা, চড়াইপুর, আঙ্গারপুর, উদ্ধবনগর, শাঁখারিপুর, মণ্ডলঘাট, নলিতাপুর, চণ্ডীপুর, মির্জাপুর, গুপ্তিপাড়া প্রভৃতি বহু স্থান অতিক্রম করিয়া সদাগর সুনন্দপুরে উপনীত হইল এবং প্রচুর ভেটসহ বীরসিংহের পত্রখানি চিত্রসেনের হস্তে অর্পণ করিল। চিত্রসেন অতিশয় আনন্দিত হইয়া জীমূতবাহনের প্রতিমা গড়াইলেন। প্রতিমার বর্ণনা এইরূপ—

আশোয়ার অশ্বপরে স্থাপন করিল সুরে ডাহিনে সোনার শ্বেতবান॥
কলধৌত কণ্ঠমালা ভুজে শোভে তাড়বালা বাহুমূলে অঙ্গদ বলয়া।
জিনি নীল গিরিখান পৃষ্ঠদেশে নম্রমান শিরোরুহ শোভিত লোলয়া॥
কানেতে কুণ্ডল দুলে রবি শশি যেন খেলে অর্দ্ধচন্দ্র ভালে কিবা শোভা।
স্বর্ণ যজ্ঞসূত্র গলে কপালে বিজুরী খেলে কোটি চন্দ্রসম রূপ আভা॥…
গজশিরে মুক্তাজোড়া মস্তকের পাগে বেড়া ঝলমল রবি দীপ্তমান॥
পরিধৌত নীলবাস তথি পরে শোভে বাস স্বর্ণরেখা দ্বিতীয়ার চাঁদ।…
—(২১২ক-খ)

প্রতিমা গড়াইয়া ও পূজার পদ্ধতি লেখাইয়া চিত্রসেন সদাগরের হস্তে দিলেন। সদাগর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে রাজা বীরসিংহ পরম ভক্তিসহকারে প্রতিমা গ্রহণ করিয়া বিপুল আড়ম্বরের সহিত দ্বাদশ বৎসর জীমূতবাহনের অর্চনা করিলেন। জীমূতবাহনের কৃপায় রাজা কীর্তিমান সাত পুত্র লাভ করিলেন।

টীকা

১. সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া নানা কাহিনী বাংলাদেশে প্রচলিত আছে (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৪০।১)। অষ্টলোকপাল ব্রতকথা বা সূর্য ব্রতকথার অনেকগুলি পুথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় আছে (২৮৬৭, ৩০৮৭, ৩১৩৩, ৩১৬০, ৩১৬৯, ৫২০১, ৫২২৪, ৬৫৪৩)। ব্রতকথা পুথিগুলিতে মোটামুটি একইভাবে পাওয়া যায়। ইহাতে বিদ্যাপতির

কন্যা জয়া-বিজয়ার সুখদুঃখময় জীবনের বর্ণনার মধ্য দিয়া সূর্যের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে সূর্যের সহিত বিশ্বকর্মার কন্যা সন্ধ্যার বিবাহ, পুত্রকন্যারূপে যম-যমুনার জন্ম, সন্ধ্যার প্রতিনিধি ছায়ার গর্ভে শনি ও অশ্বিনীরূপিণী সন্ধ্যার গর্ভে অশ্বিনীকুমারের জন্ম ও বিশ্বকর্মা কর্তৃক সূর্যের তেজ সংকোচ করার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। কথার রচয়িতা হিসাবে বিভিন্ন পুথিতে বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়—

গুণরাজ খানে বোলে দিনমণির দাস (৩১৬০।৫খ, ৩১৬৯।৩খ)
গুণরাজ খান ভণে রবির কিঙ্কর (৫২০১।১৩খ)
মালাধর বসু কহে আদিত্য কিঙ্কর (৩০৮৭।১১খ)
বিষ্ণুধর্মোত্তরে রচে দ্বিজ কালিদাস (২৮৬৭।৬খ)

ব্রতানুষ্ঠানের দিন মাঘ মাসের রবিবার— উপকরণ অষ্ট তণ্ডুল দূর্বা পনসপত্র।

রবিবারে অরুদয়ে শয্যাতে বসিয়াঁ।
কঠিনীর অষ্টরেখা মণ্ডলী করিঞা।
অষ্ট তণ্ডুলি করিয়া দূর্বা পনসপত্র লঞা॥ (৩১৩১।১খ)

২. কাশী হইতে প্রকাশিত রুদ্রধরের বর্ষকৃত্য গ্রন্থে (পৃ. ১৩২-৩৯) এই ব্রতকথা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ১৩০৬ বঙ্গাব্দে ইহা পুর্নিয়া খানাবাড়ির শ্রীমধুসূদন সিংহ স্বকৃত বাংলা পদ্যানুবাদসহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ভঞ্জভূম অধিপতি নারাজোলে অবস্থিতি
শ্রীযুত মোহনলাল খান।
না হবে এমন রাজা পুত্রসম পালে প্রজা
কি কহিব গুণের বাখান॥
তস্য রাজ্যে পোষ্য বাস পাথরায় বার মাস
রতনচকেতে নিকেতন।
দ্বিজ শম্ভুরাম গায় প্রণমি পণ্ডিত পায়
নির্বচিল জীমূতকীর্তন॥ (১৩১খ)। দ্রষ্টব্য ১২৫ক।

মোহনলাল খানের পিতা সীতারাম ও পিতামহ শোভারাম (১৭ক, ১৯ক)। শম্ভুরাম 'কংসার ধারে' সমৃদ্ধ পাথরা গ্রামের বিখ্যাত মজুন্দার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (৪২ক, ৫৫খ)।

জিতাষ্টমী ব্রতকথা গোবিন্দের গুণগাথা
প্রভুরামে বিরচিত গান।
সূর্যপুরাণেতে গায় ব্রাহ্মণী সপন পায়
সেই কথা অমৃত কাহিনী।
দ্বিজ শম্ভুরামে রটে রচিত প্রমাণ বটে
শুন সভে একমনে বাণী॥ (২০২ক)

সূর্যপুরাণের কথা প্রভুরামে ভাষে।
দ্বিজ শম্ভুরামে গায় তাহার আদেশে ॥ (২০৩ক)
প্রভুরাম কল্পতরু দ্বিতীয় দৈত্যের গুরু
প্রধান পণ্ডিত পুরাতন।
সূর্যপুরাণের কথা রচিয়াছে যেই প্রথা
বিরচিল সংক্ষেপে রচন ॥
সপনে আদেশ পেয়্যা ঠাই ঠাই তত্ত্ব লয়্যা
যুকতি সাধিয়া দ্বিজগণে।
পিপীলিকা মধুতরে যেমন সন্ধান করে
অনুবন্ধ করিনু তেমনে ॥ (১৩১খ)

৫. পূর্বের উদ্ধৃতিতে সূর্যপুরাণের সহিত যোগের উল্লেখ আছে।

লোমশ পৌলস্ত্য ঋষি দুহে সত্যকালে।
জিতাষ্টমী ব্রতকথা বিবরণ বলে ॥
স্কন্দপুরাণোক্ত আছে পদ্ধতিপ্রকাশ।
রচে দ্বিজ শম্ভুরাম পাইয়া আভাস ॥ (১৬০ক)
বৃহদ্ নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত পরাৎপর
লোমশ পৌলস্ত্য দুই ঋষি।
জিতাষ্টমী ব্রতকথা যেন অনুক্রমে যথা
বিবরণ কহিলেন বসি ॥ (৪০ক)
তস্ত পরে লোমশ পৌলস্ত্য দুই ঋষি।
বৃহন্নন্দিকেশ্বরে ব্রত উপবাসী ॥ (২১৫খ)

আশ্বিনেতে জিতাষ্টমী হৈলা উপনীত।
* * *
সপ্তমীতে আক্কিবুট ভিজায় যতনে।
স্ত্রীপুরুষে হবিষ্য করিলা দুই জনে ॥
অষ্টমীতে উপবাস করিল হরিষে।
নানা দ্রব্য আয়োজন করিল আওাসে ॥
* * *
সরোবর তুল্য এক করিল রচন।
সলিলেতে পরিপূর্ণ অতি বিলক্ষণ ॥
বটশাখা তদুপরি রোপণ করিল।
দিব্য বনমালা গলে অপূর্ব সাজাল্য ॥

হরিদ্রা কদলী ধান্ত দিলেন তাহাতে।
বিধিমতে করে পূজা হরষিত চিত্তে॥
দুয়ারে কদলী বৃক্ষ রোপণ করিল।
তদুপরি বনমালা আম্রশাখা দিল॥
দিব্য আলিপনা দিল করিয়া যতন।
বস্ত্রে আচ্ছাদন কৈলা অতি সুশোভন॥
শুক্ল পুষ্প লাল জবা দিয়া সাজাইল।
ধূপ দীপ নানা দ্রব্যে পূজা আরম্ভিল॥
সমুখে স্থাপিল ঘট দিয়া শুক্ল ধান।
তাহাতে রসাল শাখা ফল দিলা দান॥
ঘটের উপরে দিল সিন্দূরের বিন্দু।
সুশোভন হৈল অতি দেখিতে অনিন্দু॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য সাজায় রাশি রাশি।
কৃষ্ণপক্ষ সেই দিন অষ্টমীর নিশি॥
চতুর্দিকে বেষ্টিএ বসিল যত ব্রতী।
চারি বার পূজা করে জাগি সারারাতি॥
গলে বস্ত্র কৃতাঞ্জলি থাকে অনুক্ষণ।
এই মতে পূজা করে জীবিতবাহন॥
নানা বাদ্য বাজাইল করিয়া যতন।
ঢাকঢোল বাজে খোল আনন্দিত মন॥
গলে বস্ত্র ভূমি লুটি প্রণাম করিল।
সর্বশেষে প্রসাদ সর্বলোকে দিল॥

* * *

তদান্তরে সেই নিশি হৈল অবসান।
উদয়গিরিকে রবি করিল পয়ান॥

* * *

অরুণ উদয় কালে যত ব্রতিগণ।
প্রাতঃস্নান করিতে করিলা আগমন॥
তদন্তরে স্নান কৈলা দ্বিজের ব্রাহ্মণী।
আনন্দিতে ভাসাইল সিয়াল শকুনি॥
আনন্দের নাই ওর কি কহিব ভাষা।
ব্রতিগণ স্নান করে কামড়াএ শশা॥

স্নানান্তে ব্রাহ্মণী তবে ঘরেতে আইল।
আনন্দ হইএ মনে প্রসাদ লইল॥
একমনে যেই জন উপবাস করে।
পুত্রবতী হয় সতী লক্ষ্মী থাকে ঘরে॥
একমনে করে পূজা জীবিতবাহন।
অভিলাষ পূর্ণ হয় না যায় খণ্ডন।

(মধুসূদনের জিতাষ্টমী ব্রতকথা, ১৩ক-১৪ক)

শম্ভুরামের জীমূতমঙ্গলের বিবরণও এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইতে পারে—

ভাদ্রমাস কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমী দেখিয়া।
মৃত্তিকার মূর্ত্তি এক অশ্বে আরোপিয়া॥
খড়্গ ছুড়ি দিবে তায় ধনুর্বাণ হাতে।
অঙ্গদ বলয়া দিবে মুকুট মাথাতে॥
গভীর করিয়া গর্ত্ত করিবে খনন।
দেখিতে সুন্দর যেন হয় চারিকোণ॥
অখণ্ড কদলী তরু তার মধ্যে রূপি।
ব্রাহ্মণে স্থাপিব দেব বেদমন্ত্র জপি॥
পূর্বদিনে সপ্তমীতে অঙ্কুর ভিজাবে।
পায়স পিষ্টক আদি নারিকেল খাবে॥
অষ্টমীতে রামাগণ হবে ব্রতাচারী।
খড়িকার বৃন্তে কেহ খাবে নাই বারি॥
সেই দিনে শান্ত মনে সন্ধ্যার সময়।
জয়ধ্বনি দিয়া যাবে গোঠে নারীচয়॥
সেই নিশি তথায় বঞ্চিব সেই দিনে।
ব্রতকথা শুনিবেক আনন্দিত মনে॥
শেষে ভেব্যা দিনেশ বিশেষ কথা বলে।
শেষেতে বনাইয়া দিবে শুকিনী শৃগালে॥
পরিপাটি পূজার প্রচুর দ্রব্য ধর্য্যা।
করিবে কৌতুক মনে কোলাহল কর্য্যা॥ (জীমূতমঙ্গল, ৬০খ-৬১ক)

জীমূতবাহনের মূর্তির বিস্তৃততর বর্ণনা গ্রন্থশেষে (২১২খ) দ্রষ্টব্য। প্রচলিত সংস্কৃত পদ্ধতিগ্রন্থে দেবতার বর্ণনা পাওয়া যায় না। মধুসূদন সিংহ সংগৃহীত পদ্ধতিগ্রন্থে উল্লিখিত ধ্যান অনুসারে জীমূতবাহন শ্বেতবর্ণ দ্বিবাহু পীতাম্বরধারী (শ্বেতবর্ণং সুশান্তঞ্চ দিব্যদেহং দ্বিবাহুকম্। পীতাম্বরধরং দেবং ভক্তানুগ্রহকারকম্)।

এই ব্রত হয় যত ব্রতের উত্তম।
বচ্ছর তিনেক হয় অপুত্র নিয়ম॥
তিনমাস তিন পক্ষ তৃতীয় বচ্ছরে॥
অবশ্য কামনা পূরে সূর্যের কুণ্ডরে॥
ব্রত কর‍্যা ব্রতকথা করিবে শ্রবণ॥
যে যে মাসে পড়িবে শুনহ বিবরণ॥
ভাদ্র মাসে কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপদ্-আদি।
অষ্টাহ পড়িবে যথা পূজাসাঙ্গবিধি॥
শেষ দিনে বিশেষ হৈয়া একমন।
শুনিবে কৌতুক মনে কর‍্যা জাগরণ॥
তারপর কার্তিকার মাঘ মাস আদি।
বৈশাখে পড়িবে যথা অনুক্রম বিধি॥

* * *

শেষে সূর্যপূজা কর‍্যা হাতে পরে ডোর।
পতিসহ যুবতি সম্পদে হয় ভোর॥ (জীমূতমঙ্গল, ৬৯ক-খ)

শ্রীসুখময় সরকার তাঁহার বাল্যকালের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অবলম্বনে বাঁকুড়ায় অনুষ্ঠিত জিতাষ্টমীর এক বিবরণ দিয়াছেন (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৬১, পৃ. ৫২৯-৩০)। তিনি ইহাকে ইন্দ্রপূজার উৎসব বলিয়াছেন। তিনি জীমূতবাহনের যে মূর্তির বর্ণনা করিয়াছেন তাহা ইন্দ্রের মূর্তির মত। তিনি এই দিনকে নষ্টচন্দ্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কেন বুঝা যায় না।

১৮৭১-৭২ সালে প্রকাশিত বাংলার ক্ষত্রিয় সমাজের আচার-অনুষ্ঠান-বিষয়ক মহজ্জর-নামা নামক পুস্তকে ক্ষত্রিয়দের পক্ষে জিতবাহনের পূজানুষ্ঠান নিষিদ্ধ হইয়াছে। কারণ হিসাবে বলা হইয়াছে যে এই দেবতার পূজা নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত— ক্ষত্রিয়দের নিকট এই অনুষ্ঠানের নাম পর্যন্ত অজ্ঞাত। তবে অন্য জাতির বাড়িতে পূজা হইলে সেখানে পূজার দ্রব্য পাঠাইয়া দিতে কোন বাধা নাই (*Man in India*, ৪০ খণ্ড, ১৯৬০, পৃ. ১৩)।

৭. ইহার পরবর্তী অংশের সার সংকলন করিয়া দিয়াছেন শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল। ইহা ছাড়া তিনি মুরারি মিশ্র রচিত 'ভবিষ্যপুরাণোক্ত জিতাষ্টমী ব্রতকথা'র এক খণ্ড এই প্রবন্ধের জন্য ব্যবহার করিতে দিয়াছেন এবং নন্দরামের পুথির ও *Man in India* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের সন্ধান দিয়াছেন। এই সাহায্যের জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

পাতঞ্জল মহাভাষ্য : প্রত্যাহারাহ্নিক

বঙ্গানুবাদ

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

(পূর্বানুবৃত্তি)

বার্ত্তিক। ॥ * ॥ তস্য বিবৃতোপদেশাদন্যত্রাপি বিবৃতোপদেশঃ সবর্ণগ্রহণার্থঃ ॥ * ॥

ভাষ্যমূল। তস্যৈতস্যাক্ষরসমাম্নায়িকস্য বিবৃতোপদেশাদন্যত্রাপি বিবৃতোপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ ॥

কান্যত্র ?

ধাতুপ্রাতিপদিক প্রত্যয়নিপাতস্থস্য ॥

কিং প্রয়োজনম্ ?

সবর্ণগ্রহণার্থঃ। আক্ষর সমাম্নায়িকেনাস্য গ্রহণং যথা স্যাৎ ॥

কিং চ কারণং ন স্যাৎ ?

বিবারভেদাদেব ॥

ভাষ্যানুবাদ। অক্ষরসমাম্নায়ে পঠিত ('অ ই উ ণ্' সূত্রস্থ) এই সেই (অকারের) বিবৃতোপদেশ ছাড়া অন্যত্র (পঠিত অ-কারেরও) বিবৃতোপদেশ কর্ত্তব্য ॥

অন্যত্র কোন্ স্থলে (বর্ত্তমান অ-কারের বিবৃতোপদেশ কর্ত্তব্য) ?

ধাতু, প্রাতিপদিক, প্রত্যয় এবং নিপাতস্থিত (অ-কারেও বিবৃতোপদেশ কর্ত্তব্য)।

(ইহার) প্রয়োজন কি ?

সবর্ণগ্রহণই প্রয়োজন। অক্ষরসমাম্নায়ে পঠিত (অ-কারের) দ্বারা যাহাতে ইহার(ও) গ্রহণ হইতে পারে।

(অক্ষরসমাম্নায়ে পঠিত অ-কারের দ্বারা) কি কারণে (ধাতু-প্রাতিপদিক-প্রত্যয়-নিপাত-স্থিত অকারেরও গ্রহণ) হইবে না ?

বিবৃতপ্রযত্নভেদবশতঃই ॥

টিপ্পনী। বার্ত্তিককার এক্ষণে বলিতেছেন: শুধু অক্ষরসমাম্নায়ে পঠিত 'অ ই উ ণ্' সূত্রস্থ অ-কারের বিবৃতত্ব উপদেশ করিলেই চলিবে না। ধাতু, প্রাতিপদিক, প্রত্যয়, নিপাত প্রভৃতি যে যে স্থলে অ-কারের শ্রবণ হইয়া থাকে, সেই সেই স্থলে অ-কারের বিবৃতত্ব প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। কেননা, ধাতু প্রভৃতিস্থ অ-কার যদি সংবৃত-গুণযুক্তভাবে সূত্রকার কর্ত্তৃক উচ্চারিত হইয়া থাকে, তবে সেই সংবৃত গুণযুক্ত অ-কারের অচ্-কার্য্য সবর্ণ দীর্ঘত্ব প্রভৃতি হইতে পারে না। কেননা, অক্ষরসমাম্নায়ে পঠিত বিবৃত অ-কারের সহিত সংবৃত গুণযুক্ত অ-কারের প্রযত্নভেদবশত, সাবর্ণ্য অসিদ্ধ হওয়ায় সংবৃত অ-কারকে অচ্ প্রত্যাহারের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারা যায় না। সুতরাং ধাতু-প্রভৃতিস্থ সংবৃত

অ-কারের অচ্ত্ব অসিদ্ধ হওয়ায় অচ্সম্বন্ধিকার্য্যসকলও সেস্থলে হইতে পারে না। অতএব ধাতু-প্রভৃতিস্থ অ-কারেরও যাহাতে অচ্ সংজ্ঞা সিদ্ধ হইতে পারে, এবং সেই সঙ্গে অচ্সম্বন্ধিকার্য্যসমূহও সিদ্ধ হয়, তাহার জন্য ধাতু-প্রভৃতিস্থ অ-কারেরও বিবৃতত্ব প্রতিজ্ঞা অবশ্যকর্ত্তব্য। শুধু 'অ ই উ ণ্' সূত্রস্থ আক্ষরসমাম্নায়িক অ-কারের বিবৃতোপদেশ করিলেই চলিবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে: 'শমামষ্টানাং দীর্ঘঃ শ্যনি' (৭.৩.৭৪) এই সূত্রে শম্ প্রভৃতি আটটি ধাতুর (শমু, তমু, দমু, শ্রমু, ভ্রমু, ক্ষমু ক্লমু, মদী) শ্যন্‌বিকরণ পরে থাকিলে 'দীর্ঘ' বিধান করা হইয়াছে। এক্ষণে 'অচশ্চ' (১.২.২৮) এই পরিভাষাসূত্র অনুসারে যেখানে 'হ্রস্ব', 'দীর্ঘ' কিংবা 'প্লুত' শব্দ উচ্চারণ করিয়া কোনও আদেশ বিধান করা হইয়া থাকে, সেখানে সেই হ্রস্বাদি আদেশের স্থানী 'অচ্'ই কেবল হইতে পারে। এক্ষণে 'শমামষ্টানাং—' সূত্রে 'দীর্ঘঃ' এই পদ উচ্চারণ দীর্ঘস্বর আ-কারের আদেশ বিধান করা হইয়াছে। সুতরাং 'অচ্' প্রত্যাহারান্তর্গত অ-কারই কেবল ঐ দীর্ঘাদেশের স্থানী হইতে পারে। কিন্তু শম্ প্রভৃতি ধাতুস্থ অ-কার যদি সূত্রকার কর্ত্তৃক বিবৃত-গুণ-যুক্তভাবে উপদিষ্ট না হইয়া থাকে, তবে আক্ষরসমাম্নায়িক বিবৃত অ-কারের দ্বারা শম্ প্রভৃতি ধাতুস্থ সংবৃত অ-কারের গ্রহণ না হওয়ায়, শম্ প্রভৃতি ধাতুস্থ অ-কারের অচ্-প্রত্যাহারের মধ্যে অন্তর্ভাব হইতে পারে না। অতএব উহা 'অচ্' না হওয়ায় উহার স্থলে দীর্ঘাদেশ হইতে পারে না। সুতরাং 'শম্' প্রভৃতি ধাতুস্থ অ-কারের স্থলে যাহাতে দীর্ঘাদেশ হইতে পারে, তজ্জন্য উহার বিবৃতোপদেশ কর্ত্তব্য। তুলনীয়:

"**তস্যেতি**॥ যদা প্রত্যাহারে বিবৃতোঽকার উপদিষ্টস্তদা প্রযত্নভেদাত্তেন সংবৃতস্য অকারস্য গ্রহণাভাবাৎ অচ্কার্য্যং ন স্যাৎ ইতি তৎসিদ্ধয়ে সর্বস্য অকারস্য বৃবৃতত্বং কর্ত্তব্যম্ ইত্যর্থঃ। তেন 'শাম্যতি' ইত্যাদৌ দীর্ঘাদি সিধ্যতি॥"—কৈয়টঃ প্রদীপ।

"হ্রস্বমবর্ণং প্রয়োগে সংবৃতম্। দীর্ঘপ্লুতয়োস্তু বিবৃতত্বম্। তেষাং সাবর্ণ্য প্রসিদ্ধ্যর্থমকার ইহ শাস্ত্রে বিবৃতঃ প্রতিজ্ঞায়তে॥"—'অ ই উ ণ্' সূত্রস্থ কাশিকাবৃত্তির জিনেন্দ্রবুদ্ধিকৃত ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

"যদীহ—ইতি এতাবদেব উচ্যেত, তদা প্রত্যাসত্তেঃ, প্রকৃতত্বাচ্চ আক্ষরসমাম্নায়িক এব বিবৃতঃ প্রতিজ্ঞায়তে ইতি বিজ্ঞায়েত। ন ধাতুপ্রাতিপদিকপ্রত্যয়নিপাতস্থঃ। ততঃ প্রযত্নভেদাদসতি সাবর্ণ্যে অক্ষরসমাম্নায়িকেন তস্য অগ্রহণাৎ অচ্ত্বং ন স্যাৎ। তস্মিংশ্চাসতি শাম্যতীঅত্রাচ্ পরিভাষানুপস্থানাৎ স্থানিনোঽকারস্যাচ্ত্বাভাবাৎ 'শমাসষ্টাসং দীর্ঘঃ শ্যনি' (৭.৩.৭৪)— ইতি দীর্ঘত্বং ন স্যাৎ। দৃষদ্-ইত্যত্র প্রাতিপদিকস্য অন্ত উদাত্তো ভবতি— ইতি অন্তোদাত্তত্বং ন স্যাৎ, তস্যাজ্ধর্মত্বাৎ। নায়ক ইতি। অত্র প্রত্যয়স্যাকারস্যানচ্ত্বাৎ তত্রায়াদেশো ন স্যাৎ। অবনমতি— ইত্যত্র 'নিপাতা আদ্যুদাত্তাঃ' 'উপসর্গাশ্চাভিবর্জ্জম্' ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং ন স্যাৎ। কিঞ্চ অনুবৃত্তিনির্দ্দেশস্যেনাকারেণ অসতি সাবর্ণ্যে দীর্ঘস্য গ্রহণং ন স্যাৎ। তত্র কো দোষঃ? 'অস্য চ্চৌ' (৭.৪.৩২)— ইতীদৈব স্যাদীত্বং শুক্লীভবতীতি। মালীভবতীত্যত্র তু ন স্যাৎ। 'যস্যেতিচ' (৬.৪.১৪৮) ইতীদৈব স্যাদকারলোপঃ দাক্ষিঃ

প্রাক্কিরিতি। বালাকিরিত্যত্র তু ন স্যাৎ। তস্মাদ্ যাবৎ কিঞ্চিদবর্ণমাত্রমিহ শাস্ত্রে তস্য সর্বস্য বিবৃতত্বং প্রতিজ্ঞায়তে ইতি প্রদর্শনার্থং শাস্ত্রগ্রহণং কৃতম্ ॥"—কাশিকা-বিবরণ-পঞ্জিকা : ১ম ভাগ. পৃ. ৮-৯।

ভাষ্যমূল। আচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি— ভবত্যাক্ষরসমাম্নায়িকেন ধাত্বাদিস্থস্য গ্রহণমিতি। যদয়ম্ "অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ" ইতি প্রত্যাহারেঽকো গ্রহণং করোতি।

কথং কৃত্বা জ্ঞাপকম্ ?

ন হি দ্বয়োরাক্ষরসমাম্নায়িকযোর্যুগপৎ সমবস্থানমস্তি ॥

ভাষ্যানুবাদ। আচার্য্যের (অর্থাৎ সূত্রকারের) অনুশাসন (ইহাই) জ্ঞাপন করিতেছে (যে),— 'অক্ষর সমাম্নায়ে উপদিষ্ট (বিবৃত অ-কারের) দ্বারাই ধাতু-প্রভৃতিস্থ (সংবৃত অ-কারেরও) গ্রহণ হইয়া থাকে।'—যেহেতু উনি (অর্থাৎ আচার্য্য) "অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ" (৬. ১. ১০১) এই সূত্রে প্রত্যাহারগুলির মধ্যে (অন্যতম) 'অক্' (প্রত্যাহারটির) গ্রহণ করিয়াছেন ॥

কিরূপে ইহা জ্ঞাপক (হইতে পারে)?

যেহেতু, (একত্র প্রয়োগে) অক্ষর সমাম্নায়ে উপদিষ্ট দুইটি (বিবৃত অ-কারের) যুগপৎ সমবস্থিতি (বা একত্র অবস্থান সম্ভব) হইতে পারে না ॥

টিপ্পনী। পূর্বে একদেশী বলিয়াছেন যে, 'অ ই উ ণ্' সূত্রে যেমন সূত্রকার অ-কারের বিবৃতত্ব উপদেশ করিয়াছেন, সেইরূপ অষ্টাধ্যায়ীর সকল সূত্রেই ধাতু, প্রাতিপদিক, প্রত্যয়, নিপাত প্রভৃতিতে শ্রুত অ-কারেরও বিবৃতোপদেশ কর্তব্য। অন্যথা, ধাতু-প্রভৃতিতে শ্রুত অ-কারের সংবৃত প্রযত্ন হইলে উহার অচ্‌ত্ব সিদ্ধ হইবে না, এবং অচ্‌ত্ব সিদ্ধ না হইলে অচ্‌কার্য্যও সিদ্ধ হইবে না। নাগেশ তাঁহার 'উদ্দ্যোতে' বলিয়াছেন, একদেশীর এই পূর্ব্বোক্ত আপত্তি তাঁহার অজ্ঞানপ্রসূত। কেননা, সূত্রকার যেমন 'অ ই উ ণ' এই প্রত্যাহার সূত্রে অ-কারের বিবৃতত্ব প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সেইরূপ অষ্টাধ্যায়ীর সর্ব্বত্রই ধাতু প্রাতিপদিক-প্রত্যয় নিপাতাদিস্থিত অ-কারেরও তুল্যভাবে বিবৃতত্বপ্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ইহা শাস্ত্রান্তে 'অ অ' এই প্রত্যাপত্তি বিধানের দ্বারাই সূচিত হইয়াছে। তুলনীয় :

"প্রত্যাপত্ত্যা 'অ ই উ ণ্' ইত্যত্রেব প্রক্রিয়াদশায়াং সর্ব্বত্রাকারো বিবৃতঃ প্রতিজ্ঞাতঃ— ইতি অজ্ঞানঞ্ শঙ্কতে— ভাষ্যে তস্য বিবৃতোপদেশাদিতি ॥"— উদ্দ্যোত।

বর্তমান ভাষ্যেও 'যক্ষানুরূপো বলিঃ' এই ন্যায়ানুসারে একদেশীর শঙ্কাটি (অর্থাৎ সূত্রকার ধাতু প্রাতিপদিকাদিস্থ অ-কারের বিবৃতোপদেশ করেন নাই, সংবৃতোপদেশই করিয়াছেন) যথার্থ বলিয়া মানিয়া লইয়াই, একদেশী-প্রদর্শিত দোষের সমাধান করা হইয়াছে। সুতরাং বর্তমান ভাষ্যাংশটুকু সিদ্ধান্তভাষ্যরূপে মনে করা সমীচীন হইবে না। সেইজন্য 'ছায়া' টীকায় বলা হইয়াছে :

"যক্ষানুরূপ ইতি ন্যায়েন তস্যাতত্ত্বেঽপি তেন গ্রহণং জ্ঞাপকাৎ সিধ্যতি ইত্যাশয়েন একদেশী সমধিত্তে ॥"—ছায়া।

অতএব, বর্ত্তমান সমাধানও একদেশী-সমাধান মাত্র।

একদেশী-সমাধানে পূর্ব্বোক্ত শঙ্কার নিম্নোক্ত ভাবে সমাধান করা হইয়াছে : যদিও ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে সূত্রকার কেবলমাত্র 'অ ই উ ণ্' সূত্রেই অ-কারের বিবৃতত্ব প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, অষ্টাধ্যায়ীসূত্রসমূহে পঠিত ধাতু প্রাতিপদিকাদিতে শ্রুত অ-কারের বিবৃতোপদেশ করেন নাই, সংবৃতোপদেশই করিয়াছেন, তথাপি 'অ ই উ ণ্' সূত্রস্থ বিবৃত অ-কারের দ্বারা ধাত্বাদিস্থ সংবৃত অ-কারেরও গ্রহণ হইবে, এবং বিবৃত অ-কারের ন্যায় সংবৃত অ-কারেরও অচ্‌ত্ব সিদ্ধ হইবে এবং অচ্‌কার্যও সিদ্ধ হইবে। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, প্রযত্নভেদ সত্ত্বেও কি করিয়া 'অ ই উ ণ্' সূত্রস্থ বিবৃত অ-কারের দ্বারা ধাত্বাদিস্থ সংবৃত অ-কারের গ্রহণ হইতে পারে, এবং কি করিয়াই বা তাহার অচ্‌ত্ব সিদ্ধ হইতে পারে?— তাহা হইলে সেই প্রশ্নের উত্তর এই যে, সূত্রকার 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘ (৬.১. ১০১) সবর্ণ দীর্ঘ বিধায়ক এই সূত্রে 'অক্' এই প্রত্যাহার গ্রহণের দ্বারাই স্পষ্টভাবে জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, অ ই উ ণ্' সূত্রস্থ বিবৃত অ-কারের দ্বারাই ধাত্বাদিস্থ সংবৃত অ-কারেরও গ্রহণ হইয়া থাকে। এই উত্তরের তাৎপর্য্য নিম্নে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হইল : 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' সূত্রে 'অক্' এই প্রত্যাহারের অ-কারের উত্তর 'ক'-কার যোজনার দ্বারা ইহা স্পষ্টই সূচিত হইতেছে যে, এই অ-কারটি 'অ ই উ ণ্' সূত্রস্থ বিবৃত অ-কার। সুতরাং 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' সূত্রটির অর্থ এই হইবে যে, বিবৃত অ-কার, ই-কার, উ-কার, ঋ-কার এবং ঌ-কারের অব্যবহিত পরে যদি উহাদের কোনও সবর্ণ থাকে, তবে উভয়ের স্থলে দীর্ঘ একাদেশ হইবে। বিবৃত অ-কারের সবর্ণ শুধু বিবৃত অ-কারই হইতে পারে, সংবৃত অ-কার নহে। কিন্তু একই প্রয়োগে পূর্ব্ব ও পর দুইটি অ-কারই যুগপৎ বিবৃত হইতে পারে না। কেননা পূর্ব্বেই ভাষ্যে বলা হইয়াছে যে, লোকে কিংবা বেদে কোনও স্থলেই বিবৃত অ-কার প্রসিদ্ধ নাই। সুতরাং প্রয়োগে যখন বিবৃত অ-কারের একান্তই অভাব, ফলে দুইটি অত্যন্ত সন্নিকৃষ্ট অব্যবহিত পূর্ব্বাপরভাববিশিষ্ট অ-কারের একত্র সমবস্থান যখন প্রয়োগে একান্তই অসম্ভব, তখন সূত্রকার কর্তৃক 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' সূত্রে পূর্ব্বাপরভাববিশিষ্ট বিবৃত অ-কারদ্বয়ের স্থলে দীর্ঘ একাদেশ বিধান নিতান্তই ব্যর্থ। অ-কারকে বাদ দিয়া 'ইকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ'— এইরূপ সূত্র প্রণয়ন করিয়া ইকারাদি সম্বন্ধে দীর্ঘাদেশ বিধান করাই সূত্রকারের পক্ষে সমীচীন হইত। কিন্তু সূত্রটি তো একেবারেই ব্যর্থ হইতে পারে না। মহাভাষ্যকার বলিয়াছেন—"তত্র একেনাপি বর্ণেন অনর্থকেন ন ভাব্যম্, কিং পুন রিয়তা সূত্রেণ।" সুতরাং 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ'— এইরূপ সূত্র প্রণয়নের দ্বারা 'অক্' প্রত্যাহারান্তর্ব্বর্তী বুঝিতে হইবে। বিবৃত অ-কারদ্বয়ের স্থানে দীর্ঘাদেশ বিধানকরতঃ সূত্রকার ইহাই জ্ঞাপন করিতেছেন যে, বিবৃত অ-কারের উচ্চারণের দ্বারা সংবৃত অ-কারেরও গ্রহণ হইয়া থাকে। নতুবা, বিবৃত অ-কারের দ্বারা ধাত্বাদিস্থিত (প্রয়োগে) সংবৃত অ-কারের গ্রহণ হইলে, 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ'—এইরূপ অ-কার সম্বন্ধে দীর্ঘাদেশ বিধান ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

দ্রষ্টব্য : যদয়মিতি ॥ অত্র হি ক-কারেণ চিহ্নেন প্রত্যাহারস্থো বিবৃতো নির্দিষ্টঃ। তেন চ সংবৃতস্যাগ্রহণে 'ইকঃ সবর্ণে' ইতি বক্তব্যম্ ॥ প্রদীপ।

"ভাষ্যে যুগপৎ সমবস্থানমিতি। অন্য প্রয়োগে ইত্যাদিঃ ॥ উদ্দ্যোত।

"'প্রয়োগে' ইতি। একত্রেত্যাদিঃ।"— ছায়া।

ভাষ্যমূল। নৈতদস্তি জ্ঞাপকম্। অস্তি হ্যন্যদেতস্য বচনে প্রয়োজনম্। কিম্? যস্যাক্ষর সমাম্নায়িকেন গ্রহণমস্তি, তদর্থমেতৎ স্যাৎ-খট্বাঢ়কম্, মালাঢ়কমিতি। সতি প্রয়োজনে ন জ্ঞাপকং ভবতি। তস্মাদ্ বিবৃতোপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ ॥

ভাষ্যানুবাদ। ইহা (অর্থাৎ 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' সূত্রে অক্ প্রত্যাহার গ্রহণ) জ্ঞাপক হইতে পারে না। কেন না, (সূত্রে অক্ প্রত্যাহার) গ্রহণের অন্য প্রয়োজন আছে ॥

কি (প্রয়োজন) ?

(সূত্রে 'অক্'-প্রত্যাহারান্তর্ব্বর্ত্তী) অক্ষরসমাম্নায়ে পঠিত (বিবৃত অ-কারের দ্বারা যে (সবর্ণের) গ্রহণ হইয়া থাকে, সেই (সবর্ণ পরে থাকিলে পূর্ব ও পর উভয়ের স্থানে দীর্ঘ একাদেশ বিধানের) জন্য (সূত্রে অক্-প্রত্যাহারে বিবৃত অ-কারের গ্রহণ করা) হইয়াছে। (যথা,) 'খট্বাঽঢ়কম্' 'মালাঽঢ়কম্'। (সূত্রের) প্রয়োজন থাকিলে, (তাহা) জ্ঞাপক হইতে পারে না। অতএব (ধাত্বাদিস্থ অ-কারেরও) বিবৃতোপদেশ করা উচিত ॥

টিপ্পনী। এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষী পূর্ব্বোক্ত একদেশী-সমাধানের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন : পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, যেহেতু প্রয়োগে একত্র দুইটি বিবৃত অ-কারের সমবস্থান অসম্ভব, অতএব "অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ" এই সূত্রে অ-কার সম্বন্ধে দীর্ঘাদেশবিধান ব্যর্থ হইয়া প্রত্যাহারান্তর্গত বিবৃত অ-কারের দ্বারা ধাত্বাদিস্থ সংবৃত অ-কারের গ্রহণের জ্ঞাপক হইতেছে— ইহা অযৌক্তিক। কেননা, কোনও একটি সূত্র তখনই জ্ঞাপক হইতে পারে, যখন তাহার কোনও প্রয়োজন দেখাইতে পারা যায় না।— "ব্যর্থং সজ্ জ্ঞাপয়তি।"[১] কিন্তু 'অকঃ সবর্ণে—' সূত্রে 'অক্ প্রত্যাহারান্তর্ব্বর্ত্তী বিবৃত অ-কারের

---

১. দ্র. "*Jñāpaka* is that which teaches or suggests something ; and the term *Jñāpaka*, in the sense in which it is used here, is applicable to any term employed by Pāṇini, or to any rule given by him, or in short to any proceeding of his, which would be meaningless or superfluous (*vyartha*), or for which it would be absolutely impossible to assign a reason, if a particular Paribhāṣā did not exist, but which appears necessary and serves a purpose (i.e. *caritārtha*) as soon as and only when that Paribhāṣā has been adopted, and which on that account indicates the existence of that Paribhāṣā and proves that the latter was adopted and acted upon by Pāṇini in the composition of his Sūtras."—*Preface* : *Paribhāṣendusekhara* of Nāgojībhaṭṭa by Franz Kielhorn, Ph.D., pp. V-VI (Bombay Sanskrit Series).

গ্রহণ ব্যর্থ হইতে পারে না। তাহার অন্য প্রয়োজন আছে। কি সেই প্রয়োজন? যদিও একত্র প্রয়োগে বিবৃত অ-কারদ্বয়ের সমবস্থান উপলব্ধ হয় না এবং প্রযত্নভেদবশতঃ প্রত্যাহারান্তর্ব্বর্তী বিবৃত অ-কারের দ্বারা সংবৃত অ-কারের গ্রহণও হইতে পারে না, তথাপি বিবৃত অ-কারের সহিত সাবর্ণ্য সিদ্ধ হওয়ায় বিবৃতগুণযুক্ত দীর্ঘ আ-কারের গ্রহণ হইতে পারে, এবং বিবৃত দীর্ঘ আ-কারদ্বয়ের প্রয়োগে একত্র সমবস্থান সম্ভব হওয়ায়, সেই স্থলে দীর্ঘ একাদেশবিধানের দ্বারা "অকঃ সবর্ণে—" সূত্রে 'অক্' প্রত্যাহারান্তর্ব্বর্তী বিবৃত অ-কারের গ্রহণ চরিতার্থ হইয়াছে। যেমন— মালা+আঢ়কম্, খট্বা+আঢ়কম্। অতএব বিবৃত আ-কারদ্বয়ের স্থানে দীর্ঘ একাদেশবিধানই অক্ প্রত্যাহারস্থ বিবৃত অ-কার গ্রহণের উদ্দেশ্য। সুতরাং একদেশী যে "অকঃ সবর্ণে—" সূত্রে বিবৃত অকারোচ্চারণের ব্যর্থতা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণভাবে যুক্তিবিরুদ্ধ। ফলে, বিবৃত অ-কার গ্রহণের প্রয়োজনান্তর থাকায় উহার দ্বারা এইরূপ অর্থ জ্ঞাপিত হইতে পারে না যে, প্রত্যাহারস্থ বিবৃত অ-কারের দ্বারা ধাত্বাদিস্থ সংবৃত অ-কারেরও গ্রহণ সূত্রকারের অভিপ্রেত। অতএব ধাত্বাদিস্থ অ-কারেরও যাহাতে প্রত্যাহারস্থ বিবৃত অ-কারের দ্বারা গ্রহণ হইতে পারে, তজ্জন্য ধাত্বাদিস্থ অ-কারেরও বিবৃতোপদেশ অবশ্যকর্ত্তব্য ॥

দ্রষ্টব্য: "নৈতদস্তি। 'অক' ইত্যকারেণ বিবৃতেন দীর্ঘস্য বিবৃতস্য গ্রহণাদজ্ঞাপকমেতদিত্যর্থঃ ॥"— প্রদীপ।

ভাষ্যমূল। ক এষ যত্নশ্চোদ্যতে—বিবৃতোপদেশো নাম। বিবৃতোবোপদিশ্যেত, সংবৃতো বা। কোঽত্র বিশেষঃ?

ভাষ্যানুবাদ। কি (জন্য বিবৃতোপদেশরূপ এই) প্রয়াস বার্ত্তিককার কর্ত্তৃক কর্ত্তব্যরূপে বিহিত হইতেছে? (ধাত্বাদিস্থ অ-কারের) বিবৃতোপদেশ(ই) হউক, অথবা সংবৃতোপদেশ(ই) হউক— ইহাতে পার্থক্য কি?

টিপ্পনী। পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন: "অকঃ সবর্ণে—" এই সূত্রটির জ্ঞাপকত্ব বিঘটিত হওয়ায় প্রত্যাহারস্থ বিবৃত অ-কারের দ্বারা ধাত্বাদিস্থ সংবৃত অ-কারের গ্রহণ হইতে পারে না। অতএব, ধাত্বাদিস্থ অ-কারেরও যাহাতে অচ্‌ত্ব সিদ্ধ হইতে পারে, তজ্জন্য উহার বিবৃতোপদেশ অবশ্যকর্ত্তব্য ॥ পূর্ব্বপক্ষীর এই আপত্তির বিরুদ্ধে একদেশী প্রশ্ন করিতেছেন: সূত্রকার তো ধাতু-প্রত্যয় প্রভৃতির অনুশাসন করিয়াছেনই। সুতরাং সেই ধাত্বাদিস্থ অ-কার বিবৃতরূপই নাহয় পাঠ করা হউক— তাহাতে নূতন কোনও প্রয়াসের আবশ্যকতা হইবে না। কেননা, ধাত্বাদিস্থ অ-কারের সংবৃতোপদেশের জন্য যে প্রযত্ন আবশ্যক, বিবৃতোপদেশের জন্য সেই একই প্রযত্ন আবশ্যক। বিবৃতোপদেশের জন্য কোনও পৃথক প্রযত্ন আবশ্যক হইবে না— যাহাতে বিবৃতোপদেশের পক্ষে গৌরবদোষ প্রসক্ত হয়। অতএব উভয়পক্ষের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ কিছু নাই।

দ্রষ্টব্য: "ক এষ যত্ন ইতি। ধাত্বাদয়ঃ পঠিতাস্তত্রাকারো বিবৃতঃ পঠ্যতাং ন হি কিঞ্চিদ্ গৌরবং

৫

ভবতি। তৎকিমুচ্যতে— অন্যত্রাপি বিবৃতোপদেশঃ কর্ত্তব্য ইতীতি প্রশ্নঃ ॥”—কৈয়টঃ প্রদীপ।
“ধাত্বাদৌ বিবৃত-সংবৃতয়োরন্তরোচ্চারণে ন কোঽপি বিশেষ ইত্যর্থঃ ॥”—ছায়া ॥

ভাষ্যমূল। স এষ সর্ব্ব এবমর্থো যত্নঃ— যান্যেতানি প্রাতিপদিকান্যগ্রহণানি তেষামেতেনাভ্যুপায়েনোপদেশশ্চোদ্যতে, তদ্‌গুরু ভবতি। তস্মাদ্ বক্তব্যম্— “ধাত্বাদিস্থশ্চ বিবৃতঃ” ইতি ॥

ভাষ্যানুবাদ। (বার্ত্তিককারের, প্রত্যাহার ব্যতিরিক্ত স্থলে অক্ষর সমাম্নায়িক ভিন্ন অন্য অ-কারেরও বিবৃতোপদেশ বিধানরূপ) এই যত্নের ফল হইতেছে— সর্বত্র (সংবৃত অ-কারের স্থলে ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রক্রিয়া সিদ্ধির জন্য বিবৃত কার্য্য হউক। (ডিত্থ প্রভৃতি) যে সকল প্রাতিপদিক (সূত্রকার কর্ত্তৃক সূত্রে) উচ্চারিত হয় নাই, তাহাদের (সংবৃত অ-কার বিষয়ে উপরি-উক্ত) এই উপায়ের সাহায্যে (বার্ত্তিককার কর্ত্তৃক) বিবৃতোপদেশবিহিত হইতেছে। (কিন্তু সূত্রকার কর্ত্তৃক সূত্রে অনুচ্চারিত প্রাতিপদিকসমূহে শ্রুত অ-কারের বিবৃতোপদেশের জন্য প্রতিপদপাঠ) গুরু হইয়া পড়ে। অতএব (ইহা) বলা উচিত (যে),—“(সূত্রকার কর্তৃক উপদিষ্ট) ধাত্বাদিস্থ (সংবৃত অ-কারেরও শাস্ত্রীয় কার্যের জন্য) বিবৃতত্ব (প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে) ॥”

টিপ্পনী। প্রথমে প্রশ্ন উঠিয়াছিল : শিবসূত্রে পঠিত অ-কারের বিবৃতোপদেশ করা হইয়াছে কি না। তাহার সমাধানে বলা হইয়াছে যে, যেহেতু অক্ষরসমাম্নায়টি অপৌরুষেয়, সেইহেতু “প্রত্যাহারে অ-কারের বিবৃতোপদেশ কর্ত্তব্য”— এইরূপ কর্ত্তব্যত্ব নির্দ্দেশ যুক্তিযুক্ত নহে। অতএব, ইহা স্বীকার করাই উচিত যে, প্রত্যাহারে পঠিত অ-কার বিবৃতরূপেই উপদিষ্ট হইয়াছে এবং বার্ত্তিককার তাঁহার প্রথম বার্ত্তিকে (“অকারস্য বিবৃতোপদেশঃ—”) শুধু অ-কারের বিবৃতোপদেশের প্রয়োজন উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। দ্বিতীয় বার্ত্তিকে (“তস্য বিবৃতোপদেশাদন্যত্রাপি—”) প্রত্যাহার ব্যতিরিক্তস্থলেও ধাত্বাদিস্থ অ-কারের বিবৃতোচ্চারণ করা উচিত বলিয়া বার্ত্তিককার বিধান করিতেছেন। এতক্ষণে পূর্ব্বপক্ষী আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন : এই বার্ত্তিকের প্রয়োজন কি? প্রত্যাহারস্থ অ-কারের বিবৃতোপদেশ তো সিদ্ধই আছে। সূত্রকারই ধাত্বাদিও পাঠ করিয়াছেন। এখানেও যদি সূত্রকার অ-কার বিবৃতরূপেই উচ্চারণ করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তবে বর্ত্তমান বার্ত্তিকের প্রয়োজনীয়তা কি? ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী সমাধান নির্দ্দেশ করিতেছেন যে, যদিও সূত্রকার ধাত্বাদিস্থ অ-কার বিবৃতরূপে উপদেশ করিয়াছেন বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তথাপি যে-সকল শব্দ (ডিত্থ, ডবিত্থ প্রভৃতি) সূত্রকার স্বয়ং উচ্চারণ করেন নাই, সেই সকল শব্দে শ্রুত সংবৃত অ-কারের স্থলে যাহাতে বিবৃতোপদেশ হয়, তাহার জন্য পৃথক নির্দ্দেশের প্রয়োজন আছে। কেননা, অ-গ্রহণ প্রাতিপদিকস্থ অ-কারের বিবৃতত্ব সিদ্ধ না হইলে, উহার অচ্‌ত্বও সিদ্ধ হইবে না, এবং ফলে উহার অচ্‌কার্য্যও হইবে না। অতএব, অগ্রহণ প্রাতিপদিকের অ-কারের বিবৃতোপদেশের জন্য বর্ত্তমান বার্ত্তিকের আবশ্যকতা আছে। কিন্তু সমস্ত প্রাতিপদিক এক-একটি করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পাঠ করিয়া তত্রস্থ অ-কারের বিবৃতোপদেশবিধান

অসম্ভব। অতএব বার্ত্তিককার সাধারণভাবে অগ্রহণ প্রাতিপদিকের অ-কারের বিবৃতোপদেশের জন্যই "তস্য বিবৃতোপদেশাদন্যত্রাপি—" এই বার্ত্তিক প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে: তবে কি সূত্রকার সূত্রোল্লিখিত ধাত্বাদিস্থ অ-কারের বিবৃতোচ্চারণই করিয়াছেন? ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন: সূত্রকার ধাত্বাদিস্থ অ-কারের বিবৃতোচ্চারণ করিয়াছেন, ইহা স্বীকার করিয়া লওয়ার কোনও প্রয়োজন নাই। কেননা, অ-কারের স্বাভাবিক প্রযত্ন সংবৃত; বিবৃত প্রযত্ন উহার স্বাভাবিক প্রযত্ন নহে। সুতরাং সংবৃত প্রযত্ন অ-কারের গুণ বিবৃত প্রযত্নটি অ-কারের দোষ। যদি সূত্রকার ধাত্বাদিস্থ অ-কারের বিবৃতোপদেশ করিয়াছেন, ইহা স্বীকার করা যায়, তবে সূত্রকারের পক্ষে অধিক প্রযত্ন প্রসক্ত হইয়া পড়ে। কেননা, অ-কারের স্বাভাবিক সংবৃত প্রযত্ন ত্যাগ করিয়া, অস্বাভাবিক বিবৃত প্রযত্ন উচ্চারণে যত্নাধিক্য অপরিহার্য্য। তাহা ছাড়া, এই পক্ষ মানিয়া লইলে, সূত্রকার গুণযুক্ত অ-কারের পরিবর্ত্তে দোষযুক্ত অ-কার পাঠ করিয়াছেন —এইরূপ আক্ষেপও আসিয়া পড়ে। অতএব সূত্রকার ধাত্বাদিস্থ অ-কার সংবৃতভাবেই পাঠ করিয়াছেন— এইরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লওয়াই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পূর্ব্বপক্ষী বলিতে পারেন: যদি সূত্রকার ধাত্বাদিস্থ অ-কারের সংবৃতোপদেশই করিয়া থাকেন, তবে উহার বিবৃতত্ব সিদ্ধ হইবে কি করিয়া? ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন: অগ্রহণ প্রাতিপদিকস্থ অ-কারের বিবৃতোপদেশের জন্য দ্বিতীয় বার্ত্তিকটি ("তস্য বিবৃতোপদেশাদন্যত্রাপি—") যে অবশ্যপঠনীয় ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব অবশ্যপঠনীয় এই বার্ত্তিকের দ্বারাই ধাত্বাদিস্থ সংবৃত অ-কারেরও বিবৃতত্ব অতিদিষ্ট হইতেছে বুঝিতে হইবে। ফলে, একই প্রযত্নের দ্বারা অগ্রহণ প্রাতিপদিকস্থ সংবৃত অ-কার এবং সূত্রকার কর্ত্তৃক উপদিষ্ট ধাত্বাদিস্থ সংবৃত অ-কার উভয়বিধ অ-কারেরই বিবৃতত্ব সিদ্ধ হইল। এই সমাধানের একটি বিশেষ গুণ হইল এই যে, অ-কারের স্বাভাবিক সংবৃত প্রযত্নভাবে উচ্চারণের কোনও অন্যথাভাব হইল না, অথচ তাহাতে বিবৃতত্বপ্রতিজ্ঞা বর্ত্তমান বার্ত্তিকের দ্বারা সিদ্ধ হইল। ফলে দাঁড়াইল এই যে, ধাত্বাদিস্থ অ-কার অথবা অগ্রহণ প্রাতিপদিকস্থ অ-কার— যে-কোনও অ-কারই হউক না কেন, উহা সংবৃতভাবে উচ্চারিত হইলেও উহাকে বিবৃত বলিয়া মনে করিতে হইবে, সত্যসত্যই উহাকে বিবৃতভাবে উচ্চারণ করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। শাস্ত্রান্তে "অ অ" এই প্রত্যাপত্তি[1] বিধানের দ্বারা সূত্রকার ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, শাস্ত্রীয় কার্য্যসিদ্ধির জন্য স্বাভাবিক সংবৃত অ-কারের শাস্ত্রদৃষ্টিতে যে বিবৃতত্ব অতিদিষ্ট হইয়াছিল, প্রয়োগে সেই অস্বাভাবিক বিবৃতত্ববুদ্ধি ত্যাগ করিয়া পুনরায় অ-কারের স্বাভাবিক সংবৃতত্বই সিদ্ধ হইবে॥

বার্ত্তিক। * ॥ দীর্ঘপ্লুতবচনে চ সংবৃতনিবৃত্ত্যর্থঃ ॥ *

---

১. 'প্রত্যাপত্তি' শব্দটি পারিভাষিক। ইহার অর্থ—"restoration to the previous nature."—দ্র. Mm. K. V. Abhyankar, M. A. প্রণীত *A Dictionary of Sanskrit Grammar* (Oriental Institute, Boroda, 1961).

ভাষ্যমূল। দীর্ঘপ্লুতবচনে চ সংবৃতনিবৃত্ত্যর্থো বিবৃতোপদেশঃ কর্তব্যঃ, দীর্ঘপ্লুতৌ সংবৃতৌ মা ভূতাম্ ইতি। বৃক্ষাভ্যাম্, দেবদত্তা ৩ ইতি॥

ভাষ্যানুবাদ। (অ-কারের স্থানে) দীর্ঘ ও প্লুত (আ-কারাদেশ) বিধানের স্থলে, সংবৃত (দীর্ঘ ও প্লুত আ-কারাদেশের) নিরাসের জন্য (ও) (ধাত্বাদিস্থ অ-কারের) বিবৃতোপদেশ কর্তব্য— যাহাতে (স্থানীভূত সংবৃত অ-কারের স্থানে আন্তরতম্যবশতঃ) সংবৃত দীর্ঘ প্লুত (আদেশ) না হইতে পারে। (উদাহরণ যথা)— বৃক্ষাভ্যাম্, দেবদত্তা ৩॥

টিপ্পনী। দ্বিতীয় বার্ত্তিকে ('তস্য বিবৃতোপদেশাদন্যত্রাপি—') ধাত্বাদিস্থ অ-কারের বিবৃতগ্রহণের প্রয়োজন বলা হইয়াছে— প্রত্যাহারস্থ বিবৃত অ-কারের দ্বারা ধাত্বাদিস্থ অ-কারেরও গ্রহণ। বর্তমান বার্ত্তিকে ধাত্বাদিস্থ অ-কারের বিবৃতোপদেশের অপর একটি প্রয়োজন বার্ত্তিককার প্রদর্শন করিতেছেন। যদি ধাতু, প্রাতিপদিক, প্রত্যয়, নিপাত ইত্যাদিস্থিত অ-কারের বিবৃতোপদেশ না করিয়া সংবৃতোপদেশই করা হয়, তবে একটি দোষ হয়। তাহা এই : যে-স্থলে ধাত্বাদিস্থ সংবৃত অ-কারের স্থানে দীর্ঘ কিংবা প্লুতস্বরের আদেশ বিহিত হইয়াছে, সে-স্থলে স্থানীর সহিত আদেশের প্রযত্নভেদ বশতঃ আন্তর্য্য (বা সাদৃশ্য) না থাকায় সংবৃত অ-কারের স্থানে বিবৃত দীর্ঘ এবং প্লুত আ-কার আদেশ হইতে পারে না। কেননা, সূত্রকার 'স্থানেঽন্তরতমঃ' (পা. ১.১.৫০) সূত্রে স্থানীর সহিত আদেশের আন্তরতম্য অনুশাসন করিয়াছেন। উদাহরণ, যথা : 'বৃক্ষ' এই প্রাতিপদিকস্থ অন্ত্য অ-কারটি যদি সংবৃত হয়, তবে 'সুপি চ' (পা. ৭.৩.১০২) সূত্রানুসারে '-ভ্যাম্' প্রত্যয় পরে থাকিলে অ-কারান্ত অঙ্গের যে দীর্ঘাদেশ বিহিত হইয়াছে, তদনুসারে সংবৃত অ-কারের স্থানে দীর্ঘ বিবৃত আ-কারের প্রাপ্তি থাকিলেও দীর্ঘ বিবৃত আ-কারাদেশ হইতে পারিবে না, কেননা উভয়ের মধ্যে আন্তরতম্য নাই। সেইরূপ 'দেবদত্ত' শব্দের সম্বোধনে "দূরাদ্ধূতে চ' (পা. ৮.২.৮৪) সূত্রানুসারে সম্বোধনান্ত 'দেবদত্ত' পদের অন্ত্য অ-কারের প্লুতাদেশ প্রাপ্তি আছে। কিন্তু প্লুত অ-কার যেহেতু বিবৃত এবং 'দেবদত্ত' প্রাতিপদিকের অন্ত্য অ-কারটি যেহেতু সংবৃত, সেই হেতু উভয়ের মধ্যে আন্তরতম্য না থাকায় সংবৃত অ-কারের স্থানে বিবৃত প্লুতাকারাদেশ হইতে পারে না। তবে, বৃক্ষ ও দেবদত্ত শব্দের অ-কারের স্থানে বিবৃত দীর্ঘ ও প্লুত অ-কারাদেশ না হইলে, কিরূপ আদেশ হইবে? ইহার উত্তরে পূর্বপক্ষী বলেন : স্থানীভূত সংবৃত অ-কারের সহিত 'সংবৃত' দীর্ঘ ও 'সংবৃত' প্লুতের স্থানপ্রযত্ন সাম্য থাকায় সংবৃত অ-কারের স্থানে আন্তরতম্যবশতঃ; 'সংবৃত' দীর্ঘ ও প্লুতই আদেশ হইবে, বিবৃত দীর্ঘ কিংবা প্লুত নহে। কিন্তু ইহা অনিষ্ট। অতএব, স্থানীভূত অ-কারের স্থানে যাহাতে বিবৃত দীর্ঘ এবং প্লুত আদেশই হইতে পারে, তন্নিমিত্ত ধাত্বাদিস্থ অ-কারেরও বিবৃতোপদেশ অবশ্যকর্তব্য॥

দ্রষ্টব্য : "বিবৃতত্বপ্রতিজ্ঞানে প্রযোজনান্তমাহ— দীর্ঘেতি॥ অসতি বিবৃতত্বপ্রতিজ্ঞানে সংবৃতস্যাকারস্য স্থানে সাবর্ণ্যাৎ সংবৃতয়োরেব দীর্ঘপ্লুতয়োঃ প্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ॥"—প্রদীপ।

"(প্রদীপে) **বিবৃতস্থেতি**। ধাত্বাদাবিতি ভাবঃ ॥"—ছায়া ॥

"(প্রদীপে) **দীর্ঘেতি**। হ্রস্বস্য দীর্ঘপ্লুতবিধৌ ইত্যর্থঃ॥ দীর্ঘপ্লুতৌ স্থানিনোঽকারস্য সংবৃততয়া সংবৃতাবেব স্যাতামিতি তৌ মা ভূতামিতি ধাত্বাদিস্থাকারস্য বিবৃতোপদেশঃ কার্য্য ইত্যর্থঃ ॥"—ছায়া ॥

ভাষ্যমূল। নৈব লোকে ন চ বেদে দীর্ঘপ্লুতৌ সংবৃতৌ স্তঃ।

কৌতর্হি?

বিবৃতৌ। যৌ স্তস্তৌ ভবিষ্যতঃ ॥

ভাষ্যানুবাদ। লোকে অথবা বেদে দীর্ঘ (অ-কার) এবং প্লুত (অ-কার) সংবৃত (গুণযুক্ত) নাই ॥

তবে কি আছে?

বিবৃত (গুণযুক্ত) আছে। যে (গুণযুক্ত দীর্ঘ ও প্লুত) আছে, তাহাই (ধাত্বাদিস্থ সংবৃত অ-কারের স্থানে আদেশ) হইবে ॥

টিপ্পনী। একদেশী যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন ধাত্বাদিস্থ অ-কারের বিবৃতোপদেশ না হইলে, "বৃক্ষাভ্যাম্" "দেবদত্ত ৩" প্রভৃতি উদাহরণে স্থানী সংবৃত অ-কারের স্থানে বিবৃত দীর্ঘ ও প্লুত অ-কার না হইয়া আন্তরতম্যবশতঃ সংবৃত দীর্ঘ ও প্লুত আদেশ হইবে— সিদ্ধান্তী এক্ষণে একদেশীর উক্ত আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন। ধাত্বাদিস্থ অ-কারের বিবৃতোপদেশ না হইলেও তাহার স্থানে বিবৃত দীর্ঘ ও প্লুত আদেশই হইবে— 'সংবৃত' দীর্ঘ ও প্লুত হইবে না। কেননা, সংবৃতগুণযুক্ত দীর্ঘ ও প্লুত অ-কার লোকে অথবা বেদে কুত্রাপি প্রসিদ্ধ নাই। সংবৃতগুণযুক্ত দীর্ঘ ও প্লুত অ-কার আকাশকুসুমের মতই অলীক। সুতরাং সংবৃত অ-কারের স্থানে অলীক সংবৃতগুণযুক্ত দীর্ঘ কিংবা প্লুত আদেশের প্রসক্তিই নাই। এতদ্ভিন্ন সূত্রকার নিজেই "অতে দীর্ঘো যঞি" (পা. ৭. ৩. ১০১) এবং "অতো রো রপ্লুতাদপ্লুতে" (পা. ৬. ১. ১১৩) এই সূত্রদ্বয় প্রণয়নের দ্বারা যথাক্রমে জ্ঞাপন করিতেছেন যে সংবৃত অ-কারের সহিত বিবৃত দীর্ঘ অ-কার (আ-কার) এবং বিবৃত প্লুত অ-কারের সাবর্ণ্য না থাকিলেও সংবৃত অ-কারের স্থলে বিবৃত দীর্ঘ অ-কার এবং বিবৃত প্লুত অ-কারের আদেশ হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই: "অতো দীর্ঘো যঞি" সূত্রে যঞাদি সার্ব্বধাতুক প্রত্যয় পরে থাকিলে অ-কারান্ত অঙ্গের দীর্ঘাদেশ বিধান করা হইয়াছে। যেমন—'ভবামি'। এস্থলে ধাতুস্থ সংবৃত অ-কারের স্থানে দীর্ঘাদেশ বিধানের দ্বারা সূত্রকর জানাইতেছেন যে, সর্বত্রই দীর্ঘবিধিস্থলে সংবৃত অ-কারের স্থানে বিবৃত দীর্ঘ অ-কার (আ-কার)-ই আদেশ হইয়া থাকে। "অতো রো রপ্লুতাদপ্লুতে"— সূত্রে অপ্লুত অ-কারের পরবর্ত্তী 'রু'-স্থানে অপ্লুত অকার পরে থাকিলে উ-কারাদেশ বিহিত হইয়াছে। যেমন, বৃক্ষ+রু+অত্র—বৃক্ষ+উ+অত্র—বৃক্ষো+অত্র—বৃক্ষোঽত্র॥ সূত্রকার এখানে 'অতঃ' (অর্থাৎ হ্রস্ব অকারের)— ইহার 'অপ্লুতাৎ' এই বিশেষণের দ্বারা

জ্ঞাপন করিতেছেন যে, হ্রস্ব সংবৃত অ-কারের দ্বারা বিবৃত প্লুত অ-কারেরও গ্রহণ হইয়া থাকে। নতুবা, সংবৃত অ-কারের দ্বারা বিবৃত প্লুত অ-কারের গ্রহণের কোনও সম্ভাবনা না থাকিলে প্লুত বিবৃত অ-কারের পরবর্ত্তী 'রু'র স্থানে উ-কারাদেশ নিরাসের জন্য 'অতঃ' ইহার 'অপ্লুতাৎ' এই বিশেষণ অনাবশ্যক হইয়া পড়িত। অতএব সূত্রকারের সূত্রানুশাসনের দ্বারাই জ্ঞাপিত হইতেছে যে, সংবৃত অ-কারের সহিত বিবৃত দীর্ঘ ও প্লুত অ-কারের আন্তরতম্য না থাকিলেও দীর্ঘ ও প্লুত বিধিস্থলে সংবৃত অ-কারের স্থানে বিবৃত দীর্ঘ ও প্লুত অ-কারই আদেশ হইবে। সংবৃত দীর্ঘ ও প্লুত নহে। সুতরাং তাহার জন্য বার্ত্তিককারের পৃথক্ অনুশাসনের কোনও প্রয়োজনই নাই।

দ্রষ্টব্য : "**নৈবলোক** ইতি। অসত্যপি সাবর্ণ্যে লিঙ্গাদকারস্য সংবৃতস্য বিবৃতৌ দীর্ঘপ্লুতৌ ভবিষ্যতঃ। যদয় "মতো দীর্ঘো যঞি", "অতো রো রপ্লুতাদপ্লুতে" ইত্যাহেতি ভাবঃ॥"—প্রদীপ॥

বার্ত্তিক। *॥ স্থানী প্রকল্পয়েদেতাবনুস্বারো যথা যণম্॥*

ভাষ্যমূল। সংবৃতঃ স্থানী সংবৃতৌ দীর্ঘপ্লুতৌ প্রকল্পয়েৎ। অনুস্বারো যথা যণম্। তদ্‌যথা— সঁয্যন্তা, সঁব্বৎসরঃ, যঁল্লোকং, তঁল্লোকম্ ইতি— অনুস্বারঃ স্থানী যণমনুনাসিকং প্রকল্পয়তি॥

ভাষ্যানুবাদ। "(স্থানী) অনুস্বার যেমন (অপ্রসিদ্ধ অনুনাসিক) য ব র ল -কে (আদেশ-রূপে) আক্ষেপ করিয়া থাকে, (সেইরূপ) স্থানী (সংবৃত অ-কারও অপ্রসিদ্ধ সংবৃতগুণযুক্ত দীর্ঘ ও প্লুত অ-কার)-দ্বয়কে (আদেশরূপে) আক্ষেপ করিবে॥"

স্থানী সংবৃত (অ-কার) সংবৃত দীর্ঘ ও প্লুত (অ-কারকে) আদেশরূপে আক্ষেপ করিবে। (স্থানী) অনুস্বার যেমন (অনুনাসিক) যণ্-কে (আদেশরূপে আক্ষেপ করিয়া থাকে)। যেমন—সযঁযন্তা, সব঳্ঁবৎসরঃ, যল্ঁলোকম্, তল্ঁলোকম্। (এই সকল উদাহরণে) স্থানী অনুস্বার অনুনাসিক যণ্-কে (আদেশরূপে) আক্ষেপ করিতেছে॥

টিপ্পনী। এক্ষণে, একদেশী ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত সমাধানের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন : "ভাষ্যকার যে বলিয়াছেন লোকে কিংবা বেদে 'সংবৃত' দীর্ঘ ও প্লুত অ-কারের প্রসিদ্ধিই নাই, অতএব সংবৃত হ্রস্ব অ-কারের স্থানে সংবৃত দীর্ঘ ও প্লুত আদেশের কোনও প্রসক্তিই হইতে পারে না, উহা অযৌক্তিক। কেননা, লোকে কিংবা বেদে তো অনুনাসিক য ব র ল -ও অপ্রসিদ্ধ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সং+যন্তা, সং+বৎসর ; যং+লোকম্, তং+লোকম্ প্রভৃতি সন্ধিস্থলে যেমন 'বা পদান্তস্য' (পা. ৮. ৪. ৫৯) সূত্রানুসারে পদান্তস্থিত অনুস্বারের স্থানে আন্তরতম্যবশতঃ (লোকে এবং বেদে) অপ্রসিদ্ধ যথাক্রমে বিকল্পে অনুনাসিক য ব এবং ল আদেশ হইয়া থাকে, সেইরূপ তুল্যযুক্তিতে ধাত্বাদিস্থ সংবৃত অ-কারের স্থানেও আন্তরতম্যবশতঃ (লোকে এবং বেদে) অপ্রসিদ্ধ 'সংবৃত' দীর্ঘ ও প্লুতই আদেশ হইবে। বিবৃত দীর্ঘ কিংবা প্লুত আদেশ হইবে না॥"

নাগেশ তাঁহার 'উদ্দ্যোত' টীকায় মন্তব্য করিয়াছেন যে, একদেশীর এই যুক্তি অজ্ঞানপ্রসূত। কেননা, লোকে এবং বেদে অনুনাসিক য্, ব্ (র্), ল্ প্রসিদ্ধই আছে। একদেশী লোক-প্রসিদ্ধ অনুনাসিক য্, ব্, (র্), ল্-এর অস্তিত্বের কথা না জানিয়াই কেবল এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। অপরপক্ষে, কুত্রাপি 'সংবৃত' দীর্ঘ কিং প্লুত অ-কারের প্রসিদ্ধি নাই। সুতরাং উভয়স্থলে একই যুক্তি খাটে না। তুলনীয়—

"সংবৃতদীর্ঘাদিবদনুনাসিকযবলানামপি বেদলোকয়োরসত্ত্বং মন্যমান আহ—(ভাষ্যে) স্থানী প্রকল্পয়েদিত্যাদি ॥"—উদ্দ্যোত ॥

"**মন্যমান** ইতি। একদেশীত্যর্থঃ ॥"—ছায়া ॥

ভাষ্যমূল। বিষম উপন্যাসঃ। যুক্তং যৎ সতস্তত্র প্রক্লৃপ্তির্ভবতি। সন্তি হি যণঃ সানুনাসিকা নিরনুনাসিকাশ্চ। দীর্ঘপ্লুতৌ পুনর্নৈব লোকে ন চ বেদে সংবৃতৌ স্তঃ।

কৌ তর্হি ?

বিবৃতৌ, যৌ স্তস্তৌ ভবিষ্যতঃ ॥

ভাষ্যানুবাদ। (এই যুক্তিটি) বিরুদ্ধ। (ইহা যুক্তি-) যুক্ত যে (যাহা) আছে, তাহার সেইস্থানে আক্ষেপ হইয়া থাকে। 'যণ্' (অর্থাৎ 'য্, ব্, র্, ল্) সানুনাসিক এবং নিরনুনাসিক (উভয়বিধই প্রসিদ্ধ) আছে। (কিন্তু) দীর্ঘ ও প্লুত (অ-কার) লোকেও সংবৃত (-রূপে প্রসিদ্ধ নাই), বেদেও নাই ॥

তবে কিরূপ (দীর্ঘ ও প্লুত অ-কার প্রসিদ্ধ) আছে ?

বিবৃত (দীর্ঘ ও প্লুত অ-কারই প্রসিদ্ধ আছে)। (অতএব), যাহা আছে, তাহাই (সংবৃত অ-কারের স্থানে আদেশ) হইবে।

টিপ্পনী। সিদ্ধান্তী একদেশীর পূর্বোক্ত দৃষ্টান্ত খণ্ডন করিতেছেন।—"সিদ্ধান্তী দৃষ্টান্তং বিঘটয়তি—বিষম ইতি ॥" ছায়া ॥ অনুস্বারের স্থলে আন্তরতম্যবশতঃ অনুনাসিক য-ব-ল-কারের আদেশ হইয়া থাকে, অতএব সেই দৃষ্টান্তে সংবৃত অ-কারের স্থানে আন্তরতম্যবশতঃ সংবৃতগুণযুক্ত দীর্ঘ ও প্লুত অ-কারই আদেশ হইবে— একদেশীর এই যুক্তি বিরুদ্ধ। কেননা, অনুনাসিক য, ব, ল লোকে ও বেদে প্রসিদ্ধ আছে; কিন্তু সংবৃত দীর্ঘ ও প্লুত অ-কারের উচ্চারণ অসম্ভব বলিয়াই লোকে অথবা বেদে কুত্রাপি সংবৃত দীর্ঘ ও প্লুত অ-কারের প্রসিদ্ধিই নাই। অতএব সংবৃত অ-কারের স্থানে অপ্রসিদ্ধ, কাল্পনিক 'সংবৃত' দীর্ঘ ও প্লুত অ-কারাদেশ না হইয়া প্রসিদ্ধ 'বিবৃত' দীর্ঘ ও প্লুত অ-কারাদেশই হইবে ॥

দ্রষ্টব্য : "**সতস্তত্রেতি**। অশকত্বাদ্ দীর্ঘপ্লুতয়োঃ সংবৃতয়োরুচ্চারণস্য—ইত্যর্থঃ ॥"—প্রদীপ ॥

এস্থলে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাহা এই : যদিও ভাষ্যকার সামান্যতঃ 'যণে'র (য, ব, র, ল) অনুনাসিকত্ব প্রসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু 'স য্ঁ যন্তা' প্রভৃতি পূর্বোক্ত উদাহরণে তিনি কেবল য, ব এবং ল-কারেরই অনুনাসিকত্বের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। 'যণ্'-প্রত্যাহারান্তবর্তী অন্যতম বর্ণ

র-কারের অনুনাসিকত্বের কোনও উদাহরণ উল্লেখ করেন নাই। ইহার কারণ কি?—এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়া থাকে যে, র-কারের অনুনাসিকত্ব অসম্ভব। সেইজন্য ভাষ্যকার অনুস্বারের স্থানে অনুনাসিক র-কারাদেশের কোনও দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন নাই। র-কারটি অনুনাসিক না হইলে অবশিষ্ট তিনটি বর্ণের (য-ব-ল) অনুনাসিকত্ব সম্ভব বলিয়া 'ছত্রিন্যায়ে' ভাষ্যকার বাহুল্যাভিপ্রায়ে 'যণ্'-এর অনুনাসিকত্ব স্বীকার করিয়াছেন॥

তুলনীয় :

যণি হি যণ ইতি (ভাষ্যে)-যণ ইতি বাহুল্যাভিপ্রায়েণ রেকস্যানুনাসিকত্বাভাবাৎ-ইতি বোধ্যম্॥"—নাগেশঃ উদ্দ্যোত॥

অতএব 'কুণ্ডং রথেন' প্রভৃতি স্থলে অনুস্বারের স্থানে 'বা পদান্তস্য' (পা. ৮.৪.৫৯) সূত্রানুসারে বিকল্পে অনুনাসিক রেফাদেশ হইতে পারিল না॥ এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার 'হ য ব র ট্' শিবসূত্রস্থ ভাষ্যে করা হইবে॥

ভাষ্যমূল। এবমপি কৃত এতৎ—তুল্যস্থানৌ প্রযত্নভিন্নৌ ভবিষ্যতঃ, ন পুনস্তুল্য প্রযত্নৌ স্থানভিন্নৌ স্যাতামীকার উকারো বেতি?

ভাষ্যানুবাদ। এতৎসত্ত্বেও (ধাত্বাদিস্থ অ-কারের বিবৃতোপদেশ না হইলে জিজ্ঞাস্য :) কেন এইরূপ (হয় যে,)—(সংবৃত অ-কারের স্থানে) ভিন্ন প্রযত্ন (হইলেও) স্থানসাম্য বিশিষ্ট (অর্থাৎ কণ্ঠ্য) (বিবৃত দীর্ঘ ও প্লুত অ-কারই আদেশ) হইবে, অথচ, ভিন্নস্থান (হইলেও) তুল্যপ্রযত্নবিশিষ্ট (সংবৃত দীর্ঘ ও প্লুত) ঈ-কার কিংবা উ-কার (আদেশ) হইবে না?[১]

১. ১৩১৩ বঙ্গাব্দে উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ৺পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী কর্ত্তৃক অনূদিত "মহাভাষ্যে" (পৃ. ৬০) উপরি-নির্দিষ্ট ভাষ্যাংশটুকুর নিম্নলিখিতরূপ অনুবাদ দৃষ্ট হইয়া থাকে—

"এই প্রকার হইলে অর্থাৎ অ-কার ভিন্ন স্বরের বিবৃতত্ব স্বীকার না করিলে তুল্যস্থান হইলেও প্রযত্ন ভিন্ন হইবে ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে! কেবলমাত্র তুল্য প্রযত্ন নহে; ঈ-কার বা উ-কার এই প্রকার স্থান ভিন্নও হইতে পারে অর্থাৎ অ-কার ভিন্ন স্বরের বিবৃতত্ব স্বীকার না করিলে "তুল্যাস্য প্রযত্নং সবর্ণম্" যাহার উচ্চারণ স্থান এবং প্রযত্ন তুল্য তাহারা সবর্ণ হয়। এই সূত্রানুসারে সংবৃত অ-কারের স্থানে সংবৃত ঈ-কার অথবা সংবৃত উ-কার হইতে পারে।"

স্পষ্টই বুঝা যায় যে, অনুবাদক বর্ত্তমান একদেশিভাষ্যের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। অনুবাদটি সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। এস্থানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত গ্রন্থের ১ম ও ২য় আহ্নিক পর্যন্ত ৺পণ্ডিত রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় কৃত অনুবাদ। পরবর্তী আহ্নিকগুলি ৺পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী মহাশয় কর্তৃক অনূদিত। ইহা প্রকাশক শুদ্ধানন্দ স্বামিজী তাঁহার 'বক্তব্যে' স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন—

টিপ্পনী। ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত সমাধানের বিরুদ্ধে একদেশী পুনরায় শঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন: যদি পূর্ব্বপ্রদর্শিত যুক্তি অনুসারে ধাত্বাদিস্থ অ-কারের সংবৃতোপদেশই সিদ্ধ হইয়া থাকে, তবে জিজ্ঞাস্য: সংবৃত অ-কারের স্থানে যেখানে দীর্ঘ ও প্লুতস্বরের আদেশের প্রাপ্তি আছে, সেখানে কিজন্য বিবৃত দীর্ঘ ও প্লুত অ-কারই আদেশ হইবে, সংবৃত দীর্ঘ ও প্লুত ঈ-কার কিংবা উ-কারই বা কেন আদেশ হইবে না? সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন যে, সংবৃত অ-কারের সহিত বিবৃত দীর্ঘ ও প্লুত অ-কারের প্রযত্নসাম্য না থাকিলেও, স্থানসাম্য আছে। কেননা, সংবৃত অ-কারও যেমন কণ্ঠ্যবর্ণ, সেইরূপ বিবৃত দীর্ঘ ও প্লুত অ-কারও কণ্ঠ্যবর্ণ। অতএব সংবৃত আকারের স্থানে ভিন্নপ্রযত্ন হইলেও বিবৃত দীর্ঘ ও প্লুত অ-কারই আদেশ হইবে। কিন্তু একদেশী ইহার বিরুদ্ধে বলেন যে, তুল্যযুক্তিতে সংবৃত অ-কারের স্থানে সংবৃত দীর্ঘ ও প্লুত ই-কার কিংবা উ-কারেরও আদেশ হইতে পারে। কেননা, যদিও অ-কারটি কণ্ঠ্যবর্ণ, এবং ঈ-কার ও উ-কার যথাক্রমে তালব্য ও ওষ্ঠ্যবর্ণ, সুতরাং ইহারা পরস্পর ভিন্নস্থান, তথাপি অ-কারের প্রযত্ন সংবৃত এবং ঈ-কার কিংবা উ-কারেরও প্রযত্ন সংবৃত হওয়ার ফলে অ-কারের সহিত ঈ-কার কিংবা উ-কারের প্রযত্ন সাম্য রহিয়াছে। সুতরাং সিদ্ধান্ত যদি প্রযত্নভেদ সত্ত্বেও স্থানসাম্যহেতু সংবৃত অ-কারের স্থানে বিবৃত দীর্ঘ ও প্লুত অ-কারাদেশ স্বীকার করিতে পারেন, সেইরূপ একদেশীও তো স্থানভেদসত্ত্বেও প্রযত্নসাম্যহেতু সংবৃত অ-কারের স্থানে সংবৃত ঈ-কার বা উ-কার আদেশ স্বীকার করিতে পারেন। সিদ্ধান্তীয় যুক্তিই শুধু গ্রহণ করিব কেন? একদেশীর যুক্তিই বা কেন গ্রহণ করিব না? ইহাই বর্তমান একদেশিভাষ্যের তাৎপর্য।

কিন্তু সিদ্ধান্তী এইস্থানে একটি প্রশ্ন করিতে পারেন: অ-কার ভিন্ন অন্যান্য স্বরবর্ণের ঈ-কারের এবং উ-কারের ন্যায় তো' শিক্ষাগ্রন্থে বিবৃত প্রযত্নই উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা— "বিবৃতকরণাঃ করাঃ।" সুতরাং একদেশী যে ঈ-কার এবং উ-কারের সংবৃত প্রযত্ন নির্দেশ করিয়াছেন, উহার প্রমাণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে কৈয়ট বলিয়াছেন যে, কোনও কোনও (সামবেদীয়) শিক্ষাকার ঈ-কার, উ-কার, এবং ঈ-কারের সংবৃত প্রযত্ন স্বীকার করিয়া থাকেন। একদেশী তাঁহাদের মত আশ্রয় করিয়াই উপরি-উক্ত শঙ্কা উত্থাপন করিয়াছেন॥ তুলনীয়: **এবমপীতি**। অসতি বিবৃতত্ব প্রতিজ্ঞানে সংবৃতস্যাকারস্য সংবৃতাবেব ঈ-কারো

"সানুবাদ মহাভাষ্য প্রথমে পাক্ষিক পত্রে উদ্বোধনে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। প্রথম আহ্নিক ও দ্বিতীয় আহ্নিকের কতকদূর পর্য্যন্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় অনুবাদ করেন।"—ঐ. পৃ. ।০।
অপি চ—"অনূদিত মহাভাষ্যের সম্পূর্ণ প্রথম আহ্নিক এবং দ্বিতীয় আহ্নিকের অধিকাংশের অনুবাদ আমার সকৃত নহে। সুতরাং তাহার গুণ বা দোষের ভাগী আমি নহি।"— ৺পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী: ঐ, 'অনুবাদকের নিবেদন', পৃ. ৶০।

কারৌ প্রাপ্লুতঃ। "ধৃতাঃ সংবৃতা অন্যত্রার্ত্তব সাম্নঃ"— ইতি কৈশ্চিদ্ ঈকারো কারয়ের সংবৃতত্বস্যাভ্যুপগমাৎ ॥"—কৈয়টঃ প্রদীপ ॥

"ক্বচিত্ত্ব ধৃতঃ—' ইতি পাঠঃ। ঈ-কারোকারাকারা ইত্যর্থঃ ॥"—নাগেশঃ উদ্দ্যোত ॥

"(**কৈশ্চিদিতি** প্রদীপো) ছন্দোগবিশেষৈ রিত্যর্থঃ ॥"—ছায়া ॥

ভাষ্যমূল। বক্ষ্যতি—"স্থানেঽন্তরতমঃ" ইত্যত্র 'স্থানে' ইতি বর্ত্তমানে পুনঃ স্থানগ্রহণস্য প্রয়োজনম্— 'যত্রানেক বিধমান্তর্য্যং তত্র স্থানত আন্তর্য্যংবলীয়ো ভবতি' ইতি ॥

ভাষ্যানুবাদ। (পরে) বলা হইবে (যে), ["ষষ্ঠী স্থানে-যোগা" (পা. ১. ১. ৪৯) এই পূর্বসূত্র হইতে] 'স্থানে' (পদটি) অনুবৃত্ত হওয়া সত্ত্বেও "স্থানেঽন্তরতমঃ" (পা. ১. ১. ৫০) এই সূত্রে (পুনরায়) 'স্থানে' (শব্দ) উচ্চারণের প্রয়োজন (হইতেছে এই যে,)— "যেখানে বহুপ্রকার সাদৃশ্য (সম্ভব, যেখানে) স্থান-সাদৃশ্যই অধিকতর বলবৎ ॥"

টিপ্পনী। সিদ্ধান্তী এক্ষণে একদেশীর পূর্বোক্ত বিরুদ্ধ যুক্তি খণ্ডন করিতেছেন। সংবৃত অ-কারের স্থানে প্রযত্নভেদ সত্ত্বেও বিবৃত দীর্ঘ ও প্লুত অ-কারই আদেশ হইবে, ভিন্ন স্থান তুল্যপ্রযত্ন সংবৃত ঈ-কার বা উ-কার আদেশ হইবে না। কেন? ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন: 'স্থানেঽন্তরতমঃ" (পা. ১. ১. ৫০) সূত্রে সূত্রকার বিধান করিয়াছেন যে, স্থানীর সহিত যে আদেশের স্থান, অর্থ, গুণ ও প্রমাণ প্রভৃতি বিষয়ে সর্বাধিক সাদৃশ্য বা আন্তরতম্য আছে, সেই স্থানীর স্থানে সেই আদেশই হইবে। কিন্তু ইহা লক্ষণীয় যে, যদিও "ষষ্ঠী স্থানেযোগা" এই অব্যবহিত পূর্বসূত্র হইতে 'স্থান' এই পদটি ১. ১. ৫০ সূত্রে অনুবৃত্ত হইতেছে, তথাপি সূত্রকার ১. ১. ৫০ সূত্রে পুনরায় 'স্থানে' পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার কারণ কি? ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, 'স্থানে' পদের অনুবৃত্তি সত্ত্বেও যে সূত্রকার ১. ১. ৫০ সূত্রে পুনর্বার 'স্থানে' পদ উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহার দ্বারা তিনি ইহাই জ্ঞাপন করিতে চাহিয়াছেন যে, যেখানে একটি স্থানীর সহিত বিভিন্ন বর্ণের স্থান, অর্থ, গুণ, প্রমাণ প্রভৃতি অন্যতম ধর্মবশে যুগপৎ সাদৃশ্য বর্তমান আছে, সেখানে যাহার সহিত স্থানীর উচ্চারণ স্থানগত সাম্য বিদ্যমান আছে, তাহাই আদেশ হইবে, গুণ প্রমাণাদিকৃত সাদৃশ্য স্থান সাদৃশ্য অপেক্ষা দুর্বল। স্থানসাম্যই সর্বাপেক্ষা প্রবল। সুতরাং "যত্রানেকবিধমান্তর্যং তত্র স্থানত আন্তর্যং বলীয়ঃ" এই পরিভাষাটি "স্থানেঽন্তরতমঃ" সূত্রে পুনরায় 'স্থানে' গ্রহণের দ্বারা সূত্রকার কর্তৃক জ্ঞাপিত হইয়াছে। অতএব এই জ্ঞাপকসিদ্ধ পরিভাষা অনুসারে বর্তমানক্ষেত্রেও 'সংবৃত' অ-কারের স্থানে ভিন্ন প্রযত্ন হইলেও তুল্যস্থান 'বিবৃত' দীর্ঘ ও প্লুত অ-কারই আদেশ হইবে, একদেশি-শঙ্কিত ভিন্নস্থান তুল্যপ্রযত্ন 'সংবৃত' ঈ-কার কিংবা উ-কার আদেশ হইবে না। যেহেতু প্রযত্নসাম্য অপেক্ষা স্থানসাম্যই প্রবলতর। উক্ত পরিভাষা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার "স্থানেঽন্তরতমঃ" (পা. ১. ১. ৫০) সূত্রস্থ ভাষ্যে করা হইবে ॥

যদিও সিদ্ধান্তী এই বলিয়া একদেশীর আপত্তি খণ্ডন করিতে পারিতেন যে, একদেশি-

কর্তৃক প্রতিপাদিত ঈ-কার কিংবা উ-কারের সংবৃতত্ব সর্ববাদিসম্মত নহে, (সামবেদীয়) শাখাবিশেষ মাত্রেই প্রসিদ্ধ ; সুতরাং ঐ প্রমাণের উপরে ভিত্তি করিয়া একদেশী যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না, তথাপি একদেশীর আপত্তি মানিয়া লইয়াই উপরি-উক্ত সমাধানই ন্যায্য বলিয়া তাহাই সিদ্ধান্তী কর্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে ॥ তুলনীয়—

"যদ্যপি শাখাবিশেষনিয়তং তদিতি নায়ং দোষো যুক্ত ইতি যুক্তং স্ববচং তথাপি তমভ্যুপেত্যাপি সিদ্ধান্তী বাস্তবং সমাধানমাহ—বক্ষ্যতীতি ॥"—ছায়া ॥

(ইতি বিবৃতত্ব প্রতিজ্ঞানিরূপণ সমাপ্ত)

[ক্রমশঃ

হিন্দু মেলার বিবরণ

পূর্বানুবৃত্তি

শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় সংকলিত

দ্বিতীয় অধিবেশনের ঠিক এক বৎসর পরে ১৭৯০ শকে বাংলা ১২৭৫ সনের ৩০ চৈত্র তারিখে হিন্দুমেলার যে তৃতীয় অধিবেশন হয় তাহার কার্যবিবরণ এইখানে পুনর্মুদ্রিত হইল।[১]

তৃতীয় অধিবেশনে ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই বৎসরের মেলায় বহুবিধ দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল।

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত গানগুলি গীত হয়।—

মিলে সব ভারত সন্তান[২]। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সতত রত হও যতনে।
লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে[২]। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর
হের আজ কি সুখের মেলা।
কবে উদিবে সৌভাগ্য ভানু ভারতবরষে।
উঠ উঠ সকলে হে ভারত সন্তান[২]।
এ দেশের দুখে কার না সরে চখের জল[২]।
ছাড় হে অসার অলস, প্রস্তুত হও লভিতে যশ[২]।
উঠ ভারত কুমার সবে, ঘুমালে আর বল কি হবে।
বিলম্ব আর করো না, বিলম্ব কেন করিয়ে কর কাল হরণ।
আর কত দিন, হয়ে মানহীন, রহিবে ভারতবাসি।

ইহা ভিন্ন পরিশিষ্টে 'পুরস্কৃত রচনাবলী'[৩], মনোমোহন বসু প্রদত্ত 'হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য বিষয়ক বক্তৃতা'[৪] এবং '১৭৯০ শকের হিন্দুমেলার আয় ব্যয় বিবরণ' মুদ্রিত হয়।

---

১. কার্যবিবরণটি এক কপি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে আছে। জাতীয় গ্রন্থাগারেও এক কপি আছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১+পরিশিষ্ট ১০৮+৵০—১৵০, ডিমাই সাইজ।

২. এই গানকয়টি পূর্ব অধিবেশনেও গীত হয়। দ্বিতীয় বর্ষের কার্যবিবরণে স্থান পাওয়ায় বর্তমান কার্যবিবরণ পুনর্মুদ্রণকালে এই গান কয়টির প্রথম ছত্র মাত্র উদ্ধৃত হইল।

৩. নীতিবিষয়ক উদ্ভট শ্লোক। কৈলাসচন্দ্র শর্মা
ভারত মেরুন্নতি বিষয়িণী সংস্কৃত রচনা।

রামায়ণের মর্ম ও তদন্তর্গত নীতি। রজনীকান্ত গুপ্ত
মহাভারতের মর্ম ও তদন্তর্গত নীতি। জানকীনাথ দত্ত
ক্ষত্রিয় জাতির দেশপ্রিয়তা ও সাহসিকতা (কবিতা)।
যন্ত্র বিজ্ঞান।
দ্রব বিজ্ঞান।
দৃষ্টি বিজ্ঞান।
তাড়িত বিজ্ঞান। উদয় চন্দ্র বসু
সঙ্গীত বিষয়ক প্রবন্ধ। গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়
গুরু পাঠশালার উৎকর্ষবিধান। উমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

৪. মনোমোহন বসু, বক্তৃতামালা, 'তৃতীয় বার্ষিক চৈত্রমেলায় মেলার কর্তব্য-বিষয়ক বক্তৃতা', পৃ ১৪-২৭

হিন্দু মেলার কার্য্যবিবরণ।

১৭৯০ শক

৩০এ চৈত্র সংক্রান্তি দিবসে হিন্দুমেলার তৃতীয় অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করেন। পরে উদ্বোধন স্বরূপ সংস্কৃত শ্লোক পঠিত হইলে পুরস্কৃত এবং অন্যান্য রচনাবলী রচয়িতাগণ দ্বারা পঠিত হইল। মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত ও সমবেত বাদ্য হইয়াছিল।

মেলায় বহুসংখ্যক দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল। নিম্নে তাহার প্রকার-ভেদগত নামোল্লিখিত হইতেছে।

শিল্প।

(১) স্ত্রীলোকদিগের স্বচিনির্মিত পশমের ও পুঁতির কার্য্য।
(২) ছাঁচ ও খয়েরের গঠন।
(৩) জামা, চাপকান্, রুমাল, পেশোয়াজ, উড়নী, সাটী, ইত্যাদি।
(৪) কুম্ভকারদিগের নির্ম্মিত নানাবিধ ফল।
(৫) নদীয়ার বাজার।
(৬) নানাপ্রকার পুতুল।
(৭) চিত্র।
(৮) বারাণসী কাপড়।
(৯) চীনদেশীয় নানাপ্রকার রেশমী কাপড়।
(১০) ঢাকাই স্বর্ণকারদিগের নানাপ্রকার রূপা ও সোনার গঠন।
(১১) নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র।
(১২) নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র।
(১৩) ফোয়ারা।
(১৪) ভাস্করীয় প্রতিমূর্ত্তি।

—

উদ্ভিজ্জাদি।

ফল। ফুল। মূল।
চারা। শস্য। বীজ।

—

কৃষি ও শিল্পকরণ যন্ত্রাদি।

লাঙ্গল।

চরখা।

তাঁত।

যে সকল কৌতুকাবহ ও প্রয়োজনোপযোগী ক্রিয়া প্রদর্শন হইয়াছিল, তাহা এই—

রাসায়নিক ক্রিয়া।

কুস্তী।

অশ্বচালন।

পাইকের খেলা।

বাঁশ বাজী।

বেদের বাজী।

ভেল্‌কী।

—

নিম্নলিখিত গানগুলি গীত হইয়াছিল।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

মিলে সবে ভারত সন্তান,

—

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঝাঁপতাল।

সতত রত হও যতনে, দেশহিত সাধনে
এক মত ভাব ধরি, একতানে।
অতুল বলমিলন হয়, সফল হয় মনন চয়,
বিমল সুখ সলিল বয়, বিদ্যমানে॥
কি ছিল গুণ কি হল বল, কি হল সব বিভব বল,
ধিক জনম ধন বিফল হীন মানে।
বিনয় করি বচন ধর, খল অলস গরল হর,
যশ কুসুম চয়ন কর, পুলক প্রাণে॥ ২॥

—

রাগিণী বাহার—তাল জৎ।

লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে।

—

রাগিণী দেশ—তাল ঠেওট।

হের আজ কি সুখের মেলা।
এই মেলা আনন্দেরি মেলা।
স্বজাতীয় মেলা দরশন মেলা মেলা মহা মেলা।
সব মনে মেলা অদ্ভুত মেলা গুণি গণ গুণ মেলা॥
স্বদেশেরি হিত সাধিলে প্রীত কেন কর অবহেলা॥
নিরাশ তরঙ্গে ভাব কি আতঙ্কে পাবে ভরসা ভেলা॥
থাকিয়ে নীরবে ফল বা কি হবে যতন কর এই বেলা॥

—

রাগিণী মুলতান—তাল একতাল।

কবে উদিবে সৌভাগ্য ভানু ভারতবরষে।
পোহাইবে দুঃখ নিশা প্রভাত পরশে॥
সভ্যতা সরোজ লতা, প্রাপ্ত হবে প্রবলতা,
প্রস্ফুটিবে সুখাম্বুজ, মানস সরসে।
উন্নতি মরাল কুলে, ভ্রমিবে সলিলে কূলে,
প্রকৃতি প্রমোদ ভুলে, হাসিবে হরিষে॥
উৎসাহেরি উপবনে, একতার সুপবনে,
কামনা কুসুম কলি ফুটিবে সরসে ;—
দেশ-হিতাকাঙ্ক্ষি জনে, অলি সম সদাক্ষণে,
মাতিবে মোহিত হোয়ে মধুময় রসে॥

—

রাগিণী সিন্দুরা—তাল ধামাল।

উঠ উঠ সকলে হে ভারত সন্তান।

—

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল একতালা।

এ দেশের দুখে কার না সরে চখের জল

—

রাগিণী বরজ—তাল একতালা।

ছাড় হে অসার অলস, প্রস্তুত হও লভিতে যশ।

—

রাগিণী দেশ—তাল জৎ।

উঠ ভারত কুমার সবে, ঘুমালে আর বল কি হবে।
একতার সে তার কি মনে নাই, কি ছিলে আহা একি হলে ভাই,
যাবে হে শোকেরি তম রাশি জাগো কতেক ভারতবাসি,
আর এ ঘুমে লোকে কি কবে॥
যবে সৌভাগ্যের সূর্য্য উদিবে, দুঃখ কুমুদী নয়ন মুদিবে,
সুখ সরসিজ দলে ফুটিবে, পুনঃ সবে,
একতায় রবে হে গৌরবে॥

—

রাগিণী দেশ খাম্বাজ—তাল একতাল।

বিলম্ব আর করোনা, বিলম্ব কেন করিয়ে কর কাল হরণ
না লভি সুখ সার।
সকলে মিলি করি সুযতন, উন্নত কর বিনত বদন,
পর পর গলে চারুরতন নির্ম্মল যশোহার।
জনম ভূমি ছিন্ন ভিন্ন, ক্রমশ নিরখি মলিন শীর্ণ,
কেবল দুখ সলিলপূর্ণ তোষয় মন তার।
হইবে কত বিগতমান, অবিরত হও যতনবান,
কেন বধির জন সমান, বহিছ দেহ ভার॥

—

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতাল।

আর কত দিন, হয়ে মান হীন, রহিবে ভারতবাসি।
কর দেশের হিত সাধনা, হবে অশেষ সুখ ঘটনা,
ভেবনা ভেবনা হরিবে ভাবনা রবে না
যাতনা রাশি।
জনম ভূমির বিষন্ন শরীর, হেরে আঁখি নীরে ভাসি,
থাকিতে সন্তান মায়ের অপমান, এ দুখ কাহারে ভাসি।
ধিক জীবনে কি কায, বদন দেখাতে না হয় লাজ,
গর্ব্ব করিয়ে সভ্য সমাজ, কহে কত উপহাসি॥

—

যে সকল রচনা পুরস্কৃত হইয়াছিল, তাহা পরিশিষ্টে দৃষ্ট হইবে।
রচয়িতাদিগের নাম ও পুরস্কার স্বরূপ অর্থসংখ্যা পরপৃষ্ঠায় লিখিত হইতেছে।

শ্রীকৈলাশচন্দ্র শর্ম্মা	২৫৲
শ্রীতারাকুমার চক্রবর্ত্তী	৫০
শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত	১০
শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৬
শ্রীজানকীনাথ দত্ত	২০
শ্রীউদয়চন্দ্র বসু	১০০
শ্রীগঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়	৫০
শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২৫

স্ত্রী-শিল্পজাত অনেকগুলি দ্রব্য উপস্থিত হইয়াছিল। যে সকল দ্রব্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্থির হয়, তাহার নির্ম্মাত্রীদিগকে হিন্দুমেলার নামাঙ্কিত এক একটী রৌপ্য-মুদ্রা পারিতোষিক-স্বরূপ প্রদত্ত হয়। তাঁহাদের পরিচয় নিম্নে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

মৃত বাবু আশুতোষ দেবের পরিবার	১
শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ দত্তের পরিবার	১
„ „ রাজেন্দ্র মিত্রের পরিবার	১
„ „ সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিবার	১
„ „ দীননাথ বসুর পরিবার	১
„ „ নীলকমল মিত্রের পরিবার	১
„ „ মণিমোহন মল্লিকের পরিবার	১
„ „ ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পরিবার	১
„ „ হরিবল্লভ বসুর পরিবার	১
„ „ প্রসন্নকুমার মিত্রের পরিবার	১
শ্রীমতী সতী দেবী	১
কোন্নগর বালিকাবিদ্যালয়	১

নদীয়ার একজন কুম্ভকারকে মৃত্তিকানির্ম্মিত দ্রব্যের জন্য এক রৌপ্য-মুদ্রা প্রদত্ত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন সুরপুরা বাদ্যযন্ত্রের নিমিত্ত একটী রৌপ্য-মুদ্রা* প্রদত্ত হয়।

ব্যায়াম-নৈপুণ্যের নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যায়ামবিদ্যালয়ে এক একটী ঐরূপ রৌপ্য-মুদ্রা প্রদত্ত হয়।

শ্যামবাজার—ব্যায়ামবিদ্যালয়	১
শ্যামপুকুর „	১*
বাহিরসিমুলিয়া „	১

*গচ্ছিত আছে।

শ্রীযুক্তবাবু অম্বিকাচরণ গুহ অশ্বচালন-নৈপুণ্যের নিমিত্ত সাধারণের নিকট যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেন।

শ্যামপুকুর, ঝামাপুকুর ও যোড়াসাঁকোর সমবেত বাদ্যকারিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন, মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত ও সমবেত বাদ্য হইয়াছিল। তাঁহারা সাধারণের নিকট বিশেষ যশোলাভ করেন।

শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্র মল্লিক রায় বাহাদুর যে মৃত্তিকানির্ম্মিত ফল সকল প্রদর্শন করেন, তজ্জন্য তিনি পুরস্কার অভিলাষ করেন না। তিনি সাধারণের নিকট ধন্যবাদ প্রাপ্ত হয়েন।

শ্রীযুক্তবাবু নিতাইচাঁদ যে স্ত্রীলোকদিগের সূচিনির্ম্মিত কার্য্যের উৎসাহ নিমিত্ত রৌপ্য-মুদ্রা প্রদান করেন, তন্নিমিত্ত তিনি সাধারণের নিকট বিশেষ ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উদ্যানপালক মালিগণ যে সকল দ্রব্য প্রদর্শন করিয়াছিল, তজ্জন্য ২৯৭ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হয়।

—

পরিশিষ্ট।

পুরস্কৃত রচনাবলী

নীতিবিষয়ক উদ্ভটশ্লোক।

বাঞ্ছা সজ্জনসঙ্গমে পরগুণে প্রীতির্গুরৌ নম্রতা
বিদ্যায়াং ব্যসনং স্বযোষিতি রতির্লোকাপবাদাদ্ভয়ম্।
ভক্তিশ্চক্রিণি শক্তিরাত্মদমনে সংসর্গমুক্তিঃ খলে
এতে যত্র বসন্তি নির্ম্মল গুণাস্তেভ্যো নরেভ্যো নমঃ॥ ১
সনোপুমান্ যোনগুণৈরলঙ্কৃতঃ ন তে গুণাঃ যে জনয়ন্তি নো যশঃ।
ন তদ্যশো যত্র বুধৈর্ন গীয়তে, নতে বুধাঃ সৎসু ন যেঽনুরাগিণঃ॥ ২
নীতির্ভূমি ভুজাং নতির্গুণবতাং হ্রীরঙ্গনানাং ধৃতি-
র্দম্পত্যোঃ শিশবো গৃহস্য কবিতা বুদ্ধেঃ প্রসাদো গিরাম্।
লাবণ্যং বপুষঃ স্মৃতিঃ সুমনসাং শান্তির্দ্বিজস্য ক্ষমা
শক্তস্য দ্রবিণং গৃহাশ্রমবতাং স্বাস্থ্যং সতাং মণ্ডনম্॥ ৩
দাক্ষিণ্যং স্বজনে দয়া পরিজনে শাঠ্যং সদা দুর্জ্জনে
প্রীতিঃ সাধুজনে ক্ষমা গুরুজনে নারীজনে ধূর্ত্ততা।
শৌর্য্যং শত্রুজনে স্ময়ঃ খলজনে বিদ্বজ্জনে চার্জ্জবম্
যেত্বেবং পুরুষাঃ কলাসু কুশলা স্তেষ্বেব লোকঃ স্থিতঃ॥ ৪
ধর্ম্মঃ প্রাগেব চিন্ত্যঃ সচিবমতি গতির্ভাবনীয়া সদৈব
জ্ঞেয়ং লোকানুবৃত্তং বরচরনয়নৈর্মণ্ডলং বীক্ষণীয়ম্।
প্রচ্ছাদ্যৌ রাগ রোষৌ মৃদুপরুষগুণৌ যোজনীযৌচ কালে
আত্মা যত্নেন রক্ষ্যোরণশিরসি পুনঃ সোপি নাপেক্ষণীয়ঃ॥ ৫
উৎখাতান্ প্রতিরোপয়ন্ কুসুমিতাংশ্চিন্বন্ শিশূন্ বর্দ্ধয়ন্
প্রোত্তুঙ্গান্ নময়ন্ নতান্ সমুদয়ন্ বিশ্লেষয়ন্ সংহতান্।
তীব্রান্ কণ্টকিনো বহির্নিয়ময়ন্ ম্লানান্ মুহুঃ সেচয়ন্
মালাকার ইব প্রয়োগনিপুণোরাজা চিরং নন্দতু॥ ৬
কার্পণ্যেন যশঃ ক্রুধা গুণচয়ো দম্ভেন সত্যং ক্ষুধা
মর্য্যাদা ব্যসনৈর্ধনানি বিপদা স্থৈর্য্যং প্রসাদৈর্দ্বিজঃ।
পৈশুন্যেন কুলং মদেন বিনয়ো দুশ্চেষ্টয়া পৌরুষং
দারিদ্র্যেণ জনাদরো মমতয়া চাত্মপ্রকাশো হতঃ॥ ৭

মূর্খোশান্তস্তপস্বী ক্ষিতিপতিরলসো মৎসরো ধর্ম্মশীলো
দুঃস্থোমানী গৃহস্থঃ প্রভুরতিকৃপণঃ শাস্ত্রবিদ্ধর্ম্মহীনঃ।
আজ্ঞাহীনো নরেন্দ্রোঽশুচিরপি সততং যঃ পরান্নোপভোগী
বৃদ্ধোরোগী দরিদ্রঃ সচ যুবতিপতির্ধিগ্‌বিড়ম্ব প্রকারম্ ॥ ৮
বিদ্বান্ সংসদি পাক্ষিকঃ পরবশো মানী দরিদ্রোগৃহী
বিত্তাঢ্যঃ কৃপণঃ সুখী পরবশোবৃদ্ধো নতীর্থাশ্রিতঃ।
রাজা দুঃসচিবপ্রিয়ঃ কুলভবো মূর্খঃ পুমান্ স্ত্রীজিতো
বেদান্তী হতসৎক্রিয়ঃ কিমপরং হাস্যাস্পদং ভূতলে ॥ ৯
দুর্মন্ত্রিণং কমুপযান্তি নৃপং ন দোষাঃ সন্তাপয়ন্তি কমপথ্যভুজং ন রোগাঃ।
কংশ্রীর্ন দর্পয়তি কং ন নিহন্তি মৃত্যুঃ কংস্ত্রীকৃতা ন বিষয়া নমু তাপয়ন্তি ॥১০
অবলা যত্র প্রবলা মন্ত্রী যত্র নিরক্ষরঃ।
অন্ধকস্কন্ধলগ্নস্য বিঘ্ন স্তস্য পদে পদে ॥১১
লোভোপ্যস্তি গুণেন কিং পিশুনতা যস্যাস্তি কিংপাতকৈঃ
সৌজন্যং যদি পরৈঃ সুমহিমা যস্যস্তি কিং মণ্ডনৈঃ।
সত্যং চেত্তপসা চ কিং শুচিমনো যস্যস্তি তীর্থৈন কিং
সদ্বিদ্যা যদি কিং ধনৈপযশো যস্যস্তি কিং মৃত্যুনা ॥১২
দানং দরিদ্রস্য প্রভোশ্চ শান্তির্যুনাংতপো জ্ঞানবতাঞ্চ মৌনম্।
ইচ্ছা নিবৃত্তিশ্চ সুখাসিতানাং দয়াচ ভূতেষ্ দিব্য নয়ন্তি ॥১৩
বরং দরিদ্রমন্যায় সম্ভাবাদ্বিভবাদপি।
কৃশতানুমতা দেহে স্থূলতা নতু শোথজা ॥১৪
ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং ত্যজতি ন পুনশ্চন্দনঞ্চারুগন্ধং
দগ্ধং দগ্ধং ত্যজতি ন পুনঃ কাঞ্চনং কান্তমূর্তিম্।
ছিন্নং ছিন্নং ত্যজতি ন পুনঃ স্বাদুতামিক্ষুদণ্ডং
প্রাণান্তেঽপি প্রকৃতিবিকৃতির্জায়তে নোত্তমানাম্ ॥১৫
জাতঃ সূর্ধকুলে পিতা দশরথঃ ক্ষৌণীভুজামগ্রণীঃ
সীতা সত্যপরায়ণা প্রণয়িনী যস্যানুজোলক্ষ্মণঃ।
দোর্দণ্ডেন সমো নচাস্তি ভুবনে প্রত্যক্ষবিষ্ণুঃ স্বয়ম্
রামো যেন বিড়ম্বতোপি বিধিনা চান্তে পরে কা কথা ॥১৬
কাব্যে ভব্যতমেপি বিজ্ঞনিবহৈরাস্বাদ্যমানে মুহু-
র্দোষান্বেষণমেব মৎসরযুষাং নৈসর্গিকো দুগ্রহঃ।
কাসা রেপি বিকাশিপঙ্কজচয়ে খেলন্মরালে পুনঃ
ক্রৌঞ্চশ্চঞ্চুপুটেন কুঞ্চিতবপুঃশম্বূকমন্বেষতে ॥১৭

গুণ দোষৌ বুধো গৃহ্ণন্নিন্দু ক্ষেড়াবিবেশ্বরঃ।
শিরসা শ্লাঘাতে পূর্ব্বং পরং কণ্ঠে নিয়চ্ছতি ॥১৮
গুণায়ন্তে দোষাঃ সুজনবদনে দুর্জ্জনমুখে / গুণা দোষায়ন্তে ব্যভিচরতি
নৈবং কচিদপি। যতো জীমূতোয়ং লবণজলধের্বারি মধুরং /
ফণী পীত্বা ক্ষীরং বমতি গরলং দুঃসহতরং ॥১৯
পূর্ণোপি গুণযুক্তোঽপি কুম্ভঃ কূপে নিমজ্জতি।
তস্য ভারসহো নস্যাদ্ গুণস্য গ্রাহকো যদি ॥২০
আরোপ্যতেঽশ্মা শৈলাগ্রে কৃচ্ছ্রেণ মহতা যথা
নিপাত্যতে সুখেনাধস্তথাত্মা গুণদোষয়োঃ ॥২১
উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্বিভাগে / বিকসতি যদি
পদ্মং পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে। প্রচলিত যদি মেরুঃ শীততাং
যাতি বহ্নি / র্নচলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ ॥২২
প্রথমবয়সি দত্তং তোয়মল্পং স্মরন্তঃ / শিরসি
নিহিতভারান্নারিকেলা বহন্তঃ / সলিলমমৃতকল্পং
দদ্যুরাজীবনান্তং / নহি কৃতমুপকারং সাধবো
বিস্মরন্তি ॥২৩
সাধ্বীস্ত্রীণাং দয়িত বিরহে মানিনাং মানভঙ্গে
সল্লোকানামপি জনরবে নিগ্রহে পণ্ডিতানাম্।
অন্যোদ্রেকে কুটিলমনসাং নির্গুণানাং বিদেশে
ভৃত্যাভাবে ভবতি মরণং কিঞ্চ সম্ভাবিতানাম্ ॥২৪
গিরৌ কলাপী গগনে পয়োদা লক্ষান্তরেঽর্কশ্চ জলেষু পদ্মাঃ॥
ইন্দুর্দ্বিলক্ষে কুমুদস্য বন্ধু র্যো যস্য মিত্রং নহিতস্য দূরম্ ॥২৫
উৎকৃষ্ট মধ্যমনিকৃষ্ট জনেষু মৈত্রী / যদ্বচ্ছিলাসু সিকতাসু
জলেষু রেখা। বৈরং ক্রমাদধম মধ্যম সজ্জনেষু /
যদ্বচ্ছিলাসু সিকতাসু জলেষু রেখা ॥২৬
বেদং বেদ ন কোঽপি ভূধরদরীলীনা মুনীনাং গিরঃ
স্বচ্ছং ম্লেচ্ছমতং জনাস্তদনুগাঃ কা নাম ধর্ম্ম্যাঃ ক্রিয়াঃ।
মন্ত্রং হন্তমতীব বারবনিতাঃ সেব্যা নগুর্ব্বাদয়ঃ
কিং কার্য্যং পরিশিষ্টমস্তি ভবতো জানামি নাহং কালে ॥ ২৭
কিন্তেন হেমগিরিণা রজতাদ্রিণা বা যত্র স্থিতা হি তরবস্তরবস্ত এব।
বন্দামহে মলয়মেব যদাশ্রয়েণ শাকোট নিম্বকুট জান্যপি চন্দনানি ॥২৮
সিংহক্ষুণ্ণ করীন্দ্রকুম্ভগলিতং রক্তাক্ত মুক্তাফলম্ / কান্তারে বদরী
ধিয়া দ্রুতমগাদভিল্লস্য পত্নীমুদা। পাণিভ্যামগৃহ্য

শুক্লকঠিনং তদ্বীক্ষ্যদূরে জহা বস্থানে পততামতীব
মহতামেতাদৃশীস্থাদ্‌গতিঃ ॥ ২৯
ছেদশ্চন্দন চূতচম্পকবনে রক্ষা চ শাকোটকে
হিংসা হংস কোকিল কুলে কাকেষু নিত্যাদরঃ
মাতঙ্গেন খরক্রয়ঃ সমতুলা কর্পূর কার্পাসয়ো
রেষা যত্র বিচারণা গুণিগণে দেশায় তস্মৈ নমঃ ॥৩১
ব্যোম্নৈকান্তবিহারিণোপি বিহগাঃ সংপ্রাপ্নুবন্ত্যাপদং
বধ্যন্তে নিপুণৈরগাধসলিলান্মৎস্যাঃ সমুদ্রাদপি।
দুর্নীতে হি বিধৌ কিমস্তি চরিতং কঃ স্থানলাভে
গুণঃ কালোহি ব্যসনপ্রসারিত করো গৃহ্ণাতি দূরাদপি ॥৩২
বিদ্যা শিক্ষণদায়িনাসতিতরাং রাজ্ঞাং প্রতাপঃ সতাং
সত্যং স্বল্পধনস্য সঞ্চিতিরসদ্বৃত্তস্য বাগাড়ম্বরঃ।
সাচারস্য মনোদমঃ পরিণতের্বিদ্যা কুলসৈকতা
সর্ব্বেষাং ধনমুন্নতের্গুণচয়ঃ শাস্ত্রেবিবেকোবলম্ ॥৩৩
গুরুজনপরিচর্য্যা ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যলজ্জা গৃহকরণনিবেশঃ
স্বামিনি প্রেমভক্তিঃ। ইতি কুলরমণীনাং বর্ত্ম জানন্তি
সর্ব্বা রিপুকরণপরাস্তা যান্তি মার্গানতীতাঃ ॥৩৪
রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং স্তুত্যা
নির্ব্বচনীয়তাঽখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া। ব্যাপিত্বঞ্চ
বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা ক্ষন্তব্যং জগদীশ
তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মংকৃতম্ ॥৩৫

শ্রীকৈলাসচন্দ্র শর্ম্মা।
হেয়ার স্কুল, কলিকাতা।

ভারতভূমেরুন্নতিবিষয়িণী সংস্কৃত রচনা।

(বিদ্যা।)

পূর্ব্বৈঃ সুরিভিরত্র ভারতমহোদ্যানে চিরং রোপিতা
বিদ্যামূলবতী মহোন্নতিলতা জ্ঞানপ্রসূনোজ্জ্বলা।
তস্যাঃ সেবিতুমস্তিচেৎ সুখফলং বাঞ্ছা হৃদি ভ্রাতরঃ
তন্মূলংমিয়তং প্রযত্নসলিলৈঃ সিঞ্চন্তুসর্ব্বে তদা ॥

পুরা কিল সকলধরাতলললামভূতেয়ং ভারতভূমিঃ প্রসবভূমিরশেষ বিদ্যানাংসুগৃহীতনামভির্যশঃশশাঙ্ক ধবলীকৃতদিঙ্‌মণ্ডলৈরপক্ষপাতিভিরপি গুণপক্ষপাতিভির্মহারাজাধিরাজিভিরাজিভির্ব্বিরাজিতা প্রত্যাদেশোঽশেষদেশানামাসীৎ,

পুপোষচ কামপ্যলোকসাধারণীমভিখ্যাং, তদাহিজন্মভূমিরস্মাকমালোকেনেব দর্শনৈকহেতুনা গৌতমেন ভাস্করেণেব সকললোকতমোহারিণা ভাস্কারাচার্য্যেণ মহেশ্বরেণ কুমারসম্ভবকারিণা কালিদাসেন রামচন্দ্রেণেব মহাবীর চরিতবিশ্রুত-কীর্ত্তিনা ভবভূতিনা রত্নাকরেণেব রত্নাবলীং জনয়তা শ্রীহর্ষেণ অমরনাথে নেবামরকোষাধিকারিণামরসিংহেন এবমমরনগরীবা-পরৈর্ব্বিবিধবিবুধনিবহৈঃ-পরিবৃতা, সমারুরোহকামপ্যনুপমেয়মভ্যুদয়পদবীং।

অথ গচ্ছতা কালেনাস্মাকমতীবভাগ্যদোষবশাদতিদুর্দ্দান্তচেষ্টিতৈর্যবন-ভূপতিভিঃ পুণ্যভূমিরিয়স্মাকং ভারতভূমিরধিকৃতা। ততোঽতিদুর্ব্বৃত্তৈস্তৈর্জলদা-বলীবোৎপাতবাতৈঃ সুদূরমপসারিতাস্যাঃ সকল সৌভাগ্যসন্ততিঃ। এবমস্তমু-পাগতভারতসৌভাগ্যদিবাকরে কুতোঽপ্যাগত্যদৌর্ভাগ্যবিভাবরী নিখিলভারত-জনসুখালোকমেকপদেবিলোপমনয়ৎ। ততঃ প্রভৃতি-নিবিড়দুঃখতমোভিগ্রস্তাঃ সমস্তদিশোনিখিলবিদ্যাকমলিন্যশ্চাশরণাঃ সঞ্জাতাঃ।

কালেনাবসিতা সাস্মাকং চিরদৌর্ভাগ্যরজনী। সাম্প্রতমস্মৎপুণ্য পরম্পরয়া ভারতাম্বরে প্রতাপভানুরিংলণ্ডীয়ানামুলুকানিবকুতোঽপ্যসার্য্য তান্ যবনরাজহত কানুন্মীলয়ন্ প্রজাচয়হৃদয়কমলানিবিস্তারয়ন্ দিশিদিশি সুখকিরণানি সমুদিতঃ। অধুনেয়ঃ ভারতভূমির্যবনহস্তমুক্তা শশিকলেব রাহুবদনবিবরবিনির্গতা কৌমুদীব জলধরনিকরোপরোধশূন্যা দিনকরপ্রভেব নিবিড়কুজ্ঝটিকাজালবহির্গতা পুনঃশোভা-তিশয়ং পুষ্ণাতি। বিদ্যাপি রাজপুরুষগণানুরাগেণ নলিনীবদিবাকরকরেণ পুনরুজ্জৃম্ভতে।

কিন্ত্বধুনা ব্যাকরণকাব্যাদিশাস্ত্রেষু প্রায়শোজনানামনুরাগবশাদ্দৃশ্যন্তে তান্যেব শাস্ত্রাণি প্রচরদ্রূপাণি। প্রকৃতকল্যাণমূলান্যধ্যাত্ম দর্শনবিজ্ঞানজ্যোতি-রাদীন্যন্যানি চ শাস্ত্রান্যোদ্ভিদ্যকৃষিবাণিজ্যরসায়নশিল্পাদীনি বিলুপ্ত-প্রায়ান্যেব লোকানুরাগবিরহাৎ। ন খলুকস্যচিদপি দেশস্য সমুন্নতির্ব্বিজ্ঞানাদিশাস্ত্রাণাং বহুলসমালোচনমন্তরেণ সম্ভাব্যতে। যদ্যনুসন্ধীয়ন্তে কারণানি সকলমহোদয়-শালিজনপদানামভ্যুদয়স্য তদাবিজ্ঞানাদিসমালোচনমেব কারণত্বেনোপলভ্যতে।

তদিদানীমিদমর্থয়ে ভবতো বিদ্যাবৃদ্ধি কর্ম্মনি নিযুক্তান্ রাজপুরুষান্ যদেতান্যপি শাস্ত্রাণি বিজ্ঞানকৃষিবাণিজ্যাদীনি সর্ব্বেষেব বিদ্যালয়েষু পাঠয়িতুমা-জ্ঞাপয়ন্তু ভবন্তঃ, তথা সত্যচিরেনৈব ভবিষ্যতি ভারতবর্ষীয়াণাং বিবৃতদ্বারমনন্ত-সৌভাগ্যং।

নিরবধিরভ্যুদয়ো ন খলু জাতিবিশেষং ব্যক্তিবিশেষং বয়োবিশেষং সময়বিশেষম্বা সমপেক্ষতে, তত্রসুশিক্ষিতানাং সর্ব্বজাতীয়ানাং সর্ব্বাবস্থানাং সর্ব্ববিধানামেব জনানাং সর্ব্বদৈবাবলম্বনীয়ঃ প্রযত্নঃ।

দেশোন্নতিরধুনা যথাস্মাস্বমধ্যে কৃতবিদ্যানাং প্রযত্নসাপেক্ষা তিষ্ঠতি

ভবিষ্যৎসময়েঽপি সা তথাস্মাকং কৃতবিদ্যবালকবালিকানামপেক্ষিষ্যতে যত্নং। অতত্রবাস্মদ্দেশীয়বালকবালিকানাং যেন সর্ব্বাংশে সুশিক্ষাভবতি স্বদেশহিতমাধিৎসুভিঃ পরিণামদর্শিভিরাদৌতথৈব সর্ব্বথা যতনীয়ং।

যাবদ্ভারতবর্ষীয়াঃ সর্ব্বে সততমৈকমত্যং ধর্ম্মাচারাদিষু, নির্ভীকতা ন্যায়ানুষ্ঠানে, দৃঢ়তাসৎকার্য্যেষু সুনিয়মোগৃহাশনবসনাদিষু অনুরাগো বলাধানকরে ব্যায়ামাদাবিত্যেতানি চান্যানি চ করণীয়ানি নাবলম্বন্তে তাবৎ সুদূরপরাহতা তেষাং মঙ্গলাশা বিফলা চ সকলশিক্ষা।

অহো! কোঽপিমহিমাতস্য জ্ঞান-তরোর্যস্য বিবেক-বিটপেষু জায়ন্তেঽনন্তসুকৃতফলানি। ধন্যাস্তে যে তেষাং ফলানাং পরমানন্দরসমহর্নিশ মাস্বাদয়ন্তো বিগলিতসকলদুঃখামোদন্তে। অয়ে! ভারতবাসিনো ভ্রাতরঃ!

যদিবাস্তুস্তি ভবন্তো জন্মভূমেরতিদৌর্ভাগ্যমলিনিমান মপনেতুং দুর্লভমানবজন্মগরিমানঞ্চ সংরক্ষিতুং তদা বিমলহৃদয়োদ্যানেষু কেবলমবিরল প্রযত্ন-সলিলধারয়া তমেকং জ্ঞান-পাদপং সংবর্দ্ধ্য তস্য পরমকল্যাণচ্ছায়ায়াং নিষণ্নাত্মানঃ। সততমতিসুভগসৌভাগ্যসমীরণংসেবমানা বিস্মৃতসংসারক্লেশাতপাঃ কমপ্যচিন্তনীয়ামননুভূতপূর্ব্বাং শান্তিরসমাধুরীমনুভবন্তু ভবন্ত।

ভারতভূমেরুন্নতিবিষয়িণী সংস্কৃত রচনা।

(ভাষা)

কাঠিন্যাভিধদুর্গদুর্গমমহাবিদ্যাপুরীবিদ্যতে
শান্তিঃকাপিচ কোঽপি তত্র পরমানন্দশ্চিরং রাজতে
তন্মধ্যে যদি গন্তুমস্তি ভবতামিচ্ছা নিতান্তং তদা
ভাষাজ্ঞানবিশালরম্যসুগমদ্বারং সদা সেব্যতাম্॥

স্বদেশোন্নতিবিধৌ জনানাং ভাষাজ্ঞানঞ্চান্যতমো হেতুঃ। ভাষাজ্ঞানসহচরং হি শাস্ত্রজ্ঞানং; অতএব সমীচীনভাষাজ্ঞানমন্তরেণ ন খলুকস্মিংশ্চিদপি শাস্ত্রে প্রবেশ এব সম্ভাব্যতে কুতএব ব্যুৎপত্তিঃ। শাস্ত্রজ্ঞানবিহীনানাঞ্চ স্বদেশোন্নতিচিকীর্ষানৈতি কদাচিদপি সফলতাং, যতস্তেষামনবগতশাস্ত্রার্থানি হৃদয়ানি স্বতএব মলিনীভবন্তি বহুলকুসংস্কারাদিদোষৈঃ, তাদৃশ দোষসঙ্কুলেষু হৃদয়েষু চ শশধরকিরণানীব পঙ্কিলজলেষু রত্নচয়মরীচয় ইবানধিগতশাণেষু মণিষু প্রতিফলন্তি নোপদেশা নীতয়শ্চ।

অস্মদ্দেশেঽধুনা যাঃ কাশ্চিদ্ভাষাঃ প্রচরদ্রূপা দৃশ্যন্তে সংস্কৃতভাষা প্রায়শস্তাসাং সর্ব্বসাম্যেব প্রসূতিঃ। অতএব প্রচলিতাসু বঙ্গীয়াদিকাসু ভাষাসু ব্যুৎপত্তিকামৈর্দ্দেশহিতৈষুভিঃ সর্ব্বপ্রযত্নেনাস্মাকমতিপ্রাচীনা সর্ব্বাবয়বসম্পন্না সংস্কৃত ভাষাবশ্যমেবাভ্যসনীয়া।

ইমাংখলু সংস্কৃতভাষাং পীযূষকুম্ভমিব ক্ষীরোদধির্মন্দারমিব নন্দনবনী গঙ্গামিব হিমালয়োঽস্মজ্জন্মভূমিরেব প্রথমংসূতবতী। যৎপ্রসবেণ ভারতজননী রত্নগর্ভেতি বিশ্রূয়তে জগতি। ন জানে ভাষায়া অস্যামস্তি কিমপিবশীকরণমন্ত্রং যেনেয় মতিবিশালজলনিধিজলমপ্যতীত্য বিদেশীয়ানামপি মনাংসি তথা মোহিতবতী যথা তে জাতিভাষাগৌরবমাপিবিস্মৃত্যামনন্যমনসো ভাষামিমাং পঠন্তি কামপ্যনু-ভবন্তি চানন্দরসবিহ্বলামবস্থাং।

পুরাকিল সংস্কৃতভাষা সমস্তভারতবর্ষে লৌকিকব্যবহারেষ্বপি প্রচলিতা বভূব। যবনরাজাধিকারে পুনরিয়ং রাজবশতাপন্নপ্রজানামনাদরপরিভূতা প্রায়শো বিলোপমবাপ। অধুনাতু কতিপয়ানামিংলণ্ডীয়সামাজিকানাং যত্নাতিশয়েন পুনস্তৎপ্রতিষ্ঠায়াঃ সূত্রপাতো লক্ষ্যতে। সাম্প্রতমস্মিন্ রমণীয়েঽ-বসরে বিলুপ্তপ্রায়েয়ং সংস্কৃতভাষা যথাপূর্ব্ববদুৎকর্ষপদবীমধিরোহেৎ যথাচ পূর্ব্ববন্মনোহরকলেবরধারিণী সকলসামাজিকানাং মনাংস্যানন্দরসসরসীষু নিমজ্জয়েৎ বিদ্যানুরাগিমহোদয়ৈর্ব্বিবিধবিষয়গোচরয়া রচনয়াসমালোচনেনান্যৈর্বিশেষৈশ্চ বহু-ভিরুপায়ৈঃ সর্ব্বথা তথৈব প্রযতনীয়মিতি।

অয়ি! সংস্কৃতভাষাজননি! বিমুঞ্চনিদ্রাং সাম্প্রতমবসিতপ্রায়াতে চির-দৌর্ভাগ্যবিভাবরী। পশ্য! রাজপুরুষগণোৎসাহকিরণৈর্বিকাসয়ন্ সহৃদয়হৃদয়-কমলান্যুদয়তি ভারতাম্বরতলে পুনস্তে সৌভাগ্যভানুঃ; শ্রূয়ন্তেঽধুনা সকল বিদ্যালয়োদ্যানেষু বালকবিহঙ্গমোচ্চারিতাঃ শ্রবণসুভগাঃ স্তবগুণগীতয়ঃ বিকির্য্য-ন্তেচ দিশি দিশি পণ্ডিত কুসুমজন্মানঃ সদ্গুণমধুরমকরন্দাঃ সদুপদেশবিমলানিলৈঃ। দেবি! পরমানন্দসন্দোহময়ি! সাম্প্রতমস্মিন্নতিরমণীয়ে মুহূর্ত্তে সকৃদুন্মীলয়তে তদেব নয়নং যেনাবলোকিতা ত্বয়া বাল্মীকিকালিদাসভবভূতিপ্রভৃতয়ঃ, অদ্য ত্বৎপুত্রাঃ পীযূষরসতিরস্কারি পীত্বা পীত্বা তব কাব্য-পয়োধররসমিহ ভূলোকেঽপি কামপ্যনুভবন্তু স্বর্লোকসুলভাং দশাং!

ভারতভূমেরুন্নতিবিষয়িণী সংস্কৃত রচনা।

(কৃষিঃ)

যেয়ং ভারতভূমিরুর্ব্বরতয়া জিত্ব সমস্তং জগৎ
সূতেদুর্লভশস্যরত্নমখিলং স্বল্পে প্রয়াসে কৃতে।
স্বাধীনং কৃষিকর্ম গৌরবকরং তস্যাবিহায়াধুনা
রে রে ভারতবাসিনঃ পরবশা হা ধিক্! কথংজীবথ॥

লোকোত্তরেণোর্ব্বরতাগুণেনৈব রত্নপ্রসবেতি ভারতভূমের্নাম। যেন গুণেনেয়ং কৃষিবিদ্যানভিজ্ঞানামপি কতিপয়ানাং স্বল্পবুদ্ধি কৃষকাণামতিসামান্য-

প্রয়াসে নৈবানন্তং শস্যরত্নং সূতে। যদিপুনরত্র লোকসংস্থিতিকরে স্বাধীনে কৃষিকর্ম্মণি বিদ্যাবন্তঃ কৃতধিয়োঽধুনা প্রযত্নম বলম্বন্তে তদা ন জানেঽস্মাকং জন্মভূমিরচিরেনৈব কামপ্যচিন্তনীয়ামলোকসাধারণীমুন্নতিসরণীমনুসরেৎ অসংশয়ঞ্চ দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্যাদিকমপি ন প্রভেদস্যাঃ সকলরত্নৈকভূমিরিতি ভুবনোজ্জ্বলং নাম দূষয়িতুং। কিন্তস্মদ্ভাগ্যদোষাৎ কেচিদনভিজ্ঞা নিকৃষ্টজনাএব তস্মিন্নতি-গুরুতরে কৃষিকর্ম্মণি নিযুক্তাঃ কৃতবিদ্যাস্তু মৃত্যুমিব দ্বিতীয়ং, পরভৃত্যভাবমেব গৌরবমিতিমন্যমানা নিঘৃণা ইব কাপুরুষাইব কালং নয়ন্তি! অহো! ধিগস্মাকং বিদ্যার্জ্জনং যস্যৈবম্বিধঃ পরিণামঃ।

ক্বয়ং বহুকুসংস্কারোপহতচিত্তবৃত্তয়ঃ ক্বচাস্মাকং নিখিলগুণভূময়ঃ পূর্ব্বপুরুষাঃ। বয়মধুনা নিজনিয়মচারাদি দোষৈস্তেভ্যোহীনতরাঃ কেচিদ্ভিন্নজাতীয়া ইব সঞ্জাতাঃ। নাসীদেবম্বিধ নীচতাস্মাকং মহাত্মনাং পূর্ব্বপুরুষাণাং, কৃষি-কর্ম্মাদিষু তেষামেব সর্ব্বথাযত্নাতিশয়েনেয়ং ভারতভূমির্জনানামসীমসুখ-সৌভাগ্যানি সূতবতী আসীত্তেষাং পরমশ্লাঘাকরেঽস্মিন্ কৃষিকর্ম্মণ্যে তাদৃশোঽনুরাগোযত্তে নিতান্তবিশ্বাসপদেষ্বপি করণীয়েষ্বপরান্ নিযোজ্য স্বয়মেব কৃষিং নির্ব্বাহয়ন্তিস্ম (১)।

ভারতবর্ষেঽস্মিন বহবোদৃশ্যন্তে দেবমাতৃকাঃ প্রদেশাঃ। কৃষিকর্ম্মণি তদ্দেশবাসিনঃ কৃষকাশ্চাতকাইব তৃষ্ণাতুরা জলদজলমেবাপেক্ষন্তে। এবং দৈববলম্বমানানাং তেষাং জনপদেষু বৃষ্টিজনিতশস্যনাশেন প্রায়েণ প্রতিবর্ষমেব শ্রূয়তে হৃদয়বিদারী দুর্ভিক্ষকৃতহাহারবঃ। এবম্বিধেষু দেশেষু যথাকালং সলিল-সেচনায় ক্ষেত্রেষু খাতকূপাদিকান্যবশ্যমেব করণীয়ানি। এবং কৃতে ন খলু তেষাং দৈবনিরপেক্ষাণা মাপতেয়ু স্তথাবিধাবিপদঃ প্রাণযাত্রাচ সর্ব্বেষাং নদীমাতৃকদেশ-বাসিনামিব বিনায়াসেনৈব ভবেৎ। তথাবিধখাতকূপাদি খননক্রিয়াপি ন কেবলং কতিপয়ানামল্পবুদ্ধি কৃষকাণাং চেষ্টয়া সম্ভবতি, সাহি তদ্দেশবাসিনাং ভূম্যধিকারিণামন্যেষাঞ্চ স্বদেশহিতব্রতদীক্ষিত সুশিক্ষিত জনানামপেক্ষতে যত্নং।

ভারতভূমেরুন্নতিবিষয়িণী সংস্কৃত রচনা।

(বাণিজ্যং)

সৌভাগ্যং যদি গৌরবং যদি পরাং খ্যাতিং সমৃদ্ধিং যদি
প্রাধান্যং যদি চান জাত্যসুলভং লব্ধু মতির্জায়তে।

---

(১) "পিতুরন্তঃপুরে দদ্যান্মাতুর্দদ্যান্মহানসে।
গোষু চাত্মসমংদদ্যাৎ স্বয়মেব কৃষিং ব্রজেৎ॥"

লক্ষ্মীবন্ধনদামবৎ সুখসরঃ সোপানসন্তানবৎ, বাণিজ্যং
পরমঙ্গভারতজনাঃ সর্ব্বাত্মনা সেব্যতাম্॥

অহো! কোঽপ্যচিন্তনীয়ো মহিমা বাণিজ্যস্য! যৎপ্রসাদাদিংলণ্ডদেশীয়াঃ কামপ্যতিনীচতমাং তমোময়ীমবস্থাং বিহায়াচিরেণৈবাভ্যুদয়মহাগিরিশিখরে পদমাদধীনাঃ সাম্প্রতমধঃকৃতসকলকুসংস্কারামুদাঃ কল্যাণরবেঃ পরমসুখালোকমহরহঃ সেবন্তে, যৎপ্রসাদাত্তেষাং ভস্মীকৃতসকলবিপক্ষকুলশলভো দিশি দিশি প্রসরত্য তিদুঃসহঃপ্রতাপবহ্নিঃ, যৎপ্রসাদাদতি বিশালেয়ং ভারতভূমি স্তেষাং দিগ্‌দিগন্তব্যাপিনা সমতিক্রান্তদুস্তরসাগরগিরিকাননেন মহতা বিজয়রবেণাপুরি, যৎপ্রাসাদাচ্চতেষাং সৌভাগ্যলক্ষ্মীভু বনবিজয়িনীতি বিশ্রুতা জগতি। যদা বিপুলসমৃদ্ধিপদমিদং বাণিজ্যং ভারতবাসিনামুপজীব্যমাসীত্তদেয়ং ভারতভূমিরপি সর্ব্বেষামনন্তসুখৈকস্থানং বভুব। সাম্প্রতং যদিদমাপতিতমনন্তদৌর্ভাগ্যং ভারতবাসিনাং, তত্তেষাং সকলসৌভাগ্যৈকনিদানে বাণিজ্যে বীতরাগিতয়ৈব। তদস্মিন্ যাবৎসর্ব্বসাধারণজনগণানাং ন জায়তেঽনুরাগ স্তাবৎ সুদূরপরাহতৈব ভারতভূমেঃ সৌভাগ্যলক্ষ্মীঃ, যাবচ্চাস্মদ্দেশীয় সুশিক্ষিতজনা দারুণদৌর্ভাগ্যবারণদমনাঙ্কুশমিবেদং বাণিজ্য মনাদরকটাক্ষেণেক্ষমাণাঃ পরভৃত্যভাবেনৈব কথমপ্যতি কৃচ্ছ্রেণ জীবনযাপনমেব সকল শিক্ষাফলমিত্যামনন্তি তাবদ্বিড়ম্বনৈবাস্মজ্জন্মভূমেরভ্যুদয়াশা। ভো ভো! ভারতবর্ষীয়াঃ! নিখিলসৌভাগ্যদ্বারমিদং বাণিজ্যং সুচিরমযত্নকপাটনিবদ্ধংকৃত্বা স্বচ্ছন্দমতিদুর্গতিশয্যাশয়ানানাং মনসিভবতাং ভবতি ন কি মহোধিক্কারঃ? ভবতামেব পুরাতননিয়মাচারশাস্ত্রাদীনামনুসরণেন বিদেশীয়াঃ সর্ব্বে ক্রমেণাসীমামুন্নতিং লভন্তে, ভবন্তস্তু সততমালস্যকুসংস্কারাদিদোষবশীকৃতমানসাঃ সরিৎপ্রবাহাইব গিরিশিখরসম্ভবাঃ প্রতিদিনমধোগতিমেব লব্ধুমারভন্তে। কদা বাণিজ্যাদিকল্যাণকর্ম্মানুসরণক্রমেণ বিদিতাখিল সভ্যজাতিব্যবহারাণাং ভবতাং জ্ঞানবিমলীকৃতেভ্যো মানসেভ্যস্তমাংসীব দিনকরকরভাস্বরেভ্যো দিঙ্‌মণ্ডলেভ্যো জাতিভ্রংশকরী জলধিযাত্রা ধর্ম্মলোপকরী বিজাতিবিদ্যা বৈধব্যকরী কামিনীজনশিক্ষেত্যাদিকুসংস্কারশতান্যপযাস্যন্তি কদা বা প্রণয়-জল-মরুস্থলীব বহুবিবাহ রীতিরুন্নতি-লতা কুঠারইব বাল্যপরিণয়ঃ পাপ-হুতাশন-হবিরিব বিধবোদ্বাহনিবারণমেতে চান্যেচাতিহেয়তমা দেশাচারা দূরীভবিষ্যন্তি ভবতাং হৃদয়েভ্যঃ।

ভারতভূমেরুন্নতিবিষয়িণী সংস্কৃত রচনা।

(রাজনিয়মঃ)

সর্ব্বান্ সোদরবৎসমীক্ষ্য চ করান্নুৎসার্য্য পীড়াকরান্
সর্ব্বেভ্যোনিজজাতিতুল্যবিভূতাং দত্বাখিলেকর্ম্মণি।

হং হো ! ভারতবাসিনামহরহঃ কল্যাণকার্য্যেরতা
ইংলণ্ডীয় দয়ালুরাজপুরুষাঃ ! কীর্ত্তিশ্চিরং রক্ষত ॥

প্রজাপালনকর্ম্মণি নিযুক্তানাং রাজপুরুষাণাম পক্ষপাতিনিয়মৈঃ সর্ব্বথা প্রজানুরঞ্জনমেব পরমোধর্ম্মঃ। যদদ্যাপি সর্ব্বে সকল ভুবনতলবিশ্রুতযশসঃ শ্রীরামচন্দ্রস্য নামশ্রবণমাত্রেণৈবা-পূর্ব্বভক্তিরসবিহ্বলীকৃতমানসাঃ কামপি হর্ষজর্জ্জরাং দশামনুভবন্তি তত্তস্যৈব রঘুবংশাবতংসস্য রাজকুলকেশরিণঃ প্রজারঞ্জনানুরাগাদেব। যদদ্যাপি সর্ব্বে পবিত্রকীর্ত্তেরাকবরনৃপবরস্যাধিকার-কালং স্মরন্তঃ সপদি সঞ্জাতপুলকাঃ কৃতজ্ঞতারসার্দ্রীকৃতহৃদয়াশ্চ মুঞ্চতি নয়নসলিলমজস্রং, তত্তস্যৈবরাজ্ঞো যবনকুলপ্রদীপস্য রাজনিয়মেষপক্ষপাতিত্বৈব। অতএবানুরক্তাসু প্রজাসুরাজ্যমপ-গতসকলবিঘ্নান্ধকার মুদিতসৌভাগ্যদিনকরঞ্চালোকিকসুখৈকভবনং সঞ্জায়তে, জাগর্ত্তিচাক্ষয়-কালংব্যাপ্য রাজ্ঞঃকল্পান্তস্থায়িনী কীর্ত্তিঃ।

হং হো ! ভারতভূমেঃ শাসনকর্ম্মণি নিযুক্তা রাজপুরুষাঃ ! জেতৃজাতিসুলভামবজ্ঞাং বিহায় ভবন্তঃ স্বজাতিনির্ব্বিশেষেণ সর্ব্বেষ্বেব প্রধানপদেষু ভারতবাসিনামধিকারমাজ্ঞাপয়ন্তু, ব্যবহরন্তু চ তান্ প্রতি তথা যথাস্মন স্তে বিজিতানিতি ন জানন্তি, ভবন্তু সহায়াস্তেষাং সর্ব্বদা সকলকল্যাণবর্দ্ধণে দদন্তু চ তেভ্যঃ স্বাধীনতাং শরীররক্ষাসাধনেষু শস্ত্রব্যবহারাদিষু ; অন্যথা ভারতবাসিনঃ সর্ব্বে ভবদ্বিধসভ্যতমজাতীয়ানামধিকারে নিবসন্তোঽপি সার্গলমখিলোন্নতিদ্বারং জ্ঞাস্যন্তি, দূষয়িষ্যতি চ ভবতামকলঙ্কযশঃশশাঙ্কং তেষাং চিরদৌর্ভাগ্যকলঙ্ক ইতি।

ভারতভুমেরুন্নতিবিষয়িণী সংস্কৃত রচনা।

(উপসংহারঃ)

অয়ি মাতর্ভারতভূমি ! ত্বংপুরাধর্ম্মেণ বিদ্যয়া নিয়মেনাচারেণ সমৃদ্ধ্যা প্রভাবেন গৌরবেণ চ ধরণ্যাং প্রাধান্যমনন্যসুলভমযাসীঃ, সাম্প্রতং ক্ষীণপুণ্যানাং মন্দভাগ্যানামমীষাং তব পুত্রাণাং দোষেণোপস্থিতোঽয়মহহ ! তে কোপ্যপরিচিতপূর্ব্বো বিষমো দশাবিপর্য্যাসঃ !

মাতর্ভারতভূমি ! সর্ব্বসুকৃতস্যাভূঃ প্রসূতিঃ পুরা
ত্বমামাখিললোকবিশ্রুতাভূদ্বিদ্যাযশোভিস্তদা।
যাতা স্তে·দিবসা স্তথা সুখময়াঃ স্বস্থাস্ব ! তান্ সাম্প্রতম্,
হাহা ! কস্য ন মানসং বদ মহাশোকাম্বুধৌমজ্জতি ?॥১॥
হা ! মাতঃ ক্বগতা মহারথরঘুশ্রীরামকর্ণাদয়ো-
র্বৈর্ব্বীর প্রসবেতি কীর্ত্তিরজনি ত্রৈলোক্যমধ্যেতব।
তেষাং যানধুনা বিভর্ষি তনয়ান্ দূরেঽস্তুহো ! বীরতা
বেপন্তে গুরুভাতিপাণ্ডুবদনাঃ সংগ্রামনাম্নৈব তে ॥২॥
মাতঃ ! কুত্র গতা যুধিষ্ঠিরহরিশ্চন্দ্রাদয়ো ধার্ম্মিকা
যেষামাহুরগণ্যপুণ্যচরিতৈস্ত্বাং পুণ্যভূমিং ভুবি।

যে পুত্রা স্তব সাম্প্রতং জননি! কিং পাপং ন কুর্ব্বন্তি তে
হা হা হন্ত! ন কস্য দীর্য্যতিমনো দৃষ্টা তবেমাং দশাম্ ॥৩॥
পুত্রৈঃ পাণিনি গৌতম প্রভৃতিভিস্তে পূর্ব্বজাতৈঃপুরা
বিদ্যাভূমিরিতি প্রসিদ্ধিরজনি ত্রৈলোক্যমধ্যেতব।
মাত স্তে তদনন্তমক্ষয়মহো! লোকোত্তরং গৌরবম্
নানাদোষপরায়ণৈস্তবসুতৈ র্হা হা ধুনা হারিতম্ ॥৪॥
সাবিত্রী জনকাত্মজাদিরমণীরত্নানি জাতানি তে
গর্ভে যৎসুচরিত্র কির্ত্তনরবেণাপূরি বিশ্বম্ভরা।
যাতা স্তা গুণভূষিতা দুহিতর স্তে কন্যকাঃ সাম্প্রতম্
ঘোরাজ্ঞানবশা নয়ন্তি দিবসানালস্যনিদ্রাদিভিঃ ॥৫॥
মাতঃ! সুতবতী ত্বমেব হি পুরা বাল্মীকিপারাশরৌ
যদ্রামায়ণভারতামৃতরসেনাদ্যাপি মুগ্ধং জগৎ।
নো জানে ত্বয়ি সাম্প্রতং নিপতিতঃ কোবাভিশাপো মহান্
যেনৈকোঽপি মহাকবির্জননি তে গর্ভে ন সঞ্জায়তে ॥৬॥
রত্নানামিব কৌস্তুভং জলধিনা মাতঃ কবীনাংত্বয়া
যংলব্ধাভুবি কালিদাসমখিলেঽনন্তং যশঃসঞ্চিতম্
হা হা! তাদৃশ পুত্ররত্ন মখিলক্ষৌণী মহাভূষণম্
ত্যক্তাদ্যাপি করাল কালবদনে মাতঃ কথং জীবসি ॥৭॥
ত্বগদর্ভে ভবভূতি রক্ষয়যশাশ্চন্দ্রঃ সুধাব্ধৌ যথা
জাতো যস্য মনোজ্ঞকাব্যকিরণৈরালোকিতংক্ষ্মাতলম্।
কালে হন্ত! কৃতান্তরাহুবদনং তস্মিন কবীন্দোগতে
সম্প্রাপ্তং মলিনং কবিত্ব কুমুদং হা! শোচনীয়াং দশাম্ ॥৮॥

পরাধীনাম্ মগ্নানতি-বিপুলদুঃখাম্বুধিজলে
বলক্ষীণান্ হীনান্ সকলসুখসৌভাগ্যনিচয়ৈঃ।
কৃপাসিন্ধো! নাথ! ত্রিভুবনগুরো! ভারতজনান্
সকৃদ্দীনানেতান্ প্রতি বিতর কারুণ্যকণিকাম্ ॥

———

হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য বিষয়ক বক্তৃতা

হে সভাস্থ সম্ভ্রান্ত মহাশয়গণ !

সম্বৎসরের পর আমরা অদ্য আবার পুনশ্চ মিলিত হইলাম, অতএব কি আনন্দ! সম্বৎসরের পর অদ্য আবার "চৈত্রমেলা" দ্বিগুণ উৎসাহে— দ্বিগুণ সমারোহে অনুষ্ঠিত হইল, অতএব কি সৌভাগ্য! যেমন এক ঋতুর বর্ষণদ্বারা বসুমতীকে সকল ঋতুতেই সরস রাখে, তেমনি এই একদিনের সমাবেশ দ্বারা আমাদিগের মনকে সম্বৎসরকাল সুপ্রসন্ন রাখিতেছে! বসুমতীর আকর্ষিত সেই রস যেমন অদৃশ্যভাবে ফল মূল শস্যোৎপাদনের কারণ হয়, তেমনি এই মেলারূপ সমাবেশটী অজ্ঞাতভাবে আমাদিগকে উন্নতিপ্রসবের ক্ষমতা দান করিতেছে। কুজ্ঝটিকার পর নবোদিত অরুণকে দেখিয়াই যেমন মাধ্যাহ্নিক মার্ত্তণ্ডের প্রখর দীপ্তি অনুভব করিতে পারা যায়, তেমনি হিন্দুসমাজের বহু বিশৃঙ্খলার পর এই মেলার আবির্ভাব দেখিয়াই ইহার ভবিষ্যৎ প্রভাব অনুভূত হইতেছে! বীরসিংহ পুরুষের বাল্যাবস্থার লক্ষণ দর্শনেই যেমন দূরদর্শীলোকে তাহার ভাবিজীবনকে নখদর্পণের ন্যায় দেখিতে পান, তেমনি এই মেলার আদ্যাবস্থার সুলক্ষণ সমূহ ঈক্ষণ করিয়াই ইহার ভবিষ্যৎ মাহাত্ম্যের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

ভাবিয়া দেখুন, জন্মবৎসরে ইহা কিরূপ ছিল? পরবৎসর কিরূপ সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে? এবং এ বৎসরে কি পরিমাণেই বা উন্নত হইতে পারিয়াছে? জন্মদিনে কেবল কতিপয় বান্ধব ও প্রতিবেশীমাত্র উৎসাহী ছিলেন, অর্থাৎ নিজবাটীর লোক ও নিজ কুটুম্ব বই নয়, কিন্তু দ্বিতীয় উৎসবে গ্রামস্থ এবং অদ্য এই তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে চাকলাস্থ লোক আকর্ষিত হইয়াছেন, এরূপ উপমা অনায়াসে খাটিতে পারে। দেশহিতৈষী সম্প্রদায়ের এইরূপ সদুৎসাহ, সদাগ্রহ এবং সৎসঙ্কল্প দৃষ্টি করিয়া কাহার অন্তঃকরণ না আপনা হইতেই সুখতরঙ্গে মগ্ন এবং আশাগগনে উত্থিত হয়? আমরা যে এ প্রকারে একত্রিত হইব, এরূপ স্বজাতীয় অনুষ্ঠান দ্বারা স্বজাতির বিলুপ্ত নাম, বিনষ্ট গৌরব এবং বিপর্য্যস্ত একতার পুনরুদ্ধারে যত্নশীল হইব, তাহা কিছুদিন পূর্ব্বে কাহার মনে ছিল? অতএব আজ যে কি সুখের দিন এবং এই মেলা যে হিন্দুজাতির কত আরাধ্য বস্তু, তাহা বাক্যেও নয়, লেখনীতেও নয়, কিছুতেই প্রকাশ করিবার নয়, ধ্যান ভিন্ন হৃদ্বোধ হইবার উপায় নাই।

কিন্তু এখনও ইহার অতি তরুণাবস্থা,— বলিষ্ঠ ও দ্রঢ়িষ্ঠ করিতে এখনও বিস্তর আয়াস, অনেক সময় লাগিবেক। এখনও দেশের সকল লোকে ইহার যে কি মঙ্গলগর্ভ তাৎপর্য্য, তাহার মর্ম্মজ্ঞ হয়েন নাই, ইহার যে কি অনুপম গুণ, তাহার গুণজ্ঞ হইতে পারেন নাই। তাহা দূরে থাকুক, এখনও সকলে ইহার নামও শ্রবণ করেন নাই। যাঁহারা শুনিয়াছেন,

তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ইহার উদ্দেশ্যও জানিতে পারেন নাই। যাঁহারা কতক জানিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে আবার ইহাকে সামান্য কৌতুক ও আমোদের স্থান বলিয়াই জানিয়াছেন, দেশের মঙ্গলভূমি বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। যাঁহারা কতক বুঝিয়াছেন, তাঁহারা এখনও ইহার প্রতি এবং ইহার স্থায়িত্বের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন নাই। যাঁহারা বিশ্বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই এখনও ইহাকে সেইরূপ প্রেমচক্ষে দেখেন নাই, যেরূপ প্রেমদৃষ্টি ভিন্ন কোনপ্রকার শুভব্রতে সর্ব্বান্তঃকরণে ব্রতী হওয়া অসম্ভব! অতএব এই মেলা "মহামেলা" নাম পাইতে এবং যথার্থ জাতীয় মেলা রূপে গণ্য হইতে এখনও কত দিনের, কত যত্নের, কত অর্থের, কত উৎসাহের, কত উপদেশের অপেক্ষা করিতেছে, তাহা সংখ্যা করা যায় না। যখন দেখিবেন শারদীয় মহাসপ্তমীর ন্যায় এই মেলার দিনকে সকল হিন্দু মহামহোৎসবের দিন মনে করিতেছে; যখন দেখিবেন দুর্গোৎসবের জন্য লোকে যেমন নব নব বসন ভূষণ ক্রয় করিতে মহাব্যস্ত ও ঋণগ্রস্তও হইয়া থাকে, তেমনি এই মেলায় আসিবার জন্য— ইহার অনুষ্ঠানভাগী হইবার জন্য সকল নগরে— সমুদায় গ্রামে, প্রত্যেক ঘরে, সকলেই মেলার বহুদিন পূর্ব্বাবধি মহাব্যস্ত হইতেছে এবং অন্তঃপুরচারিণীরাও স্বামী পুত্র ভাই বন্ধু প্রভৃতি আত্মীয়গণকে পাঠাইবার জন্য সমুৎসুকা হইতেছে; যখন দেখিবেন, যাহার যেরূপ সাধ্য যাহার যেরূপ বিদ্যা, যাহার যেরূপ ঐশ্বর্য্য, যাহার যে কিছু গুণপণা, সে এই সমাজস্থলে আসিয়া তাহা প্রকাশ করিতেছে; যখন দেখিবেন অবস্থার তারতম্য রহিত হইয়া ছোট বড় সকলেই উৎসবের সমভাগী হইতেছে; যখন দেখিবেন, এই মেলার নিষ্পাদিত বিচার এবং ইহার প্রদত্ত পুরস্কারকে গুণিগণ, শিল্পীগণ ও কৃষকগণ প্রভৃতি প্রদর্শকমণ্ডলী শিরোধার্য্য করিতেছে; যখন দেখিবেন, আপাততঃ যাঁহারা ইহাকে ঈষৎ বক্রদৃষ্টিতে অথবা সম্পূর্ণ সন্দেহ-দৃষ্টিতে দর্শন করিতেছেন, তাহারাও আসিয়া মিলিত হইয়াছেন, তখনই জানিবেন, এই মেলা যথার্থ "জাতীয় মেলা" নাম পাইবার যোগ্য হইয়াছে— তখনই জানিবেন এই সমাবেশক্ষেত্র যথার্থই স্বজাতীয় গৌরব-ভূমি হইয়া উঠিয়াছে! কিন্তু কি কি উপায়ে ও কি কি রূপ কৌশল অবলম্বন করিলে এই শুভানুষ্ঠান সেই উন্নতির উচ্চ শিখরে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হইবে, তাহার আলোচনা অতি কর্ত্তব্য।

প্রকৃতির অচ্ছেদ্য নিয়মানুসারে সকল বিষয়েরই ক্রমশঃ উন্নতি হইয়া থাকে। এক দিনে কিছুই হয় না। এবং সেই পর পর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যখন যেরূপ অবস্থা, তখন তদুপযুক্ত উপায়াদিই উদ্ভাবিত হইতে পারে। বর্ত্তমান অবস্থানুসারে এই মেলাদ্বারা বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং রাজকীয় উন্নতি সম্ভবে না, সুতরাং তদালোচনাও বৃথা। বর্ত্তমান অবস্থানুসারে ইহা দ্বারা শিল্প, কৃষি এবং উদ্যান বিষয়ক উন্নতি সম্ভবে। দৈহিক ও সামাজিক উন্নতিও কিয়দংশে সম্ভবপর হয়। এবং সাহিত্য, কবিত্ব ও বাগ্মীত্ব বিষয়েও অনেক উৎসাহ হইতে পারে। ইহার প্রত্যেক বিষয়ের পৃথক্ পৃথক্ সমালোচনা করাই আবশ্যক, কিন্তু প্রস্তাবের প্রাচুর্য্যভয় তাহার বিশেষ প্রতিবন্ধক। এক দিনের অধিবেশনে তাহার সূক্ষ্মানুসন্ধান কেবল বৈরক্তিরই কারণ হইবেক, সুতরাং প্রধান ২ কয়েকটী বিষয়ে সাধারণ্যে কিঞ্চিৎ বলিয়াই

ক্ষান্ত হইব। ইহাতে যে ক্ষোভ থাকিল, তাহা ঈশ্বরানুগ্রহে পরবৎসর নিবারিত হইতে পারিবে।

প্রথম। প্রদর্শনের সামগ্রী।

মেলাস্থলে প্রদর্শয়িতব্য দ্রব্য সম্বন্ধে বক্তব্য এই, যখন জাতিসাধারণের উন্নতি প্রার্থনীয়, তখন স্বজাতীয় শিল্পীগণের হস্তসম্ভূত ও যন্ত্রসম্ভূত দ্রব্যাদি প্রদর্শন করাই সর্ব্বাগ্রে উচিত। আমাদের রমণীগণ বিলাতি আদর্শানুবর্ত্তিনী হইয়া যে সকল সূচিকর্ম্ম ও সামান্য ২ কারুকার্য্য প্রস্তুত করিতেছেন এবং যে সকল ইউরোপীয় প্রতিরূপ চিত্র করিতে শিখিয়াছেন, তাহার অভিনয় দ্বারা সম্যক্ ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। ব্যবহার পক্ষে সেই সকল শিল্পকর্ম্মের উপযোগিতা অতি অল্প, না সংসারের কাজে লাগে, না সমাজের উপকারে আইসে। তাহার প্রচুরতর সংগ্রহ দ্বারা তৎপ্রতি প্রচুরতর উৎসাহ দেওয়াই হয়; তদ্দ্বারা পাকতঃ দেশের পূর্ব্বতন শিল্পকার্য্যকে সম্পূর্ণ অনাদর করা হইয়া উঠে। আমাদের সংসারের শৃঙ্খলা চিন্তা করিলে বিলক্ষণ বোধ হইবে, যে অতি অল্প সংখ্যক ধনীলোকের ভবন ভিন্ন আর সকল ঘরেই পুরন্ধ্রী গৃহিণীগণকে সংসারের তাবৎকর্ম্ম সমাধা করিতে হয়। সেই সব নিত্য কর্ম্ম ব্যতীত "বারমাসে তের পার্ব্বণও" আছে। তেরটী কেন, চার তেরং বায়ান্নটী বলিলেও বলা যায়। এই সমুদায় ক্রিয়াকলাপের সমুদায় আয়োজন তাঁহাদিগকে স্বহস্তে করিতে হয়। জ্ঞাতিকুটুম্বের ভূরি ভোজের দিন, অন্য জাতীয়ের ন্যায় ভোজ্যদ্রব্য, ভোজ্য-বিক্রেতার দোকান হইতেও আইসে না, ভৃত্যবর্গ দ্বারাও প্রস্তুত হইতে পারে না। দশজনকে খাওয়াইতেও যেমন, দশ সহস্রকে খাওয়াইতেও সেইরূপ। একটী জামাই বাটীতে আইলে পল্লীগ্রাম-বাসিরা প্রায় কোন দ্রব্যই ক্রয় করেন না। পুরস্ত্রীবর্গ আহ্লাদপূর্ব্বক ক্ষীরের ছাঁচ, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরেলা, সরভাজা, ছেনা, মাখন, পায়স, পিষ্টক প্রভৃতি অমৃতাস্বাদ চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় প্রস্তুত করিয়া দেন; যাহা পাইলে সর্ব্বদেশীয় সদ্ভোক্তা মাত্রেই দুর্ল্লভ জ্ঞানে ভোজনে তৃপ্তি পাইতে পারেন। অনতিপূর্ব্বকালের রমণীরা নিত্য গৃহকর্ম্ম সমাপন করিয়া যে অবকাশ পাইতেন, সে সময় কড়ির আন্‌লা, দড়ির শিকা, রেসমের শিকা, সিন্দুরচুপড়ি বুনা, সুতা কাটা, সেলাই ফোড়াই অথবা ছাঁচকাটা প্রভৃতি দৃশ্যমনোরম অথচ ব্যবহারক্ষম দ্রব্যাদি নির্ম্মাণে নিযুক্তা থাকিতেন। এখনও ইহার অনেক দ্রব্য অনেকের ঘরে— বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে —প্রস্তুত হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা আমরা বহুমূল্য সেগুণ ও মেহাগ্নি কাষ্ঠাধার প্রভৃতির ব্যয় হইতে বহুলাংশে আসান পাই। যাঁহাদিগের এত কাজ করিবার আছে, তাহাদিগকে তাহা হইতে নিরস্ত করিয়া আলস্যজনক বিফল কারপেটের কাজে বেশী উৎসাহ দেওয়া কোন মতেই শ্রেয়ঃ নহে। যদি সূচিকর্ম্ম শিখাইতেই হয়, তবে স্বামী পুত্রের ব্যবহারযোগ্য বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার শিক্ষা দেওয়াই কর্ত্তব্য। সেই সঙ্গে অল্প পরিমাণে বিলাতি কাজ থাকে থাকুক, হানিও নাই। নচেৎ শুদ্ধ বিলাতি অনুকরণের পক্ষপাতী হইয়া মহোপকারী প্রাচীন আদর্শকে পরিত্যাগ করাতে অপকার ভিন্ন কোন উপকার দেখিতে পাই না। শুদ্ধ

অনুকরণ দ্বারা কোন জাতির উন্নতি হয়ও নাই, হইবেও না। বিশেষ যাহারদিগের পূর্ব্বসমাজ ও পূর্ব্বসভ্যতার অনিবার্য্য পরাক্রম অদ্যাপি দেদীপ্যমান আছে, তাহাদের মধ্যে বিপরীত ভাবাপন্ন অপর দেশীয় সভ্যতার প্রচলন শুভও নয় সুসাধ্যও নয়, সুসিদ্ধ হইবারও নয়। বরং পূর্ব্বকার সেই সকল শিল্পাদির সংশোধন ও উন্নতি করিবার চেষ্টা করা উচিত। এবং যদি বিদেশীয় এমন কোন কারুকার্য্য থাকে, যাহা আমাদের সংসারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং সুষমা ও রুচি বর্দ্ধক তবে তন্মাত্রকেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। শুদ্ধ স্ত্রীশিল্প কেন? সাধারণ শিল্প সম্বন্ধেও এই কথা খাটিতে পারে। ফলতঃ সকল বিষয়েই এই সিদ্ধান্তটী স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইউরোপীয়দের স্বাবলম্বন ও উদ্যোগটী আমাদের অনুকরণীয় বটে, কিন্তু, কার্য্যসাধন-প্রণালী ও ঘরসংসারের রীতি-নীতি গৃহীতব্য নহে। এই মীমাংসাকে সম্মুখে রাখিয়া এই মেলার প্রদর্শন-গৃহ সজ্জিত করা উচিত। বিশেষতঃ যখন স্বদেশীয় লোক ও স্বদেশীয় উদ্যোগ দ্বারা স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনোদ্দেশেই ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন অগ্রে স্বদেশীয় শিল্পবিদ্যার সংস্কার, উত্থান ও নবযৌবন সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করাই অত্যাবশ্যক হইতেছে। এ বৎসর পুরস্কারের সুগম উপায় অবধারিত হইয়া অতি উত্তমই হইয়াছে। কিন্তু যাহা হইয়াছে, তাহা যথেষ্ট হয় নাই, আরো অধিক প্রয়োজন। এমন অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে, যদ্দ্বারা রাজধানীর সন্নিকট স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া, সমস্ত বঙ্গদেশ তৎপরে ক্রমে ক্রমে অঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র, কাশী, কাশ্মীর, পঞ্জাব, অযোধ্যা প্রভৃতি সমস্ত প্রদেশের শিল্পী, কৃষক ও উদ্যানপালক যথোপযুক্ত রূপে পুরস্কৃত হইতে পারে। সেই পুরস্কারের আকর্ষণে বিবিধ জনপদজাত, অথবা বন পর্বত আকর সাগর সম্ভূত ভারতের অতুল্য অমূল্য শিল্পজাত ও প্রাকৃত বস্তু সকল এক স্থানে প্রদর্শিত হইয়া প্রতিযোগিতা বৃত্তির উত্তেজনা করিয়া দিতে পারে। এত সুদীর্ঘ আশা করা, এক্ষণে দুরাশাবৎ বোধ হইতেছে, কিন্তু সাধনার অসাধ্য কিছুই নাই। যদিও সমুদায় সুসিদ্ধ হওয়ার কাল এখনও দূরবর্ত্তী তথাপি এক্ষণে যে সকল দ্রব্যাদি সহজ-প্রাপ্য এবং যাহা প্রদর্শন দ্বারা আশু উপকার ও ভবিষ্যতের উৎসাহ জন্মিতে পারে, তাহাতে বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, গালিচা তুলিচা মশারি চাদর প্রভৃতি তন্তুকার্য্য, কামার কুমার ছুতার স্বর্ণকার কংসকার প্রভৃতির কারুকার্য্য, শিল্প ও কৃষিকর্ম্মের যন্ত্রাদি এবং বিবিধ ফলমূল শস্য প্রভৃতি আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য সামগ্রী সমূহের নাম করা যাইতে পারে। তৎসঙ্গে সুসেব্য গন্ধদ্রব্য ও সুশ্রাব্য গান্ধর্ব্ব বিদ্যার যন্ত্রাদির জন্যও অনুরোধ করা যাইতে পারে। এই সকলের মধ্যে যদিও কতক কতক সংগৃহীত ও প্রদর্শিত হইতেছে, কিন্তু অবশিষ্ট সামগ্রীরও নির্ব্বাচন, প্রদর্শন এবং তজ্জন্য পারিতোষিক অর্পণ, নিতান্তই প্রয়োজন।

২য়। শারীরিক বল বিধান।

শারীরিক বলবীর্য্যের উৎকর্ষ বিধান জন্য এক্ষণে যেরূপ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা প্রশংসনীয়। কিন্তু সেই উপায় ও কৌশলকে আরো প্রসারিত করা আবশ্যক।

অপেক্ষাকৃত সমধিক পারিতোষিক বণ্টন করিতে হইবেক। সেই প্রলোভন দ্বারাই হউক, অথবা নানা প্রদেশের ভূস্বামী ও ধনীবর্গকে অনুরোধ করিয়াই হউক, অধিক সংখ্যক ও উচ্চতর-রূপে শিক্ষিত মল্লযোদ্ধা, অস্ত্রচালক ও পাইক প্রভৃতি নিমন্ত্রণ করিতে হইবেক। যাহাতে স্থানে ২ ব্যায়ামশিক্ষার পাঠালয় স্থাপিত হইয়া উঠে, এবং যাহাতে দেশের লোকে অঙ্গ-চালনা ও শারীরিক বলবৃদ্ধির উপকার জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহার উপায় করাও কর্ত্তব্য। মেলা দ্বারা এইরূপে আনুকূল্য ও উৎসাহ প্রদত্ত হইলে কিয়দ্বৎসরের মধ্যেই দেখিতে পাইবেন, বঙ্গবাসী লোকে ভীরুস্বভাব পরিত্যাগ করিয়া সাহসী হইয়া উঠিবে, সুতরাং "ভেতো বাঙ্গালি" বলিয়া যে ঘৃণাবাচক উপাধিটী আছে তাহা ক্রমে অবসৃত হইয়া যাইবে।

৩য়। সামাজিক উন্নতি।

"সামাজিক উন্নতি" বলাতে সামাজিক নিয়মাদি পরিবর্ত্তন অথবা নূতন প্রথা প্রচলন দ্বারা সমাজের উন্নতি সাধন করা এ মেলার উদ্দেশ্যও নহে— সাধ্যায়ত্তও নহে। সমাজবন্ধন দৃঢ় করা এবং সামাজিকতার নষ্টোদ্ধার করাই সার অভিপ্রায়। সামান্যতঃ লোকে সামাজিকতার যে অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন, সে পক্ষে মেলাকর্ত্তৃক কিছুই হইতে পারে না। অর্থাৎ সং-ক্রিয়াদি উপলক্ষে কাহারো বাটীতে সামাজিক লোকে আহার করিলে, কর্ম্মকর্ত্তা তাঁহাদিগকে মর্য্যাদাস্বরূপ যাহা দান করেন, বঙ্গীয় সমাজে তাহাই সামাজিকতা নামে প্রসিদ্ধ আছে। মেলা দ্বারা সে সামাজিকতার কোন সাহায্য হইতে পারিবেক না। সামাজিকতার যে অন্য একটী মহোচ্চ ব্যুৎপত্তি আছে, দুর্ভাগ্যক্রমে আধুনিক হিন্দুজাতি যাহা ভুলিয়া গিয়াছেন, সেই ব্যুৎপত্তিবোধক সামাজিকতাই লক্ষ্য। তাহাকে পাইবার জন্যই এত প্রয়াস। সে সামাজিকতার অভাবে কোন জাতি, জাতি-পদবাচ্যই হইতে পারে না— সে সামাজিকতার অভাবে স্বাতন্ত্র্য আর অনৈক্য, যথেচ্ছাচার আর পরতন্ত্রতা, ইহারাই সমাজরাজ্যের অধিপতি হইয়া সমাজকে উচ্ছৃঙ্খলতার হস্তে সমর্পণ করিয়াছে। অতএব সেই সামাজিকতাকে উদ্ধার করা যে কতদূর আবশ্যক হইয়াছে তাহা বলা যায় না। সে সামাজিকতার অন্য নাম জাতিধর্ম্ম। সেই স্বজাতিধর্ম্ম আমাদিগের অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার-কারাগারে পরবশ্যতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ আছে, তাহাকে মুক্ত করা সর্ব্বপ্রযত্নে বিধেয়। কিন্তু তাহা করিতে গেলে অগ্রে আত্ম-নির্ভর নামা শাণিত অস্ত্র দ্বারা পরবশ্যতারূপ শৃঙ্খলকে ছেদন করিতে হইবে। সেই আত্মনির্ভর লাভ করিবার জন্য এইরূপ সমাবেশ যে অদ্বিতীয় উপায়, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা বাহুল্য। স্বজাতীয় সকল শ্রেণীস্থ লোকের একত্র অধিবেশন, পরস্পর সংসম্ভাষণ, পরস্পরের মনোগত ভাব বিনিময়, গত সম্বৎসর মধ্যে সমাজের কি বা উন্নতি আর কি বা অনুন্নতি হইয়াছে তদা-লোচনা পূর্ব্বক উন্নতিকে উৎসাহ দেওয়া আর অনুন্নতিকে নিরুৎসাহ করা এবং স্বজাতীয়ের প্রতি স্বজাতীয়ের অনুরাগ বর্দ্ধন ও স্বজাতীয় শিল্প-সাহিত্যাদির প্রতি সমুচিত আস্থা জন্মাইয়া দেওয়া যখন মেলার কার্য্য হইল, তখন এই মেলা যে স্বাবলম্বনরূপ অমূল্য নিধির আকরস্থল হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই অধিবেশন, সেই সম্ভাষণ, সেই ভাব-

বিনিময়, সেইসব আলোচনা যদি শুদ্ধ মৌখিক বক্তৃতাতেই পর্য্যবসিত হয়,— যদি তাহাতে আন্তরিক অনুরাগের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত না হয়, যদি তত্তাবতকে কার্য্যে পরিণত করিবার প্রতিজ্ঞা না জন্মে, যদি সকলেই সাধ্যানুসারে সযত্ন না হন, এবং যদি রঙ্গভূমি হইতে বহির্গত হইয়াই নাটকের অভিনেতার ন্যায় সজ্জা পরিত্যাগ করেন, তবে ইহার মহদুদ্দেশ্য সফল না হইয়া বরং বিফল হইবার কথা! তাহা হইলে প্রকৃত সঙ্কল্পের অঙ্গহানি হইয়া এই মেলা কেবল কৌতুকাবহ মেলা হইয়া উঠিবে, দেশ-বিদেশীয়ের চক্ষে বাঙ্গালির চরিত্র হাস্যাস্পদ হইয়া উঠিবে, ভবিষ্যতে বাঙ্গালির অনুষ্ঠিত কোন বিষয়েই লোকের বিশ্বাস ও আস্থা থাকিবে না। কিন্তু ভরসা আছে, অধুনা কৃতবিদ্য দেশহিতৈষী মণ্ডলীর চিত্ত-ভূমিতে স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-বাৎসল্য বদ্ধমূল হইতেছে, তাঁহারা কখন এরূপ সর্ব্বনাশক দোষের অধীন হইবেন না— তাঁহারা কখনই এমন দুরপনেয় কলঙ্কাগ্নিতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঝম্পদান করিবেন না— তাঁহারা কখনই হাস্য ও কৌতুকের হস্তে স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তিকে অর্পণ করিবেন না। তাঁহাদের অবিচলিত অধ্যবসায়-কুঠারে বিঘ্ন-কণ্টক অবশ্যই ছেদিত হইয়া মনোরথ তরু মুঞ্জরিত ও ফলিত হইবে, সন্দেহ মাত্র নাই।

আমরা এই মেলার উদ্যোগী মহাশয়দিগের মনোগত অভিপ্রায় বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি। যে ২ উপায়দ্বারা এরূপ অনুষ্ঠান ও ইহার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতে পারে, তাহা তাঁহারা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন। কেবল বর্ত্তমান অবস্থার প্রতিবন্ধকতা বশতঃ ইচ্ছাসত্বেও এককালে সকল সুসংযোগ করিয়া তুলিতে পারিতেছেন না। সকলই অর্থ-ব্যয়-সাধ্য। এবং কোন কোন বিষয় সময়-সাপেক্ষ। ইতিপূর্ব্বে যে সকল প্রকরণের আলোচনা করা হইল এবং বাহুল্য ভয়ে যে সকলের নামমাত্র উল্লেখ করা গিয়াছে, তত্তাবৎ সুচারুরূপে সংঘোটন ও সম্পাদন করা, কত ব্যয়ের কর্ম্ম, তাহা সহৃদয় মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু এই প্রচুর অর্থ কোথা হইতে আসিবে? কে দিবে? অবশ্যই আমাদিগকে দিতে হইবে। অবস্থানুসারে প্রত্যেক হিন্দুরই কর্ত্তব্য, সাধারণভার বহন জন্য আপনাপন স্কন্ধ বিস্তার করেন! যদি উত্তরোত্তর ও উপর্য্যুপরি এত প্রকার রাজকর দিয়াও আমরা এখনও নিঃস্ব হই নাই, তবে স্বদেশের মহদুন্নতির নিদান-স্বরূপ এই মঙ্গলময় মেলার পুষ্টিসাধন জন্য কিছু ২ দান করিয়া কখনই দায়গ্রস্ত হইব না— দান করিতে কখনই কাতর হইব না। "দশের নড়ি একের বোঝা" সকলে ভার বাঁটিয়া লইলে কাহারো কষ্ট হইবে না, অথচ একটী অনুপম সুখ-রাজ্যের রাজপুরী নির্ম্মিত হইয়া উঠিবে!

অতএব হে সম্রান্ত দেশহিতৈষি মহাশয়গণ! ভাবিয়া দেখুন, আমরা যিনি যাহা সাহায্য করিয়াছি, তাহার দ্বিগুণতর আনুকূল্য করা এক্ষণে উচিত কি না? যাঁহারা অদ্যাপি বান্ধব-শ্রেণীতে আছেন, কিন্তু সহকারী-শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন নাই, তাঁহাদিগের তাহাতে সন্নিবিষ্ট হওয়া আবশ্যক কি না? এবং যাঁহারা দূর হইতে ইহাকে সামান্য ক্রীড়াভূমি জ্ঞানে অদ্যাপি প্রীতি-পরায়ণ হয়েন নাই, ইহার প্রতি তাঁহাদিগের প্রেম-দৃষ্টিপাত ও ইহাকে প্রেমালিঙ্গন করা কর্ত্তব্য কি না? কেবল যে ধন দ্বারাই সাহায্য হইতে পারে, অন্তবিধরূপে হইতে পারে না,

তাহাও নহে। কিঞ্চিৎ ২ দান করা সকলেরই সাধ্যাধীন, সুতরাং তাহা তো করিতেই হইবেক। তদ্ব্যতীত যাঁহার যে বিষয়ে যেমন ক্ষমতা, তিনি সেই বিষয়ে তদনুরূপ সহকারিতা করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। যিনি মান্যব্যক্তি, তাঁহার উপস্থিতি দ্বারা মেলার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করা উচিত। যিনি অনুসন্ধিৎসু প্রজ্ঞাবান্ বলিয়া খ্যাত, তাঁহার সদুপায় নির্দ্ধারণ ও সদুপদেশ দান করা কর্ত্তব্য। যিনি বিদ্বান্, তিনি অধ্যক্ষশ্রেণীর বিদ্যোৎসাহী বিভাগে নিযুক্ত হইয়া তাহার গুরুত্ব বিধান করুন। যিনি কবি, তিনি হিতজনক প্রসঙ্গ-পুষ্প ভাব-সূত্রে গ্রন্থন করিয়া মেলার অঙ্গশোভা সম্পাদন করুন। যিনি বক্তা, তিনি সদ্বক্তৃতা দ্বারা সমাজের উৎসাহ ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানকে জাগরূক করিতে থাকুন। যিনি সঙ্গীতজ্ঞ, তিনি সুমধুর সঙ্গীত রসে মেলা-ভূমিকে অমৃতস্রোতে প্লাবিত করুন। যাঁহারা মল্লবিদ্যার কৌতুকী, তাঁহারা যোদ্ধা প্রতিযোদ্ধা আনয়ন করিয়া বল ও কৌশলের শিক্ষক হউন। যাঁহারা দৃশ্যকাব্যের রসজ্ঞ, তাঁহারা রঙ্গভূমির বিশুদ্ধ আমোদ দেখাইয়া আমোদ ও উপদেশ দান করুন। যাঁহারা উদ্ভিদ্‌বিদ্যার ভাবগ্রাহী, তাঁহারা নানাজাতি কুসুম, নানাজাতি ফলমূল, নানাজাতি তরুলতা, নানাজাতি শস্য এবং নানাজাতি জলজ শৈবালাদি আহরণ করিয়া অথবা আহরণকারীদিগকে উৎসাহ দিয়া, কৃষি ও বাণিজ্যের শোভা ও ভৈষজ্যের উন্নতি সাধন করুন। এরূপ হইলে আর কিসের চিন্তা? এরূপ না হইলেই বা চলিবে কেন? এরূপ হইতেই বা অসম্ভাবনা কি? আরো কি জন্মভূমির প্রতি আমরা কঠোর থাকিব? এখনও কি আলস্যের জড়তাতে জরাগ্রস্ত থাকিব? এখনও কি স্বার্থদৃষ্টির ঘোরে অচৈতন্য— অন্ধবৎ রহিব? এখনও কি পরিবার প্রতিপালন ভিন্ন অন্য কর্ত্তব্যকে স্মরণ করিব না? সমাজের নিকট— স্বদেশের নিকট যে গুরুতর ঋণে ঋণী আছি, তাহা কি চিরকাল ভুলিয়া থাকিব? ইন্দ্রিয়সেবার সেবক হইয়া নির্দ্দোষ আমোদ ও যথার্থ সুখভোগে আজো কি বঞ্চিত থাকিব? কখনই না! চারিদিকে এই সকল সমুৎসুক আনন্দোৎফুল্ল কর্ত্তব্য-জ্ঞান-জ্যোতিঃ-বিকাশক বদনপরম্পরা দৃষ্টি করিয়া নিশ্চিত বোধ হইতেছে, আমরা উপর্য্যুক্ত দোষাবলীকে মহোদ্যম দ্বারা দূরীভূত করিতে সমর্থ হইব— অবশ্যই সমর্থ হইব! যখন তিন বৎসর মধ্যেই এতদূর হইয়াছে, তখন কিছুকালে আশানদী অবশ্যই সুখ-সিন্ধুর সঙ্গমলাভে সমর্থা হইবে, সন্দেহ নাই।

কিন্তু যতদিন সেইটী সুসম্পন্ন না হইয়া উঠে, ততদিন ইহার অনুষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষমণ্ডলীকে অবিচলিত অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে। তাঁহারা ইহার সূত্রপাত ও ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া ইতিমধ্যেই আমাদের নমস্য ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এক্ষণে প্রার্থনা, তাঁহারা ইহাকে পরিণত অবস্থায় উন্নত করিয়া এবং ইহাকে পূর্ব্বোক্ত রূপে সম্পূর্ণ ঐক্য-বিধায়ক ও মঙ্গলসাধক করিয়া দিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করুন— ভারতবর্ষের ভাবী ইতিহাসের পত্রাবলী মাধ্য হীরকের রেখার ন্যায় অঙ্কিত থাকুন,— লোকানুরাগের সঙ্গে আত্মপ্রসাদ ও ঈশ্বরপ্রসাদ লাভ করিয়া অনন্ত কালের সুখাধিকারী হউন।

নিতান্ত বাধিত।

শ্রীমনোমোহন বসু।

রামায়ণের মর্ম্ম ও তদন্তর্গত নীতি।

সুপ্রথিত আর্য্যাবর্ত্তের উত্তরাংশে অযোধ্যা নামে এক অতি সমৃদ্ধিশালিনী নগরী আছে। স্নিগ্ধসলিলবাহিনী সরযূ অনুপম লহরী-লীলা বিস্তার করতঃ যাহার উপকণ্ঠ দিয়া সুমধুর কলস্বরে প্রবাহিত হইতেছে। যাহার গবাক্ষ-জাল-রন্ধ্র দিয়া সুবিমল রত্নজ্যোতিঃ পরম্পরা সহস্রধা বিকীর্ণ হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন নগরী দশনাংশু-প্রভা বিস্তার করিয়া পরম সমৃদ্ধিশালিনী অমরাবতীকেও উপহাস করিতেছে। সেই অযোধ্যা নগরীতে সূর্য্যতনয় মনুর বিশুদ্ধ বংশে দশরথ নামা এক অতীব প্রতাপান্বিত শান্তশীল নরপতি জন্ম পরিগ্রহ করেন। নৃপশ্রেষ্ঠ অজের পরলোক গমনান্তর দশরথ পিতৃ-সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। দশরথ অলৌকিক বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ও পরম ন্যায়বান ছিলেন। তাঁহার প্রখর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ নিবন্ধন নিখিল অরাতি-কণ্টক উন্মূলিত হওয়াতে রাজ্য শান্তি-প্রবল হইয়াছিল, সুশাসন বশতঃ দস্যুতস্করাদি উপশান্ত হওয়াতে প্রকৃতিবর্গ নিরুপদ্রব ও নিষ্কণ্টক হইয়াছিল, অধিক কি, রাজাধিরাজ দশরথ সৌরাজ্য-সম্ভূত নিয়মসমূহ যথারীতি প্রয়োগ করিয়া মহেন্দ্ররাজধানীকেও অধঃকৃত করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদন-হেতু চন্দ্র ও প্রতাপ-হেতু তপনের ন্যায় মহারাজ প্রকৃতিরঞ্জন-হেতু রাজ-শব্দ অন্বর্থ করিয়াছিলেন। কৌশল্যা কৈকেয়ী ও সুমিত্রা নামে তাঁহার তিন ধর্ম্মপত্নী ছিল। মহারাজ, ত্রিবিধ মন্ত্র-শক্তির ন্যায়, পতিব্রতা ধর্ম্মপরায়ণা উক্ত তিন মহিষীতে নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন। দশরথ রাজ্য শাসন প্রসঙ্গে প্রায় অযুত বৎসর অতিবাহন করিলেন, কিন্তু সংসারাশ্রম-সুখের নিদানভূত পুন্নাম-নরক-পরিত্রাতা পুত্রের অভাবে তাঁহার মন দিন দিন অপ্রসন্ন ও গ্লানির আস্পদ হইয়া উঠিল, রাজ্য শাসন বিষয়ে নিতান্ত ঔদাসীন্য দৃষ্ট হইতে লাগিল। তিনি সর্ব্বদা বিরলে বসিয়া বিষয়-বিরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অমাত্যবর্গ রাজার এইরূপ মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া নিতান্ত পরিতপ্ত হইতে লাগিলেন।

এই সময়ে দেবগণ, কমলযোনি-বর দৃপ্ত লঙ্কেশ্বর রাবণ কর্ত্তৃক নিতান্ত উপদ্রুত হইয়া, ভগবান্ ভূতভাবন নারায়ণ সমীপে আগমন করতঃ বিনয়-নম্র বচনে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! দুরাত্মা রাবণ প্রজাপতির বরে গর্ব্বিত হইয়া আমাদিগের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে, তাহার দৌরাত্ম্যে আমরা নিপীড়িত হইয়া ভবৎ সমীপে আগমন করিয়াছি। আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। * *

* হে বিশ্বভাবন! আমরা কাতর হইয়া করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি যেমন লোকস্থিতিরক্ষার্থ বরাহ আকার স্বীকার করিয়া প্রলয়-জলধি-মগ্ন মেদিনীমণ্ডলের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলে, সেইরূপ দশরথ-গৃহে মানব-রূপে অবতীর্ণ হইয়া দুরাত্মা দশাননকে সবংশে নিহত করতঃ আমাদিগকে নিরুপদ্রব কর। ভগবান্ নারায়ণ দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া,

সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রার্থনা স্বীকার করিলেন। ইন্দ্র-প্রমুখ নাকেসদ্‌গণও বিষ্ণুর সহায়তা সম্পাদনার্থ স্ব স্ব আংশিক মাত্রা দ্বারা বানর রূপে অবতীর্ণ হইতে সঙ্কল্প করিয়া হৃষ্ট-চিত্তে স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন।

এ দিকে মহারাজ দশরথ কুলগুরু বশিষ্ঠ দেবের আদেশ ক্রমে বারাঙ্গনা দ্বারা মহাতেজা ঋষ্যশৃঙ্গকে স্বরাজ্যে আনয়ন করিয়া পুত্রেষ্টি সত্রের অনুষ্ঠান করিলেন। মহদাড়ম্বরসহকারে যজ্ঞ-ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইল। দশরথ কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে যজ্ঞীয় চরু প্রদান করিলেন। সুমিত্রা উক্ত দুই মহিষীর নিতান্ত প্রিয়পাত্রী ছিলেন বলিয়া তাঁহারা স্ব স্ব অংশ প্রদান দ্বারা তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন করিলেন। এইরূপে মহিষীত্রয় পুত্রোৎপাদক চরু ভক্তিসহকারে ভক্ষণ করিয়া শুভলক্ষণযুক্ত গর্ভ ধারণ করিলেন। ক্রমে গর্ভগৌরব প্রযুক্ত তাঁহাদের শরীর অবসন্ন ও আভরণনিচয় দুর্ব্বহ বোধ হইতে লাগিল। প্রভাত সময়ে বিরলতারকাস্তবকময়ী বিপাণ্ডুরা রজনী যাদৃশ শোভমানা হয়, স্বর্ণালঙ্কারপরিধানা, ক্ষীণকান্তি মহিষীত্রয়ও তাদৃশী শ্রীসম্পন্না হইলেন।

উপযুক্ত সময়ে, কৌশল্যা ও কৈকেয়ী যথাক্রমে কুমারদ্বয় এবং সুমিত্রা যুগল কুমার প্রসব করিলেন। মহারাজ দশরথ আত্মানুরূপ পুত্রলাভে সন্তুষ্টহৃদয় হইয়া, বিভবানুরূপ মহোৎসবে প্রবৃত্ত হওয়াতে সমস্ত নগরী আহ্লাদময়— উৎসবময় হইয়া নয়নের অনির্ব্বচনীয় প্রীতি সম্পাদন করিতে লাগিল। মহারাজ কৌশল্যা-গর্ভ-সম্ভূত সর্ব্বজ্যেষ্ঠ তনয়ের নাম রাম, কৈকেয়ী-সম্ভূত তনয়ের নাম ভরত ও সুমিত্রার যুগল কুমারের নাম যথাক্রমে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন রাখিলেন। সৌর-কিরণের অনুপ্রবেশ হেতু চান্দ্রমসী শশিকলা যেমন দিন দিন পরিবর্দ্ধমান্ হয়, রামপ্রমুখ কুমার চতুষ্টয় সেইরূপ পরিবর্দ্ধমান্ হইয়া জনগণের অপরিসীম আনন্দ উৎপাদন করিতে লাগিলেন। মহারাজ দশরথ পুত্রগণের অলৌকিক রূপ-লাবণ্য ও বিনয়-নম্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ দর্শনে আপনাকে পরম সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিয়া হর্ষ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। কুমারগণের রূপ-লাবণ্যের সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের সৌভ্রাত্রবন্ধনও দৃঢ়তর হইতে লাগিল। সকলেই একত্র আহার বিহারাদি কার্য্যকলাপে জনগণের নয়ননন্দন হইয়া উঠিলেন। যদিচ তাহারা সকলেই একহৃদয় ছিলেন, তথাপি অনির্ব্বচনীয় কারণ প্রভাবে লক্ষ্মণ রামের ও শত্রুঘ্ন ভরতের একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন, মহারাজ দশরথের যেমন অতুল ঐশ্বর্য্য, কুমার চতুষ্টয়ের গর্ভৈকাদশবর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে উপনয়ন কার্য্যও তদনুরূপ সমারোহ সহকারে নির্ব্বাহ করিয়া, অধ্যয়নার্থ সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। কুমারেরা অসাধারণ মেধাবলে অল্পকাল মধ্যেই সমগ্র শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। অনন্তর মহারাজ স্বয়ংই অসি চর্ম্ম শরাসন প্রভৃতি ধারণ করিয়া পুত্রদিগকে সমন্ত্রক ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। দশরথ সসাগরা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি ছিলেন এরূপ নহে, অদ্বিতীয় অস্ত্র-বেদজ্ঞ বলিয়াও বিখ্যাত ছিলেন ; রামাদি, ভ্রাতৃচতুষ্টয় পিতৃ-সমীপে অস্ত্রশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া অসাধারণ যোদ্ধা বলিয়া প্রথিত হইলেন।

এইরূপে এই প্রস্তাব-রচয়িতা রামের বিবাহ,— রামের যৌবরাজ্যাভিষেক ও বনবাস, —রাবণের সীতাহরণ,— রাবণ বধ,— সীতার পরীক্ষা,— রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন ও

রাজ্যগ্রহণ,— সীতাবিসর্জ্জন,— কুশ ও লবের জন্ম,— অশ্বমেধ,— কুশ ও লবের রামায়ণ গান ও তাহাদের পরিচয়,— সীতার পুনঃপরীক্ষা প্রার্থনা ও তাঁহার প্রাণত্যাগ— প্রভৃতি রামায়ণের সমুদায় মর্ম্ম বাল্মীকির ভাবমত সবিস্তরে বর্ণন করিয়াছেন। বিস্তৃতি নিবন্ধন এখানে তৎসমুদায় উদ্ধার করা হইল না। রামায়ণান্তর্গত নীতি-বিষয়ে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইতেছে।

এই সপ্তকাণ্ডরূপ কল্পপাদপে নানা নীতিবিষয়িণী কথা বর্ণিত আছে। লঙ্কাদ্বীপে রাবণ অতিশয় দুরাচার ছিল। সে বল পূর্ব্বক পরদার হরণ করিয়া আনিত। পরিশেষে সীতা হরণ করাতে তাহাকে যে প্রকার দুরবস্থান্বিত ও অপমানিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল, তাহা ইহাতে সবিস্তর বর্ণিত আছে। সুতরাং তৎপাঠে রাবণের ন্যায় ব্যবহারের প্রতি সকলেরই ঘৃণা জন্মে। পক্ষান্তরে রাম অতি সদাশয় ছিলেন, পুরাণে যেরূপ বর্ণিত আছে তাহাতে বোধহয়, ধৈর্য্য, বিনয়, গাম্ভীর্য্য, সরলতা, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল। রামচন্দ্র অনেক বার নানা বিপদে পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি বিচলিত হন নাই। তাঁহার বদনমণ্ডলে নিরবচ্ছিন্ন ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য বিরাজ করিত। সত্যসন্ধ রামচন্দ্র পিতৃপরায়ণ ছিলেন, তিনি একমাত্র পিতৃসত্যরক্ষার্থ অনায়াসে রাজ্য-সুখ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক চতুর্দ্দশ বর্ষকাল বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অসাধারণ পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। দুরাত্মা রাবণ সীতারে হরণ করিয়া লইয়া গেলে রামচন্দ্র বানর-বল সহকারে লঙ্কা অবরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি সত্য-লঙ্ঘন ও রাজ্যের অনিষ্টাশঙ্কা ভয়ে অযোধ্যায় গমন করিয়া অনুজ ভরতের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। রাম প্রিয়তমার উদ্ধার সাধন করিয়া নিয়মিত চতুর্দ্দশ বর্ষান্তে অযোধ্যায় গমন পূর্ব্বক রাজ্য-ভার গ্রহণ করত বিলক্ষণ সুনিয়ম সহকারে প্রজাপালন করিয়াছিলেন। বনগমন সময়ে জটাচীর ধারণ করিতে, রামের যে প্রকার বিনয়-চিহ্ন-সুশোভিত মুখকান্তি দৃষ্ট হইয়াছিল, রাজাসন গ্রহণ সময়ে মহার্হ রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিতে তাহার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। রামচন্দ্র বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অনেক সময়ে দুর্ব্বিষহ দুঃখানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি, রাজ্য-ভার গ্রহণ পূর্ব্বক, তদ্দুঃখের নিদানভূতা জননী কৈকেয়ীর প্রতি কিছুমাত্র অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই, প্রত্যুত অনুক্ষণ দৃঢ়তর ভক্তি সহকারে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। পরিশেষে রামচন্দ্র একমাত্র প্রজারঞ্জনের নিমিত্ত স্বীয় স্নেহময়ী প্রতিমা প্রিয়তমাকে নিতান্ত নিরপরাধা জানিয়াও অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

রামায়ণ পাঠে পাতিব্রত্য বিষয়িণী নীতিও লাভ করিতে পারা যায়। জনকনন্দিনী সীতা অতিশয় পতিপরায়ণা ছিলেন। বোধহয়, জগদীশ্বর জগল্লোককে পতিভক্তি বিষয়ক উপদেশ দিবার নিমিত্ত সীতার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সীতা, সাক্ষাৎ প্রজাপতি সদৃশ জনক এবং সর্ব্বগুণান্বিত ও সর্ব্বপ্রকার ধনসম্পদের অধিপতি পতি লাভ করিয়া, এরূপ চিরদুঃখিনী ছিলেন যে ভূমণ্ডলে অন্য কোন রমণী, তাদৃশ সুভগকুলের বধূ হইয়া, সীতার ন্যায় দুরবস্থান্বিতা হন নাই। সুকুমারাঙ্গী জানকী প্রগাঢ় দাম্পত্যপ্রেমে আবদ্ধ হইয়া, ভর্ত্তার অনুগমন করত একমাত্র তাহার

মুখ দেখিয়াই সুকঠোর বনবাসদুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন। অনন্তর দুর্ম্মতি রাবণ কর্ত্তৃক হৃতা হইয়া লঙ্কায় অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করেন, কিন্তু তথাপি অমূল্য সতীত্ব-রত্ন বিনষ্ট করেন নাই। পরিশেষে রামচন্দ্র রাবণ বধ করিয়া, অগ্নিপরীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক সীতাকে গ্রহণ করত অযোধ্যায় আগমন করেন। এমন সময়েও নিদয় দৈব প্রতিকূল হইয়া চিরদুঃখিনী সীতার সুখরত্ন অপহরণ করেন। রামচন্দ্র দুর্নিবার লোকগঞ্জনা সহ্য করিতে না পারিয়া, তাদৃশ পতিপরায়ণা কামিনীকে অরণ্যে নির্ব্বাসিত করিলে সীতা, ভ্রমক্রমেও ভর্ত্তা কিম্বা দেবরগণের নিন্দাবাদ করেন নাই, প্রত্যুত আপনাকেই চিরদুঃখিনী ও হতভাগিনী বলিয়া বারম্বার ধিক্কার প্রদান করিয়াছিলেন। সীতা একান্ত পতিপ্রাণা ও সরল-হৃদয়া ছিলেন। তাঁহার ন্যায় শুদ্ধাচারিণী কামিনী ভূমণ্ডলে দৃষ্টিগোচর হয় না। নির্ম্মল পবিত্রভাব ও অলৌকিক মহত্বচ্ছটা তাঁহার বদন মণ্ডলে নিরন্তর বিরাজমান্ থাকিত। সীতা, তাদৃশ সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তী পতি লাভ করিয়াও চিরজীবনের মত বননিবাসিনী হইয়া, যদৃচ্ছালব্ধ ফলমূল দ্বারা অতিকষ্টে জীবন ধারণ করিয়া ছিলেন। তিনি রাজ্যসুখ ভোগ প্রার্থনা করেন নাই, কেবল পতিসুখেই সুখী ও পতী-দুঃখেই দুঃখী ছিলেন। সীতা, শ্বশ্রূগণের প্রতি কখনও অভক্তি প্রকাশ করেন নাই, প্রত্যুত তাঁহাদিগের নিরন্তর শুশ্রূষা করিয়া আশীর্ব্বাদ পাত্রী হইতেন। জানকী নিরন্তর দুঃখাতিবেগ সহ্য করিয়াই জীবনাতিবাহন করেন, তাঁহার ভাগ্যে একদিনের তরেও সুখভোগ ঘটিয়া উঠে নাই। সুতরাং এরূপ ললনার ইতিবৃত্তি পাঠ করিলে কাহার হৃদয় বিগলিত না হয়? এবং কোন্ সামাজিকের মনেই বা অভূতপূর্ব্ব আনন্দ-মিশ্র শোক ভাবের উদয় না হইয়া থাকে? সীতার ন্যায় সেই পবিত্র ভাব— সেই পতিপরায়ণতা— সেই মহত্বগরীমাবিষয়িণী নীতি লাভ করিতে চেষ্টা করা অস্মৎ কামিনীকুলের একান্ত বিধেয়, এবং তজ্জন্য রামায়ণান্তর্গত সীতাচরিত অধ্যয়ন করা তাহাদিগের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

রামায়ণে, অসাধারণ ভ্রাতৃপ্রেম, অসাধারণ সুহৃৎ প্রণয় ও অসাধারণ প্রভু-ভক্তির বিষয় সবিস্তর বর্ণিত আছে। সুশীল ভরত পিতৃ-দত্ত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াও কেবল প্রগাঢ় ভ্রাতৃ-প্রেম নিবন্ধন তাহা গ্রহণ করেন নাই। প্রত্যুত অগ্রজের পাদুকাকেই রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা করিয়াছিলেন। ভরত অগ্রজ রামচন্দ্রকে অতিশয় ভক্তি করিতেন, প্রাণান্তেও অগ্রজের অপ্রিয় কার্য্য সাধন করেন নাই। তিনি মাতুলালয় হইতে আগমন করিয়া সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে অরণ্যে প্রস্থান করত অগ্রজকে পুনরানয়ন করিতে বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এইরূপ লক্ষ্মণও রামচন্দ্রের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিমান্ ছিলেন। তিনি অগ্রজের প্রতি অনুরাগ বশতঃ, স্বল্পবয়সে অনায়াসে রাজ্য-সুখ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বনে বনে ভ্রমণ করিয়া তদীয় প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। দুর্ব্বিষহ শক্তিশেল-বেদনা সহ্য করিয়া ও বিপুল পরাক্রম সহকারে যুদ্ধকরত ভ্রাতৃজায়ার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ অগ্রজের আজ্ঞা কখনও অমান্য করেন নাই। তিনি ভ্রাতৃ আজ্ঞা বশতঃ নিতান্ত নির্দ্দয়ের ন্যায়, গর্ভবতী ভ্রাতৃ-বধূকে অরণ্যে পরিত্যাগ করেন।

সুগ্রীব ও বিভীষণ অসাধারণ সুহৃৎ-প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। বিপদকালে

বন্ধুকে পরিত্যাগ না করিয়া কিরূপে তাহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হয়, উক্ত মহাত্মদ্বয়ই তাহার এক শেষ করিয়াছেন। স্বগ্রীব প্রিয়তম মিত্রের সহায়তা সম্পাদনের নিমিত্ত, সসৈন্যে লঙ্কায় গমন পূর্ব্বক যুদ্ধস্থলে বিপুল কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন। বিভীষণও প্রিয় মিত্রের নিমিত্ত স্বীয় আত্মীয়বর্গের— প্রাণাধিক-প্রিয়তম পুত্রের বিনাশসাধন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এইরূপ পবনতনয় হনুমানও অসামান্য প্রভুভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। শত যোজন বিস্তীর্ণ জলধি উত্তীর্ণ হইয়া জনকতনয়ার অন্বেষণ, সেতুবন্ধে কষ্ট স্বীকার, গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে বিশল্যকরণী আনয়ন পূর্ব্বক লক্ষ্মণের জীবনপ্রদান প্রভৃতি প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহার অসাধারণ প্রভুভক্তির নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিপদ সময়ে প্রভুর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন কিম্বা তাহাকে পরিত্যাগ না করিয়া কিরূপে তাহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হয়, হনুমানই তদ্বিষয়ের আদর্শ-ভূমি। প্রভুপরায়ণ হনুমান্ প্রাণান্তেও স্বামী রামচন্দ্রের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে নাই। প্রত্যুত নিরন্তর দৃঢ়তর ভক্তি সহকারে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতেন। রামায়ণে এতাদৃশ মহাত্মগণের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে তদনুরূপ আচরণ করিতে বলবতী প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। কিন্তু বিশেষরূপ যুক্তিসহকারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিভীষণের সমুদায় কার্য্য সন্নীতির অনুমোদিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। যাহা হউক, রামায়ণে উল্লিখিত মহাত্মগণের চরিত্র পাঠ করিলে যে বহুতর নীতি লাভ করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে কাহারও দ্বিরুক্তি নাই।

এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বতন মহর্ষিগণের বিনয়, সরলতা, সত্যনিষ্ঠা, বিদ্যাপরায়ণতা প্রভৃতি বিষয় পাঠ করিলে বহুল পরিমাণে নীতিবিষয়ক উপদেশ লাভ করিতে পারা যায়। বাহুল্য-ভয়ে তদ্বিষয় সবিস্তর বর্ণন করিতে না পারিয়া, এই স্থানেই প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।
সংস্কৃত কলেজ।

মহাভারতের মর্ম্ম ও তদন্তর্গত নীতি।

একদা নৈমিষারণ্যে শনকাদি ঋষিগণ তপস্যা করিতেছিলেন। এমন সময়ে বেদব্যাসের শিষ্য সৌতি তথায় উপস্থিত হওয়াতে পরমশ্রদ্ধাস্পদ ঋষিগণ তাঁহাকে ভৃগুবংশের উৎপত্তি বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিলেন। সৌতি তাঁহাদিগের আজ্ঞানুসারে বিস্তারিতরূপে ভৃগুবংশ কীর্ত্তন করণানন্তর রাজা জনমেজয়ের উপাখ্যান আরম্ভ করিলেন।

কোন সময়ে রাজা জনমেজয়ের পিতা মহারাজ পরীক্ষিৎ মৃগয়া করিতে গিয়া নিরপরাধে একজন তপস্বীকে অপমান করেন। তাহাতে উক্ত তপস্বীর পুত্রের অভিসম্পাতে তক্ষক দংশনে তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ হয়। পিতার তক্ষক-দংশনে মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া রাজা জনমেজয় পৃথিবীস্থ সমুদায় সর্পের বিনাশার্থ সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞ-কার্য্য সমাধা হইলে পর তিনি সর্প-বিনাশ-জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য পুনরায় অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করেন। দেবরাজ ইন্দ্র সেই যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদনার্থে ছেদিত অশ্বের মস্তকে প্রবেশ করত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে একটি ব্রাহ্মণকুমার বিকট হাস্য করিয়াছিলেন বলিয়া রাজা জনমেজয় তাঁহাকে সেই স্থলে বিনাশ করেন। কথিত আছে সেই ব্রহ্মহত্যা পাপে তিনি মহাব্যাধিগ্রস্ত হইলে, ব্যাসদেব তাঁহাকে মহাপাপ হইতে মুক্তির জন্য প্রিয় শিষ্য বৈশম্পায়নের নিকট মহাভারত শ্রবণ করিতে উপদেশ দেন। তাঁহার আদেশে মহর্ষি বৈশম্পায়ন তাঁহাকে ক্রমান্বয়ে অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত শ্রবণ করাইয়াছিলেন।

পূর্ব্বকালে চন্দ্রবংশে শান্তনু নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত প্রজারঞ্জন রাজা ছিলেন। তাঁহার প্রথমা ভার্য্যা গঙ্গার গর্ভে অষ্টবসু পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, সর্ব্বকনিষ্ঠ ভীষ্ম ব্যতীত সকলেই গঙ্গাদেবী কর্ত্তৃক ভাগীরথী প্রবাহে নিক্ষিপ্ত হন। ঐ কনিষ্ঠ পুত্রের নিক্ষেপকালে রাজা তাঁহাকে নিবারণ করাতে গঙ্গাদেবী পুত্র রাখিয়া পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যান। রাজা পুনর্ব্বার সত্যবতী নাম্নী পরম রূপবতী মৎস্যজীবীর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে রাজার দুই কুমার জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত কুমারদ্বয়ের শৈশবাবস্থাতেই মহারাজ শান্তনু তনুত্যাগ করেন। মহানুভব ভীষ্ম তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া চিত্রাঙ্গদের মস্তকে রাজছত্র প্রদান করেন, যেহেতুক তিনি নিজে পিতার সত্যবতী সহ বিবাহকালে, রাজ্য ও সংসার ত্যাগ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। চিত্রাঙ্গদ চিত্ররথ নামক গন্ধর্ব্বের সহিত সমরে হত হইলে তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যই তৎসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার যক্ষ্মারোগ জন্মিল, সুতরাং তাঁহার মাতার আদেশে ব্যাসদেব তাঁহার ভার্য্যার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু এবং তাঁহার দাসীর গর্ভে বিদুর এই তিন পুত্র উৎপাদন করেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার অনুজ পাণ্ডু পিতার পরলোকান্তে রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন।

গান্ধাররাজকন্যা গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের মহিষী ছিলেন। পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রী নামে কন্যাদ্বয়ের পাণিগ্রহণ করেন। পাণ্ডুরাজ দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া স্ত্রীসম্ভোগে বঞ্চিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সহধর্ম্মিণী কুন্তী বাল্যকালে দুর্ব্বাসা ঋষিকে সন্তুষ্ট করিয়া এক মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই মন্ত্রপ্রভাবে তিনি যে দেবতাকে স্মরণ করিতেন সেই দেবতাই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন। বালসুলভ চপলতা প্রযুক্ত তিনি সূর্য্যদেবকে ঐ মন্ত্রদ্বারা স্মরণ করেন, তদনুসারে তাঁহার ঔরসে কুন্তীর এক পুত্র হয়। ঐ পুত্র মাতাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে রাধা নাম্নী এক সূতভার্য্যার দ্বারা প্রতিপালিত হয়; এবং কাল প্রাপ্তে জামদগ্ন্য পরশুরামের নিকট সমুদায় যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া মহাবীর কর্ণ নামে বিখ্যাত হন। পাণ্ডুপত্নী কুন্তী স্বীয় পতির আজ্ঞায়, যম, পবন ও ইন্দ্রদেবের ঔরসে ক্রমান্বয়ে যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জ্জুন নামে তিন পুত্র উৎপাদিত করেন। মাদ্রীরও ঐ মন্ত্র দ্বারা অশ্বিনীকুমারের ঔরসে নকুল ও সহদেব নামে যমজ পুত্র হয়। এদিকে ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি একশত পুত্র হইল। মহারাজা পাণ্ডু শাপ জন্য শীঘ্রই কলেবর পরিত্যাগ করিলেন, মাদ্রী তাঁহার অনুমরণ করিলেন। তদনন্তর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রতি ক্রূর-স্বভাব দুর্যোধনের হিংসা-বৃত্তি ক্রমশই পরিবর্ধিত হইতে লাগিল। তিনি এক দিবস বাল্য-ক্রীড়া করিতে করিতে মধ্যম পাণ্ডব ভীমকে বিষাক্ত মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া বন্ধন করতঃ পাতালে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু ভাগ্যবলে অনন্তের অনুগ্রহে তিনি সে যাত্রা বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন এবং পাতাল হইতে সুধাপান দ্বারা সমধিক বলবান হইয়া হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিলেন। ভরদ্বাজ মুনীর পুত্র দ্রোণ দ্রুপদ নামক পাঞ্চাল রাজার রাজ্যে বাস করিতেন। কোন সময়ে তৎকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া পাঞ্চাল রাজ্য ত্যাগ করতঃ পরশুরামের নিকট সমুদয় অস্ত্র-শিক্ষা করেন। তাঁহার ন্যায় রথী ভীষ্ম ব্যতীত আর কেহই ছিল না। তিনি এক্ষণে অশ্বত্থামা নামা পুত্রের সহিত ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন প্রভৃতির শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। রাজপুত্রগণ তাঁহার নিকট সমুদয় অস্ত্রবিদ্যায় সুসম্পন্ন হইলেন, কিন্তু তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের ন্যায় ধনুর্ধারী হইতে কেহ পারিলেন না। ভীম ও দুর্য্যোধন উভয়েই গদাযুদ্ধে সুনিপুণ হইলেন। অশ্বত্থামাও স্বীয় পিতার নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া এক জন অসামান্য ধনুর্দ্ধর হইয়া উঠিলেন। পাণ্ডবেরা অচিরকাল মধ্যেই বেদবিদ্যায় ও ধনুর্বিদ্যায় অত্যন্ত বিচক্ষণ হইয়াছে দেখিয়া অসূয়াপরতন্ত্র দুর্য্যোধন যৎপরোনাস্তি ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং কি উপায়ে তাহাদিগের বিনাশ সাধন করিবেন এই চিন্তাই তাঁহার অন্তঃকরণ মধ্যে জাগরূক রহিল। তিনি কর্ণকে অদ্বিতীয় ধনুর্ধর দেখিয়া তাঁহার দ্বারাই সিদ্ধ-মনস্কাম হইবেন মনে করিয়া, তাঁহাকে অঙ্গ দেশের আধিপত্য প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার সহিত মিত্রতা করিলেন।

এইরূপে এই প্রস্তাব রচয়িতা যুধিষ্ঠিরের যৌবরাজ্যাভিষেক ও জতুগৃহদাহ— দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ ও দ্রৌপদীর বিবাহ— প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হেতু অর্জ্জুনের তীর্থযাত্রা— খাণ্ডবদাহন— রাজসূয় যজ্ঞ— দ্যূতক্রীড়া— পাণ্ডবদিগের বনগমন— বিরাটের গৃহে অজ্ঞাতবাস—

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ— অশ্বমেধ যজ্ঞ— পাণ্ডবদিগের স্বর্গারোহণ প্রভৃতি মহাভারতোল্লিখিত বৃত্তান্ত সকল সবিস্তরে বর্ণন করিয়াছেন। বিস্তৃতি নিবন্ধন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা হইতেছে না। মহাভারতের অন্তর্গত নীতি বিষয়ে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

দুর্য্যোধন স্বীয় অভিমান ও পাণ্ডুপুত্রগণের প্রতি চিরবিদ্বেষ বশতঃ দুষ্ট মন্ত্রী শকুনির পরামর্শে যুধিষ্ঠিরাদিকে যৎসামান্য বিষয় প্রদানেও অস্বীকৃত হইয়া কেবল আপনিই যে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন, এমন নহে, ভূরি ভূরি ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব নৃপতিবর্গের বিনাশ সাধনেরও হেতু হইয়াছিলেন। অভিমান ও দ্বেষ সত্ত্বেও তাঁহার ভ্রাতৃস্নেহ ও মহত্ত্ব প্রভৃতি সদগুণ ছিল। রাজা যুধিষ্ঠির সত্যব্রততা, দয়ালুতা, ধর্ম্মানুরাগিতা প্রভৃতি সদ্গুণের আদর্শ-স্বরূপ। ভীমার্জ্জুন নকুল সহদেবের সদৃশ গুরুভক্তি দেখাইতে দ্বাপর যুগে আর কেহই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। দ্রৌপদীর পতিগণের প্রতি অসামান্য ভক্তি ছিল। ধৃতরাষ্ট্রের স্বীয় পুত্রের প্রতি অন্যায় স্নেহ, ভীষ্মদেবের মহানুভবতা, কর্ণের দাতৃত্ব ও অহংকার, দ্রোণাচার্য্যের পুত্র-বৎসলতা ও শিষ্য-স্নেহ এবং কৃষ্ণের অপ্রতিহত বুদ্ধিকৌশল অনৈসর্গিক বোধ হয়। মহাভারতের অধিকাংশ বর্ণনাই বীর-রসে পরিপূর্ণ। স্থলবিশেষে অন্য অন্য রসও দৃষ্ট হয়। ইহার স্থলবিশেষ পাঠ করিলে হীনবল ব্যক্তিদিগেরও অন্তঃকরণ বীররসে আস্ফালিত হইতে থাকে। স্থলবিশেষ শ্রবণ করিলে নিতান্ত পাষাণ হৃদয়েরও অন্তঃকরণ দয়ায় দ্রবীভূত হইতে থাকে। যখন, পাণ্ডবেরা দ্যূতে পরাজিত হইলে দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক রাজসভায় আনয়ন করত তাঁহার প্রতি বস্ত্রহরণ প্রভৃতি অহিতাচার করিতে উদ্যত হইতেছে, আর মহাবাহু ভীম সেই সমুদয় অবমাননা সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করত এক ২ বার যুধিষ্ঠিরের প্রতি তৎপ্রতি-হিংসার প্রার্থনায় দৃষ্টিপাত করিতেছে, কিন্তু যুধিষ্ঠির আজ্ঞা প্রদান করিলেন না বলিয়া আবার মস্তক অবনত করিয়া রহিতেছে,— সেই স্থলটা পাঠ করা যায়, তখন কাহার অন্তঃকরণে ক্রোধের সঞ্চার না হয়? কাহার মনেই বা যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদিত্বের উপর দৃঢ় প্রত্যয় না হয়? এবং কাহার মনেই বা ভীমের যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃঢ় ভক্তি প্রত্যক্ষীভূত না হয়? যখন দুর্য্যোধন অসঙ্কুচিত চিত্তে সাত জন রথীকে একা শিশু অভিমন্যুর প্রাণ সংহার করিতে আদেশ দিলেন, আহা! সেই স্থলটি পাঠ করিলে কাহার মনে না তাহার প্রতি ঘৃণা জন্মে? যখন মহানুভব ভীষ্ম পাণ্ডবদিগকে আপন বধের উপায় বলিয়া দিলেন, পাঠ করা যায়, তখন কোন্ ব্যক্তির অন্তঃকরণ তাঁহার সদাশয়ত্ব দর্শনে অক্ষম হয়? মহাভারত আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে জিতেন্দ্রিয়তা, দয়া, মহানুভবতা প্রভৃতি বহুবিধ সুনীতি প্রাপ্তে অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইয়া উঠে। জ্ঞাতিবিরোধ যে কি প্রকার অনিষ্টকর এবং তাহা হইতে পৃথিবীর যে কত প্রকার অমঙ্গল ঘটিয়া উঠে, এবং যতই কেন ক্লেশ সহ্য করিতে হউক না, সর্ব্বশেষে যে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় হয়, মহাভারত পাঠে তদ্বিষয়ক বিশেষ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীজানকীনাথ দত্ত।

ক্ষত্রিয়জাতির দেশপ্রিয়তা ও সাহসিকতা।

"—রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়, শতধিক তারে!"

—মেঘনাদ বধ কাব্য।

বিখ্যাত ভারত ভূমি অতি পুরাতন,
মনোরমস্থান নাই ইহার মতন।
ইথে জন্মিয়াছে কত শত মহাজন,
ঘটেছে এখানে কত অদ্ভুত ঘটন!
সুন্দর ভারত ভূমি ফল ফুলে নত,
আকাশ ভূমির শোভা কোথা আছে এত?
নদ নদী বন গ্রাম ভূধর নগর,
শস্যপূর্ণ শস্যক্ষেত্র, উদ্যান সুন্দর,
এ দেশের সম হেন কোথায় বা আছে?
সার্থক এখানে যেই জন্ম লভিয়াছে।
কত শত মহাজ্ঞানী— কত কবিগণ—
শত শত মহীপাল— মহাশূর জন—
ইহাতে জন্মিয়াছিল, কিন্তু এবে গত,
সেই সঙ্গে ভারতের পরাক্রম হত।
পূর্ব্বে যবে ভারতের ছিল একদিন,
যখন ভারতভূমি ছিলেন স্বাধীন,
আছিল তখন ইথে মহিপালগণ,
ভারত-গরিমা, সূর্য্য বংশের ভূষণ,
যখন ক্ষত্রিয় বীর বীররসে ভাসি,
সেবিতেন স্বীয় দেশ দেশ-শত্রু নাশি।
সময়ের দ্রুত গতি, কিন্তু সম নয়,
ভাগ্যলক্ষ্মী স্থিরভাবে বল কোথা রয়।
ভারতের সুখ সূর্য্য যবে অস্ত গেল,
ভাগ্যবান্ বলবান্ যবন আইল।

এহেন সময় যত হিন্দু রাজগণ,
পরস্পর গৃহরণে মত্ত সর্ব্বজন।

দারুণ হিন্দুর অরি, যবে বীরদর্প করি
আইল ভারতরত্ন করিতে গ্রহণ,
পরস্পর নাশে ব্যস্ত ক্ষত্রিয় তখন।

তথাপি ক্ষত্রিয় নহে হীনপরাক্রম,
স্বদেশ রক্ষার্থ ধরি সিংহের বিক্রম,
বধিল যে কত অরি, যথা নলবনে করী,
অথবা মৃগের যূথে মৃগরাজ সম,
কোথায় বীরতা হেন চির নিরুপম।

নির্ভয়ে সমর ক্ষেত্রে করিয়া গমন,
সাহসে যুঝিয়া রণে করি প্রাণপণ,
মরিয়াছে শত ২, ব্যথিত সিংহের মত,
যখন শীকারি দলে করিয়া বেষ্টন,
বহু অস্ত্রাঘাতে করে তাহার নিধন।

ভারতের রত্ন দেখি লুব্ধ রাজগণ,
লভিতে করিত চেষ্টা করি আক্রমণ,
তাদের করিয়া নাশ, পুরাইয়া মন আশ,
পরাক্রমে জন্মভূমি করিতে রক্ষণ।
হায় কিন্তু সেই দিন নাহিক এখন।

পূর্ব্বে বহুকাল গত যবে ক্ষত্রগণ,
বদ্ধপরিকর সবে করিতে ভ্রমণ,
উপেক্ষিয়া আর কাজ, পরিয়া সমর সাজ,
এক কাজে এক মনে করিত যতন,
সাধ্য কি ভারতে শত্রু আসিতে তখন?

ছিল যবে বাপ্পারাও মিবার ঈশ্বর,
ভুবন বিখ্যাত যথা চিতোর নগর,
যবনেরে পরাজিয়া, রাজপুত সৈন্য নিয়া,
সিন্ধুপারে নিজ রাজ্য করিলা বিস্তার,
কর দিয়া বহু দেশ পাইল নিস্তার।

পারসিক আরবিক বহু রাজচয়,
আক্রমি ভারত মানিয়াছে পরাজয়।
মহাশূর সেকন্দর, এসিয়ার রাজ্যেশ্বর,
ডেরায়স্ আদি সব করিয়া বিজয়,
ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রে শেষে বীরগর্ব্ব ক্ষয়।

পরহিত, দেশহিত করিতে সাধন,
করেছে ক্ষত্রিয় নিজ জীবন অর্পণ।
সাহসে নির্ভর করি, জীবন আশা পরিহরি,
স্নেহময় স্বদেশের করিতে রক্ষণ,
ত্যজি সুখ আশ, ত্যজি গৃহ পরিজন।

অনুপম রূপে গুণে ক্ষত্রিয়ললনা,
না দেখি রমণী দিতে তাদের তুলনা;
খুলি স্বর্ণ অলঙ্কার, খুলি চারু রত্নহার,
সমরের ব্যয় তরে দিয়াছে অঙ্গনা,
রণে পাঠায়েছে সুতে করি উত্তেজনা।

সার্থক ক্ষত্রিয় শূর! মৃতবত জন
ভারতে জন্মেছি কেন আমরা এখন?
নাহি পরাক্রম লেশ, ক্ষীণ মান পূর্ণদেশ,
তাই অধীনতা পাশে বন্দীর মতন,
তাহে অপমান নাই— হেন নীচমন।

কোথা ক্ষত্রবীর সব— ক্ষত্র রাজগণ!
কোথা ভীষ্ম কার্ত্তবীর্য্য পাণ্ডুর নন্দন!
কোথায় হামির রায় কোথা ভীমসিংহ হায়,
কোথায় প্রতাপ আদি বীরবরগণ!
দেখুক ভারতে তারা কি দশা এখন!

—

যন্ত্র-বিজ্ঞান।

আত্মা ব্যতীত সকল বস্তুই মৌর্ত্তিক। মৌর্ত্তিক বলিতে যাহাতে মূর্ত্ত আছে তাহাই বুঝায়। মূর্ত্তের কোন লক্ষণ সুস্পষ্টরূপে দেওয়া বড় সুকঠিন। যত প্রাকৃত বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, ততই মূর্ত্তের নূতন ২ গুণ প্রকাশ পাইতেছে। মূর্ত্তের গুণ ব্যতিরেকে মূর্ত্তের বিষয় আমরা কিছুই জানিতে পারি না। অতএব মূর্ত্তের লক্ষণ করিতে গেলে কেবল মূর্ত্তের কতকগুলি গুণের নামোল্লেখের অধিক কিছুই হইবে না। যন্ত্রবিজ্ঞান, দৃষ্টিবিজ্ঞান, দ্রববিজ্ঞান, তড়িৎবিজ্ঞান, এ সকল গুলিই প্রাকৃত বিজ্ঞানের এক ২ প্রধান প্রধান অংশ। যে বিদ্যাদ্বারা, বস্তু কি নিয়মানুযায়ী হইয়া এক স্থানে থাকে বা স্থান পরিবর্ত্তন করে, ইহা জ্ঞাত হই, তাহাকে আমরা যন্ত্র-বিজ্ঞান কহিয়া থাকি। যন্ত্র বিজ্ঞান দুই অংশে বিভক্ত। (১) স্থিতি বিজ্ঞান, (২) গতি বিজ্ঞান।

(১) বলের কার্য্য হইলে পরও যদি কোন দ্রব্য সাম্যাবস্থায় থাকে, তাহা হইলে যে বিদ্যা দ্বারা সেই সমস্ত বলের সম্বন্ধ বিষয় জানিতে পারি তাহাকে স্থিতি-বিজ্ঞান কহিয়া থাকি।

(২) যে বিষয়ে বল দ্বারা সঞ্চালিত বস্তুর বিষয় বিবেচনা করি তাহাকে আমরা গতি-বিজ্ঞান কহিয়া থাকি।

উপরুক্ত লক্ষণ মধ্যে বল কথাটির ব্যবহার করা হইয়াছে। বলের লক্ষণ নিম্নলিখিতরূপে করা যাইতে পারে। গতি বা স্থিরতা বিশিষ্ট অবস্থার পরিবর্ত্তনকারী যে কারণ, তাহাকে আমরা বল কহিতে পারি। যন্ত্র বিজ্ঞানের লক্ষণ গতির ক্ষেত্রতত্ত্ব বলিলেও বলা যায়। যন্ত্র বিজ্ঞানের বিষয় জানিবার পূর্ব্বে মূর্ত্তের নিম্নলিখিত মৌলিক ধর্ম্ম কয়েকটী জানা কর্ত্তব্য। সকল মূর্ত্তিক পদার্থ ঘনত্ব, আয়তন, বিভাজ্যতা, তরলতা, স্থিতিশীলতা, আকর্ষণ, প্রত্যাকর্ষণ বা নিরাকরণ বিশিষ্ট।

ঘনত্ব বা অবকাশব্যাপীত্ব,— দুইটী মূর্ত্তিক পদার্থ এক সময়ে এক স্থানে থাকিতে না পারা যে মূর্ত্তের গুণ তাহাকেই বলে। যথা, একটী পয়সা যে স্থানে রহিয়াছে তথায় আর একটী পয়সা বা অন্য একটী পদার্থ রাখিতে হইলে সেই প্রথম পয়সাটীকে অগ্রে স্থানান্তরিত করিতে হয়। অথবা জলে কোন বস্তু নিক্ষেপ করিলে সেই স্থানের জল চারি পার্শ্বে সরিয়া যায়।

আয়তন,— উপরুক্ত পরীক্ষা দ্বারা এই গুণ প্রকাশ পায়, বস্তুবিশেষে বিশেষ বিশেষ স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

বিভাজ্যতা,— সকল মূর্ত্তিক পদার্থ যত ক্ষুদ্র হউক না কেন, তাহাকে আরও ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা,— অতি ক্ষুদ্র রেণুকেও আরও ছোট ছোট ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করা যায়। কোন বস্তুর গন্ধ, ঘ্রাণ-শক্তি দ্বারা জ্ঞাত হইবার কালীন

সেই বস্তুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেণু বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত সংসর্গ দ্বারা গন্ধজ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। মৃগনাভির গন্ধ একটী ঘরে ২০ বৎসর কালের অধিককাল থাকে অর্থাৎ ২০ বৎসরেও সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেণু ক্ষয় হয় না।

বারুদে অগ্নি প্রদান করিলে ২৪৪ পরিমাণে স্থূলতর হয়। জল তাতদ্বারা ধূমাকার প্রাপ্ত হইলে ১৮০০ পরিমাণে তরল অবস্থা অপেক্ষা স্থূলতর হয় ইত্যাদি। মূর্ত্তের যে উপরুক্ত গুণ তাহাকে আমরা বিভাজ্যতা কহিয়া থাকি।

তরলতা,— সকল মূর্ত্তিক বস্তুকে এক স্থান হইতে যে স্থানান্তরিত করা যায়, তাহাকেই তরলতা কহা যায়।

আকর্ষণ,— মূর্ত্তিক বস্তুদিগের একত্রে আনিবার আশয়কে আকর্ষণ কহে। আকর্ষণ ৫ প্রকার। তন্মধ্যে দুইটী আকর্ষণ আমাদিগের জানা কর্ত্তব্য, সংসক্তি আকর্ষণ ও গুরুত্ব বিষয়ক আকর্ষণ। দুইখানি কাচ যদি একত্র করা যায়, তাহা হইলে সেই দুইটাকে ভিন্ন করিবার জন্য কিঞ্চিৎ বল প্রদানের আবশ্যক করে। সেই কাচের একত্র থাকিবার আশয়কে সংসক্তি আকর্ষণ কহা যায়। গুরুত্ব বিষয়ক আকর্ষণের সংসক্তি আকর্ষণ হইতে এই প্রভেদ যে গুরুত্ব আকর্ষণ, একটী বস্তু যতদূরে থাকুক না কেন, তদুপরি তাহার কার্য্য হইতে থাকে। গুরুত্ব বিষয়ক আকর্ষণ দ্বারা চন্দ্র সূর্য্য নিজ নিজ স্থানে রহিয়াছে। কোন একটী বস্তুকে ঊর্দ্ধদিকে নিক্ষিপ্ত করিলে শীঘ্র নিম্নে পতন হয়, ইহা পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তিবশতঃ।

যে পরিমাণে একটী বস্তুতে মূর্ত্ত আছে, সেই পরিমাণে তাহার গুরুত্ব স্বল্প বা অধিক হইয়া থাকে। এই কারণবশতঃ একটী পালক ও একটী টাকা একত্রে ঊর্দ্ধ হইতে নিক্ষিপ্ত হইলে একত্রে ভূমে পতিত হয়। (Experiment to be seen within an Air Pump). বায়ু শোষক যন্ত্রের ভিতরে পরীক্ষা করিতে হইবে, কারণ ঐ টাকাতে অধিক মূর্ত্ত আছে বলিয়া আকর্ষণ জন্য অধিক শক্তির আবশ্যক হয়, এই কারণবশতঃ অধিক বেগে গতি হইতে পারে না। পৃথিবী হইতে সমান দূরে সকল স্থানে আকর্ষণ শক্তির সমান আধিক্য। এই বিষয়টী পরিদোলক পরীক্ষা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান্ হয়। উত্তরমেরুতে সেকেণ্ড গণনা জন্য পরিদোলকের দীর্ঘতা যেরূপ, তদপেক্ষা নাড়ীমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী যে পরিমাণে হইবে, সেই পরিমাণে পরিদোলকের দীর্ঘতা ছোট করা আবশ্যক। কারণ, পৃথিবী ঠিক গোলাকার নয়। আকর্ষণ পৃথিবীর উপরিস্থলে অন্য সকল স্থান অপেক্ষা অধিক, নিম্নে বা ঊর্দ্ধে আকর্ষণ শক্তি ক্রমশঃ অল্প হইয়া আইসে।

একটী বস্তু নিম্নে নিক্ষিপ্ত হইলে পর আকর্ষণবশতঃ প্রথম সেকেণ্ডে সামান্যত সংখ্যায় ১৬ ফুট ১০ হাত পতিত হয়। দুইটি বস্তু যদি পৃথিবীর আকর্ষণ ও অন্যান্য সকল প্রকার বাহ্য পদার্থের আকর্ষণ বিবর্জ্জিত হইয়া শূন্যে স্থিত হইত, তাহা হইলে নিজ নিজ আকর্ষণ ক্রমে কিঞ্চিৎ সময় মধ্যে দুইটী দুইটীর মধ্যাংশে আসিয়া একত্রিত হইত। একত্রিত হইবার স্থল যে পরিমাণে মূর্ত্ত আছে সেই পরিমাণে নির্ণীত হয়।

আকর্ষণ দ্বারা বস্তুর গতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। কারণ, আকর্ষণের কার্য্য সকল সময়ে সকল

অবস্থায় হইয়া থাকে। যথা, এক মিনিটে এক ক্রোশ গমনের শক্তি থাকিলে দ্বিতীয় মিনিটে দুই ক্রোশ গতির শক্তি হইবে।

সমান পরিমাণে বর্দ্ধিত গতিকে Acceleration কহা যায়। যে কোন পদার্থ হউক না কেন, যদি তাহার গতি সমান রূপে বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে বিযোড় সংখ্যা ১৩৫৭... এই পরিমাণে স্থল পরিভ্রমণ করিবে। যথা, প্রথম সেকেণ্ডে ১ ফুট বা ১ হাত বা ১ ক্রোশ গতি হইলে দুই সেকেণ্ডে তাহা ৩ ফুট বা ৩ হাত বা ৩ ক্রোশ গতি হইবে।

আকর্ষণ জন্য বস্তুদের গতি পতনকালে সমানরূপে বর্দ্ধিত হয়; উর্দ্ধদিকে নিক্ষেপ করিলে আকর্ষণ জন্য গতি সমানরূপে স্বল্প হইয়া আসে। একটি দ্রব্য উর্দ্ধদিকে নিক্ষেপ করিলে যে সময়ে তাহার গতি নষ্ট হয়, পতন অবস্থায় সেই গতি প্রাপ্ত হইবার জন্য সেই সময় ও সমান দীর্ঘ স্থল পরিভ্রমণ করা আবশ্যক করে।

আকর্ষণ ও গুরুত্ব একই পদার্থ নহে। আকর্ষণ ও গুরুত্ব এই দুইটী মধ্যে কার্য্যকারণ ভাব। গুরুত্ব আকর্ষণের কার্য্য। আকর্ষণ স্বল্প হইলে গুরুত্বও স্বল্প হইয়া আসে। ইহার দৃষ্টান্ত, বেলুনের উপরে কোন দ্রব্য ওজন করিলে পৃথিবীর উপরিভাগ অপেক্ষা অনেক অল্প ভারি বোধ হয়।

প্রত্যাকর্ষণ,— আকর্ষণের বিপরীত গুণকে প্রত্যাকর্ষণ বা নিরাকরণ কহা যায়। আকর্ষণের কারণ প্রদর্শন করা যেমন অতি সুকঠিন, নিরাকরণের কারণ প্রদর্শনও সেইরূপ। বিলাতীয় একজন দর্শনকার Dr. Knight কহিয়াছেন যে, সকল বস্তুতে যে তাড়িৎ আছে, তাহাতেই নিরাকরণ বা প্রত্যাকর্ষণ জন্মিয়া থাকে।

প্রত্যাকর্ষণ থাকাতে জল ও তেলেতে মিশ্রিত হইতে পারে না। ইত্যাদি

Motion. গতি

গতির কোন লক্ষণ দেওয়া বড় সুকঠিন। গতিকে স্থান পরিবর্ত্তন বলিলে হয়, কিন্তু তাহা হইলে গতিকে গতি বলা অপেক্ষা কিছু অধিক বলা হইল না। গতি দ্বারা আমরা সকল বস্তুর স্থায়িত্ব বিষয়ে জ্ঞাত হই। কোন কার্য্য গতি ব্যতিরেকে সাধন হয় না। গতি দুই প্রকার; নিরপেক্ষ গতি ও আপেক্ষিক গতি।

একটি বস্তু যে স্থানে স্থিত, যখন সেই স্থানটী, আরো একটি বস্তু যে স্থানে স্থিত, তাহার সহিত তুলনা করিয়া দেখি এবং সেই বস্তু অন্য অন্য বস্তুর সম্বন্ধে কিরূপ স্থান পরিবর্ত্তন করে, তাহা বিবেচনা করি, তখন আমরা তাহার আপেক্ষিক গতির বিষয় বিবেচনা করিয়া থাকি।

কিন্তু সকলপ্রকার গতিই নিরপেক্ষ গতির মধ্যে ধর্ত্তব্য। কারণ, গতি হইলেই স্থান পরিবর্ত্তন হইবে, কিন্তু গতি বিষয়ে আমাদের যে জ্ঞান জন্মায় তাহা কেবল আপেক্ষিক গতি বিষয়ে।

যথা, দুইখানি জাহাজ সমান বেগে যদি ক্রমশঃ একদিকে চলিতে থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক জাহাজের লোকেরা অন্য জাহাজখানি গতিহীন বলিয়া বোধ করিবে। অথবা,

পৃথিবীর গতি দ্বারা পৃথিবীর উপরিস্থ সকল প্রকার দ্রব্যের গতি হইতেছে, কিন্তু সে গতি বিষয়ে আমাদিগের কোন জ্ঞান জন্মায় না। অথবা, যদি দুইখানি জাহাজ দুই বিপরীত দিকে সমান বেগের সহিত যায়, তাহা হইলে একখানি জাহাজস্থিত ব্যক্তিরা অন্য জাহাজখানির যথার্থ গতি অপেক্ষা দ্বিগুণ গতিবেগ বিবেচনা করিবে। এইরূপ বোধ হইবার কারণ এই যে, যখন আমরা কোন দ্রব্যের গতি বিষয়ে বিবেচনা করি, তৎকালে আমরা আপনারা স্থির রহিয়াছি এইরূপ মনে করিয়া লই।

কোন দ্রব্যের নিক্ষেপ দ্বারা যে গতি প্রাপ্ত হয় তদ্বিষয়ে আমরা যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞাত আছি।

উপরুক্ত দুই প্রকার গতি হইতে বিভিন্ন আর এক প্রকার গতি আছে, যদ্দ্বারা গাছ মনুষ্য ও অন্যান্য জীব সমুদায় প্রতিদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। সকল প্রকার গতির বিষয় বিবেচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে, সকলপ্রকার পদার্থই গতি-বিশিষ্ট।

গতির বিষয় বিবেচনা করিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় আমাদের জানা কর্ত্তব্য ;—

(১) যে কারণ দ্বারা গতি হইতেছে,
(২) গতির বেগ ও দিক্ নিরূপণ,
(৩) গতি-বিশিষ্ট দ্রব্যে কত মূর্ত্ত আছে,
(৪) কতদূর গতি হইতেছে,
(৫) সেই স্থল পরিভ্রমণে কত সময় আবশ্যক হইল,
(৬) কত বেগ সহিত সেই দ্রব্য অন্য কোন এক দ্রব্যেতে আঘাত করিতেছে।

দ্রব্যসমূহের উপরুক্ত যে জড়তা শক্তির বর্ণনা করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা সকল প্রকার অবস্থা পরিবর্ত্তনে বাধা জন্মে। কোন বস্তু স্থির থাকিলে তাহা স্থিরই থাকে, যদি না অন্য কোন বাহ্য কারণ দ্বারা গতি প্রাপ্ত হয়। গতি প্রাপ্ত হইলে তাহার গতি রোধ জন্য বাহ্য বলের আবশ্যক করে। কোন বস্তুকে গতি প্রদান করিতে হইলে, বায়ু জল আকর্ষণ ও দ্রব পদার্থের স্থিতিস্থাপকতা ও অন্যান্য জীব ও মনুষ্যের গতি হেতু শক্তির ব্যবহার করা হয়। কোন্ দ্রব্য কত দূর কত সময়ে পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা বিবেচনা করিয়া, গতির কত বেগ তাহা আমরা জানিতে পারি। যত অল্প সময়ে যত অধিক দূর পরিভ্রমণ হয়, ততই গতির বেগ অধিক বলিয়া থাকি। গতির বেগ নির্ণয় করিবার জন্য আমরা সময় দ্বারা পরিভ্রমিত স্থলকে ভাগ করিয়া থাকি। যথা, ১০০০ ক্রোশ ১০ মিনিটে পরিভ্রমণ করিলে ১ মিনিটে ১০০ ক্রোশ পরিভ্রমণ করে, অর্থাৎ ১০০ ক্রোশ সেই বস্তুর গতিবেগ। যদি দুইটি বস্তুর গতিবেগ তুলনা করিতে হয়, যথা, একটি বস্তু ৬০ ক্রোশ ৬ মিনিটে পরিভ্রমণ করে, আর একটি বস্তু ৯০ ক্রোশ ১০ মিনিটে পরিভ্রমণ করে, তাহা হইলে

প্রথম বস্তুর গতিবেগ : দ্বিতীয় বস্তুর গতিবেগ :: ১০ : ৯। কোন দ্রব্য এক নিয়োজিত সময় মধ্যে কত পরিভ্রমণ করিতে পারে, ইহা জানিবার নিমিত্ত সময়কে গতিবেগ দিয়া গুণ

করিতে হয়, সেই গুণফল পরিভ্রমিত স্থলের সমান। কারণ, গতিবেগ কিম্বা সময় বৃদ্ধি করিলে স্থল পরিভ্রমণ সেই পরিমাণে অধিক হয়।

এইরূপে গতি-বেগ দ্বিগুণ করিলে, নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে দ্বিগুণ স্থল পরিভ্রমণ হইবে। অথবা যদি সময় দ্বিগুণ করা হয় কিন্তু গতিবেগ অগ্রে যেরূপ ছিল সেই রূপই থাকে, তাহা হইলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, দ্বিগুণ স্থল পরিভ্রমণ করিবে।

গতি বিশিষ্ট পদার্থ যখন কোন বিশেষ দিকেচালিত হয়, তখন তাহার গতিকে সরল গতি কহা যায়। কিন্তু যখন ক্রমশঃ দিক্ পরিবর্ত্তন করিতে থাকে, তৎকালে তাহার গতিকে বক্রগতি বলা যায়।

কোন এক বিশেষ দিকে গতি বিশিষ্ট পদার্থ সেই দিকে দুই তিনটী সঞ্চালন-সামর্থ্য সম্পন্ন বল দ্বারা সঞ্চালিত হইলে, তাহার গতি সেই দিকেই থাকে, কেবল বেগের স্বল্পতা বা আধিক্য হয়। কিন্তু যদি ভিন্ন ভিন্ন দিকে সঞ্চালন-সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে সেই বস্তু সঞ্চালিত হয়, নিম্নলিখিত নিয়ম দ্বারা তাহাদের বিশেষ বিশেষ গতি নির্ণয় করা যায়।

দুই বলের যোগে, সেই বলদ্বয় প্রতিরূপ যে দুই সরল রেখা, তদুপরি সমান্তরাল চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের কর্ণরেখা ক্রমে গতি হইয়া থাকে।

দুই তিন বল দ্বারা সঞ্চালিত দ্রব্য আমরা সচরাচর অনেক দেখিতে পাই। একখানি নৌকা বায়ুভরে ও জলস্রোতে চলিতে থাকে। গাড়ি চলিতাবস্থায় যদি আমরা লম্ফন করি তাহা হইলে তাহাও এই প্রকার গতির ভিতর বিবেচ্য।

যদি একটি বস্তুর গতি নির্দ্ধারিত সময়ে সময়ে ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে, সেই গতির বেগ বৃদ্ধি হইতেছে, এইরূপ কহিয়া থাকি। যদি তাহার ক্রমশঃ গতি ক্ষয় হইয়া আইসে, তাহা হইলে তাহার গতি (Retarded) অর্থাৎ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে, কহিয়া থাকি। আকর্ষণ দ্বারা দ্রব্য নিম্নদিকে পতিত হইলে তাহার গতিবেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহার গতি-বেগের হ্রাস হয়। এই বিষয়টি অনেক কৌশল দ্বারা স্থির হইয়াছে। যদি একটি দ্রব্যকে সরল রেখা পরিভ্রমণ করিবে বলিয়া নিক্ষিপ্ত করা যায়, তাহা হইলে সেই দ্রব্যটি সমান সরল রেখা পরিভ্রমণ না করিয়া, আকর্ষণ দ্বারা আকর্ষিত হইয়া, ক্ষেপণী রেখাতে গতি হয়। ক্ষেপণী রেখাতে পরিভ্রমণ করা, ইহা গেলিলিও কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছিল। বায়ু দ্বারা বাধিত হয় বলিয়া, ঠিক ক্ষেপণী রেখাতে পতন হয় না। গতি হইবার কালে যে বলের আবশ্যক করে, তাহা নির্ণয় জন্য আমরা গতির বেগ এবং দ্রব্যের গুরুত্বতে গুণ করিয়া থাকি। এবং যত পরিমাণে সেই গুণফল অধিক হয়, সেই পরিমাণে আমরা বলটাকে অধিক বলবতী বা স্বল্প বলবতী বলিয়া থাকি। ঐ গুণফলটিকে আমরা সেই বস্তুর (Momentum) ভার-শক্তি কহিয়া থাকি। এই রূপে আমরা দেখি যে দুইটি বস্তুর সমান বেগ হইলে, তাহাদের ভার-শক্তি তাহাদের মূর্ত্তিক পরমাণু পরিমাণে হইয়া থাকে। কিন্তু গতি-বেগ বিভিন্ন হইলে সেই গতি-বেগ পরিমাণে তাহাদের ভার-শক্তি (Momentum) হইয়া থাকে। উপরুক্ত নিয়মটি প্রাকৃত বিজ্ঞানের নিয়ম সমূহের মধ্যে একটি প্রধান নিয়ম।

উপর উক্ত বর্ণনা মধ্যে এক প্রকার গতির নিয়ম সমুদায় দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু প্রাকৃত বিজ্ঞান মধ্যে ঐ নিয়মগুলি সুচারু রূপে জানা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। তজ্জন্য পরিষ্কার রূপে সেইগুলি নিম্নে লিখিত হইল।

গতির নিয়ম।

(১) সকল বস্তু জড়তা গুণবিশিষ্ট; অর্থাৎ যখন স্থির অবস্থায় থাকে বা গতি বিশিষ্ট হয়, তখন সেই সেই বস্তু সেই সেই অবস্থায় থাকে, যদি না কোন বাহ্য কারণ দ্বারা তাহারা সেই সেই অবস্থা-বিবর্জ্জিত হয়। "জড় পদার্থ নিশ্চেষ্ট"।

(২) "জড়ের প্রতি যত বল কেন একবারে দেওয়া যাউক না, সকল বলগুলি স্ব স্ব অভিমুখে সরল রেখা ক্রমে উহার গতি উৎপাদন করে"।

(৩) কার্য্য কারণের সমান ভাব। যথা, দুইটী বস্তুর মধ্যে যদি একটী আর একটীকে আসিয়া আঘাত করে, তাহা হইলে দুইটীর আঘাত সমান ও বিপরীত দিকে কার্য্য করে।

গতির নিয়ম তিনটী অনেক পরিশ্রমের ফল। এই নিয়ম তিনটীর যাথার্থ্য বিষয়ে অনেক প্রকার প্রমাণ দেওয়া যায়। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত প্রমাণটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। এই নিয়ম সমুদয় স্বীকার করিয়া যে-সকল জ্যোতিষ-ঘটনা গণনা করা যায়, তাহা একবারে সম্পূর্ণরূপে আমাদের তদ্বিষয়ে দর্শন-শক্তিজনিত জ্ঞানের সহিত মিলিত হয়।

এতদ্ব্যতীত অনেকানেক তুচ্ছ বিষয় হইতে আমরা এই সমুদায়ের যাথার্থ্য পরীক্ষা করিতে পারি। যথা, একখানি গতি-বিশিষ্ট জাহাজের মধ্যে একটি গোলা ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিলে যে স্থান হইতে সেই গোলা নিক্ষিপ্ত হয়, সেই স্থানেই পতিত হয়, জাহাজের গতি হেতু সেই গোলা পশ্চাতে পতিত হয় না। এই বিষয়টি দ্বারা দ্বিতীয় নিয়মটির যাথার্থ্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

একজন অশ্বারোহী ব্যক্তি, অশ্ব দ্রুতগামী হইয়া দৌড়িতেছে, এমন সময়ে অশ্ব হইতে ঊর্দ্ধে লম্ফন করিয়া পুনরায় সেই অশ্বের উপর বসে। এই বিষয়টি অতি আশ্চর্য্য ও অনেক কৌশল ও ভরসার কার্য্য, কিন্তু ইহা ঐ দ্বিতীয় নিয়মটী অনুযায়ী হইয়া কার্য্য করা ব্যতীত আর কিছুই নয়। কারণ, সেই ব্যক্তি লম্ফন কালে তাহারও সেইদিকে সমান বেগে গতি হইয়া থাকে।

অন্যান্য নিয়ম সমুদায়ের প্রমাণ, সচরাচর দেখিতে পাই, এমন ঘটনা হইতে দেওয়া যায়।

মাধ্যিক বল।

Central Forces.

সকল বস্তুর সরল রেখাতে গতি হইবার আশয় আছে। যখন আমরা কোন বস্তু বক্র গতি-বিশিষ্ট দেখিতে পাই, তখন এ বিষয় আমরা নিশ্চয় স্থির করিতে পারি যে, বস্তুটীর স্বাভাবিক গতি দুইটী বল দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে। এবং ইহাও নিশ্চয় স্থির করিতে পারি যে,

কোন উপায় দ্বারা সেই দুইটী বল বিনষ্ট করিতে পারিলে সেই বস্তু পুনরায় সরলরেখা-গতি-বিশিষ্ট হইবে। দুইটী বলের মধ্যে একটীকে আমরা কেন্দ্রাভিমুখ বল ও অপরটীকে কেন্দ্রত্যাগী বল কহিয়া থাকি। যে বল দ্বারা সেই বস্তুর বৃত্ত-স্পর্শক রেখা ক্রমে গতি হইবার আশয় থাকে, তাহাকে কেন্দ্রত্যাগী বল কহিয়া থাকি। যদ্দ্বারা কোন বিশেষ কেন্দ্রাভিমুখে সঞ্চালিত হয়, তাহাকে কেন্দ্রাভিমুখ বল কহিয়া থাকি। কেন্দ্রাভিমুখ বল ও কেন্দ্রত্যাগী বল দুইটীকে একত্রে আমরা মাধ্যিক বল কহিয়া থাকি। মাধ্যিক বল দ্বারা সঞ্চালিত পদার্থ আমরা অনেক দেখিতে পাই। এইরূপ বল দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া পৃথিবী চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহগণ অণ্ডাকার বৃত্তেতে সূর্য্যের চারিপার্শ্বে ঘুরিতেছে। জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা করিবার পূর্ব্বে গতি-বিজ্ঞান উত্তম রূপে জানা কর্ত্তব্য। লাভ্রিরিয়র নামক একজন ফরাসিস জ্যোতির্বেত্তা গতি-বিজ্ঞানের নিয়ম অনুযোগ দ্বারা নেপচুন নামক গ্রহের আবিষ্ক্রিয়া করেন। তিনি অন্যান্য গ্রহগণের অণ্ডাকার বৃত্তিতে গোলযোগ দেখিয়া সেই গোলযোগের কারণ জানিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশেষে গণনা দ্বারা দেখিলেন যে একটী গ্রহ অবশ্য থাকিবে, যদ্দ্বারা এই গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে। পরে গণনা দ্বারা সেই গ্রহ কতদূরে স্থিত, কোনখানে স্থিত, এবং কত বড় তাহা ঠিক করিয়াছেন। পরে দূরবীক্ষণ দ্বারা সেই গ্রহের স্থায়িত্ব নিশ্চিত হইয়াছিল।

ভারকেন্দ্র।

Centre of Gravity.

সকল পদার্থ মধ্যে একটী বিন্দু আছে, যাহাকে ভারকেন্দ্র কহা যায়। বস্তু-মধ্যে যে বিন্দু স্থিরতা প্রাপ্ত হইলে বস্তুর সকল অংশ সকল অবস্থায় স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই ভারকেন্দ্র কহা যায়। সকলেই জানে যে একটী যষ্টিকে অঙ্গুলীর উপর স্থির রাখিবার নিমিত্ত সেই যষ্টির মধ্যভাগ আমাদের অঙ্গুলীর উপর রাখিতে হয়। অর্থাৎ সেই যষ্টির ভার-কেন্দ্র তাহার মধ্যভাগে স্থিত। যষ্টির যদি এক দিক্ সূক্ষ্ম ও এক দিক্ মোটা হয়, তাহা হইলে যষ্টিকে দুই ভাগে বিভক্ত বিবেচনা করিলে, সূক্ষ্ম দিক্ দীর্ঘে অনেক বড় হয়। অর্থাৎ যে দিক অধিক মোটা সেই দিকে অধিক মূর্ত্ত আছে বলিয়া ভারকেন্দ্র সেই দিকের নিকটেই হইয়া থাকে। এই জন্য দুইটী সমান ভারী বস্তুর ভার-কেন্দ্র সেই দুইটী বস্তুর ভার-কেন্দ্র সংযোগকারী সরল রেখার মধ্যভাগে হইয়া থাকে। যদি একটী বস্তু আর একটী বস্তু অপেক্ষা দ্বিগুণ ভারী হয় তাহা হইলে সেই লঘু বস্তু হইতে ভার-কেন্দ্রের দূর গুরু-পদার্থ হইতে ভার-কেন্দ্রের দূরের দ্বিগুণ হয়। যে পরিমাণে মূর্ত্ত থাকে, সেই পরিমাণে দূর নির্ণয় হয়। কারণ, ভার-কেন্দ্র স্থির থাকিলে বস্তুর অন্য সকল অংশ সকল অবস্থায় স্থির থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ এক ধারের ভার দ্বারা ভার-কেন্দ্র হইতে তাহার দূরকে গুণ করিলে সাম্যাবস্থা জন্য অন্য দিকের ভার দ্বারা ভার-কেন্দ্র হইতে তাহার দূরকে গুণ করিলে দুইটী গুণফল সমান হওয়া আবশ্যক। এই দুইটী গুণফল সমান না হইলে সাম্যাবস্থা থাকিতে পারে না। একটী বস্তুর সমস্ত ভার তাহার ভার-কেন্দ্রের

ভিতর দিয়া উৰ্দ্ধ রেখা ক্রমে কার্য্য করিতে থাকে। এই জন্যই সেই উৰ্দ্ধ রেখাকে ভার-কেন্দ্রের দিক্ নিরূপণী রেখা বলে। ভার-কেন্দ্রের দিক্ নিরূপণী রেখা, কোন বস্তুর তলা যে স্থল ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তন্মধ্যে পড়িলে সেই অবস্থায় বস্তু দণ্ডায়মান থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা না হইলে বস্তু সে অবস্থায় থাকিতে পারে না।

কোন নৌকা উল্‌টাইয়া পড়িবার কালে তন্মধ্যস্থিত ব্যক্তিরা দণ্ডায়মান হইলে, সেই নৌকার উল্‌টাবার অধিক সম্ভাবনা। কারণ, তাহা হইলে ভার-কেন্দ্রের দিক্ নিরূপণী রেখা তলার বাহিরে পড়িবার অধিক সম্ভাবনা। তজ্জন্য নৌকা যখন টলমল্ করে তখন তন্মধ্যে আমাদের স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে বাঁচিবার অধিক সম্ভাবনা থাকে।

একটী বস্তুর তলা যে পরিমাণে মোটা হয় সেই পরিমাণে তাহা উল্‌টাইবার অল্প সম্ভাবনা।

মনুষ্য বেড়াইবার কালে তাহাদের দুই পদের মধ্যস্থলে ভার-কেন্দ্র দিক্ নিরূপণী রেখা পতিত হয়। যখন কোন ভার পৃষ্ঠের উপর করা যায়, তৎকালে দণ্ডায়মান থাকিবার নিমিত্ত সেই মনুষ্যকে সম্মুখে নত হইতে হয়। যে সকল লোক বাঁশ বাজী করিয়া থাকে, তাহারা রজ্জুর উপর বেড়াইবার কালে হস্তে একটা বাঁশ লইয়া যায়। ইহার কারণ কেবল ভার-কেন্দ্র নিরূপণী রেখা তাহার পদতল মধ্যে রজ্জুর উপর পড়িবার জন্য।

যন্ত্র সমুদায়ের বিবরণ।

নিম্নলিখিত যন্ত্র কয়েকটী সচরাচর ব্যবহার করা হয়।—

(১) দণ্ড যন্ত্র।

(২) কপিকল যন্ত্র।

(৩) অক্ষচক্র যন্ত্র।

(৪) ক্রম-নিম্ন ধরাতল।

(৫) কাজলা।

(৬) স্ক্রু যন্ত্র।

প্রাকৃত বিজ্ঞানে যে সমুদায় বর্ণনা করা হইয়াছে এবং যাহা কিছু যন্ত্র বিষয়ে বর্ণনা করা যায়, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

(১) পৃথিবীর উপরি ভাগের অল্প খণ্ড সমধরাতল বলিয়া বিবেচনা করি, যদিও তাহা সেরূপ নয়।

(২) আকর্ষণ বশতঃ সকল বস্তুই পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে পতিত হয়।...

(৩) কোন বলের কার্য্য তাহার দিক্ নিরূপণী সরল রেখার সর্ব্ব স্থানে সমান।

(৪) যদিও কোন ভূমি ও যন্ত্র একবারে সমান (Smooth) নয়, তথাচ সামান্যতঃ সেই সমুদায়কে সমান বলিয়া বিবেচনা করি।

সরল-দণ্ড যন্ত্র।

এক লৌহ বা কাষ্ঠ নির্ম্মিত দীর্ঘাকার দণ্ডকে দণ্ড-যন্ত্র বলা যায়। দণ্ড-যন্ত্র বলিলে তিনটী বিষয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য; (১) ভারাশ্রয়ী পদার্থ, যদুপরি অবলম্বের ন্যায় দণ্ড-যন্ত্র ঘুরিতে পারে, (২) অবলম্বের দুই পার্শ্বে দণ্ডের দুই ভুজ···

"অবলম্ব বল ও ভারের বিনিবেশ ক্রমে এই দণ্ড-যন্ত্র তিন প্রকার হইতে পারে।"

(১) প্রথম প্রকারে ভারাশ্রয়ী পদার্থের দুই দিকের মধ্যে এক দিকে বল প্রদান করা হয়, আর এক দিক গুরুত্ব বিশিষ্ট পদার্থতে প্রয়োগ করা হয়।

(২) দ্বিতীয় প্রকারে ভারাশ্রয়ী পদার্থ অর্থাৎ অবলম্ব এক শেষে ও অন্য শেষে বল প্রদায়িকা পদার্থ থাকে এবং মধ্যে ভার-বিশিষ্ট পদার্থ।

(৩) তৃতীয় প্রকারে ভারাশ্রয়ী পদার্থ ও গুরুত্ব-বিশিষ্ট পদার্থের মধ্যে বল প্রয়োগ করা হয়।

ভারাশ্রয়ী পদার্থ হইতে বল প্রয়োগে স্থলের দীর্ঘতা বল দ্বারা গুণ করা হইলে, সেই গুণ-ফলটীকে আমরা বলের ভার-শক্তি কহিয়া থাকি। ঐরূপে ভারাশ্রয়ী পদার্থ হইতে যন্ত্রের আর শেষ পর্য্যন্ত পদার্থের গুরুত্ব দ্বারা গুণ করা হইলে, সেই গুণ-ফলটিকে আমরা সেই গুরুত্ব বিশিষ্ট পদার্থের ভার-শক্তি কহিয়া থাকি। উপরুক্ত দুইটী গুণ-ফল সমান হইলে যন্ত্র-মধ্যে সাম্যাবস্থা থাকে।

দ্রব বিজ্ঞান।

তরল পদার্থ দ্বারা চাপ প্রয়োগ করা যায়, ইহা সচরাচর তরল পদার্থের কার্য্য দেখিলে নিশ্চয় জানা যায়। জল মধ্যে হাত ডুবাইতে কিঞ্চিৎ বল প্রয়োগের আবশ্যক হয়। কোন লঘু পদার্থ জল মধ্যে ডুবাইলে তাহা তৎক্ষণাৎ জলের উপরি ভাগে উত্থিত হয়। জল পরিপূর্ণ পাত্রের গাত্রে ছিদ্র করিলে সেই জলের গতিরোধ জন্য বলপ্রয়োগ আবশ্যক হয় ইত্যাদি। এই সকল বিবেচনা করিলে তরল পদার্থের চাপ-শক্তি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

বায়ুরাশির চাপ বায়ু-শোষকযন্ত্র দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যদি বায়ুশোষক যন্ত্র দ্বারা একটি কাচের পাত্র হইতে বায়ু শোষণ করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে বায়ুরাশির চাপে সেই কাচের পাত্র একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত নৌকার বায়ুভরে গমন ও বায়ু ঘরট্ট যন্ত্রের ঘূর্ণন দেখিয়া বায়ুর চাপ বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান জন্মে। মাগডিবর্গে যে পিত্তলের দুইটী অর্দ্ধ বর্ত্তুল লইয়া কৌতুক করা হইয়াছিল, তাহা হইতেও বায়ুর চাপের কার্য্য অতি সুস্পষ্ট রূপে দেখা যায়।

দুইটী পিত্তলের অর্দ্ধ বর্ত্তুল একত্রিত করিলে কোন দিকে বায়ু প্রবেশের পথ থাকে না। সেই পিত্তলের অর্দ্ধ বর্ত্তুল-দ্বয়-মধ্যস্থিত বায়ু একটী ছোট ছিদ্রের (যাহা স্ক্রু দ্বারা বন্ধ করা যায়) মধ্য দিয়া বায়ুশোষক যন্ত্র দ্বারা নিষ্কাষিত করা যায়। বায়ু নিষ্কাশিত হইলে পর অশ্বের বল সহযোগ দ্বারাও সেই দুইটী অর্দ্ধ বর্ত্তুলকে ভিন্ন করা কঠিন হইয়া উঠে।

তৈল, পারদ, ধূম, জল, বায়ু সকলই তরল পদার্থ মধ্যে গণিত। কিন্তু তরল পদার্থের লক্ষণ নিরূপণ নিমিত্ত তরল পদার্থ সমূহের এক সাধারণ গুণ নির্ণয় করা আবশ্যক। জল বায়ু ইত্যাদি পদার্থ সকলের পরমাণু অতিশয় তরলতাগুণ-বিশিষ্ট। এই হেতু নিম্নলিখিত লক্ষণ তরল পদার্থের লক্ষণ বলিয়া দেওয়া যায়।

যে পদার্থের পরমাণু বিভাগে অত্যল্প বল প্রয়োগের আবশ্যক করে, তাহাকেই আমরা তরল পদার্থ কহিতে পারি। এই লক্ষণ হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে তরল পদার্থের সহিত সংলগ্ন কোন পদার্থের উপর চাপ তদুপরি দণ্ডায়মান রেখাক্রমে হইয়া থাকে।

তরল পদার্থ দুই প্রকার। এক প্রকার ধূমাকারে দৃষ্ট হয়, আর এক দ্রব। প্রথম প্রকার তরল পদার্থ চাপন দ্বারা মর্দ্দিত হইলে পূর্ব্বাবস্থাপেক্ষা স্বল্পস্থানব্যাপী হয়। চাপন হইতে মুক্ত হইলে অধিক অবকাশব্যাপী হয়। এতৎ প্রকার তরল পদার্থ স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট বলা হয়। দ্রব পদার্থ চাপন দ্বারা মর্দ্দিত হয় না এবং তজ্জন্য দ্রব পদার্থসমূহকে অস্থিতি-স্থাপকতা গুণবিশিষ্ট বলা যায়।

ঘনত্ব ও আপেক্ষিক গুরুত্ব।

তরল পদার্থ সমুদায় দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যে সকল তরল পদার্থ ধূমাকারে থাকে এবং যে সকল তরল পদার্থ জলাকারে থাকে। অন্য ২ অনেক প্রকার গুণ দ্বারা তরল পদার্থ সমুদায়কে অন্য ২ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু দ্রব বিজ্ঞান মধ্যে আমরা তরল পদার্থ কিরূপ ঘনত্ব বা আপেক্ষিক গুরুত্ব-বিশিষ্ট তাহাই বিবেচনা করি; এবং এই দুইটী গুণের বিষয় বিবেচনা করিয়া অন্য অন্য গুণের বিষয় নির্ণয় করিয়া থাকি।

এক কিউঃ ইঞ্চ জল ও এক কিউঃ ইঞ্চ পারদ, দুইটী তুলনা দ্বারা আমরা বলিয়া থাকি যে পারদে জল অপেক্ষা ১৩ গুণ ঘনত্ব।

আপেক্ষিক গুরুত্ব,— কোন বস্তুর গুরুত্ব কোন স্থিরীকৃত পদার্থের সমান অংশের গুরুত্বের সহিত তুলনা করিয়া যাহা হয় তাহাই আপেক্ষিক গুরুত্ব।

ঘনত্ব নির্ণয়কালে যে স্থিরীকৃত পদার্থের সহিত তুলনা করা হয় ও আপেক্ষিক গুরুত্ব বিষয় নির্ণয় করিবার জন্য যে স্থিরীকৃত পদার্থের সহিত তুলনা করা হয়, এই দুইটী স্থিরীকৃত পদার্থ যদি এক হয়, তাহা হইলে কোন এক বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ঘনত্ব একই হইবে। যথা, জল যদি স্থিরীকৃত পদার্থ হয়, তাহা হইলে পারদের ঘনত্ব ও আপেক্ষিক গুরুত্ব একই হইবে।

তরল পদার্থ সমুদায়ের অন্যান্য জড় পদার্থের সহিত এক সাধারণ গুণ আছে, তাহা আকর্ষণ। অন্যান্য জড় পদার্থ যে নিয়ম অনুসারে আকর্ষিত হয় ও আকর্ষণ করে, তরল পদার্থ সমুদায়ও সেই সকল নিয়মানুযায়ী হইয়া থাকে। এইরূপ না হইলে আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ঘনত্ব কিছুই থাকিত না। তাহা হইলে দ্রব-বিজ্ঞান আর এক প্রকারেরই হইত।

কোন তরল পদার্থ সাম্যাবস্থায় থাকিলে তাহার মধ্যে এক সমতল ক্ষেত্রের সকল অংশে সমান চাপ হয়। এই বিষয়টী কোন উপায় দ্বারা এক সমতল ক্ষেত্রের দুই ভিন্ন অংশের চাপ নির্ণয় করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। যথা, মনে কর একটী বোতল মধ্যে একটী ছিপি পুরিবার নিমিত্ত ।৹ সের চাপ প্রয়োগ করিতে হয়। এই বোতল যদি নিম্ন দিকে মুখ করিয়া জলে নিমগ্ন করা যায়, এবং ১৹ হাত কি ১২ হাত দূরে গিয়া সেই ছিপি বোতল মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে সেই জলের অন্য এক অংশে ঐরূপে ঐ বোতল নিমগ্ন করিলে ১৹ হাত কি ১২ হাত নিম্নে ডুবাইলে ছিপি বোতলের ভিতর প্রবেশ করিবে। এইরূপ অন্যান্য পরীক্ষা দ্বারা এই বিষয় স্থির করা যায়। স্থিতি-স্থাপকতা বিশিষ্ট তরল পদার্থের চাপও এইরূপ অন্যান্য পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হয়।

একটী জড় পদার্থ যদি কোন প্রকার তরল পদার্থে নিমগ্ন করা যায়, তাহা হইলে সেই জড় পদার্থের উপর সমুত্থিত চাপ কত হইবে? নিমগ্নিত জড় পদার্থ স্থানান্তরিত করিয়া সেই স্থান তরল পদার্থে পরিপূর্ণ বিবেচনা কর, এবং মনে কর যে সেই তরল পদার্থ যাহা সেই জড়ের স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তাহা জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ মনে করায় কোন সাম্যাবস্থার পক্ষে কোন হানি হয় না। জড়ত্ব প্রাপ্ত তরলের উপর চাপ ও সেই

নিমগ্নিত পদার্থের উপর চাপ সমান হইয়া থাকে। জড়ত্ব প্রাপ্ত তরলের উপর চাপ তাহার ভারিত্বের সহিত সমান। অর্থাৎ নিমগ্নিত জড় পদার্থের উপর যে চাপ তাহা স্থানান্তরিত তরলের ভারিত্বের সহিত সমান।

যখন একটী বেলুন বাতাসে উড়িতে থাকে, তৎকালীন যে বাতাস সেই বেলুনের জন্য চারি পার্শ্বে সরিয়া যায়, তাহার গুরুত্ব বেলুনের গুরুত্ব অপেক্ষা অধিক হয়, এই কারণ বশতঃ বেলুন উপরে উত্থিত হয়। হাইড্রোজেন গ্যাস অন্য সকল প্রকার গ্যাস অপেক্ষা লঘু বলিয়া এই গ্যাসে বেলুন পরিপূর্ণ করা হয়। বেলুন রেশম কাপড় দ্বারা প্রায়ই নির্ম্মিত হয়।

একটী ধূমাকার তরল ও জলাকার তরলের চাপের এই বিভিন্নতা যে ধূমাকার তরলের চাপ তাহার ঘন ফলের উপরে নির্ভর করে, এবং জলাকার দ্রবের চাপ কোন বাহ্য চাপ বা দ্রবের ভারিত্ব বা ঘনত্বের উপর নির্ভর করে।

বায়ুর চাপ একটী পিচকিরীর কার্য্য দেখিলে স্পষ্ট দেখা যাইবে। পিচকিরীর মুখের ছিদ্র অঙ্গুলী দ্বারা বন্ধ করিয়া পিচ্‌কিরির হাতল ভিতরে পুষিতে অনেক বলের আবশ্যক করে। কারণ, যে পরিমাণে বায়ু স্বল্প স্থলব্যাপী হয়, সেই পরিমাণে অধিক চাপ হয়।

বায়ুর ভার আছে ইহা অতি সহজে নিশ্চয় করা যায়। যথা, একটী বোতলকে বায়ু পরিপূর্ণ ওজন করিলে এবং বায়ুশোষক যন্ত্র দ্বারা বায়ু নিষ্কাশিত করিয়া ওজন করিলে শেষ বারের ওজন পূর্ব্ব অপেক্ষা অনেক স্বল্প হয়। অর্থাৎ বায়ুর গুরুত্ব আছে।

পৃথিবীর চারি পার্শ্ব বায়ু-রাশি দ্বারা বেষ্টিত। এই বায়ু-রাশি উর্দ্ধে কিঞ্চিৎ দূর অবধি আছে। কোন সমতল দ্রব্যের উপর বায়ু-রাশির চাপ সেই সমতল দ্রব্যের ন্যায় মোটা বায়ু-স্তম্ভের গুরুত্ব। এই অনুমান পরীক্ষার সহিত মিলিত হয়। যথা, পর্ব্বতের উপরে বায়ু-রাশির চাপ নিম্ন অপেক্ষা অনেক স্বল্প।

সকল প্রকার তরল পদার্থের গুরুত্ব, বায়ুর গুরুত্ব যেরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়, সেই উপায় দ্বারা জানা যায়। অনেক ধূমাকার তরল পদার্থ বায়ু অপেক্ষা ভারী। যথা, ‘কার্‌বোনিক এসিড গ্যাস’ একটী বোতল হইতে আর একটী বোতলে ঢালা যায়।

দৃষ্টি বিজ্ঞান।

বস্তু হইতে আলোক নির্গত হইয়া চক্ষুঃ মধ্যে প্রবেশ হইলে পর বস্তু সমুদায় আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। পৃথিবীস্থ সকল বস্তু হইতে স্বভাবতঃ আলোক নির্গত হয় না। যে সকল বস্তু হইতে আলোক নির্গত হয়, তৎসমুদায়কে আমরা স্বয়ং-জ্যোতির্ম্ময় কহিয়া থাকি। একটী জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ হইতে যে আলোক নির্গত হয় তাহা চারিপার্শ্বস্থ অদৃশ্য পদার্থতে প্রতিফলিত হইয়া, আমাদের চক্ষুঃ মধ্যে প্রবেশ করে। সেই প্রতিফলিত আলোক দ্বারা আমরা স্বভাবতঃ অদৃশ্য পদার্থ সমুদায় দেখিতে পাই। যে সমুদায় বস্তু মধ্যে আলোকের প্রবেশ হয়, তাহাকে আমরা স্বচ্ছ কহিয়া থাকি, যে সকল বস্তু মধ্যে আলোকের প্রবেশ হয় না তাহাদের অস্বচ্ছ কহিয়া থাকি। কাচ, বায়ু, জল ইত্যাদি স্বচ্ছ, কাষ্ঠ ধাতু ইত্যাদি অস্বচ্ছ। যখন স্বল্প পরিমাণে আলোকের প্রবেশ হয়, তন্মধ্য দিয়া অন্যান্য বস্তু উত্তম রূপে দৃষ্ট হয় না। শৃঙ্গ কোয়াসা-আচ্ছাদিত বায়ু-রাশি মেঘ এই সকল পদার্থের ভিতর দিয়া সুস্পষ্ট রূপে দেখা যায় না। কোন বাহ্য কারণ দ্বারা বাধিত না হইলে আলোক সরল রেখাতে নির্গত হয়। এক-একটী আলোকের সরল রেখাকে কিরণ কহিতে পারি। যে স্থলে আলোকের সরল রেখা সমুদায় একত্রিত হয়, অর্থাৎ যে স্থল হইতে আলোক নির্গত হয়, সেই স্থানকে আলোক-যোনি বলা যায়। আলোকের সরল রেখায় গতি নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। একটী অন্ধকার ঘর মধ্যে যদি এক বক্র নলের এক পার্শ্বে একটী আলোক-যোনি থাকে, তাহা হইলে সেই আলোক-যোনি অন্য পার্শ্ব হইতে দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু নলটী যদি সরল হয়, তাহা হইলে এক পার্শ্বস্থিত আলোক-যোনি অন্য পার্শ্ব হইতে সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়, অর্থাৎ আলোকের কিরণ সরল রেখাতে নির্গত হয়। আর আলোকের কিরণ সরল রেখাতে নির্গত হয় বলিয়া, একটী বর্ত্তুলের ছায়া চক্রাকার রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আলোকের গতি এক সেকেণ্ডে ১০০,০০০ লক্ষ ক্রোশ; সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে আট মিনিটে পৌছে। একটী কামানের গোলার যদি গতিবেগ বরাবর সমান থাকিত, তাহা হইলে ৩২ বৎসরে এ কার্য্য সাধন হইতে পারিত। এই তুলনা করিবার কারণ এই যে তুলনা দ্বারা এ বিষয় কিঞ্চিৎ সুস্পষ্ট রূপে বুঝা যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, একটী বস্তুতে যে মূর্ত্ত আছে তাহা, সেই বস্তুর গতিবেগ দ্বারা গুণ করা হইলে, গুণ-ফল সেই বস্তুর ভার-শক্তি।

অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, আলোকের পরমাণু আমাদের যতদূর বোধগম্য হইতে পারে, তাহা অপেক্ষা যদি না অনেক ক্ষুদ্রতর হইত, তাহা হইলে আমাদের জীবন ধারণ করা অতি সুকঠিন হইয়া উঠিত।

চক্ষুর মধ্যে আলোকের প্রবেশ দ্বারা যে জ্ঞান উৎপাদন হয়, তাহা আলোক সরাইবার কিঞ্চিৎ কাল পর পর্য্যন্ত থাকে। যথা, একটী জ্বলন্ত পদার্থ সূত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া ঘূর্ণন করিলে একটী জ্বলন্ত চাকার ন্যায় বোধ হয়।

আলোক এক অবকাশ হইতে অন্য অবকাশে যাইবার কালীন দুই অবকাশের মধ্যে তাহার গতি প্রতিভঙ্গিত হয়। এই গুণটীকে আলোকের প্রতিভঙ্গ গুণ বলা যায়। নিউটনের মতে প্রতিভঙ্গের কারণ আকর্ষণ। আলোকের পরমাণু সমুদায় এক প্রকার অবকাশে এক রকমে আকর্ষিত হয়, অন্য প্রকার অবকাশে অন্য রকমে আকর্ষিত হয়।

আলোকের গতি যে এক অবকাশ হইতে অন্য অবকাশে যাইবার কালীন প্রতিভঙ্গিত হয়, এতদ্বিষয়ে অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যথা, একটী যষ্টি জল মধ্যে ডুবাইলে সেই যষ্টিকে ভাঙ্গা বা বক্র বোধ হয়। অথবা, একটী গেলাস মধ্যে একটী টাকা রাখিয়া যদি ক্রমশঃ গেলাস হইতে অন্তরে যাওয়া যায়, যতক্ষণ না টাকাটী ঠিক অদৃশ্য হয়, এবং পরে যদি গেলাস জলে পরিপূর্ণ করা হয়, তাহা হইলে ঐ টাকা সেই স্থান হইতে আবার দৃষ্ট হয়। ইহা আলোক প্রতিভঙ্গিত হয় বলিয়া এইরূপ হইয়া থাকে। ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে যে-সকল কিরণ বক্র হইয়া পতিত হয়, সেই সকলগুলিই কেবল প্রতিভঙ্গিত হয়, কিন্তু যেগুলি দণ্ডায়মান রেখাক্রমে পতিত হয়, সেগুলি প্রতিভঙ্গিত হয় না। কারণ, দণ্ডায়মান রেখা-ক্রমে পতিত হইলে চারিপার্শ্বের আকর্ষণ সমান হয়, তজ্জন্য আকর্ষণের কোন কার্য্য হয় না।

আলোক প্রতিভঙ্গিত হইবার নিয়ম আছে। সেই নিয়ম এই যে, দুইটী বিশেষ অবকাশ মধ্যে প্রতিভঙ্গিত কিরণ ও দণ্ডায়মান রেখার কোণ এবং কিরণের আপাত রেখা ও দণ্ডায়মান রেখার কোণ এই দুয়ের নিষ্পত্তি স্থির থাকে। বায়ু হইতে জলে আলোকের গতি হইলে এই নিষ্পত্তি··· পরিমাণে হয়।

ইহা দেখা যাইতেছে যে, আলোক এক অবকাশ হইতে অন্য এক অবকাশ মধ্যে প্রতিভঙ্গিত হইলে, সেই অবকাশের ঘনত্ব যদি অধিক হয়, তাহা হইলে তদুপরি দণ্ডায়মান রেখার নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রতিভঙ্গিত হয়। এই কারণ বশতঃ যাঁহারা জল মধ্যে মৎস্যকে বন্দুক দ্বারা মারিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের মৎস্য যেখানে দেখিতে পান তাহার অনেক নিম্নভাগে লক্ষ্য করিতে হয়। যাহারা আলোকের প্রতিভঙ্গ-শক্তি বিষয় জ্ঞাত নয়, তাহারা হঠাৎ বিশ্বাস করিবে না যে, তারা সমুদায় যেখানে দেখিতে পাই, ঠিক সেইখানে স্থিত নয়, কারণ, পৃথিবী বেষ্টনকারী বায়ুরাশিতে আলোকের গতি প্রতিভঙ্গিত হয়। এইজন্য সূর্য্যের আলোক সূর্য্য অস্তে যাইবার পরও অনেকক্ষণ থাকে। এমন কি ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে সময়ে সময় ২॥ ঘণ্টার অধিককাল থাকে। Zenith নিকটবর্ত্তী হইলে Horizon অপেক্ষা স্বল্প পরিমাণে আলোকের গতি প্রতিভঙ্গিত হয়।

আলোকের প্রতিভঙ্গিত হওয়া গুণ বশতঃ মনুষ্যেরা নিজ কার্য্য সাধন জন্য অনেক প্রকার আবশ্যকীয় যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছে। যথা, দৃষ্টিকাচের নির্ম্মাণ, যদ্দ্বারা আলোক কিরণ সমুদায়ের এক-প্রবণতা হয় বা পৃথক-প্রবণতা হয়।

প্রতিফলন।

আলোক প্রতিফলিত হইবার কারণ নিউটনের মতে মূর্ত্তের নিরাকরণ গুণ বশতঃ। সকল প্রকার পদার্থ, যাহা স্বয়ং-জ্যোতির্ম্ময় নয়, তাহা অন্যান্য স্বয়ং-জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের আলোক তদুপরি প্রতিফলন দ্বারা দৃষ্টিগোচর হয়।

কাচ জল ও অন্যান্য অতি স্বচ্ছ পদার্থ হইতে আলোকের কিরণ কিয়দংশ প্রতিফলিত হয়, প্রতিফলিত না হইলে দৃষ্টিগোচর হইত না।

সমস্ত আলোক কিরণ কোন পদার্থ হইতে কখন প্রতিফলিত হয় না। অতি উৎকৃষ্ট মুকুর হইতেও আলোকের অর্দ্ধেক কিরণের কিয়দংশের অধিক বই প্রতিফলিত হয় না।

কোন বস্তু হইতে আলোক কিরণ নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে প্রতিফলিত হয়।

(১) আপাত এবং প্রতিফলিত কিরণ সেই অবকাশস্থ আপাত চিহ্নের গ্রহজ দণ্ডের সহিত সমধরাতলে থাকিয়া তাহার দুই বিপরীত পার্শ্বে অবস্থান করে।

(২) গ্রহজ দণ্ডের সহিত আপাত কিরণ এবং প্রতিফলিত কিরণ যে কোণে অবস্থান করে তাহাদের পরিমাণ সমান।

এই কারণ বশতঃ যখন কোন মুকুর মধ্যে একটী বস্তুর প্রতিবিম্ব দিকে দৃষ্টি করা যায়, তৎকালে বোধ হয় যে, সেই আলোক কিরণ সেই মুকুরের পশ্চাৎ হইতে আসিতেছে। যখন আপনাদের প্রতিমূর্ত্তি মুকুর মধ্যে দৃষ্টি করি তৎকালে বোধ হয় সেই প্রতিমূর্ত্তি মুকুরের পশ্চাতে রহিয়াছে।

আলোক সমধরাতলে প্রতিফলিত হইলে তাহার প্রতিফলনের চুল্লি-স্থান ঐ সমধরাতলের পশ্চাতে হইয়া থাকে। আর আলোক-যোনি ঐ সমধরাতলের সম্মুখে যত দূরে স্থিত, পশ্চাতে ঠিক সমান দূরে চুল্লী-স্থান হইয়া থাকে।

একখানি পুরোন্নত মুকুরের সম্মুখে আলোক-যোনি থাকিলে সেই আলোক-যোনির চুল্লী তাহার পশ্চাতে হইয়া থাকে, কিন্তু ঠিক সমান দূরে হয় না, তদপেক্ষা নিকটে হইয়া থাকে। এইরূপ হইলে বস্তু অপেক্ষা তাহার প্রতিবিম্ব ছোট বলিয়া বোধ হয়।

পুরোনিম্ন মুকুরের সম্মুখে থাকিলে এবং সম্মুখস্থ দূর যদি ঐ কাচের ব্যাসার্দ্ধ অপেক্ষা ছোট হয়, তাহা হইলে প্রতিবিম্ব বস্তু অপেক্ষা বড় বোধ হয়।

আলোকের তেজ।

কোন স্বয়ং-জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ হইতে আলোক কিরণ নির্গত হইলে, যে পরিমাণে সেই আলোকময় পদার্থ হইতে দূরে স্থিত হইবে, সেই পরিমাণে দূরের বর্গ ক্রমে আলোক

কিরণের তেজের হ্রাস হইবে। এ বিষয় অনেক প্রকার পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু সে সকল পরীক্ষা এ স্থলে দেওয়া যাইতে পারে না।

সূর্য্য-কিরণে সাত প্রকার রঙ আছে বলিয়া আকাশের এক পার্শ্বে মেঘ ও অপর পার্শ্বে সূর্য্য থাকিলে রামধনু দেখা যায়। জল-বিন্দুর ভিতর দিয়া সূর্য্য-কিরণ একবার প্রতিফলিত ও দুইবার প্রতিভঙ্গিত হইলে রামধনু দেখা যায়। কোন কোন সময়ে একত্রে দুইটী ধনু দৃষ্ট হয়। কখন কখন রাত্রেও রামধনু দেখা যায়। চন্দ্রের কিরণ অতি তেজোহীন বলিয়া রামধনু স্পষ্ট দেখা যায় না।

তাড়িত বিজ্ঞান।

কোন কোন বস্তু ঘর্ষিত অথবা উত্তাপিত হইলে অন্য লঘু বস্তুকে আকর্ষণ করে। কোন ২ সময়ে তন্মধ্য হইতে শব্দ সহকারে ফস্‌ফরাসের গন্ধ-বিশিষ্ট অগ্নিকণা নির্গত হয়। বস্তুসমূহের উপরুক্ত গুণকে তাড়িত কহা যায়। যে বস্তু হইতে ঘর্ষণ অথবা উত্তাপ দ্বারা তাড়িত উৎপন্ন হয়, তাহাকে তাড়িতাত্মক কহা যায়। যে সকল বস্তুতে তাড়িত প্রবেশ করে তাহাকে তাড়িত-পরিচালক কহা যায়। এবং যাহাতে তাড়িতের প্রবেশ হয় না, অথবা যদ্দারা তাড়িত চালনা হয় না, তাহাকে তাড়িত-রোধক বলা যায়। যে বস্তুতে স্বাভাবিক তাড়িতাংশ অপেক্ষা অধিকতর তড়িৎ প্রবেশ করে তাহাকে ধন-তাড়িত বিশিষ্ট কহা যায়। এবং যাহার স্বাভাবিক অংশ অপেক্ষা তাড়িতের ভাগ ন্যূন তাহাকে ঋণ-তাড়িতপূর্ণ বলা যায়। তাড়িতপূর্ণ বস্তু হইতে অপর বস্তুর মধ্য দিয়া শব্দসহকারে তাড়িত নির্গত হইয়া-যাওয়ার নাম তাড়িতাঘাত।

কাচ ঘর্ষণ দ্বারা ঋণ-তাড়িতপূর্ণ হয়। গালা রজন আম্বর প্রভৃতি কতক প্রকার পদার্থ ঘর্ষণ দ্বারা ঋণ-তাড়িতপূর্ণ হয়। বিড়ালের লেজের রোম রেশমী পদার্থে ঘর্ষণ করিলে ঋণ-তাড়িত উৎপন্ন হয়। যখন কোন বস্তু কোন তাড়িতাত্মক দ্রব্য দ্বারা পৃথিবী হইতে অসংলগ্নিত হয়, তৎকালে ঐ বস্তু একান্তীকৃত হইয়াছে বলিলে বলা যায়।

বস্তুসমূহ দুই প্রকার; তাড়িতাত্মক ও তাড়িতেতর। তাড়িতাত্মক দ্রব্যসমূহ তাড়িত-রোধক এবং তাড়িতেতর পদার্থসমূহ তাড়িত পরিচালক। ধাতুসমূহ, জল, কয়লা, ইত্যাদি দ্রব্য তাড়িত-পরিচালক; অপর বস্তু উদ্ভিজ্জ অথবা জীবিত তাড়িত-রোধক। ভূমিসংলগ্ন কাচের নল অথবা গোলা ঘর্ষণ দ্বারা ধন-তাড়িত উৎপন্ন করে। অসংলগ্ন কাচের দ্রব্য অথবা গালা গন্ধক ইত্যাদি দ্রব্য ঘর্ষণ দ্বারা ঋণ-তাড়িত উৎপন্ন করে। যে বস্তুকে ঘর্ষণ করা যায় এবং যদ্দারা ঘর্ষিত হয়, এই দুই বস্তুর মধ্যে বিপরীত প্রকার তাড়িত উৎপন্ন হয়। যথা, কাচেতে এবং রেশমী দ্রব্যেতে ঘর্ষিত হইলে, কাচে ধন-তাড়িত ও রেশমী দ্রব্যেতে ঋণ-তাড়িত উৎপন্ন হয়।

লিডনজায় যে একপ্রকার আবৃত বোতল নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার উপরিভাগে ঋণ-তাড়িত ও ভিতরে ধন-তাড়িত উৎপাদিত হয়।

এই দুই বিপরীত প্রকার তাড়িতের পরস্পর অত্যন্ত আকর্ষণ। যদ্যপি কোন তাড়িত-পরিচালক দ্বারা আবৃত বোতলের ভিতর ও বহির্ভাগ সংলগ্ন করা হয়, তাহা হইলে শব্দ ও উজ্জ্বল শিখাসহকারে তাড়িত নির্গত হয়। বস্তু-মধ্য-গত তাড়িত ও আকাশ-দেশের বিদ্যুৎ একই প্রকার। আকাশীয় বিদ্যুতের তাবৎ গুণ দ্রব্য-জাত তাড়িতে দেখা যায়। এবং আকাশীয় বিদ্যুৎ ঘুড়ি দ্বারা নিয়ে আনয়ন পূর্ব্বক দ্রব্য-জাত তাড়িতের কার্য্য সাধন হইতে পারে।

এ বিষয়ে মহাবিজ্ঞ ডাক্তার ফ্রাঙ্কলিন সাহেব অনেক পরীক্ষা দ্বারা মহাবিখ্যাত হইয়া-

ছিলেন। তিনি একখানি রেশমী রুমালে ঘুড়ির কাঁপের ন্যায় কাঁপ বসাইয়া ও এক লম্বা নেজুড় দিয়া উড়াইয়াছিলেন। ঘুড়ির শিরোভাগে এক সূচাগ্রে তার জড়াইয়াছিলেন, অর্দ্ধ হাত উপরিভাগ পর্য্যন্ত তার ছিল। আকাশ-দেশে মেঘ আচ্ছাদিত হইবার প্রাক্‌কালে এই পতঙ্গ উড়াইয়াছিলেন। মেঘের ভিতর হইতে তাড়িতরাশি এই পতঙ্গ দ্বারা নিম্নে আনিয়া, একটী একান্তীকৃত ধাতুময় পাত্রে রাখিয়া, অনেক প্রকার দ্রব্যজাত-তাড়িত হইতে যে পরীক্ষা হয়, তাহা সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

উচ্চ মন্দির ও ইমারতাদি তাড়িত-পরিচালক দ্বারা বিদ্যুৎ-আঘাত হইতে রক্ষা করা যায়। বিজ্ঞানশাস্ত্র দ্বারা তাড়িত সহকারে নানাপ্রকার অদ্ভুত কার্য্য সমাধা হয়। তাড়িত বার্ত্তাবহ, যদ্দ্বারা এখান হইতে শত ২ ক্রোশ দূরের সংবাদ ক্ষণকাল মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা দ্রব্য-সম্ভূত তাড়িত দ্বারা সম্পন্ন হয়।

তাড়িতের আঘাত দ্বারা বাত রোগের বিশেষ উপশম হয়। তাড়িত উৎপাদনের অনেক প্রকার উপায় আছে, তন্মধ্যে নিম্নে একটি প্রধান উপায় দেওয়া হইতেছে।

সচরাচর তাড়িত উৎপাদনের যন্ত্র এই প্রকারে নির্ম্মিত হয়। যথা, একখানি কাচের চক্রাকার থালা, ২ নাগাদ ৪ ফুট পরিসর অর্দ্ধ ইঞ্চ মোটা তাহার মধ্যস্থলে এক শলা আছে, যাহার চতুষ্পার্শ্বে ঐ থালা চক্রের ন্যায় ঘুরিতে থাকে। ঐ শলাকা উভয় পার্শ্বে দুই মঞ্চের উপরে স্থাপিত ও এক দিকে চরকার ন্যায় হাতল আছে, যাহা ধরিয়া ঐ থালা ঘুরান যায়। ঐ থালা ৪ খানা গদিতে সংলগ্ন হইয়া ঘুরিতে থাকে, গদির উপর পারদ মিশ্রিত টিন লেপিত থাকে। এক পিতল নির্ম্মিত ফাঁপা চোঙ্গাকৃতি তাড়িত-বাহক ঐ কাচের থালার অতি নিকটে ভূমি হইতে একান্তীকৃত হইয়া স্থাপিত হইলে, তন্মধ্যে তাড়িতরাশি একত্রিত হয়। ঐ তাড়িতাত্মক পদার্থ হইতে অপর বস্তুতে তাড়িত চালনা করিয়া নানা প্রকার কৌতুক ও পরীক্ষা করা যায়। তাড়িতোৎপাদক যন্ত্র অনেক প্রকারের হইতে পারে।

(শ্রীউদয়চন্দ্র বসু।)

সঙ্গীত বিষয়ক প্রবন্ধ।

পৃথিবীতে সময়ে সময়ে যে সকল বিদ্যা প্রকাশ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সঙ্গীত বিদ্যার সমতুল্য মানবজাতির চিত্তবিনোদন করিতে আর কেহই সক্ষম নহে। কোন্ মহাত্মা কোন্ সময়ে এবং পৃথিবীর কোন্ দেশে প্রথমে এই শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিকারিণী অত্যাশ্চর্য্য-সুখপ্রদা বিদ্যার অনুশীলনে যত্নবান্ হইয়াছেন, তাহা নিরূপণ করা সহজ নহে। বসুন্ধরার প্রাচীন দেশ সকলের পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয় যে, অতি পুরাকালেও কি সভ্য কি অসভ্য জাতি কেহই সঙ্গীত-রসাস্বাদনে বঞ্চিত ছিলেন না। অতীব প্রাচীনকালে যখন ভারতবর্ষে পুস্তকাদি লিখনের প্রথা ছিল না, তখন সঙ্গীত-রূপা তরণীই যে সময়-সমুদ্র অতিক্রম করিয়া অমূল্য ধন প্রাচীন চরিত্র মনুষ্য-বংশে অর্পণ করিয়াছে, তাহার প্রমাণ-স্তম্ভ স্বরূপ শ্রুতি অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বলিতে কি, সঙ্গীত-বিদ্যা এত পুরাতন কালে মানবকুল সমুজ্জ্বল করিয়াছে, বোধহয় যেন প্রকৃতি তাঁহার নরসন্তানকে আজন্ম সঙ্গীতপরায়ণ করিবার মানসেই গম্ভীর ঘননিনাদ, জল-প্রপাতের ঝর ঝর শব্দ, ঝটিকার হুহুঙ্কার, এবং বিহঙ্গদলের কণ্ঠধ্বনি প্রভৃতি সঙ্গীত উপদেষ্টাগণের প্রথমে সৃজন করিয়াছিলেন। ফলতঃ অঙ্কবিদ্যা যেরূপ অসীম বিশ্বরাজ্যের দৈর্ঘ্য পরিমাণে ও অসংখ্য জগতের সংখ্যাকরণে প্রকাশ পাইয়াছে, তদ্রূপ সঙ্গীতবিদ্যা শব্দ-সাগরের হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত রূপ তরঙ্গমালায় বিকাশিত হইয়া, চিরকালব্যাপী পরম পুরুষের অপার মহিমা কীর্ত্তনে প্রকাশ পাইতেছে, তাহার সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষ নিবাসি ঋষি-প্রণীত পুরাণে কথিত আছে যে, সকল সিদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী সংসারের মঙ্গলকর্ত্তা ভগবান্ দেবাদিদেব ভবানীপতি সঙ্গীতবিদ্যার প্রথম প্রকাশ করিয়া বিশ্বব্যাপী পরমাত্মা বিষ্ণুর এতাধিক প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন যে, করুণানিধান প্রেমানন্দে আর্দ্র হইয়া পবিত্রময়ী গঙ্গারূপে তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন করেন। বস্তুতঃ উপর্য্যুক্ত রূপকের যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে ঋষিবাক্য নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। অর্থাৎ যে কালে পদার্থ মাত্রের পরমাণু সকল ভগবৎ স্বেচ্ছায় সঞ্চালিত হইয়া বিশ্বরচনা কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছে, সেই কাল হইতেই যে তাহাদের পরস্পরের গাত্র ঘর্ষণ শব্দ-হিল্লোল মহাকালরূপ হর-মুখ-কুহরে প্রতিধ্বনিত হইয়া সঙ্গীতরূপ তরঙ্গরাশি মহাকাশে বিস্তৃত হইতেছে, তাহার বিচিত্র কি? আর সঙ্গীত বিদ্যার প্রকৃত আলোচনা করিলে অর্থাৎ ভগবৎ মহিমা কীর্ত্তনে নিয়োজিত করিলে, যে আনন্দ-প্রবাহ-রূপিণী গঙ্গার জলে চিত্তের অসুখ মলা ধৌত হইয়া অন্তঃকরণ পবিত্র রসে আপ্লুত হয়, তাহাও ভ্রান্তিমূলক বলা যাইতে পারে না। সঙ্গীত যে সমাজের কতদূর হিতসাধন করে, তাহা পাঠক মহাশয়েরা কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ইহার পর হিতকর পদার্থ আর নাই। যখন রণক্ষেত্রের মুহুর্মুহুঃ অস্ত্রনিক্ষেপের বজ্রপাত শব্দ, অশ্বগজাদির বেগযুক্ত পদধ্বনি, সৈন্যদলের কোলাহল, ধরাশায়ী ক্ষত যোদ্ধাদিগের আর্ত্তনাদ

একত্রিত হইয়া সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপ ভীষণ নিনাদে প্রাণীমাত্রকে মরণভয়ে ব্যাকুল করে, তখন যদি সঙ্গীতের অসামান্য শক্তি যোদ্ধগণের অন্তঃকরণে বীর-রস সিঞ্চন না করিত, তবে সমরানলের অসহ্য দাহন কেহই সহ্য করিতে সমর্থ হইত না। ফলে, সঙ্গীত যে বীররসে ভয়, আদিরসে শোক, ঘৃণারসে কুপ্রবৃত্তি, রৌদ্ররসে অত্যাচার, করুণরসে দুঃখ প্রভৃতি নিবারণ করিতে পারে, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। হীন ব্যক্তিকে মহতের নিকট আহূত করিবার পক্ষে সঙ্গীত ভিন্ন সহজ উপায় নাই। অসাধু-মার্গ-গমনশীলা বারাঙ্গনারাও সঙ্গীতের মহদাশ্রয় অবলম্বনে জনসমাজে সমাদৃতা হইয়া আসিতেছে, তাহা কাহার অবিদিত আছে?

পৃথিবীর আদিম নিবাসীরা সঙ্গীতবিদ্যার যে প্রথম স্থত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট বোধ হয়। পরে জন-সমাজের জ্ঞানোন্নতি ও সভ্যতার উন্নতি সহকারে তাহার ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষের ঋষিবৃন্দের মধ্যে সঙ্গীতের যথেষ্ট সমাদর ছিল। নারদ, বাল্মীকি, ব্যাস প্রভৃতি মহাত্মারা বিখ্যাত সঙ্গীত-পরায়ণ ছিলেন। এবং তাঁহারা যে সংসারের শ্রেয় অবলম্বন ঈশ্বর উপাসনা কার্য্যের প্রধান অঙ্গ করিয়া সঙ্গীতকে নিয়োজিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি পূজাকালীন ঘণ্টাবাদনে প্রমাণ হয়। বর্ত্তমান অপেক্ষা পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে সঙ্গীতবিদ্যা অধ্যয়নের যে অনেক সুবিধা ও সুশৃঙ্খলা ছিল, তাহার প্রমাণ ভারতাদি পুরাণে লক্ষিত হয়। বিরাটরাজ্যে যখন পাণ্ডবেরা বৎসরেক অজ্ঞাতবাস করেন, তখন অর্জ্জুন বৃহন্নলারূপে রাজপ্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতবিদ্যালয়ে অধ্যাপিকা পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইহাতে সাহস পূর্ব্বক বলা যাইতে পারে, যে সঙ্গীতশাস্ত্র অধ্যয়ন করা সভ্যমাত্রের অবশ্যকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া, প্রাচীন হিন্দু নরপতিরা স্থানে স্থানে পাঠশালা স্থাপন পূর্ব্বক তাহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিতেন। অদ্যাপি তাঁহাদের চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিসকল জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। নারদ, ভরত, হনুমন্ত কল্লীনাথ প্রভৃতি মহাত্মাদের প্রণীত প্রাচীন সঙ্গীতগ্রন্থ সকল যাঁহাদিগের নয়নগোচর হইয়াছে, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, প্রাচীন হিন্দুজাতির বুদ্ধিক্ষেত্র কি অত্যাশ্চর্য্য উর্ব্বরা ছিল, এবং তাহাতে বিদ্যা-বৃক্ষ যে অসামান্য ফলশালী হইবে তাহার সন্দেহ কি? অনেক ভাষাজ্ঞ পণ্ডিতবর সার্ উইলিয়ম জোন্স বলেন, যে জ্যোতিঃ পদার্থের সপ্ত বর্ণ রক্ত নীল প্রভৃতি যে রূপ নভোমণ্ডলে রামধনুতে দৃষ্টিগোচর হয়, সেইরূপ শব্দতত্ত্বের সপ্ত স্বরদেশ ষড়জ ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত নিষাদ প্রভৃতি শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপলব্ধি হয় এবং বর্ণসকলের মধ্যে যেমন হরিত ও নীল বর্ণদ্বয় নয়নের প্রীতিজনক, তেমনই সপ্ত স্বরের মধ্যে ষড়্জ ও পঞ্চম সাতিশয় শ্রবণ-প্রিয়। ফলে দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয় এই উভয়ের বিষয় আলোক ও শব্দের পরস্পরের অনেক সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। প্রকৃতির কোন্ নিয়ম-কৌশলে জ্যোতিঃ ও শব্দতত্ত্ব এক ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াছে, তাহার গুহ্যতম ভাব প্রকাশ করিতে এ পর্য্যন্ত কেহই সমর্থ হন নাই। ভারতবর্ষের সূক্ষ্মদর্শী মহোদয়েরা যেকালে শব্দতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া স্বর-দেশের সপ্ত খনি হইতে সঙ্গীতরত্ন উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন, সেকালে জ্যোতির্বিদ্যাপ্রকাশক মহাপুরুষ নিউটনের জন্মভূমি ইংলণ্ড দেশের নাম মাত্র কাহারও কর্ণগোচর ছিল না। মহাত্মা জোন্স প্রণীত ভারত-সঙ্গীত প্রস্তাবে

লিখিত আছে যে, ভারতবর্ষের সঙ্গীতশাস্ত্রবেত্তারা সঙ্গীত শব্দটীকে গীত, বাদ্য, নৃত্য প্রভৃতি ত্রিবিধ বিদ্যার উপাধি করিয়াছেন। সঙ্গীত শব্দটী শুনিবামাত্রই বোধ হয় যে, গীত বাদ্য প্রভৃতির উল্লেখ করা হইল। এক্ষণে গীত, বাদ্য, নৃত্য, পৃথক্ পৃথক্ সঙ্গীত বৃক্ষের কোন্ কোন্ শাখারূপে শোভিত হয়, তাহা যথাসাধ্য বর্ণনে বাধ্য হইলাম।

প্রথম, গীত।

কণ্ঠ-বিনির্গত স্বরযুক্ত নানা রস ও ছন্দোবন্ধে প্রপূরিত কবিতা সকল যাহা রাগরাগিণী পথে ধাবমান হয়, তাহাকে গান অথবা গীত বলে।

দ্বিতীয়, বাদ্য।

নানা প্রকার যন্ত্র যাহা অঙ্গুলি দ্বারা পীড়িত অথবা বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া মনোহর শব্দ উৎপাদন করতঃ গীতের সহায়তা করে এবং কাল বিধান করে, তাহাকে বাদ্য কহে।

বাদ্য দুই প্রকার; স্বর-সহায়ী ও সময়-সহায়ী। বীণা বংশী সারঙ্গ এস্‌রাজ প্রভৃতি যন্ত্র, যাহাতে সপ্ত-স্বরের আন্দোলন করিয়া রাগরাগিণী-মার্গে ধাবিত গীতের ছায়া প্রদর্শিত হয়, তাহাদিগকে স্বর-সহায়ী যন্ত্র কহে। আর মৃদঙ্গ ঢোল করতাল মন্দিরা খচতাল প্রভৃতি যন্ত্র, যাহাতে গীতকালীন অথবা বাদ্যকালীন সময় বিভাগ করা যায়, তাহাকে তাল বা সময়-সহায়ী যন্ত্র কহে। এই প্রস্তাবের শেষ ভাগে বাদ্যযন্ত্রের বিষয় বিস্তারিত রূপে লিখিত হইবে।

তৃতীয়, নৃত্য।

বাদ্য দ্বারা যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে সময় বিভাগ করা হয়, সেই সময়ে সময়ে অর্থাৎ তালে তালে পদনিক্ষেপ ও সর্ব্বাঙ্গচালন করিয়া মনোগত উল্লাস প্রকাশ করাকে নৃত্য কহে। নৃত্যটী মনুষ্য মাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ। তাহার চমৎকার উদাহরণ শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র লাল মিত্র পণ্ডিতচূড়ামণি প্রণীত বিবিধার্থসংগ্রহ প্রবন্ধে এইরূপ উল্লিখিত আছে যে, শৈশব কালে মনে আহ্লাদের সঞ্চার হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই করতালি ও লম্ফপ্রদানে পদনিক্ষেপ করতঃ বালকেরা নৃত্য করে, ইহা শিশুচরিত্রে প্রত্যহ দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষের সঙ্গীতশাস্ত্রে নৃত্য দুই মহৎশাখায় বিভক্ত আছে। ঐ শাখাদ্বয়কে তাণ্ডব ও লাস্য কহে। তাণ্ডব অর্থে শিব অর্থাৎ পুরুষ-নৃত্য, লাস্য অর্থে প্রকৃতি অর্থাৎ স্ত্রী-নৃত্য। নৃত্যের এই উভয় শাখায় যে বহুরূপ কৌশল আছে, তাহার সন্দেহ নাই।

সঙ্গীত-বৃক্ষের যে প্রথম অথবা প্রধান শাখা গীতবিদ্যা, তাহা স্বরযোগে নানা প্রকার রাগরাগিণী পথে প্রকাশ হয়। তাহারই এই স্থানে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে।

রাগ শব্দে মনের ভাব অথবা প্রকৃতির শোভা বুঝায়। ভারতবর্ষে বৎসর ষড়্‌ঋতুতে বিভক্ত আছে। ঐ ঐ ঋতুকালীন স্বভাবের বিশেষ বিশেষ মনোহর শোভা বর্ণন করিতে

ছয় রাগের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাচীন মতে চান্দ্রবর্ষ* হইতে আরম্ভ হয় বলিয়াই শরৎকাল হইতে ঋতু গণনা করার প্রথা ছিল এবং সেই রীতি অনুসারে আদি ছয় রাগ ছয় ঋতু-ক্রমান্বয়ে নিরূপিত আছে। যথা, শরতে ভৈরব, হেমন্তে মালব বা মালকোষ, শিশিরে শ্রী, বসন্তে হিন্দোল বা বসন্ত, গ্রীষ্মে দীপক এবং বর্ষায় মেঘ। পরে দিবারাত্রকে পঞ্চ ভাগ করিয়া, অর্থাৎ প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ ও সন্ধ্যাকাল সকলের শোভা বর্ণনচ্ছলে পঞ্চ পঞ্চ রাগিণীর উৎপত্তি হইয়া, ছয় রাগের সহিত ৩০টি রাগিণীর পরিণয় হয়। এবং পুনর্ব্বার দিবারাত্রকে অষ্ট প্রহরে বিভাগ করিয়া এক এক রাগের আট আট পুত্ররূপে ৪৮টী উপরাগের উৎপত্তি হয়। অনেক প্রাচীন গ্রন্থে সর্ব্বশুদ্ধ উপর্য্যুক্ত ৮৪টী রাগরাগিণীর বিবরণ আছে। এবং অনেকে বলেন যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের সঙ্গীত-রাজ্যে অসংখ্য রাগরাগিণী বিদ্যমান ছিল। এমন কি যখন দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে সুচারুনয়না গোপাঙ্গনা মণ্ডলীকে প্রেমতত্ত্ব উপদেশ করিতেন, তখন তাঁহাকে সেই প্রেমাভিলাষিণী ষোড়শশত গোপিনী প্রত্যেকে এক এক বিশেষ রাগরাগিণীতে স্বীয় স্বীয় প্রণয়ানুরাগের পরিচয় দিতেন। রাগবিরোধের গ্রন্থ-কর্ত্তা সুবিখ্যাত সোম মহাশয় বলিয়াছেন যে, যেরূপ সমুদ্র-জল বায়ুসহযোগে অনন্ত তরঙ্গ-রাশি বিস্তার করে, সেইরূপ শব্দতত্ত্বের প্রধান সপ্ত স্বররাজ ও তাহাদের পরস্পরের মধ্যস্থিতা ২২টী শ্রুতি অর্থাৎ খণ্ড-স্বর বা স্বর-কামিনী সকল শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ত্রিগুণে প্রপূরিত করিলে, অর্থাৎ উদারা মুদারা তারা প্রভৃতি তিন গ্রামে বিস্তার পূর্ব্বক বিশেষ বিশেষ স্বরের পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগে ক্রমশঃ যে অসংখ্য রাগ-তরঙ্গের উদ্ভব হইতে পারে, তাহা অসম্ভব নহে। তবে যন্ত্র বা কণ্ঠস্বর উপলক্ষে উপর্য্যুক্ত ৮৪টী অতিরিক্ত রাগরাগিণীর আলোচনা করা সু-কঠিন ও আয়াস-সাধ্য বিবেচনায় সচরাচর সঙ্গীত গ্রন্থে তাহাদের নাম মাত্র উল্লেখ নাই। এই স্থলে ঐ সপ্ত স্বর সকলের মধ্যস্থিতা ২২টী শ্রুতি বা স্বরকামিনী কোন্ কোন্ স্থানে অবস্থিতি করে, তাহা জানা আবশ্যক। ষড়জ ও ঋষভের মধ্যে ৪, ঋষভ ও গান্ধারের মধ্যে ৩, গান্ধার ও মধ্যমের মধ্যে ২, মধ্যম ও পঞ্চমের মধ্যে ৪, পঞ্চম ও ধৈবতের মধ্যে ৪, ধৈবত ও নিষাদের মধ্যে ৩, এবং নিষাদ ও ষড়জের মধ্যে ২, মোট ২২টী খণ্ড স্বর বর্ত্তমান আছে। তাহাদিগকে কোমলতর ও কোমলতম ও তীব্রতর ও তীব্রতম বলিয়া উল্লেখ করা হয়। হিন্দু সঙ্গীত-বেত্তারা সকলে সুকবি ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের কাব্য-নৈপুণ্য দর্শন করাইবার জন্য স্বর-পরিবারদের নায়ক-নায়িকা রূপে বর্ণন করিয়াছেন। উক্ত ২২টী খণ্ড-স্বরকে স্বরকামিনী অথবা অপ্সরা রূপে গণনা করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের এক এক নাম রাখিয়াছেন। যথা পঞ্চমের ৪টী মহিষীর নাম মালিনী চপলা লোলা ও সর্ব্বরত্না, ধৈবতের শান্তা প্রভৃতি তিনটী ভার্য্যা এবং অপরাপর স্বর-পত্নীদিগের রমণীয় নাম সকল উৎকৃষ্ট সঙ্গীত গ্রন্থ মাত্রে উল্লিখিত আছে। শব্দদেশের তিনগ্রামে যখন কোন এক বিশেষ স্বর-নায়ক বিশেষ নায়িকা সহযোগে আধিপত্য করেন এবং অপর স্বর-পরিবারেরা তাহার অনুচর এবং বৈরীদল-শ্রেণীভুক্ত হয়, তখন এক বিশেষ রাগ বা রাগবধূর মূর্ত্তি প্রকাশ হয়। এবং তান উপজ প্রভৃতি আরোহ অবরোহ দ্বারা তাহাকে অলংকৃত করে। কোন বিশেষ রাগ-

রাগিণীতে যে কয়েকটি স্বরের ব্যবহার হয়, তাহাদের প্রত্যেকের প্রয়োগের স্থান ও পরিমাণ বিবেচনায় তাহারা ভিন্ন ভিন্ন উপাধি গ্রহণ করে। যথা, বাদী, সম্বাদী, ন্যাস ইত্যাদি।

গীত বা রাগের আরম্ভে যে স্বরের প্রয়োগ হয় তাহাকে গ্রহ কহে এবং সমাপ্তিকালীন স্বরকে ন্যাস ও যাহার বহুল প্রয়োগ হয় তাহাকে বাদী অথবা অংশ কহে। ফলে, রাগ বা রাগিণীর বাদীস্বরকে রাজা সম্বাদীকে মন্ত্রী এবং অপর স্বরদের অনুচর বলিয়া গণনা করা হয় এবং যে বিশেষ স্বরকে রাগ বিশেষে ত্যাগ করিতে হয়, তাহাকে বিবাদী অথবা বৈরী কহে। প্রসিদ্ধ সঙ্গীত গ্রন্থ নারায়ণ হইতে উহার একটী প্রমাণ বচন নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

গ্রহঃ স্বরস্য ইত্যুক্তো যো গীতাদৌ সমর্পিতঃ
ন্যাসঃ স্বরস্তু স প্রোক্তো যো গীতাদি সমাপ্তিকঃ।

* * * *

যস্য সর্ব্বত্র বহুলম্ বাহ্যংশোঽপি*

কোন স্বর স্বামীত্ব স্বীকার করিলে এবং অপর স্বরেরা কেহ তাহার গ্রহ, কেহ অমাত্য, কেহ অনুচর পদবিশেষে নিয়োজিত হইলে এবং কেহ বা বৈরীরূপে পরিত্যক্ত হইলে কোন বিশেষ রাগ বা রাগিণীর মূর্ত্তি উদয় হয়।

ভারতবর্ষের কবিত্ব-আকাশে প্রাচীনকালে কি আশ্চর্য্য সূর্য্যই উদয় হইয়াছিল, যাহার আলোকে রাগরাগিণীর অদ্ভুত দেবমূর্ত্তি সকল সঙ্গীতবেত্তাদের হৃদয় দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া গ্রন্থবিশেষে বর্ণিত হইয়াছে! জোন্স মহাশয় বলেন যে রাগপরিবারদের শিল্পনৈপুণ্যসম্পন্ন যে সকল পট-সঙ্গীত গ্রন্থ নারায়ণে দৃষ্টিগোচর হয়, তাহারা দামোদর রত্নমালা চন্দ্রিকা এবং নারদ প্রণীত সঙ্গীত গ্রন্থ হইতে বচন সঙ্কলিত হইয়া চিত্রিত হইয়াছে।

উক্ত গ্রন্থে রাগরাগিণীদিগের চমৎকার মূর্ত্তির বিষয় বর্ণিত আছে। সে সমুদায় উল্লেখ করা শ্রমসাধ্য বিবেচনা করিয়া একটিমাত্র বচন নিম্নে লিখিত হইল।

লীলা বিহারেণ বনান্তরালে
চিম্বন্ প্রসূনানি বধূসহায়ঃ।
বিলাসবেশো ধৃতদিব্যমূর্ত্তিঃ
শ্রীরাগ এব প্রথিতঃ পৃথিব্যাম্॥

অস্যার্থ। পৃথিবীতে সুবিখ্যাত শ্রীরাগ যিনি বনের অন্তরালে নিজ কামিনীগণের সহিত নব মুকুল ও কুসুম চয়ন করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন, তাঁহার মনোহর দেব-মূর্ত্তি দৃষ্ট হইতেছে।

কথিত আছে রাগরাগিণী সকল অসামান্য শক্তিসম্পন্ন এক এক দেবদেবী। তাহাদের প্রভাবে অলৌকিক ব্যাপার সমস্ত সম্পাদন হইতে পারে। জনশ্রুতি আছে যে, যখন যবন-কুলতিলক সম্রাট্ আকবর সঙ্গীত চূড়ামণি তানসেনকে গ্রীষ্ম ঋতুর শোভা বর্ণনচ্ছলে দীপক রাগের আলাপ করিতে আজ্ঞা করেন, তখন গায়ক বীর তানসেন দীপকের প্রভাব দর্শন করাইতে এতাধিক দৃঢ়-ব্রত হইয়াছিলেন যে তত্রস্থ লোক সকল সাক্ষাৎ বৈশ্বানরদের অনলের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভয়ে ব্যাকুল হইয়াছিল এবং স্বয়ং তানসেনের জীবনান্ত হইয়াছিল। এই

গল্পটি কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিচার করিবেন। শব্দ ও অনলের সহিত পরস্পরের কি সম্বন্ধ আছে তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। তাহা পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা বলিতে পারেন। তবে দুই পদার্থের পরস্পর ঘর্ষণ হইলে অগ্নির উৎপত্তি হয়, ইহা অনেকে দেখিয়াছেন। এবং বনে বায়ু বহিলে শুষ্ক বৃক্ষের পরস্পর ঘর্ষণ সহকারে দাবাগ্নি উদ্ভূত হইয়া বন দাহন করে, তাহাও অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। সেইরূপ যে দীর্ঘকাল স্বরঝটিকার প্রবল বহনে কণ্ঠ তালু জিহ্বা-মূল প্রভৃতি স্থান সকলের বায়ুর পরমাণুর সহিত বিপুল ঘর্ষণ হইলে হুতাশন প্রজ্জ্বলিত হইতে পারে, তাহা কি প্রকারে অসম্ভব বলা যাইবে? এবং তানসেন দীর্ঘকাল অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া অতিশয় ক্ষীণ হইয়াছিলেন, সুতরাং কলেবর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, তাহাতেই বা অযুক্তিযুক্ত কি? শুনিতে পাওয়া যায়, তানসেনের দুইটি কন্যা পিতার বিপদের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ব্যাকুলচিত্তে মেঘ রাগের আলাপ করিতে করিতে পিতার নিকটে ধাবমানা হইয়াছিলেন এবং অনল হইতে পিতৃজীবন রক্ষা করিতে এতাধিক ব্যগ্র হইয়া বর্ষার আহ্বান করিয়াছিলেন যে, মুষলধারায় বৃষ্টি হইয়া তত্রস্থ ভূমি প্লাবিত হইয়াছিল। এস্থলে বিচার্য্য এই যে, কণ্ঠাবিনির্গত বায়ুর সঞ্চালনে দূরস্থ মেঘ সকল আকর্ষিত হইয়া বৃষ্টি হইয়াছিল, কি সেই পিতৃশোকে বিহ্বলা অনাথা বালিকাদ্বয়ের খেদযুক্ত বিলাপধ্বনি তত্রস্থ লোকসমূহের নয়ন-মেঘ হইতে বারি আকর্ষণ করিয়া বর্ষণ করিয়াছিল? এতদুভয় যুক্তির মধ্যে পাঠক মহাশয়দিগের যাহা অভিরুচি হয়, তাহা গ্রহণ করিবেন। আমাদিগের বক্তব্য মাত্র এই যে, রাগরাগিণীর প্রভাবে যদিও কোন বাহ্যিক অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করা অসম্ভব বোধ হয়, কিন্তু নানা প্রকার অদ্ভুত আন্তরিক অবস্থা উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

এক্ষণে আদি ছয় রাগ ও তাহাদিগের পঞ্চ পঞ্চ কামিনী, একুনে ৩৬টী রাগরাগিণীর নাম উল্লেখ করা যাইতেছে। এবং ঐ সকল রাগরাগিণীর কোন স্বর অবলম্বন করিয়া প্রকাশমান হয়, তাহাও লিখিত হইতেছে।

স্বর সকলের সাঙ্কেতিক নাম নিম্নে লিখিত হইল। যথা,—

ষড়জ	ঋষভ	গান্ধার	মধ্যম	পঞ্চম	ধৈবত	নিষাদ
সা	ঋ	গা	ম	প	ধ	নি

এবং যে বিশেষ রাগ বা রাগিণীতে যে কোন বিশেষ স্বরবৈরী অর্থাৎ বিবাদী রূপে ত্যক্ত হইবে, তাহার স্থানে (০) শূন্য দৃষ্ট হইবে।

সুবিখ্যাত সোমেশ্বর প্রণীত রাগ বিরোধ হইতে নিচের লিখিত রাগপরিবারের নাম সকল উদ্ধৃত হইল।

রাগভৈরব	ধ	নি	সা	ঋ	গা	ম	প
তাহার পঞ্চ ভার্য্যা							
রাগিণী বরাতী	সা	ঋ	গা	ম	প	ধ	নি
ঐ মধ্যমাদি	ম	প	০	নি	সা	০	গা

ঐ ভৈরবী	সা	ঋ	গা	মা	প	ধ	নি
ঐ সৈন্ধবী	সা	ঋ	০	ম	প	ধ	০
ঐ জঙ্গালী	সা	ঋ	গা	ম	প	ধ	নি
রাগ মালব	নি	সা	ঋ´	গ	ম	প	ধ
তাহার পঞ্চ ভার্য্যা							
রাগিণী টোড়ী	গ	ম	প	ধ	নি	সা	ঋ
ঐ গাড়ী	নি	সা	ঋ	০	ম	প	০
ঐ গন্ধাক্রী	সা	ঋ	গ	ম	প	০	নি
ঐ ষষ্ঠাবতী	রাগবিরোধ নাই						
ঐ কুকুভা	ঐ ঐ						

[রাগবিরোধ মতানুযায়ী]

(২১ পৃষ্ঠায় * * * চিহ্নিত দেখ।)

রাগ হিন্দোল	ম	০	ধ	নি	সা	০	গ
তাহার পঞ্চ ভার্য্যা							
রাগিণী রামক্রী	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
ঐ দেশাক্ষী	গ	ম	প	ধ	০	সা	ঋ
ঐ ললিত	সা	ঋ	গ	ম	০	ধ	নি
ঐ বিলাবলী	ধ	নি	সা	০	গ	ম	০
ঐ পটমঞ্জরী	রাগবিরোধ নাই						
রাগ দীপক	রাগবিরোধ নাই						
তাহার পঞ্চভার্য্যা							
রাগিণী দেশী	ঋ	০	ম	প	ধ	নি	সা
ঐ কাম্বোদী	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	০
ঐ নেতা	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
ঐ কেদারী	নি	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ
ঐ কর্ণাটী	নি	সা	০	গ	ম	প	০
রাগ মেঘ	রাগবিরোধ নাই						
তাহার পঞ্চভার্য্যা							
রাগিণী টেঙ্কা	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
ঐ মল্লারী	ধ	০	সা	ঋ	০	ম	প
ঐ গুর্জ্জরী	ঋ	গ	ম	০	ধ	নি	সা
ঐ ভূপালী	গ	০	প	ধ	০	সা	ঋ
ঐ দেশাক্রী	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি

প্রাচীন সঙ্গীতবেত্তাদের মধ্যে রাগরাগিণী বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন মত ছিল, দৃষ্ট হয়। সঙ্গীতপারগ মিরজা খাঁর গ্রন্থ হইতে ৩৬টী রাগরাগিণীর প্রণালী যাহা জোন্স মহাশয় উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাও এ স্থানে লেখা যাইতেছে। তাহাতে রাগ বিশেষে স্থানে স্থানে স্বরের বিভিন্নতা দৃষ্ট হইবে। মিরজা খাঁ বলেন যে তিনি স্বকপোলকল্পিত কোন রাগ বা রাগিণীর স্বরপ্রণালী প্রকাশ করেন নাই, যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তৎসমুদায় প্রাচীন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রথম

রাগ ভৈরব	ধ	নি	সা	০	গ	ম	০
রাগিণী বরাতী	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
ঐ ভৈরবী	ম	প	ধ	নি	সা	ঋ	গ
ঐ মধ্যমাদী	ম	প	ধ	নি	সা	ঋ	গ
ঐ সৈন্ধবী	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
ঐ বাঙ্গালী	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি

দ্বিতীয়

রাগ মালব	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
রাগিণী টড়ী	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
ঐ গাড়ী	সা	০	গ	ম	০	ধ	নি
ঐ গণ্ডাক্রী	নি	সা	০	গ	ম	প	০
ঐ ষষ্ঠাবতী	ধ	নি	সা	ঋ	গ	ম	০
ঐ কুকুভা	ধ	নি	স	ঋ	গ	ম	প

(রাগবিরোধ মতানুযায়ী) * * *

রাগ শ্রী	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
রাগিণী মলয়াশ্রী	সা	০	গ	ম	প	০	নি
ঐ মারভী	গ	ম	প	০	নি	সা	০
ঐ ধ্যানশ্রী	সা	০	গ	ম	প	০	নি
ঐ বাসন্তী	সা	ঋ	গ	ম	০	ধ	নি
ঐ আসয়ারি	ম	প	ধ	নি	সা	ঋ	গ

(মিরজা খাঁ গ্রন্থানুযায়ী)

তৃতীয়

রাগ শ্রী	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
রাগিণী মলয়াশ্রী	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
ঐ মারভী	সা	০	গ	ম	প	ধ	নি

ঐ ধ্যানস্থী	সা	প	ধ	নি	ঋ	গ	০
ঐ বাসন্তী	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
ঐ আসওয়ারি	ধ	নি	সা	০	০	ম	প
চতুর্থ							
রাগ হিন্দোল	সা	০	গ	ম	প	০	নি
রাগিণী রামক্রী	সা	০	গ	ম	প	০	নি
ঐ দেশাক্ষী	সা	ম	গ	ধ	নি	সা	০
ঐ ললিত	ধ	নি	ম	০	গ	ম	০
ঐ বিলাবলী	ধ	নি	সা	ঋ	গ	ম	প
ঐ পটমঞ্জরী	প	ধ	নি	সা	ঋ	গ	ম
পঞ্চম							
রাগ দীপক	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
রাগিণী দেশী	ঋ	গ	ম	০	ধ	নি	সা
ঐ কাম্বোদী	ধ	নি	সা	ঋ	গ	ম	প
ঐ নেতা	সা	নি	ধ	প	ম	গ	ঋ
ঐ কেদারী	নি	ম	০	গ	ম	প	০
ঐ কর্ণাটী	নি	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ
ষষ্ঠ							
রাগ মেঘ	ধ	নি	সা	ঋ	গ	০	০
রাগিণী টেঙ্কা	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি
ঐ মল্লারী	ধ	নি	০	ঋ	গ	ম	০
ঐ গুর্জ্জরী	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি	সা
ঐ ভূপালী	সা	গ	ম	ধ	নি	প	ঋ
ঐ দেশাক্রী	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি	সা

এতদ্দেশে সঙ্গীত বিষয়ক চারিটী প্রাচীন মত প্রচলিত আছে। যথা ঈশ্বর, ভরত, হনুমন্ত বা পবন এবং কল্লীনাথ। ছয় রাগ ও ত্রিশটী রাগিণীর সংখ্যার বিষয় যাহা উপরে লিখিত হইল তাহা কেবল পবন মত অনুযায়ী, সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। কল্লীনাথ মতে এক এক রাগের ছয় ছয় ভার্য্যা ও আট আট পুত্র। সর্ব্বশুদ্ধ ৯০টী রাগরাগিণী বিদ্যমান আছে এবং ভরত মতে ৪৮টী রাগ পুত্রদের এক এক পত্নী আছে। তাহাতে রাগপরিবারেরা একশত আটত্রিশ সংখ্যা হয়। ফলে, যে সময়ে ভারতবর্ষে সঙ্গীত বিদ্যার অতিশয় চর্চা ছিল, তখন ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন পাঠশালার মতে নূতন রাগ সকল রচিত হইত এবং সেই সেই

রাজধানীর নামানুযায়ী তাহাদের নামকরণ হইত। মূলতান রাগের নাম শ্রবণ করিলে বোধ হয় উক্ত রাগটী মূলতান নগরের প্রাচীন সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সম্পত্তি। কখন কখন রচয়িতার নামে রাগের উপাধি দেওয়া যাইত। সারেং রাগটী বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ শারঙ্গদেবের রচিত অনুভব হয়। কখন বা কোন বিশেষ ঘটনা দ্বারা কোন রাগ বিশেষ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। বাঘেশ্বরী অথবা বাঘশ্রী রাগিণী, অনেকে বলিয়া থাকেন, মহাহিংস্র পশু ব্যাঘ্র প্রভৃতিকে মোহিত করিতে পারে। বোধহয় কোন সময়ে শ্রী রাগের পরিবারের মধ্যে কোন বিশেষ রাগিণীর আলাপ কালে মৃগ সর্প এবং অপরাপর জন্তুদের ন্যায় ব্যাঘ্রও বশীভূত হইয়া থাকিবে এবং সেই ঘটনা অবধি সেই রাগিণীটী বাঘশ্রী আখ্যা পাইয়াছে। যখন ভারতবর্ষে ঐ ঐ রীতি অনুসারে রাগরাগিণীর নামকরণের প্রথা ছিল এবং যখন সঙ্গীতবেত্তারা নিজ নিজ পাণ্ডিত্য দেখাইবার লালসায় নূতন নূতন রাগরাগিণী রচনা করিতে নিযুক্ত থাকিতেন, তখন যে ক্রমশঃ রাগরাগিণীর বহু সংখ্যা হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি!

ভারতবর্ষের যে কয়েকটী বাদ্য যন্ত্রের সচরাচর নাম শুনা যায়, তাহাদের উল্লেখ করা উচিত বোধে নিম্নে লিখিত হইতেছে। বাদ্যযন্ত্র শব্দে কাষ্ঠ, ধাতু, চর্ম্ম, মৃত্তিকা প্রভৃতি পদার্থে নির্ম্মিত বস্তু, যাহা হস্ত বা বায়ুর আঘাতে শব্দায়মান করা যায়, তাহাকে বুঝায়। কোন্ কোন্ সময়ে কোন্ ২ যন্ত্র প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল, কোন্ ২ মহাত্মা তাহাদের প্রকাশ করেন এবং তাহাদের প্রকাশ হইবার বিশেষ ঘটনাই বা কি? তৎসমুদয় বর্ণন করা আমাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত। তবে মাতৃভূমির গৌরব কীর্ত্তন করিবার মানসে তাহাদের যথাজ্ঞাত নাম সকল লিখিতে বাধ্য হইলাম। পুরাতন বাদ্যযন্ত্র সকলের মধ্যে বীণা ও বংশীর নাম শ্রেষ্ঠ রূপে গণনা করা হয়। তাহাদের উভয়ের মধ্যে কে প্রাচীনতর ও কে প্রাচীনতম তাহা বলিতে পারি না। পুরাণ-অগ্রগণ্য ভারতে উভয়েরই নাম উল্লেখ করা আছে। সমুদ্র মন্থনে যে আশ্চর্য্য বংশ উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহার প্রধান অংশ মুরলীরূপে জগতের উৎকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণ করে শোভিত হইয়াছিল, এবং দেবর্ষি নারদ, যিনি পরম ভাগবতদিগের অগ্রগণ্য ছিলেন, যিনি জ্ঞানযোগে ও তপোবলে পরম পবিত্র পুরুষার্থ লাভ করিয়াছিলেন, তিনি ভগবৎ উপাসনার শ্রেষ্ঠ উপযোগী সঙ্গীত বিদ্যার সমাদর করিতে জগন্মাতা বাগ্‌দেবীর করকমল-স্থিতা বীণাযন্ত্রের অনুরূপ পৃথিবীতে প্রকাশ করেন, কথিত আছে। শিঙ্গা, ডমরু, দুন্দুভি প্রভৃতি অপর অপর বাদ্য-যন্ত্রসকল, যাহাদের নাম পুরাণে শ্রুত হওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে কোন্‌টী কোন্ সময়ে প্রথম প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা অনুসন্ধান করা সুকঠিন। আমরা কেবল তাহাদের নাম মাত্র নীচের লিখিত শ্রেণী মতে উল্লেখ করিলাম।

স্বরসহায়ী।

যে সকল যন্ত্র ফুৎকার বা বায়ুর সঞ্চালনে বাদিত হয়।		যে সকল যন্ত্র অঙ্গুলীর পীড়নে অথবা রজ্জুর ঘর্ষণে বাদিত হয়।	
বংশী	তুমড়ী	বীণা	স্বরশিঙ্গার
শিঙ্গা	ভেপু বা	রবাব	তাউস
তূরী	ভোড়ং	সরদ	তানপুরা
ভেরী		সেতার	একতারা
শঙ্খ		এস্‌রাজ	মুচং
সানাই		সারঙ্গ	জলতরঙ্গ
রোসন চৌকি		সারিন্দা	

সমরসহায়ী।

কাষ্ঠ চর্ম্ম ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত	
মৃদঙ্গ বা পাখোয়াজ	জগঝম্প
তবলা	দারা
খোল	খঞ্জনী
ঢোলক	ডমরু
জোড়খাই	গোপীযন্ত্র
রণ ঢক্কা বা ঢাক	মাদল।
দামামা	**ধাতু নির্ম্মিত**
দগড়া	ঘণ্টা
দুন্দুভি	কাঁসর
নাগরা,	কাঁসি
নহবৎ	মন্দিরা
তাসা	কর্ত্তাল
কাড়া	খরতাল।

উপরি-উক্ত বাদ্যযন্ত্র সকলের মধ্যে কেহ কেহ রণবাদ্য কেহ কেহ মাঙ্গল্য বা উৎসব বাদ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। তূরী ভেরী দুন্দুভি দামামা প্রভৃতি প্রাচীন কালের রণক্ষেত্রে বাদিত হইত, সুতরাং তাহাদিগকে রণবাদ্য বলা যাইতে পারে। এবং শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর সানাই ঢোল নহবৎ প্রভৃতি বাদ্য সকল মঙ্গল বা উৎসব কার্য্যে ব্যবহৃত হয় বলিয়া তাহাদিগকে মাঙ্গল্য বাদ্য কহে।

স্বরলিপি।

স্বরলিপির সহজ পদ্ধতি স্থাপন করা প্রয়োজন হইতেছে। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে স্বর সকলের লিপিবদ্ধ করিবার সদুপায় ছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে তাহার সাঙ্কেতিক চিহ্নসকল অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। স্বর বিশেষের কম্পন বা হ্রস্ব দীর্ঘ ও বিশ্রাম কাল নির্দ্দিষ্ট করিতে হইলে বিশেষ বিশেষ সাঙ্কেতিক লক্ষণ সকল অঙ্কিত হইত এবং ঐ সকল চিহ্ন উপলক্ষ করিয়া গীত সকল যে রাগরাগিণী বিশেষে লিপিবদ্ধ করা যাইবে, তাহার বাধা কি?

আক্ষেপের বিষয় এই যে হিন্দু আধিপত্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতমাতার পূর্ব্ব-ধন সকল অন্ধকার কূপে পতন হইয়াছে। যবন অধিকার কালেও প্রাচীন সঙ্গীতের কিছু কিছু আদর ছিল। সম্রাট্ আকবর ও মহম্মদ সা প্রভৃতি কেহ কেহ হিন্দুসঙ্গীতের আদর করিতেন। ব্রজ বাওরা, গোপাল নায়ক, তানসেন প্রভৃতি সঙ্গীত-নিপুণ বড় বড় গায়কেরা রাজ-অন্নে প্রতিপালিত হইতেন এবং সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থসকল যবন ভাষায় অনুবাদিত হইত, শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান কালে ভারত-সঙ্গীত-প্রদীপ একেবারে নির্ব্বাণ হইয়াছে। সাধারণের উপকারার্থে কোন রাজকীয় সঙ্গীত পাঠশালা স্থাপিত নাই, রাজকোষ হইতে কিছুমাত্র সাহায্য প্রদান করা হয় না, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থসকল প্রায় লোপ হইয়াছে, আর যে কয়েকখানির নাম শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাও দুষ্প্রাপ্য। সুবিজ্ঞ অধ্যাপকের সংখ্যা অতি অল্প, যাঁহারা আছেন তাঁহারা বিনা বেতনে শিক্ষা প্রদান করেন না। সঙ্গীত বিদ্যার্থীদিগের মধ্যে অনেকে ক্ষমতাহীন, গুরু সন্তোষ করিতে অসমর্থ, এবং শিক্ষা দিবারও সুপ্রণালী নাই। সুতরাং সঙ্গীতবিদ্যার যে পূর্ব্বশ্রী ভ্রষ্ট হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ কি! ভারতমাতার স্বাধীনতা যে পথে গমন করিয়াছে সঙ্গীতবিদ্যাও যে সেই পথগামিনী হইয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য! হায়! বঙ্গভূমির ধনাঢ্য হিন্দুসমাজ আর কতকাল মাতৃদুর্দশা দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন! পৃথিবীর অন্য অন্য দেশবাসী আধুনিক সভ্য জাতিদের স্বদেশ গৌরবাকাঙ্ক্ষা দর্শনে কি তাহাদের মনে ধিক্কার উপস্থিত হয় না? ভারতভূমির অমূল্য ধন সঙ্গীত-রত্ন তাচ্ছিল্য তস্করে অপহরণ করিতেছে তাহা কি তাঁহারা দেখিয়াও দেখিতেছেন না?

এক্ষণে দেশ-হিতৈষী বিদ্যানুরাগী সভ্য মহাশয়দিগের নিকট প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা মাতৃভূমির পূর্ব্ব গৌরব পুনরুদ্দীপণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া, সঙ্গীত বিদ্যালয় সংস্থাপনে অগ্রসর হউন। প্রাচীন প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থ সকল, যাহাদের নাম শুনিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ রাগবিরোধ, রাগমালা, রাগদর্পণ, নারায়ণ, রত্নাকর, সভাবিনোদ প্রভৃতির অন্বেষণ করিয়া বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ করণের উপায় করুন, শিক্ষা প্রদান করিবার সুনিয়ম সকল সংস্থাপিত হউক এবং অধ্যয়ন করিবার সুলভ উপায় করিতে চেষ্টিত হউন। তাহা হইলেই সঙ্গীতের যথার্থ পুরস্কার করা হইবে এবং অল্প কাল মধ্যেই ভারতের চির-উর্ব্বরা ভূমির সঙ্গীততরু পুনঃমঞ্জরিত হইবে ও পূর্ব্বশ্রী ধারণ করিতে থাকিবে। আর এই দেশবাসিদের উৎসাহ ও একাগ্রতা দেখিলে বিদ্যাপ্রতিপালক প্রজারঞ্জক ব্রিটিশরাজ বিশেষ সাহায্য প্রদানে উদ্যত হইবেন, এবং

কালেতে যে রাজ-প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত বিদ্যালয় ভারতবর্ষের নগরে নগরে দৃষ্ট হইবে এমত ভরসা করা যাইতে পারিবে।

আহা! আমাদের মাতৃভূমি হিন্দুস্থানে কবে সেই শুভদিনের উদয় হইবে, যখন প্রধান প্রধান বিদ্যালয় মাত্রে সঙ্গীত বিদ্যা অধ্যয়ন করিবার উপায় হইবে, বিশুদ্ধ সঙ্গীত শিক্ষা করা সভ্য মাত্রের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম সকলের মধ্যে পরিগণিত হইয়া বালক বালিকারা পঠদ্দশায় সাহিত্য কাব্য জ্যোতিষ অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতির আলোচনা করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিতে থাকিবে।

আহা! যখন ভারতমাতার সঙ্গীত তরু পুনর্জ্জীবিত হইয়া স্বর্গলোক-প্রিয় পারিজাত কুসুম নিচয়ে শোভিত হইবে, তাহাদের অপরিসীম সৌরভে যেদিন সমস্ত পৃথিবী আমোদিত করিবে, আর যেদিন সেই ত্রিভুবন মোহন সৌরভে মোহিত হইয়া ইটালি, ফ্রান্স, জরমনি, প্রভৃতি দেশবাসী সঙ্গীত-অনুরাগী অলিকুল ভারত-সঙ্গীত-তরু মূলে আকর্ষিত হইবে, সেই শুভদিনে ভারতবাসীরা যে কি অপার আনন্দনীরে মগ্ন হইবেন, তাহা ব্যক্ত করিতে লেখনী অসমর্থ হইতেছে।

শ্রীগঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়।

গুরু পাঠশালার উৎকর্ষ বিধান।

এ দেশীয় গুরুমহাশয়েরা এক্ষণে যেরূপে শিক্ষা দিয়া থাকেন, কিরূপে তাহার উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে তদ্বিষয়ক রচনা।

এক্ষণে দেশীয় গুরুমহাশয়েরা বালকদিগকে যেরূপে শিক্ষা দিতেছেন, তাহার উৎকর্ষ সাধন বিষয়ে নিম্নলিখিত উপায়গুলি প্রশস্ত। প্রথম, উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ। দ্বিতীয়, বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর পরিবর্ত্তন। তৃতীয়, এক্ষণে যে ২ বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহার আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন।

১ম। উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ।

অন্যান্য সকল কার্য্য অপেক্ষা শিক্ষকের কার্য্য অতি দুরূহ। কিঞ্চিৎ লেখাপড়া জানিলেই শিক্ষকতা করা যায় না। একজন উপযুক্ত ও সুবিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইয়া যেরূপ উপকার দর্শে, যে সে ব্যক্তি দ্বারা উহা সম্পাদন করিবার উপকার হওয়া দূরে থাকুক, তদপেক্ষা দশ গুণ অপকার সংঘটিত হয়। শিক্ষকের উপদেশ ও তাহার দৃষ্টান্তানুসারে বালকদিগকে কার্য্য করিতে হইলে শিক্ষকের উপদেশ ও তাঁহার ব্যবহারানুসারে বালকেরাও সৎ বা অসৎ হইয়া পড়ে।

এক্ষণে আমরা যেরূপ শিক্ষাকার্য্যের বিষয়ে এই প্রস্তাব লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহা আরও গুরুতর। অধিকবয়স্ক শিক্ষিত বালকদিগের অপেক্ষা যে সকল সুকুমারমতি বালকগণ প্রথমে বিদ্যারম্ভ করে, তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া অতি সুকঠিন কার্য্য। তাহাদের মনঃক্ষেত্র তৎকালে এরূপ আর্দ্র থাকে যে তখন তাহাতে যে কোন প্রকার বীজ বপন করা যায় তাহাই শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়। এবং উহা ক্রমে ২ এত সুদৃঢ় হইতে থাকে যে পরে উহার মূলোৎপাটন করা অতিশয় কঠিন হইয়া পড়ে। সে সময়ে তাহাদের মন যেদিকে ফিরান যায় সেই দিগেই ফিরে। যাহা শিখান যায় তাহাই শিখে। বালকদিগের তৎকালীন শিক্ষাদির উপরেই উহাদের ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখ নির্ভর করে। তখন যাহার যেরূপ স্বভাব হইয়া পড়ে বয়োবৃদ্ধি অনুসারে সেই স্বভাবেরই বৃদ্ধি হইতে থাকে। এবং সময়ে উহা অসীম দুঃখ বা অনির্ব্বচনীয় সুখের কারণ হইয়া উঠে। যে বালক বাল্যাবস্থা হইতে সৎ শিক্ষা ও সদুপদেশ পাইয়া আইসে, সে কখনই বড় হইয়া অসৎ বা দুশ্চরিত্র হয় না। আর যাহারা বাল্যকাল হইতে অসদুপদেশ প্রাপ্ত ও অসৎ দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া আইসে, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহারা কদাচ সচ্চরিত্র হয় না। অতএব যে সকল ব্যক্তি বালকদিগকে প্রথম বিদ্যারম্ভ কালে শিক্ষা প্রদানে নিযুক্ত হন, তাঁহারা অতি গুরুতর ভার স্কন্ধে গ্রহণ করেন।

শিশুগণকে সর্ব্বদাই মাতার নিকটে থাকিতে হয়। তাহাদের অধিকাংশ সময় মাতৃ-সংসর্গে অতিবাহিত হয়। সুতরাং মাতা শিক্ষিতা হইলে বালকেরা প্রথম হইতেই সৎশিক্ষা ও সদুপদেশ প্রাপ্ত হইতে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদিগের দেশে মাতা শিক্ষিত হওয়া দূরে থাকুক, অনেক পিতাকেও অভিধান খুলিয়া শিক্ষা শব্দের অর্থ দেখিতে হয়। এমন অবস্থায় গুরুমহাশয়ের পাঠশালাই আমাদের বালকদিগের একমাত্র শিক্ষাস্থল। এক্ষণে যে সকল গুরুমহাশয়দিগের উপরে আমরা বালকগণের ভবিষ্যৎ সুখ-দুঃখের ভার নিক্ষেপ করিতেছি, তাঁহারা কি প্রকার ধাতুর লোক এবং কি প্রকার শিক্ষা প্রদান করেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যাঁহারা কোন কার্য্যেরই হইলেন না, তাঁহারা অবশেষে এক পাঠশালা খুলিয়া বসেন। কিন্তু তাঁহারা কি গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন, তাহা একবারও বিবেচনা করেন না। বালকেরা প্রথম হইতেই তামাক, সুপারি, ও দুই একটা পয়সা পিতামাতাকে গোপন করিয়া আনিয়া দিয়া গুরু মহাশয়ের মন রক্ষা করিতে থাকে। সেই সময় হইতেই তাহারা চুরি ও মিথ্যা কথা শিখিতে আরম্ভ করে। গুরুমহাশয়ও নিজ শিক্ষানুসারে বালকগণকে শিক্ষা দিয়া, যে কোন প্রকারে কিঞ্চিৎ পয়সার পন্থা দেখিতে থাকেন। মধ্যে ২ বেত্র হস্তে যেরূপ শিক্ষা দেন, তাহা বালকেরা আজীবন বিস্মৃত হইতে পারে না। বনের ব্যাঘ্র ভল্লুক অপেক্ষাও বালকেরা গুরুমহাশয়কে অধিক ভয় করে। এমন কি পাঠশালার বালকগণকে ভয় দেখাইবার আবশ্যক হইলে "ঐ গুরুমহাশয় আসিতেছে" এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হয়। হাপা জুজুর আবশ্যক হয় না। এই ত বর্ত্তমান গুরুমহাশয়দিগের অবস্থা। এই সকল ব্যক্তিদ্বারা সুকুমারমতি বালকগণের যেরূপ শিক্ষা হইতে পারে তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন।

এক্ষণে যে উপায় অবলম্বন করিলে এই সকল অনিষ্ট নিবারণ হইয়া বালকগণের যথার্থ শিক্ষা হয়, তদ্বিষয়ে বিবেচনা করা উচিত। সার্কেল পণ্ডিতদিগের যেরূপ পরীক্ষা দিয়া কার্য্য করিতে হয়, গুরুমহাশয়দিগের মধ্যেও সেই প্রকার একটী পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম করা উচিত। যাঁহারা পরীক্ষা দিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহাদিগকেই গুরুমহাশয় মনোনীত করা যাইবে। যে-সে ব্যক্তি গুরুমহাশয় হইতে পারিবেন না। সার্কেল পণ্ডিতদিগের যেরূপ বেতনের নিয়ম আছে ইঁহাদিগেরও সেইরূপ একটী নিয়ম করিতে হইবে। বেতন অন্ততঃ ৮ টাকার ন্যূন হইলে ভাল লোক পাওয়া যাইবে না। এতদপেক্ষা বেতন ন্যূন হইলে বালকদিগের নিকট হইতে পয়সা ও সিধা প্রভৃতি লইবার যে রীতি আছে, তাহার লোপ হইবে না। এক্ষণে কথা হইতেছে বর্ত্তমান গুরুমহাশয়েরা এরূপ নিয়মে সম্মত হইবেন কি না? ইহার উত্তর স্থলে এই মাত্র বক্তব্য যে, উক্ত দলের মধ্যে যাঁহারা নিতান্ত 'গুরুমহাশয়' তাঁহারা প্রস্থান করুন্। যাঁহারা কিঞ্চিৎ লেখাপড়া জানেন, তাঁহারা পরীক্ষা দিতে অসম্মত হইবেন না। তবে যাঁহারা প্রাচীন, কিঞ্চিৎ লেখাপড়াও জানেন এবং অনেকদিন অবধি ঐ কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগকে পরীক্ষা দিতে হইলে তাঁহারা অসন্তুষ্ট ও আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিবেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা উপযুক্ত ও প্রধান ব্যক্তিদিগের প্রশংসাপত্র প্রদর্শন করিতে পারিলে কর্ম্মপ্রাপ্ত হইবেন।

বৎসরে অন্ততঃ দুইবার বালকদিগের উন্নতির হিসাব দিতে হইবে। তাহা হইলে কেহ ফাঁকি দিতে পারিবে না। কার্য্যের নিমিত্ত দায়ী হইতে হইলে কোন মূর্খ ব্যক্তি উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইবে না। বালকদিগের উন্নতি অনুসারে উহাদিগের পুরস্কারের নিয়ম করিতে হইবে। নতুবা উহাদের নিজের কোন উন্নতির আশা না থাকিলে, বালকদিগের উন্নতি বিষয়ে উহাদের তত যত্ন থাকিবে না। উৎসাহদান ভিন্ন কোন উন্নতিরই আশা করা যায় না। সন্তুষ্ট চিত্তে কার্য্য করিলে উহা যে প্রকার সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা, বাধ্য হইয়া অসন্তুষ্ট চিত্তে কার্য্য করিলে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রত্যুত তাহাতে অনিষ্টই হইয়া থাকে। যে গ্রামে পাঠশালা হইবে উহা, তত্রত্য বা তন্নিকটবর্ত্তী যে কোন বিদ্যালয় থাকিবে, তাহার অধীন করিতে হইবে। ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের উপর উহার তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত হইবে। তিনি মধ্যে ২ উহার পরিদর্শন করিবেন। এইরূপ নিয়মে কার্য্য করিলে অনেকাংশে উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে। নতুবা বর্ত্তমান সময়ের গুরুমহাশয়দিগের দ্বারা প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন হইবে না।

২য়। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তন।

বর্ত্তমান সময়ের গুরুমহাশয়েরা যে রূপে শিক্ষা দিয়া থাকেন তদ্দ্বারা যথার্থ কার্য্য হইতেছে না। বরং উহাদ্বারা অনিষ্টই হইতেছে। প্রথমেই তালপত্রে বর্ণ লিখাইবার রীতি আছে। কিন্তু উহার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। বর্ণ পরিচয়ের পূর্ব্বে লিখাইয়া বর্ণ শিক্ষা করাইলে তাহাতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় বৃথা নষ্ট হয় মাত্র। কিঞ্চিৎ জ্ঞান যোগ হইলে এবং ভালরূপ অক্ষর পরিচয় হইলে পরে অক্ষর লিখিবার নিমিত্ত বড় ক্লেশ হয় না। বালকেরা আপনা আপনিই লিখিতে শিখে। যাহারা প্রথম হইতে ইংরাজি শিক্ষা করে, তাহাদিগকেও লিখাইয়া বর্ণ পরিচয় করাইতে হয় না। পরে কিঞ্চিৎ পড়া হইলে, এবং ভাল করিয়া বর্ণ পরিচয় হইলে, তাহারা কি অক্ষর লিখিতে অশক্ত হয়? তালপত্রের পরিবর্ত্তে সেলেটে এক একটী বর্ণের আকারাদি লিখাইয়া শিক্ষা দিয়াই উত্তম হইতে পারে। যে বর্ণের আকারাদি মনে দৃঢ় রূপে অঙ্কিত হয়, তাহা কাগজে বা সেলেটে অনায়াসে রাখা যাইতে পারে। এক্ষণে বর্ণ লিখাইয়া শিক্ষা করাইবার যে রীতি আছে, তদ্দ্বারা বৃথা পরিশ্রম ও বৃথা অধিক সময় নষ্ট হয় মাত্র। এমন স্থলে ইংরাজদিগের প্রথমে বর্ণ পরিচয়ের যে নিয়ম আছে তাহাই প্রশস্ত। সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিলে অল্প সময়ে এবং অনায়াসে কার্য্য সাধন হইতে পারে। তালপত্রের পরিবর্ত্তে সেলেটের ব্যবহারই এক্ষণকার ন্যায় সভ্য ও উন্নত সময়ে উপযুক্ত। বর্ণ পরিচয় করাইবার জন্য কার্ডের নিয়ম করাই শ্রেয়। এক এক খণ্ড কাগজে এক একটী অক্ষর বড় করিয়া লেখা থাকিবে। উহার চতুষ্পার্শ্বে নানা প্রকার চিত্র-বিচিত্র বা এক একটী পশুপক্ষীর ছবি থাকিবে। উহা দর্শন করিতে বালকগণের আনন্দ জন্মিবে এবং তৎসঙ্গেই তন্মধ্যস্থ অক্ষরটিও শিক্ষা হইবে। এরূপ নিয়ম করিলে অল্পকালের মধ্যে ও অনায়াসে শিশুগণের বর্ণপরিচয় হইবে। বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ সমাপ্ত হইলে যখন দ্বিতীয় ভাগ

আরম্ভ করা যাইবে, সেই সময় ছোট এবং সরল শব্দগুলি শ্লেটে লিখিয়া বানান করাইতে হইবে। তখন ঐ সকল বর্ণ উহারা আনায়াসে লিখিতে পারিবে।

অধিকবয়স্ক বালকদিগের অপেক্ষা অল্পবয়স্ক শিশুগণকে শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। যাহাতে তাহাদের মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে এরূপ করিতে হইবে। তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। নতুবা যাহা কিছু শিখান যাইবে তদ্দারা কোন কার্য্য হইবে না। শিক্ষক তাহাদের পক্ষে একটি ভয়ানক জিনিস হইয়া দাঁড়াইলে শিক্ষা কার্য্যের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত হইয়া উঠিবে। শিক্ষা দিবার সময় মধ্যে ২ তাহাদিগকে বিশ্রাম দিতে হইবে। মধ্যে ২ তাহাদের সহিত উপদেশ-পূর্ণ অথচ কৌতুকাবহ গল্পাদি করিতে হইবে। এমনকি প্রতি ঘণ্টায় অন্ততঃ ১০।১২ মিনিটকাল বিশ্রাম দিতে হইবে। তাহাদের নিকট অত্যন্ত গাম্ভীর্য্য প্রদর্শন করিলে হইবে না। কিন্তু কারণ উপস্থিত হইলে ভয় করে, এরূপ গাম্ভীর্য্য থাকা আবশ্যক। তাহাদের গায় হাত বুলাইয়া কার্য্য করিতে হইবে। অর্থাৎ যে কোন প্রকারেই হউক যাহাতে তাহাদের মন প্রফুল্ল থাকে এরূপ করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। অন্যথা তদ্দারা যথার্থ কার্য্য হইবে না। সর্ব্বদা সদুপদেশ দিতে হইবে। মধ্যে ২ তাহাদের গুণের পুরস্কার করিতে হইবে। কারণ, উৎসাহ-বারি ভিন্ন মনুষ্য হৃদয়ে কোন প্রকার উন্নতি সাধন হয় না। এই অবস্থা হইতে যত তাহাদের সুশিক্ষা ও সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, ততই তাহারা পরে মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সাধনে সাহসী হইবে। এই অবস্থার শিক্ষার উপরে তাহাদের ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখ নির্ভর করে। অতএব শৈশবাবস্থা হইতে বালকগণকে সৎপথাবলম্বী করা এবং সুশিক্ষা দেওয়া যে কতদূর কর্ত্তব্য, তাহা লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। এই সময় হইতে তাহাদের মন যে পথে ধাবিত হয়, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বিষয়ান্তরে তাহাদের সেই মন ফিরান দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। এ অবস্থায় অত্যন্ত সাবধানের সহিত তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। যিনি উপরোক্ত নিয়মানুসারে শিশুগণকে লওয়াইতে পারেন, তিনিই উপযুক্ত শিক্ষক এবং তাঁহার দ্বারাই যথার্থ উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে। নতুবা অধিক লেখাপড়া জানিলেই উত্তম শিক্ষক হওয়া যায় না। যাহারা উপরোক্ত নিয়মানুসারে শিক্ষা দিতে সক্ষম, তাহাদিগকে গুরুমহাশয় নির্ব্বাচিত করা উচিত। তাঁহারা শিশুগণকে শিখাইতে পারিবেন। নতুবা অজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করা, আর বালকদিগের পরিণাম নষ্ট করিয়া দেওয়া উভয়ই তুল্য। উপরে যেরূপ শিক্ষা-প্রণালীর নিয়মাদি বলা গেল তদনুসারে শিক্ষা দিলে বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর অনেকাংশে উৎকর্ষসাধন হইতে পারে। নতুবা বর্ত্তমান প্রণালী অনুসারে কার্য্য হইলে কখনই ইহার উন্নতি হইবে না বরং ইহাদ্বারা ক্রমশঃই অনিষ্টোৎপাদিত হইতে থাকিবে।

৩। এক্ষণে যে ২ বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহার আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন।

বাল্যকাল অভ্যাসের একটি প্রশস্ত সময়। এ সময়ে যাহা অভ্যাস করা যাইবে, যাবজ্জীবন তাহা হৃদয়ে গ্রথিত থাকিবে। এক্ষণকার সময় অতি মহামূল্য। এ সময় কথনই বৃথা নষ্ট করা যায় না। কিন্তু আমাদিগের শিক্ষাপ্রণালীর গুণে উহাদিগের সেই বহুমূল্য সময় বৃথা নষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সময় দ্বারা অন্যান্য অনেক কার্য্য করা যাইতে পারে। কতকগুলি অনাবশুক বিষয়ের শিক্ষা দিয়া অনেক সময় বৃথা নষ্ট করা হয়। ঐ সময় কোন ভাল বিষয়ের শিক্ষা দিলে যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। নামতার ন্যায় যে সকল বিষয়ের শিক্ষা করাইবার প্রণালী এক্ষণে বর্ত্তমান আছে, নিম্নলিখিত মতে তাহা পরিবর্ত্ত করিলে অনেক সময়ের লাঘব হইতে পারিবে অথচ তাহাতে কার্য্যহানি হইবে না। নামতা এবং শতকিয়া বর্ত্তমান প্রণালী অনুসারে শিক্ষা করান উচিত। কারণ, এই সময় অভ্যাসের সময়। এক্ষণে উহা মুখস্থ করিয়া রাখিলে পরিণামে অনেক সুবিধা হইবে এবং উহা না জানিলে পরে অত্যন্ত কষ্ট হইবে। এগুলি না জানিলে অঙ্ক শিক্ষা করিবার সময় অত্যন্ত অসুবিধা হইবে। ইহা না জানিলে পরে অঙ্ক কসা যাইবে না। এবং সে সময় ইহা অভ্যাস করিয়া লওয়া অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিবে। এই সকল কারণে নামতা ও শতকিয়া প্রথম হইতেই শিক্ষা করান উচিত। এতদ্ভিন্ন আর ২ গুলির শিক্ষা বিষয়ে এইরূপ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। কড়ানিয়া ও গণ্ডাকিয়া প্রভৃতির নিম্নলিখিত মত একটী তালিকা করিলেই সুবিধা হইবে। যথা—

৪ কড়া — ১ গণ্ডা
২০ গণ্ডা — ৵০ পণ
১৬ পণে — ১ কাহন

৫ গণ্ডা — ১ পাই
৪ পাই — ৵০ আনা
৪ আনা — ।০ সিকি
৪ সিকি — ১ টাকা

এই তালিকা অনুসারে কার্য্য করিলে অল্প সময়ের মধ্যে ও অল্পায়াসে কার্য্য হইতে পারিবে। তদ্ভিন্ন শুভঙ্করের যে কাগ, ক্রান্তির নিয়ম আছে, তৎপরিবর্ত্তে ভগ্নাংশের নিয়ম করিলে অনেক সুবিধা হইবে। অঙ্ক সূক্ষ্ম করিবার নিমিত্ত শুভঙ্কর ঐ এক একটী কাল্পনিক শব্দের সৃষ্টি করিয়াছিলেন মাত্র। যাহা হউক ভগ্নাংশের নিয়ম প্রবর্ত্তিত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কড়ানিয়া ও গণ্ডাকিয়া প্রভৃতি তালপত্রে লিখাইয়া এবং পড়াইয়া শিক্ষা করাইবার যে রীতি আছে তাহাতে অনেক সময় বৃথা নষ্ট হয় মাত্র। এক্ষণে যেরূপ প্রণালীর কথা বলা গেল, তদ্দ্বারা সমান কার্য্য হইবে, অথচ অল্প সময়ের মধ্যে হইবে। বোধোদয় আরম্ভ করিবার সময় হইতেই তেরিজ ও জমাখরচ ক্রমে ২ শিক্ষা করাইতে হইবে। গুণন ও ভাগহার প্রভৃতি বর্ত্তমান পাটীগণিতের নিয়মানুসারে কসাইতে হইবে। শুভঙ্করের যে সমস্ত অঙ্কাদি আছে তাহার অধিকাংশই ত্রৈরাশিকের নিয়ম হইতে সংগৃহীত। বালকেরা ত্রৈরাশিক শিক্ষা

করিলে শুভঙ্করের অঙ্কাদির নিয়ম অনায়াসে আপনা আপনিই বুঝিতে পারিবে। আমাদের সমাজ যেরূপ তাহাতে শুভঙ্করের নিয়মাদি না জানা থাকিলে সামান্য বিষয়ে অত্যন্ত অসুবিধা ঘটে। মনে কর ৫ টাকা করিয়া কোন দ্রব্যের মণ, বিক্রীত হইতেছে তাহার ॥০ সেরের মূল্য স্থির করিতে হইলে শুভঙ্করের নিয়ম যেরূপ সহজ বোধ হয়, ত্রৈরাশিক সেরূপ নহে। শুভঙ্করের মতানুসারে যত টাকা মণের মূল্য হইবে এক সেরের মূল্য প্রত্যেক টাকার ৮ গণ্ডা ধরিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই,—১ টাকা=৩২০ গণ্ডা, ১ মণ=৪০ সের। তাহা হইলে এক সেরের মূল্য ৩২০-এর ৪০ ভাগ ৮ গণ্ডা হইবে। ত্রৈরাশিক জানিলে ইহার যুক্তি অনায়াসেই বুঝা যাইবে। তখন ঐ সকল নিয়ম শিক্ষা করিবার নিমিত্ত অধিক আয়াস পাইতে হইবে না। একবার মাত্র দেখিলেই শিখিতে পারিবে। শুভঙ্কর যে সময়ে ঐ সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন তখন উহা শোভা পাইয়াছে। কিন্তু এখন সে কাল নাই। এক্ষণে সকল বিষয়েরই উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। এবং সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইতেছে, এক্ষণকার সমাজে শুভঙ্কর আর প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন না। এক্ষণে অনেকে বি. এ. পরীক্ষা দিয়া ২০।২৫ টাকার কর্ম্মের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে ত্রুটি করিতেছেন না। বোধ হয় ১০ বৎসর পরে এল.এ. ও বি.এ.-রাও গুরুমহাশয়গিরি করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না। যাহা হউক, যখন দেখা যাইবে যে উহারা গুরুমহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়াছেন তখন জান যাইবে যে আমাদিগের ভারতবর্ষের সৌভাগ্য সূর্য্য উদয় হইয়াছে। অলমিতিবিস্তরেণ।

২৮এ মার্চ্চ
১৮৬৯ খৃঃ অব্দ

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
রাজপুর ইংরাজি সংস্কৃত বিদ্যালয়

১৭৯০ শকের হিন্দুমেলার আয়-ব্যয় বিবরণ।

আয়।

গত বৎসরের তহবিল মজুত	...	৮৶১০
শ্রীযুক্ত বাবু স্বরেন্দ্রনাথ মিত্র	...	৩
" " কুমারকৃষ্ণ মিত্র	...	২
" " নিমচাঁদ মৈত্র	...	২
" " আনন্দচন্দ্র দাস	...	২
" " রাজনারায়ণ বসু	...	২
" " মাধবচন্দ্র রুদ্র	...	৫
" " ব্রজবন্ধু মল্লিক	...	২৫
" " রাজেন্দ্র মল্লিক (রায়বাহাদুর)	...	৫০
" " বেণীমাধব বসু	...	১০
" " মুরারি গুপ্ত	...	২
" " কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১
" " দুর্গাচরণ লাহা	...	২৫
" " শ্রীনাথ দাস	...	৫
" " নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১৫
" " যদুনাথ দে	...	২
" " পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়	...	১০
" " সাগরলাল দত্ত	...	৫
" " মধুসূদন সরকার	...	১০
" " শ্রীনাথ রায়	...	১৫
" " তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১০
" " ব্রজলাল মিত্র	...	১
" " গিরিশচন্দ্র শর্ম্মা	...	১
		২১১৸১০
শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল ভট্টাচার্য্য	...	৫
" " সারদাপ্রসাদ রায়	...	১
" " রমানাথ ঠাকুর	...	৫০
" " হরলাল রায়	...	১

"	"	গিরিশ্চন্দ্র দেব	...	২
"	"	সারদাপ্রসাদ সেন	...	১
"	"	যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	...	১
"	"	অভয়াচরণ গুহ	...	২৫
"	"	প্রাণকৃষ্ণ শীল	...	১
"	"	মুরারিচরণ সেন	...	১
"	"	বিনোদীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১
"	"	যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর	...	৫০
"	"	ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র	...	২
"	"	ভোলানাথ দত্ত	...	২
"	"	প্রসাদদাস দত্ত	...	৫
"	"	খেলচন্দ্র ঘোষ	...	২৫
"	"	হৃষীকেশ মল্লিক	...	২৫
"	"	নন্দলাল মল্লিক	...	২৫
"	"	শ্যামাচরণ বিশ্বাস	...	২
"	"	হীরালাল শীল	...	২৫
"	"	অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	১০
"	"	নগেন্দ্রলাল বসু	...	২
"	"	গৌরদাস বসাক	...	৫
"	"	রমেশচন্দ্র মিত্র	...	৫
"	"	মহেশ্চন্দ্র চৌধুরী	...	৩
				৪৮৬৸/১০
শ্রীযুক্ত	বাবু	ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২
"	"	বৃন্দাবন বসু	...	৮
"	"	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১০০
"	"	আন্তচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২
"	"	মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত	...	১
"	"	কাশীশ্বর মিত্র	...	২
"	"	শালগেরাম খাঁনা	...	১
"	"	কুঞ্জলাল মিত্র	...	১
"	"	বিপিনবিহারী বসু	...	২
"	"	অতীন্দ্রনন্দন ঠাকুর	...	১০
"	"	কিশোরীচরণ চক্রবর্ত্তী	...	১

” ”	গোপাললাল ঠাকুর	...	৫০
” ”	ঠাকুরদাস বসু	...	৫
” ”	রামচাঁদ ক্ষেত্রী	...	৫
” ”	হরিনাথ দত্ত	...	১
” ”	নন্দলাল জহুরী	...	১
” ”	শ্যামাচরণ সেনগুপ্ত	...	১
” ”	ভবানীচরণ দত্ত	..	১
” ”	শিবচন্দ্র দেব	..	১০
” ”	রামেশ্বর বসু	...	৫
” ”	অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	১
” ”	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৫
” ”	হরনাথ ঠাকুর	...	১
” ”	যদুমণি মিত্র	...	২
” ”	শিবচন্দ্র বসু	...	১
			৭০৫৮/১০
” ”	রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেববাহাদুর	...	২৫
শ্রীযুক্ত বাবু	বেণীমাধব ঘোষ	...	১
” ”	শম্ভুচন্দ্র কর	...	১
” ”	কৃষ্ণদয়াল রায়	...	২
” ”	বিনোদবিহারী মিত্র	...	১
” ”	বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়	...	১
” ”	দ্বারকানাথ ঘোষ	...	৫
” ”	কালীপ্রসন্ন ঘোষ	...	৫০
” ”	রাজনারায়ণ মিত্র	...	৩
” ”	চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায়	...	১০
” ”	দীননাথ বসু	...	৫
” ”	অবিনাশচন্দ্র মল্লিক	...	১
” ”	মুরারিধর সেন	...	৮
” ”	রাজকুমার চক্রবর্ত্তী	...	১
” ”	বেণীমাধব ঘোষ	...	২
” ”	দ্বারকানাথ বিশ্বাস	...	২৫
” ”	নন্দলাল পাল	...	৫
” ”	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	...	২

”	”	বলরাম দাসবর্ম্মণ	...	২৫
”	”	পৃথ্বীনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	৫
”	”	বরদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	...	১
”	”	শ্রীনাথ মিত্র	...	১
”	”	গোপালচন্দ্র সেন	...	১
”	”	রামচন্দ্র মিত্র	...	৪
”	”	উপেন্দ্রনাথ বসু	...	১
				৮৯১৸/১০
শ্রীযুক্ত	বাবু	উমাচরণ ভদ্র	...	২
”	”	গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	২
”	”	রাজকৃষ্ণ বসু	...	১
”	”	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	...	৫
”	”	কাশীনাথ দত্ত	...	৪
”	”	তারণকৃষ্ণ দেব	...	১
”	”	কার্ত্তিকলাল মিত্র	...	১
”	”	ক্ষেত্রমোহন রায়চৌধুরী	...	১
”	”	সুরেশচন্দ্র মিত্র	...	১
”	”	হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	...	১
”	”	উদ্ধবচন্দ্র মল্লিক	...	৫
”	”	দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়	...	১
”	”	আনন্দচন্দ্র বসু	...	১
”	”	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১
”	”	রসিকলাল পাইন	...	২
”	”	অমৃতকৃষ্ণ বসু	...	৫
”	”	ব্রজেন্দ্রনাথ রায়	...	১
”	”	শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১
”	”	যাদবচন্দ্র রায়	...	১
”	”	যোগেন্দ্রনাথ রায়	...	১
”	”	নীলমণি চট্টোপাধ্যায়	...	১
”	”	গোপালচন্দ্র ঘোষ	...	১
”	”	গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	...	২
”	”	নীলমাধব মিত্র	...	২
”	”	প্রিয়নাথ দত্ত	...	৫

৯৪০৮/১০

শ্রীযুক্ত বাবু	জয়কৃষ্ণ দত্ত	...	১
” ”	শ্যামলাল পাল	...	৮
” ”	শ্যামচাঁদ মিত্র	...	৫
” ”	শ্যামাচরণ শ্রীমাণি	...	২
” ”	ত্রিগুণাচরণ বসু	...	১
” ”	দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়	...	১
” ”	উমানাথ চট্টোপাধ্যায়	...	১
” ”	এম্ এন্ মিত্র	...	১
” ”	রসিকলাল দত্ত	...	২
” ”	মহেন্দ্রনাথ বসু	...	১
” ”	হরমোহন চট্টোপাধ্যায়	...	২
” ”	বৈদ্যনাথ বসু	...	১
” ”	হেমচন্দ্র দত্ত	...	১০
” ”	ভোলানাথ পাল	...	১
” ”	যদুনাথ মল্লিক	...	১০
” ”	নবীনচন্দ্র দেব	...	৫
” ”	দীননাথ ঘোষ	...	৬
” ”	উপেন্দ্রনাথ সরকার	...	১
” ”	নীলমণি মিত্র	...	২
” ”	নীলমাধব মিত্র	...	৫
” ”	ভোলানাথ লাহিড়ী	...	২
” ”	প্রতাপচন্দ্র মল্লিক	...	২
” ”	বলাইচাঁদ সিংহ	...	১০
” ”	এক বন্ধু (হিন্দু স্কুল)	...	১
” ”	মনীন্দ্রমোহন ঘোষ	...	১০

১০৩১৮/১০

শ্রীযুক্ত বাবু	তারকচন্দ্র সরকার	...	১০
” ”	নন্দলাল মিত্র	...	৪
” ”	অভয়াচরণ বসু	...	২
” ”	রাখালচন্দ্র মিত্র	...	২
” ”	লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র	...	১
” ”	নীলমাধব মুখোপাধ্যায়	...	৫

”	”	প্রসন্নকুমার মিত্র	...	৮
”	”	যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	১
”	”	তুলসীদাস মল্লিক	...	৫
”	”	ঘোষ পরিবার	...	২০
”	”	ক্ষেত্রমোহন মিত্র	...	৫
”	”	জয়গোপাল মিত্র	...	৫
”	”	ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল	...	৫
”	”	হরীশচন্দ্র বসু	...	১
”	”	গুঃ মহেন্দ্রনাথ দত্ত, কয়েক ব্যক্তির দান	...	৭
”	”	আশুতোষ ধর	...	১
”	”	নবীনচন্দ্র বড়াল	...	২
”	”	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	..	২
”	”	যোগেশচন্দ্র মজুমদার	...	১
”	”	কালীকৃষ্ণ প্রামাণিক	...	২০
”	”	অম্বিকাচরণ ঘোষ	...	১
”	”	প্যারীচরণ সরকার	...	২০
”	”	দীননাথ চট্টোপাধ্যায়	...	১
”	”	গোকুলনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	৫
”	”	হরিমোহন নন্দী	...	১
				১১৬৬৸/১০
শ্রীযুক্ত	বাবু	বেণীমাধব রুদ্র	...	৫
”	”	নীলকমল মিত্র	...	১০০
”	”	মাধবচন্দ্র সেন	...	২
”	”	শ্যামাচরণ বসু	...	২
”	”	নন্দলাল বসু	...	১
”	”	দিগম্বর মিত্র	...	২৫
”	”	তারকনাথ দত্ত	...	৫
”	”	জয়কৃষ্ণ বসু	...	২
”	”	শ্যামলাল মিত্র	...	২
”	”	দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়	...	১
”	”	নবীনচন্দ্র যে	...	১
”	”	কেদারনাথ ঘোষ	...	১
”	”	দ্বারিকানাথ বসাক	...	১

” ”	বিশ্বম্ভর চট্টোপাধ্যায়	...	১
” ”	জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১
” ”	অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১
” ”	নীলকমল দাস	...	৫
” ”	ক্ষেত্রমোহন ঘোষ	...	২
” ”	বিনায়কচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	২
” ”	রমানাথ পালিত	...	৫
” ”	কালিদাস শীল	...	২
” ”	তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়	...	১
” ”	প্রসাদদাস মল্লিক	...	৫
” ”	গোপালচন্দ্র মল্লিক	...	১
” ”	জয়গোপাল সেন	...	১০
			১৩৫০৶/১০
শ্রীযুক্ত বাবু	বেণী মাধব সেন	...	২৫
” ”	শম্ভু নাথ মল্লিক	...	৫
” ”	নীল মাধব হালদার	...	২
” ”	গুঃ নীলকমল মুখোপাধ্যায় বিরাহামপুরের ও সাহাজাদপুর দিগরের নানা ব্যক্তির দান	...	৬৪
” ”	পঞ্চানন মিত্র	...	২
” ”	বেণী মাধব মজুমদার	...	১০
” ”	চণ্ডীচরণ সিংহ	...	১০
” ”	প্রাণ নাথ বসু	...	৫
” ”	ঈশান চন্দ্র দত্ত	...	৫
” ”	রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৫
” ”	পূর্ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	২
” ”	শ্যামলাল দত্ত	...	৮
” ”	অক্ষয়কুমার মজুমদার	...	৫
” ”	তিনকড়ি গুপ্ত	...	১
” ”	অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়	...	১৬
” ”	যজ্ঞেশ প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	...	২০
” ”	গোপাল লাল মিত্র	...	৫
” ”	গণেন্দ্র নাথ ঠাকুর	...	১০০

„	„	নীলকমল মুখোপাধ্যায়	...	২৫
„	„	যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী	...	৫
„	„	জানকী নাথ ঘোষাল	...	৫
„	„	কালীকিঙ্কর মিত্র	...	১
				১৬৭৬৵১০
শ্রীযুক্ত বাবু		জগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	৩
„	„	মহেন্দ্রলাল দে	...	৮
„	„	রমানাথ লাহা	...	৫
„	„	প্রসাদদাস মল্লিক	...	৩
„	„	কালীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২
„	„	আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	১
„	„	ভোলানাথ রায়	..	২
„	„	ভূতনাথ রায়	...	২
„	„	নীলমণি ঘোষ	...	১
„	„	নীলরত্ন ঘোষাল	...	১
„	„	বিশ্বনাথ মজুমদার	...	১
„	„	বেচুলাল শুক্ল	...	১
„	„	উমাচরণ রায়	...	১
„	„	দুর্গাপ্রসাদ	...	১
„	„	কেদার নাথ	...	১
„	„	সিদ্ধেশ্বর বসাক	...	১
„	„	প্রসাদ দাস দত্ত	...	৫
„	„	শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়	...	১
„	„	নবগোপাল মিত্র	...	১২
„	„	তারাবল্লভ চট্টোপাধ্যায়	...	২
„	„	অখিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	১
„	„	রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর	...	৫০
„	„	যোগেন্দ্রকৃষ্ণ দেব	...	৪
„	„	অনন্তকৃষ্ণ বসু	...	৪
„	„	বেণীমাধব ছত্রী	...	১
„	„	রাধারমণ রায়	...	৪
				১৭৯৪৵১০
শ্রীযুক্ত বাবু		দেবেন্দ্রচন্দ্র দেব দে	...	১

„ „	যোগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র	...	১
„ „	আনন্দমোহন বসু	...	৩
„ „	তারকনাথ দত্ত	...	৫
„ „	মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৮
„ „	শারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	...	৪
„ „	কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য	...	৫
„ „	শ্রীনাথ দত্ত	...	১
„ „	যাদবচন্দ্র শীল	...	২
„ „	অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ	...	২
„ „	উমাপ্রসাদ ঘোষ	...	২
„ „	বেণীমাধব কর	...	১
„ „	প্রসন্নকুমার বিশ্বাস	...	২
„ „	মহেন্দ্রনাথ সোম	...	২
„ „	রাজা কালীকুমার মল্লিক	...	৩
„ „	গিরীশচন্দ্র চৌধুরী	...	১
„ „	বৈদ্যনাথ মল্লিক	...	১
„ „	কার্ত্তিকচরণ মল্লিক	...	১
„ „	গঙ্গানারায়ণ মল্লিক	...	২
„ „	নীলমাধব মুখোপাধ্যায়	...	৪
„ „	তুলসীদাস আঢ্য	...	২
„ „	ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	..	১
			১৮৪৮৶১০
শ্রীযুক্ত বাবু	শিবচন্দ্র বসাক	...	১
„ „	অনন্তরাম ধর	...	১
„ „	গোপালচন্দ্র আঢ্য	...	১
„ „	মহেন্দ্রনাথ কর	...	১
„ „	ব্রজবন্ধু আঢ্য	...	১
„ „	হরিমোহন পাইন	..	১
„ „	পূর্ণচন্দ্র মিত্র	...	১
„ „	হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১
„ „	গোপাললাল আঢ্য	...	২
„ „	দীননাথ মুখোপাধ্যায়	...	১
„ „	চন্দ্রমোহন ধর	...	১

„	„	গোপালচন্দ্র বসাক	…	১
„	„	কানাইলাল পাইন	…	১
„	„	গোপালচন্দ্র দে	…	১
„	„	বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়	…	১
„	„	গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	…	১
„	„	হরিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	…	১
„	„	ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	…	১
„	„	কৃষ্ণদাস লাহা	…	২
„	„	দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক	…	১
„	„	নীলমাধব সেট	…	১
„	„	গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	…	১
„	„	দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়	…	২
„	„	বাদলচন্দ্র দত্ত	…	৪
				১৮৭৮৶১০
শ্রীযুক্ত	বাবু	ভূমেশচন্দ্র বসু	…	১
„	„	নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	…	১
„	„	রাজেন্দ্রনাথ সেট	…	২
„	„	কেদারনাথ সেন	…	২
„	„	কার্ত্তিকচরণ সেন	…	১
„	„	মথুরানাথ মুখোপাধ্যায়	…	১
„	„	সুবলদাস সেন	…	২
„	„	রাধাগোবিন্দ বসাক	…	২
„	„	বদনচাঁদ সেট	…	১
„	„	কেদারনাথ দত্ত	…	২
„	„	কানাইলাল মল্লিক	…	১
„	„	কিশোরীলাল পাইন	…	২
„	„	জয়গোপাল সেট	…	২
„	„	গোপালদাস সেট	…	১
„	„	পূর্ণচন্দ্র বসাক	…	১
„	„	বৈষ্ণবদাস আঢ্য	…	২
„	„	সূর্য্যমোহন দত্ত	…	১
„	„	গোপাল চন্দ্র বসাক	…	২
„	„	নকুড় দাস মল্লিক	…	২

„ „	শিবকৃষ্ণ দাঁ	...	৫
„ „	হরি মোহন বসু	...	১
„ „	নকুড় চন্দ্র বসু	...	১
„ „	দ্বারকা নাথ বসু	...	৪
„ „	গিরিশ্চন্দ্র ঘোষ	...	৪
			১৯২২৶/১০
শ্রীযুক্ত বাবু	রাম দয়াল দে	...	১
„ „	বৈকুণ্ঠ নাথ সেন	...	৫
„ „	দেবেন্দ্র নাথ দত্ত	...	৪
„ „	মহেন্দ্র লাল চন্দ্র	...	১
„ „	গঙ্গাধর লাহিড়ি	...	৫
„ „	দীন নাথ সেট	...	১
„ „	ঠাকুর লাল মল্লিক	...	১
„ „	যদুনাথ ঘোষ	..	২
„ „	অক্ষয় কুমার শীল	..	৫
„ „	মোহন লাল ক্ষেত্রী	...	২
„ „	চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	...	২
„ „	রামকৃষ্ণ দালাল	...	২
„ „	কানাই লাল দে	...	১
„ „	মাধব কৃষ্ণ সেট	...	৫
„ „	রসিক লাল মল্লিক	...	১
„ „	যাদব চন্দ্র শীল	.	১
„ „	শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	১
„ „	জগৎ রাম চট্টোপাধ্যায়	...	৫
„ „	গিরিশচন্দ্র মিত্র	...	১
„ „	বলাই চাঁদ দত্ত ও		
„ „	রাজ কৃষ্ণ মল্লিক	...	১০
„ „	প্যারীলাল মল্লিক	...	৮
„ „	দেবী চরণ পাল	...	২
„ „	কানাই লাল মল্লিক	...	১
			১৯৮৯৶/১০
শ্রীযুক্ত বাবু	যুগোল কিশর বিলাসীরাম	...	৫
„ „	শ্রীনাথ চন্দ্র	...	২

„	„	শ্যামল ধন দত্ত	...	৩
„	„	ক্ষেত্র মোহন রায়	...	২
„	„	সিদ্ধেশ্বর মল্লিক	...	১
„	„	ব্রজনাথ পাইন	...	১
„	„	উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	১
„	„	জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১
„	„	রাখাল রাজ বড়াল	...	১
„	„	গণেস্থ বাবু	...	১
„	„	ক খ গ	...	১
„	„	চৈশরূপ ছোটেলাল	...	১
„	„	যজ্ঞেশ্বর হালদার	...	২
„	„	ভৈরব চন্দ্র আঢ্য	...	৫
„	„	কানাই লাল মল্লিক	...	২
„	„	নারায়ণ চাঁদ ধর	...	২
„	„	নীলমণি আঢ্য	...	১
„	„	রাসবিহারী আঢ্য	...	২
„	„	নিমাই চরণ মল্লিক	...	৫
„	„	দেবেন্দ্র নাথ দত্ত	...	১
„	„	শিবরতনপুরী গোঁসাই	...	৫
„	„	অপূর্ব্বকৃষ্ণ সেট	...	১
„	„	হরিদাস বসাক	...	১
				২০৩৬৮/১০

শ্রীযুক্তবাবু		হরিমোহন শীল ও কজিন	...	৪
„	„	নৃসিংহ দাস শীল	...	৪
„	„	কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২
„	„	ঠাকুরদাস সেন	....	১
„	„	মদনমোহন সেন	...	২
„	„	নবীনচন্দ্র বড়াল	...	৩
„	„	জহরলাল দত্ত	...	৩
„	„	জিতলাল দত্ত	...	১
„	„	কেশবলাল পাইন	...	১
„	„	বেণীমাধব দে	...	১

,, ,, রমানাথ আঢ্য	...	১
,, ,, হরিবল্লভ বসু	...	৫
,, ,, গুঃ নবগোপাল মিত্র		
নানা ব্যক্তির দান	...	৯
		২০৭৩ ৸৵১০

চাঁদা আদায়	২০৬৫
বাঁশ ও দরমা বিক্রয়	১৫
পুস্তক বিক্রয়	৩
গত বছরের মজুত	৮ ৸৵১০
গচ্ছিত	১৬৮ ৶১৫
	২২৬০ ৴৫

কতকগুলিন দান অনাদায় প্রযুক্ত শ্রীযুক্তবাবু ব্রজনাথ দেবের হিসাব এ বৎসর প্রকাশ হইল না।

ব্যয়

বাগান পরিষ্কার মেরামতি ও বাঁশ দরমা প্রভৃতি ক্রয়	২৬১ ৴১০
কর্ম্মচারিদিগের বেতন ও টাকা আদায়ের কমিসন	১৯৪৷৴০
বিবিধ খরচ	৭৪।৵৫
সমবেত বাদ্যকর, পণ্ডিতগণ, ব্যায়াম-প্রদর্শনকারিদিগের ও মেলার নানা প্রকার কার্য্যের জন্য গাড়ীভাড়া	১৪৫৷০
তাম্বুর ভাড়া ও তাহার সমুদায় ব্যয়	১২২৷০
বোট ভাড়া	২৬
ডাক মাস্থল	১৷৴১০
চৌকি ও টেবিলের ভাড়া	১৯
দ্রব্যাদি প্রদর্শনের মাচায় মুড়িবার জন্য থান কাপড়ের ভাড়া	৫৫
নহবতখানা গেট ও বাউয়ার তৈয়ারির জন্য ব্যয়	১১৫
ঠিকা দ্বারবান ও বেহারাদিগের বেতন ও খোরাকি	৪৩ ৵৫
কাগজ ও বিবিধ দ্রব্যাদি ক্রয়	১৩।৵১০
১৭৮৯ শকের মেলার পুস্তক ছাপার ব্যয়	৫৫ ৵১৫
বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ছাপার ব্যয়	১০৫৷০
বেঞ্চ, চৌকি প্রভৃতি দ্রব্যাদি বাগানে লইয়া যাইবার ও আনিবার ব্যয়	৮৪৷৴০
	১৩১৬৷১৫

জের	১৩১৬৷১৫
মেলা সম্বন্ধে প্রস্তাব-লেখকদিগের পুরস্কার	৩০৬
মহিলাদিগের পুরস্কার প্রভৃতি	২৯৭
লক্ষ্ণৌ বেণুওয়ালাদিগের পুরস্কার	৫০
গায়ক ও বাদ্যকরদিগের পুরস্কার	২৪
পাইকদিগের পুরস্কার	৩০
কুস্তিওয়ালাদিগের পুরস্কার	২০
শিল্পনৈপুণ্যের জন্য পুরস্কার	৬
ঐ জন্য কারপেটের পেটেণ্ট	২৭
ঐ জন্য মেডেল তৈয়ারির হিসাবে ব্যয়	১৫
স্বরপুরা বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মাণের ব্যয়	৮
বাজিওলাদিগের পুরস্কার	৮
ইলেক্‌ট্রীক্ জন্য পুরস্কার	৮
পুলিষ প্রহরীদিগের পুরস্কার	৩৮

বেণীসংহার নাটকের অভিনয়	
জন্য নানাপ্রকার ব্যয়	৬৩
কেমিকেল্ এক্‌সপেরিমেণ্টের জন্য ব্যয়	৪০
ফোয়ারার জন্য ব্যয়	৩৷০
	২২৬০ ৻১৫
আয়	২২৬০ /৫
ব্যয়	২২৬০ ৻১৫
মজুত	৻১০

শ্রীনবগোপাল মিত্র।
সহকারি সম্পাদক।

চতুর্থ বর্ষের কার্যবিবরণ

চতুর্থ বর্ষের কার্যবিবরণটি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। এই কার্যবিবরণের বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য হইল সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষণ।

ইহা ভিন্ন যে-সকল প্রবন্ধ পঠিত ও গান গীত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা কার্যবিবরণে মুদ্রিত করা হয় নাই।

কার্যবিবরণের শেষে '১৭৯১ শকের হিন্দু মেলার আয় ব্যয় বিবরণ' মুদ্রিত হয়।

চতুর্থ বর্ষের কার্যবিবরণ এযাবৎ আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে ছিল। সম্প্রতি কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত একত্রে বাঁধানো কয়েকটি পুস্তিকা সংকলন হইতে উদ্ধার করিয়া এখানে পুনর্মুদ্রণ করা গেল। প্রাপ্ত কার্যবিবরণটি স্থানে স্থানে কীটদষ্ট। সকল স্থানে পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। হিন্দু মেলার কার্যবিবরণটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭। ডিমাই সাইজ। ইহার টাইটেল পৃষ্ঠাটি নাই।

হিন্দুমেলা ॥

১৭৯১ শক।

বর্ত্তমান বর্ষের মেলার ঘটনা দৃষ্টে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে ইহার দ্বারা অস্মদ্দেশের একটী স্থায়ী ও ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ হইবে, ইহার উৎসাহীদিগের বিনা যত্ন ২রা ফাল্গুন শনিবার বালকদিগের দর্শনার্থ সমস্ত গভর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য বিদ্যালয় বন্ধ হইয়াছিল, বালকদিগের পক্ষে ইহা এক উৎসাহের বিষয় বলিতে হইবে। এবং মেলাও তদ্দ্বারা বহুজনাকীর্ণ হওয়াতে উৎসাহীদিগের মনে ইহার ভাবী উন্নতির আশাও ক্রমশঃ বলবত্তর হইতেছে।

এবৎসর মেলাটী অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা পূর্ব্বে কিছু স্থাপিত করিবার মানসে পূর্ব্ব হইতেই দ্রব্যাদির আয়োজন হইয়াছিল। আমরা মনে করিয়াছিলাম এ বৎসর বহুবিধ দ্রব্যাদির আয়োজন হইবে কিন্তু আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইতে পারি নাই। যে সকল দ্রব্য আসিয়াছিল তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিতে হইবে, তদ্দৃষ্টে দর্শকগণের মনেও ইহার ক্রমশঃ উন্নতির আশা সঞ্চা[র] [ক]রিত ১লা ফাল্গুন শুক্রবার সমস্ত দ্রব্যাদি যথাস্থানে নিয়োজিত হইয়াছিল এবং প্রায় ২০০ প্রদর্শক ব্যক্তি সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন।

শনিবার প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রায় তিন সহস্র দর্শক উপস্থিত ছিলেন। অপরাহ্ণ সার্দ্ধ চারি ঘটিকার সময়, মেলার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর এই বিষয়ে নিম্নলিখিত উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা বক্তৃতা পাঠ করিলেন।

কতকগুলি লোকের উৎসাহে ও যত্নে এই মেলার ক্রমোন্নতি হইতেছে। অদ্যকার আয়োজন দেখিয়া যেমন মনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হইতেছে তেমনি দুঃখেরও উদ্রেক হইতেছে, বাবু গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অকাল মৃত্যুই এই দুঃখের কারণ। যতদিন এই মেলা থাকিবে তাবৎকাল তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রমের ফল লোকের মনে জাগরূক থাকিবে সন্দেহ নাই। যাহাই হউক ভাগ্যই বলবান। এই বিষয়ে মনুষ্যের হস্ত নাই যাহা ঈশ্বরের কার্য্য তাহাতে শোক করা বৃথা। এক্ষণে ঈশ্বর স্মরণ করিয়া কার্য্যারম্ভ করা আবশ্যক। কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে বর্ত্তমান সম্পাদকদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। তাঁহারা স্বহস্তে যে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন, তাহাতে উৎসাহ বারি সিঞ্চন করা সকলের কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই ইহার প্রকৃত ফল উপলব্ধ হইবে। এক্ষণে ঈশ্বর সহায়। তাঁহার সাহায্য ও অনুগ্রহ ভিন্ন কোন কার্য্যই লব্ধ হয় নাই।

তদনন্তর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র সম্বৎসরের কার্য্যবিবরণ এবং মেলার উদ্দেশ্য বিষয়ক একটী প্রস্তাব পাঠ করিলেন। অবশেষে সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অভ্যাগত ব্যক্তিগণের আহ্বানার্থ এক উৎকৃষ্ট সুশ্রাব্য প্রস্তাব পাঠ করিলেন। তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল।—

অদ্যকার এই যে অপূর্ব্ব সমারোহ ইহা এত দিন পরে ইহার প্রকৃত নাম ধারণ করিয়াছে, ইহা হিন্দু মেলা নামে আপনাকে লোক সমক্ষে পরিচয় দিতেছে। বিহঙ্গ-শাবক যেমন অল্পে অল্পে আপনার বল পরীক্ষা পূর্ব্বক ক্রমে উচ্চতর নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইতে সাহসী হয়, সেই রূপ প্রথমে জাতীয় মেলা চৈত্র মেলা এইরূপ অস্ফুট শব্দ আমারদের শ্রবণে আনন্দ বর্ষণ করিয়াছিল, এক্ষণে "হিন্দুমেলা" এই সুস্পষ্ট নাম দ্বারা মেলার প্রকৃত মূর্ত্তি প্রকাশ পাইতেছে, এমন কি ইহার উদ্দেশ্য ইহার নামেতে[ই] প্রকাশ পাইতেছে, সুতরাং তাহা কাহারো নিকটে আর গোপন থাকিতে পারে না। জগদীশ্বর ধন্য, তিনিই কেবল আমারদের হৃদয়ের আশাকে ব্যর্থ হইতে দিতেছেন না, তাঁহার মৃত সঞ্জীবনী শক্তি আমাদের এই মুমূর্ষু অবস্থাতে প্রাণ দান করিয়া আমারদিগকে সজীব ও উন্নত রাখিতেছে। নতুবা এ দুর্দ্দিনের সময় আমারদের আর আশা কি? যিনি মেঘের মধ্য হইতে বিদ্যুৎ আকর্ষণ করিয়া দিক্ দিগন্ত উজ্জ্বল করেন তিনিই বঙ্গদেশের মুখশ্রীকে অদ্যকার এই প্রীতিপূর্ণ নবোৎসাহে উজ্জ্বলিত করিতেছেন, অতএব তাঁহাকে শত শত নমস্কার।

মেলার কি উদ্দেশ্য এবং তাহা কতদূর ফলদায়ক এবং বাঞ্ছিতফল লাভে তাহা কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে, এ সকল প্রশ্নের উত্তর মুখে ব্যক্ত করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা দেখিতেছি না। এক্ষণে এরূপ সময় উপস্থিত হইয়াছে, যে [এই] বিস্তীর্ণ মেলারূপ সাগরে; নানা নদী নানা রত্ন লইয়া তাহার সেবার্থ সমাগত হইতেছে; কেহ তাহাদিগকে আহ্বান করে নাই, তাহারা আপনাদের হৃদয়ের স্বাধীন প্রীতি দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া স্বহস্তে বিরচিত অলঙ্কার দ্বারা মেলাকে সুসজ্জিত করিতেছে। বিজ্ঞান, শিল্প, কৃষি, হস্তের কারিকরি, বাহুর বল, মনের উৎসাহ, ধনবানের বিত্ত, দরিদ্রের কায়িক পরিশ্রম, বন্ধুগণের সাহায্য, পণ্ডিতগণের মস্তিষ্ক, গায়কগণের কণ্ঠ নিঃসৃত অমৃত ধারা, সকলই এই মেলার বিশাল বক্ষে স্থান পাইয়া, পরস্পর পরস্পরের শোভাজনন হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। দেশীয়গণের ঐক্যবন্ধন এতদিন কেবল মুখে মুখে বিচরণ করিয়া কাতর হইতেছিল, এক্ষণে তাহা কার্য্যে স্ফূর্তি পাইতেছে। কত লোকের যে কত যত্ন কত চেষ্টা ও কত পরিশ্রম ইহাতে প্রয়োজন হইয়াছে, আমার বলা বৃথা। সভ্য মহাশয়েরা যাঁহারা অদ্য এখানে উপস্থিত আছেন, সকলেই তাহা আপনা আপনাতেই অনুভব করিয়া অবগত হইতে পারিতেছেন, বিশেষতঃ যাঁহার প্রাণপণ যত্ন ও উৎসাহে গুরুতর কার্য্য সকল বাল্যক্রীড়ার ন্যায় অনায়াস-সাধ্যরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, দেশের উন্নতি মেলার লীলাতে হাস্য করিতেছে; (ইহা এক প্রকার অসাধ্য সাধন বলিতে হইবে)— অদ্ভুত ব্যাপার স্বচ্ছন্দে অকাতরে নির্ব্বাহ হইতেছে, তিনি কি তাহা অবগত নহেন? কিন্তু কেবল কার্য্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি থাকাতে এবং উৎসাহে ও আনন্দে তাঁহার মন মগ্ন থাকাতে সে বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্য হইতেছে না। ইহাদের সকলকে ধন্যবাদ দিবার আমার সাধ্য নাই: নিশীথের তারকা সকল ধ্বনি উচ্চারণ না করিয়াও যেমন সঙ্গীত করে, সেইরূপ আমাদের দেশীয় ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয় একতান হইয়া যে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছে এবং চিরকাল করিতে থাকিবে, তাহা মুখে ব্যক্ত করিলে তাহার গৌরবের লাঘব করা হয় মাত্র আর কিছুই হয় না। সর্ব্বশেষে আর এক

ভাব সহসা মনে আসিয়া উদিত হইতেছে, কিন্তু তাহা উল্লেখ করা মেলার এই উৎসবের সময় কতদূর সঙ্গত তাহা জানি না, কিন্তু সেই প্রশান্ত মূর্ত্তি মনে হইলে— সেই অমায়িক বিক্ষুব্ধ ধীর প্রকৃতি মনে হইলে কোন্ পাষাণ হৃদয়ে অশ্রুর সঞ্চার না হইবে। বিশেষতঃ সেই এই স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া এই হৃদয়ের অধীরতাকে কে নিবারণ করিতে পারে? যদি আক্ষেপ মূর্ত্তিমান হয়, তবে এ স্থান তাহাকেই সাজে; এই পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইলাম॥

এইরূপে কার্য্য আরম্ভ হইলে, কোন স্থানে সুবিখ্যাত কথক কথকতার দ্বারা শ্রোতৃগণের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন, কোন স্থানে কোন ব্যক্তি তাড়ীতের কৌশল সমস্ত দেখাইতে লাগিলেন, এবং বহির্দ্দেশে মল্লগণ তাহাদিগের অস্ত্র শিক্ষার নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে লাগিল। দর্শকগণ সমস্ত দিবস ইতস্ততঃ দর্শন করিয়া সূর্য্যাস্তের সময় প্রস্থান করিলেন।

রবিবার প্রাতেই দর্শনীয় বস্তু সমস্ত যথা স্থানে নিয়োজিত হইল। পরীক্ষকগণ দশম ঘটিকার সময় উপস্থিত হইলেন এবং বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া সমস্ত দ্রব্যের মূল্য নির্ণয় করিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভীষ্মদেবের জীবন চরিত প্রস্তুত করিয়া বহুজন সমক্ষে পাঠ করিলেন। সেই স্থানে বাবু (?) তান লয় সংযুক্ত গায়কেরা কতকগুলি বিশুদ্ধ সুশ্রাব্য সঙ্গীত গাইয়াছিলেন। এবং মধ্যে মধ্যে সুশ্রাব্য একতান বাদন হইয়াছিল।

গৃহাভ্যন্তরে একটী কথক আপনার কথকতার নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে বংশীধ্বনি প্রভৃতি নানা প্রকার সুশ্রাব্য সঙ্গীত শাস্ত্রালাপ হইতেছিল। পার্শ্ব গৃহে বাবু মহেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য রসায়ন বিদ্যার সুকৌশল সমস্ত প্রকাশ করিতেছিলেন। অপর গৃহে পশ্চিমাঞ্চলীয় নানা প্রকার ভোজবাজী হইতেছিল।

বালকেরা সিমলা, শাঁখারীটোলা, হরিনাভি এবং বারুইপুর হইতে আসিয়া "জিম্‌নেস্‌টিক" খেলা দেখাইতেছে এবং দর্শকমণ্ডলী হইতে অনবরত প্রশংসা ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। কোন স্থানে মল্লযুদ্ধ; কোন স্থানে অস্ত্র শিক্ষার কৌশল, কোন স্থানে পাইকদিগের নানাপ্রকার বল, বিক্রম প্রকাশ, কোন স্থানে ভেড়ার যুদ্ধ, কোন স্থানে ভাল্লুক নাচ, কোন স্থানে মণিপুরের লোকদিগের ও দেশীয় বাবুদিগের ঘোড় দৌড়, বাহিরে জলাশয়ে সন্তরণ এবং নৌকা চালান ইত্যাদি নানা স্থানে নানা প্রকার ক্রীড়া হইতেছে; দর্শকগণ আগ্রহ সহকারে দেখিয়া বেড়াইতেছেন।

দর্শনীয় বস্তু সমস্ত নানা প্রকার ও অত্যন্ত মনোহারী হইয়াছিল এবং এত অধিক পারিমাণে আয়োজিত হইয়াছিল, যে তাহাদিগের নাম যথা ক্রমে প্রকাশ করা সুকঠিন। তন্মধ্যে অত্যুৎকৃষ্ট দ্রব্যাদির নাম প্রকাশ করা আবশ্যক। শ্রমজাত দ্রব্যাদি ভিতরে সজ্জিত রাখা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে কৃষি-জাত দ্রব্য, অন্যান্য গৃহ ব্যবহৃত ও রন্ধনের যন্ত্রাদি এবং বঙ্গদেশীয় রন্ধনের দ্রব্যাদি আয়োজিত ছিল। কৃত্রিম ফল সমস্ত স্বাভাবিক বর্ণে এবং আকারে প্রস্তুত হইয়াছিল। ঢাকা এবং অন্যান্য প্রদেশীয় সুতা-নির্ম্মিত বস্ত্র প্রদর্শিত হইয়া সূচের কার্য্য

এবং নানা দেশীয় শিল্প কার্য্য সমস্ত স[হ] স্থাপিত উৎকৃষ্ট গজদন্ত নির্ম্মিত খেলানা দেশীয় সঙ্গীত যন্ত্র, সুতা এবং বা[দ্য] প্রস্তুত করিবার যন্ত্র; নানা প্রকার লৌহ নির্ম্মিত দ্রব্যাদি, একটী ক্ষুদ্র মৃণ্ময় জমিদারী কাছারী নীল কুঠি, ও ঠাকুর দালান এবং কয়েদীদিগের শ্রমজাত সামগ্রী ইত্যাদি বহুবিধ দ্রব্যাদির আয়োজন হইয়াছিল। এবং বাঙ্গালা পুস্তক, কতকগুলি বিক্রয়ের নিমিত্ত ও কতকগুলি দর্শনের নিমিত্ত স্থাপিত ছিল।

বহুবিধ জীবিত পক্ষী, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৌবাচ্ছায় নানা প্রকার জীবিত মৎস্য ও আর আর নানা প্রকার সুদৃশ্য পশু, পক্ষী, মৎস্য প্রভৃতি জীবজন্তুগণ যথাস্থানে সংরক্ষিত হইয়াছিল। গৃহের সম্মুখ এবং ভিতরে নানা প্রকার চিত্রিত ও সুদৃশ্য পশম নির্ম্মিত এবং নানা প্রকার মৃত্তিকা ও প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি সকল স্থাপিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে দুইটী মূর্ত্তি অতিশয় দীর্ঘাকার।

পূর্ব্বাপেক্ষা ফল, পুষ্প ও অন্যান্য উদ্ভিজ্য দ্রব্যাদির ক্রমশঃ উন্নতি দেখা যাইতেছে। এবং নানা প্রকার উৎকৃষ্ট এবং দুষ্প্রাপ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ পুষ্প সকল সংগৃহীত হইয়াছিল।

দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে, শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ দত্ত ও ব্রজনাথ দেবের অন্তঃপুর হইতে যে সমস্ত পশম নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তিগুলি আসিয়াছিল তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।— উহার মধ্যে একটী যুবতী একটী রকে বসিয়াছে, তাহার উরুতে একটী সন্তান এবং পার্শ্বদেশে একটী কুকুর রহিয়াছে; একটী প্রশস্ত মাঠের উপর নীলবর্ণের আকাশ, তাহার উপর তরল মেঘ সমস্ত যেন ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে উত্থিত হইয়া এক স্থানে মিলিত হইয়াছে। হঠাৎ দেখিলেই স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। দর্শকগণ সমস্ত বস্তু দেখিয়া প্রশংসা করিবেন, ইহাই আমাদিগের উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্যটী সম্পূর্ণরূপে সার্থক হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটী হীরক খচিত হুঁকা, এবং একটী বৃহদাকার তানপুরা দর্শকমণ্ডলীর মনকে আকর্ষণ করিয়াছিল।

এই বৎসর বালক, বৃদ্ধ, যুবা এবং ভিন্ন জাতিতে প্রায় বিংশতি সহস্র হাজার লোক একত্র হইয়াছে। বাগানের মধ্য দেশ হইতে গৃহের পশ্চিম দিক পর্য্যন্ত অনেকগুলি তাঁবু সংস্থাপিত হইয়াছিল। দর্শকগণের সূর্য্য উত্তাপ হইতে বিশ্রামের নিমিত্ত প্রত্যেক তাঁবুতে বেঞ্চও দেওয়া হইয়াছিল। কতকগুলিতে লেম্পেনেড, সোডা ওয়াটার, বরফ ইত্যাদি, কতকগুলিতে [ ] বাজারের দ্রব্যাদি বিক্রয় হইতেছিল, এবং অন্যান্যগুলি ফটগ্রাফ [ ]-কারদিগের চিত্রালয় হইয়াছিল। নানা স্থানে নানা প্রকার মিষ্ট দ্রব্য, নারিকেল, আপেল, ইক্ষু, সোডা ওয়াটার, ও লেমনেড প্রভৃতি দ্রব্যের দোকান স্থাপিত হইয়াছিল। বাগানের প্রধান পথের দুই পার্শ্বে নিশান দেওয়া হইয়াছিল, ও পার্শ্বভূমি এবং দমদমার রাস্তা সমাগত রথীদিগের গাড়িতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এই সমস্ত দেখিয়া ইহার উৎসাহীদিগের মনে যে কত আনন্দ হইয়াছে তাহা সহজেই সকলে অনুভব করিতে পারেন।

এই মেলা স্বদেশীয়দিগের উৎসাহ, যত্ন এবং চেষ্টায় স্থাপিত সুতরাং সর্ব্ব সাধারণের মানসিক ও শারীরিক উন্নতি সাধন হয় ইহাই আমাদিগের লক্ষ্য, ইহার দ্বারা পরিশ্রমের বৃদ্ধি ও তদ্দ্বারা উন্নতির আশাও ক্রমশঃ [ফল]বতী হইতেছে। ইহার দ্বারা সাধারণ জনগণের মনকে ক্রমশঃ উন্নতির পথে আনাই আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য।

১৭৯১ শকের হিন্দুমেলার আয় ব্যয় বিবরণ

১৭৯০ শকের চাঁদা আদায়	১৩০।৶০
১৭৯১ শকের চাঁদা আদায়	১৬১৮
১৭৯২ শকের অগ্রিম চাঁদা আদায়	৩০০
হাওলাত জমা	৫৮৮॥৶০
১৭৯০ শকের মেলার পুস্তকাদি বিক্রয়	২৮৸৴০
গত বৎসরের স্থিত	...
	২৬৬৬...

ব্যয়।

গত বৎসরের নানা প্রকার ছাপা প্রভৃতি ব্যয়ের হাওলাত শোধ	১১৬।৴০
মালীদিগের পুরস্কার	১২৯
প্রস্তাব লিখিবার পুরস্কার	২৭১
মণিপুরের ঘোড় দৌড় জন্য	১০০
পণ্ডিতদিগের বিদায় ও গাড়ি ভাড়া	১২৫৸০
নানাপ্রকার কার্য্যের জন্য গাড়ি ভাড়া	১১১৶০
তাম্বুর ভাড়া	৩৫২
বোট ভাড়া	২৭
ব্যায়ামাদির ব্যয়	৪৪॥০
বিবিধ বাজে খরচ	৫৪।০
ব্যয় নিসান তৈয়ারির	৫৩
বাগানের পরিষ্কার প্রভৃতি নানাবিধ ব্যয়	২৪৫।৶০
১৭৯০ শকের মেলার বিবরণ ছাপার ব্যয়	১৫২
বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ছাপার ব্যয়	২১১
কর্ম্মচারিদিগের বেতন ও টাকা আদায়ের কমিসন	১৮৫
নহবত খানা ও গেট তৈয়ারি ব্যয়	৬০
গায়ক ও বাদ্যকরদিগের পুরস্কার ১৭৯০ ও ৯১ শকের	১২৫
মেডেল তৈয়ারি ব্যয়	২৯৮
মজুত	৪
	২৬৬৬ ...

স্বরলিপি

প্রাচীন বাংলা গান

বাহার বাগেশ্রী

বল দেখি বিধুমুখি আমারে কি ছিল মনে
সতত তোমার লাগি জ্বলেছি[1] পরাণে
পরেরি পরাণ তুমি   তব অনুগত আমি
দেশেতে আছে বদ্‌নামী তব কারণে।
প্রাণ তোমারি আশা করে এদেশেতে আশা ফিরে
এসে পেয়েছি তোমারে দেখেছি বেঁচেছি প্রাণে॥

কথা॥ শ্রীধর কথক   সুরসংগ্রহ॥ শ্রীকালীপদ পাঠক   স্বরলিপি॥ শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

II II ধা ণা পা মা। মধা ধপা মজ্ঞা মা। মা মণা ধা ণপা। পা পধণর্সা র্সনা র্র্সা I
ব ল দে খি বি॰ ধু মু॰ খী আ মা॰ রে কি॰ ছি ল॰॰॰ ম॰ নে

না র্সা র্রা র্রা। র্সর্রর্মর্জ্ঞা -া র্রা র্সা। নর্সর্রা র্র্সা ণধণা পা। পধণর্সা -নর্রা র্সনা -র্সা II
স ত ত তো মা॰॰॰ র্ লা গি জ্ব॰॰ লে ছি॰॰ প রা॰॰॰ ॰॰ নে॰ ॰

II { র্সা র্সা না ধা। পধনর্সা -া র্সা র্সা। ধা র্রজ্ঞা র্রা র্সা। নর্সা নর্সর্রা র্র্সা ণধা I
প রে রি প রা॰॰॰ ণ্ তু মি ত ব॰ অ নু গ॰ ত॰॰ আ মি॰

ধা ণা পা সা। সা ধপা সজ্ঞা সা। র্সা র্সা র্রা র্সা। নর্সর্রর্স নর্সধণা র্রজ্ঞর্রর্সা নর্সা II
দে শে তে আ ছে ব দ্ না॰ মী ত ব কা র নে॰॰॰ ॰॰॰॰ ॰॰॰॰ ॰॰

II র্সা র্সা না ধা। ধা পধনর্সা র্সা র্সা। ধা র্রজ্ঞা র্রা র্সা। নর্সা নর্সর্রা র্র্সা ণধা I
প্রাণ্ তো মা রি আ শা॰॰॰ ক রে এ দে॰ শে তে আ॰ শা॰॰ ফি রে॰

না র্সা র্রা র্রা। র্রা র্সর্রর্মর্জ্ঞা র্রা র্সা। নর্সর্রা র্র্সা ণধণপা পা। পা পধণর্সা র্সনা র্র্সা II II
এ সে পে য়ে ছি তো॰॰॰ মা রে দে॰॰ খে ছি॰॰॰ বেঁ চে ছি॰॰॰ প্রা॰ ণে॰

১ পাঠান্তর: সদা পুড়েছি।

॥ কার্য্যবিবরণীর জন্য
১৬০ সংখ্যক পৃষ্ঠার পর দ্রষ্টব্য ॥